চিত্রসূচী

কবিতা ও গান

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

সূচনা

অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় পর্যায়ক্রমে বৈষ্ণব পদাবলী প্রকাশের কাজে যখন নিযুক্ত হয়েছিলেন, আমার বয়স তখন যথেষ্ট অল্প। সময়নির্ণয় সম্বন্ধে আমার স্বাভাবিক অন্যমনস্কতা তখনো ছিল, এখনো আছে। সেই কারণে চিঠিতে আমার তারিখকে যাঁরা ঐতিহাসিক বলে ধরে নেন তাঁরা প্রায়ই ঠকেন। বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের কাল অনুমান করা অনেকটা সহজ। বোম্বাইয়ে মেজদাদার কাছে যখন গিয়েছিলুম তখন আমার বয়স ষোলোর কাছাকাছি, বিলাতে যখন গিয়েছি তখন আমার বয়স সতেরো। নূতন-প্রকাশিত পদাবলী নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, সে আরো কিছুকাল পূর্বের কথা। ধরে নেওয়া যাক, তখন আমি চোদ্দোয় পা দিয়েছি। খণ্ড খণ্ড পদাবলীগুলি প্রকাশ্যে ভোগ করবার যোগ্যতা আমার তখন ছিল না। অথচ আমাদের বাড়িতে আমিই একমাত্র তার পাঠক ছিলুম। দাদাদের ডেস্ক্ থেকে যখন সেগুলি অন্তর্ধান করত তখন তাঁরা তা লক্ষ্য করতেন না।

পদাবলীর যে ভাষাকে ব্রজবুলি বলা হোত আমার কৌতূহল প্রধানত ছিল তাকে নিয়ে। শব্দতত্ত্বে আমার ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। টীকায় যে শব্দার্থ দেওয়া হয়েছিল তা আমি নির্বিচারে ধরে নিই নি। এক শব্দ যতবার পেয়েছি তার সমুচ্চয় তৈরি করে যাচ্ছিলুম। একটি ভালো বাঁধানো খাতা শব্দে ভরে উঠেছিল। তুলনা করে আমি অর্থ নির্ণয় করেছি। পরবর্তীকালে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ যখন বিদ্যাপতির সটীক সংস্করণ প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হলেন তখন আমার খাতা তিনি সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেলে সেই খাতা তাঁর ও তাঁর উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে ফিরে পাবার অনেক চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারি নি। যদি ফিরে পেতুম তা হলে দেখাতে পারতুম কোথাও কোথাও যেখানে তিনি নিজের ইচ্ছামত মানে করেছেন ভুল করেছেন। এটা আমার নিজের মত।

তার পরের সোপানে ওঠা গেল পদাবলীর জালিয়াতিতে। অক্ষয়-বাবুর কাছে শুনেছিলুম বালক কবি চ্যাটার্টনের গল্প। তাঁকে নকল

করবার লোভ হয়েছিল। এ কথা মনেই ছিল না যে, ঠিকমত নকল করতে হলেও, শুধু ভাষায় নয়, ভাবে খাঁটি হওয়া চাই। নইলে কথার গাঁথুনিটা ঠিক হলেও সুরে তার ফাঁকি ধরা পড়ে। পদাবলী শুধু কেবল সাহিত্য নয়, তার রসের বিশিষ্টতা বিশেষ ভাবের সীমানার দ্বারা বেষ্টিত। সেই সীমানার মধ্যে আমার মন স্বাভাবিক স্বাধীনতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারে না। তাই ভানুসিংহের সঙ্গে বৈষ্ণবচিত্তের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা নেই। এইজন্যে ভানুসিংহের পদাবলী বহুকাল সংকোচের সঙ্গে বহন করে এসেছি। একে সাহিত্যে একটা অনধিকার প্রবেশের দৃষ্টান্ত বলেই গণ্য করি।

প্রথম গানটি লিখেছিলুম একটা স্লেটের উপরে, অন্তঃপুরের কোণের ঘরে—

গহনকুসুমকুঞ্জমাঝে
মৃদুল মধুর বংশি বাজে।

মনে বিশ্বাস হল চ্যাটার্টনের চেয়ে পিছিয়ে থাকব না।

এ কথা বলে রাখি ভানুসিংহের পদাবলী ছোটো বয়স থেকে অপেক্ষাকৃত বড়ো বয়স পর্যন্ত দীর্ঘকালের সূত্রে গাঁথা। তাদের মধ্যে ভালোমন্দ সমান দরের নয়।

উৎসর্গ

ভানুসিংহের কবিতাগুলি ছাপাইতে তুমি আমাকে অনেকবার অনুরোধ করিয়াছিলে। তখন সে অনুরোধ পালন করি নাই। আজ ছাপাইয়াছি, আজ তুমি আর দেখিতে পাইলে না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
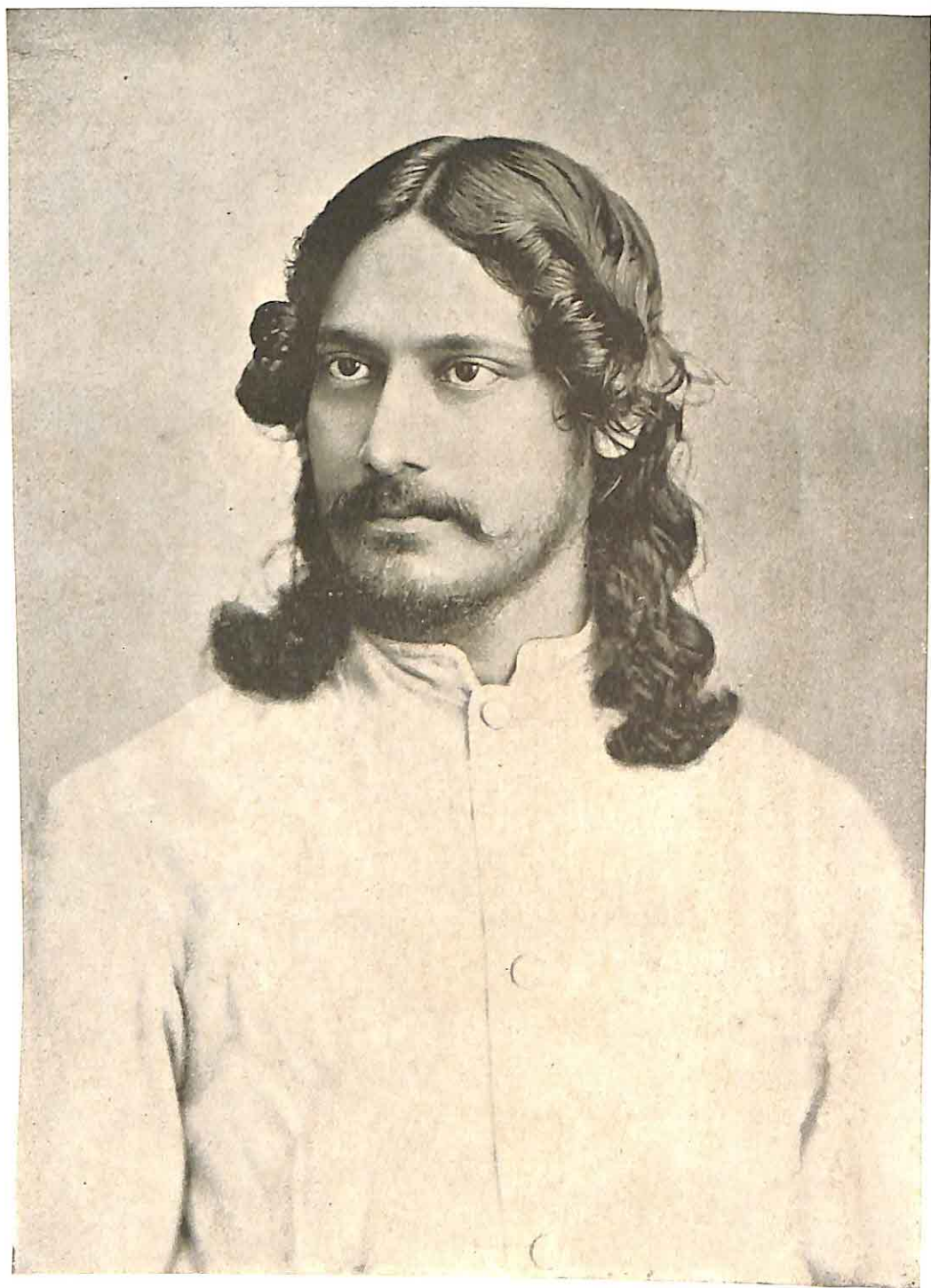
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

১

বসন্ত আওল রে !
মধুকর গুন গুন, অমুয়ামঞ্জরী
কানন ছাওল রে।
শুন শুন সজনী হৃদয় প্রাণ মম
হরখে আকুল ভেল,
জর জর রিঝসে দুখ জ্বালা সব
দূর দূর চলি গেল।
মরমে বহই বসন্তসমীরণ,
মরমে ফুটই ফুল,
মরমকুঞ্জ'পর বোলই কুহু কুহু
অহরহ কোকিলকুল।
সখি রে উছসত প্রেমভরে অব
ঢলঢল বিহ্বল প্রাণ,
নিখিল জগত জনু হরখভোর ভই
গায় রভসরসগান।
বসন্তভূষণভূষিত ত্রিভুবন
কহিছে, দুখিনী রাধা,
কঁহি রে সো প্রিয়, কঁহি সো প্রিয়তম,
হৃদিবসন্ত সো মাধা ?
ভানু কহত, অতি গহন রয়ন অব,
বসন্তসমীরশ্বাসে
মোদিত বিহ্বল চিত্তকুঞ্জতল
ফুল্ল বাসনা-বাসে।

২

শুনহ শুনহ বালিকা,
রাখ কুসুমমালিকা,
কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখি শ্যামচন্দ্র নাহি রে।
দুলই কুসুমমুঞ্জরী,
ভমর ফিরই গুঞ্জরি,
অলস যমুনা বহয়ি যায় ললিত গীত গাহি রে।
শশিসনাথ যামিনী,
বিরহবিধুর কামিনী,
কুসুমহার ভইল ভার— হৃদয় তার দাহিছে।
অধর উঠই কাঁপিয়া
সখিকরে কর আপিয়া,
কুঞ্জভবনে পাপিয়া কাহে গীত গাহিছে।
মৃদু সমীর সঞ্চলে
হরয়ি শিথিল অঞ্চলে,
চকিত হৃদয় চঞ্চলে কাননপথ চাহি রে।
কুঞ্জপানে হেরিয়া
অশ্রুবারি ডারিয়া
ভানু গায় শূন্যকুঞ্জ, শ্যামচন্দ্র নাহি রে!

৩

হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে,
কণ্ঠে বিমলিন মালা।
বিরহবিষে দহি বহি গেল রয়নী,
নহি নহি আওল কালা।
বুঝনু বুঝনু সখি বিফল বিফল সব,
বিফল এ পীরিতি লেহা—

বিফল রে এ মঝু জীবন যৌবন,
বিফল রে এ মঝু দেহা!
চল সখি গৃহ চল, মুঞ্চ নয়নজল,
চল সখি চল গৃহকাজে।
মালতিমালা রাখহ বালা,
ছি ছি সখি মরু মরু লাজে।
সখি লো দারুণ আধিভরাতুর
এ তরুণ যৌবন মোর,
সখি লো দারুণ প্রণয়হলাহল
জীবন করল অঘোর।
তৃষিত প্রাণ মম দিবসযামিনী
শ্যামক দরশন আশে,
আকুল জীবন থেহ ন মানে,
অহরহ জলত হুতাশে।
সজনি, সত্য কহি তোয়,
খোয়ব কব হম শ্যামক প্রেম
সদা ডর লাগয়ে মোয়।
হিয়ে হিয়ে অব রাখত মাধব,
সো দিন আসব সখি রে—
বাত ন বোলবে, বদন ন হেরবে,
মরিব হলাহল ভখি রে।
ঐস বৃথা ভয় না কর বালা,
ভানু নিবেদয় চরণে,
সুজনক পীরিতি নৌতুন নিতি নিতি,
নহি টুটে জীবনমরণে।

৪

শ্যাম রে, নিপট কঠিন মন তোর।
বিরহ সাথি করি সজনী রাধা
রজনী করত হি ভোর।
একলি নিরল বিরল পর বৈঠত
নিরখত যমুনা-পানে,—
বরখত অশ্রু, বচন নহি নিকসত,
পরান থেহ ন মানে।
গহনতিমির নিশি ঝিল্লিমুখর দিশি
শূন্য কদমতরুমূলে,
ভূমিশয়ন-'পর আকুল কুন্তল,
কাঁদই আপন ভুলে।
মুগধ মৃগীসম চমকি উঠই কভু
পরিহরি সব গৃহকাজে
চাহি শূন্য-'পর কহে করুণস্বর—
বাজে রে বাঁশরি বাজে।
নিঠুর শ্যাম রে, কৈসন অব তুঁহু
রহই দূর মথুরায়—
রয়ন নিদারুণ কৈসন যাপসি
কৈস দিবস তব যায়!
কৈস মিটাওসি প্রেমপিপাসা
কঁহা বজাওসি বাঁশি?
পীতবাস তুঁহু কথি রে ছোড়লি,
কথি সো বঙ্কিম হাসি?
কনকহার অব পহিরলি কণ্ঠে,
কথি ফেকলি বনমালা?
হৃদিকমলাসন শূন্য করলি রে,
কনকাসন কর আলা!

*

এ দুখ চিরদিন রহল চিত্তমে,
ভানু কহে, ছি ছি কালা !
ঝটিতি আও তুঁহু হমারি সাথে,
বিরহব্যাকুলা বালা।

৫

সজনি সজনি রাধিকা লো
দেখ অবহুঁ চাহিয়া,
মৃদুলগমন শ্যাম আওয়ে
মৃদুল গান গাহিয়া।
পিনহ ঝটিত কুসুমহার,
পিনহ নীল আঙিয়া।
সুন্দরি সিন্দূর দেকে
সীঁথি করহ রাঙিয়া।
সহচরি সব নাচ নাচ
মিলনগীতি গাও রে,
চঞ্চল মঞ্জীররাব
কুঞ্জগগন ছাও রে।
সজনি অব উজার মঁদির
কনকদীপ জালিয়া,
সুরভি করহ কুঞ্জভবন
গন্ধসলিল ঢালিয়া।
মল্লিকা চমেলী বেলি
কুসুম তুলহ বালিকা,
গাঁথ যূথি, গাঁথ জাতি,
গাঁথ বকুলমালিকা।

তৃষিতনয়ন ভানুসিংহ
কুঞ্জপথম চাহিয়া—
মৃদুলগমন শ্যাম আওয়ে,
মৃদুল গান গাহিয়া।

৬

বঁধুয়া, হিয়া'পর আও রে,
মিঠি মিঠি হাসয়ি, মৃদু মধু ভাষয়ি,
হমার মুখ'পর চাও রে!
যুগযুগসম কত দিবস বহয়ি গল,
শ্যাম তু আওলি না,
চন্দ্র-উজর মধু-মধুর কুঞ্জ'পর
মুরলি বজাওলি না!
লয়ি গলি সাথ বয়ানক হাস রে,
লয়ি গলি নয়নআনন্দ!
শূন্য কুঞ্জবন, শূন্য হৃদয়মন,
কঁহি তব ও মুখচন্দ?
ইথি ছিল আকুল গোপনয়নজল,
কথি ছিল ও তব হাসি?
ইথি ছিল নীরব বংশীবটতট,
কথি ছিল ও তব বাঁশি?
তুঝ মুখ চাহয়ি শতযুগভর দুখ
নিমিখে ভেল অবসান।
লেশ হাসি তুঝ দূর করল রে
সকল মানঅভিমান।

ধন্য ধন্য রে ভানু গাহিছে—
প্রেমক নাহিক ওর।
হরখে পুলকিত জগতচরাচর
দুঁহুক প্রেমরস ভোর।

৭

শুন সখি বাজত বাঁশি।
গভীর রজনী, উজল কুঞ্জপথ,
চন্দ্রম ডারত হাসি।
দক্ষিণপবনে কম্পিত তরুগণ,
তম্ভিত যমুনাবারি,
কুসুমসুবাস উদাস ভইল, সখি,
উদাস হৃদয় হমারি।
বিগলিত মরম, চরণ খলিতগতি,
শরম ভরম গয়ি দূর,
নয়ন বারিভর, গরগর অন্তর,
হৃদয় পুলকপরিপুর।
কহ সখি, কহ সখি, মিনতি রাখ সখি,
সো কি হমারই শ্যাম ?
মধুর কাননে মধুর বাঁশরী
বজায় হমারি নাম ?
কত কত যুগ সখি পুণ্য করনু হম,
দেবত করনু ধেয়ান,
তব ত মিলল সখি শ্যামরতন মম,
শ্যাম পরানক প্রাণ।

শ্যাম রে,
শুনত শুনত তব মোহন বাঁশি
জপত জপত তব নামে,
সাধ ভইল ময় দেহ ডুবায়ব
চাঁদউজল যমুনামে !
'চলহ তুরিত গতি শ্যাম চকিত অতি,
ধরহ সখীজন হাত,
নীদমগন মহী, ভয় ডর কছু নহি,
ভানু চলে তব সাথ।'

৮

গহন কুসুমকুঞ্জমাঝে
মৃদুল মধুর বংশি বাজে,
বিসরি ত্রাসলোকলাজে
সজনি, আও আও লো।
অঙ্গে চারু নীল বাস,
হৃদয়ে প্রণয়কুসুমরাশ,
হরিণনেত্রে বিমল হাস,
কুঞ্জবনমে আও লো।
ঢালে কুসুম সুরভভার,
ঢালে বিহগ সুরবসার,
ঢালে ইন্দু অমৃতধার
বিমল রজত ভাতি রে।
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে,
ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে
বকুল যূথি জাতি রে॥

দেখ সজনি শ্যামরায়,
নয়নে প্রেম উথল যায়,
মধুর বদন অমৃতসদন
চন্দ্রমায় নিন্দিছে।
আও আও সজনিবৃন্দ,
হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ,
শ্যামকো পদারবিন্দ
ভানুসিংহ বন্দিছে।

৯

সতিমির রজনী, সচকিত সজনী
শূন্য নিকুঞ্জঅরণ্য।
কলয়িত মলয়ে, সুবিজন নিলয়ে
বালা বিরহবিষণ্ণ!
নীল আকাশে তারক ভাসে,
যমুনা গাওত গান,
পাদপ মরমর, নির্ঝর ঝরঝর,
কুসুমিত বল্লিবিতান।
তৃষিত নয়ানে বনপথপানে
নিরখে ব্যাকুল বালা,
দেখ না পাওয়ে, আঁখ ফিরাওয়ে
গাঁথে বনফুলমালা।
সহসা রাধা চাহল সচকিত
দূরে খেপল মালা,
কহল— সজনি শুন, বাঁশরি বাজে
কুঞ্জে আওল কালা।

চকিত গহন নিশি, দূর দূর দিশি
বাজত বাঁশি সুতানে।
কণ্ঠ মিলাওল ঢলঢল যমুনা
কল কল কল্লোলগানে।
ভণে ভানু অব শুন গো কানু
পিয়াসিত গোপিনী-প্রাণ।
তোঁহার পীরিত বিমল অমৃতরস
হরষে করবে পান।

১০

বজাও রে মোহন বাঁশী
সারা দিবসক বিরহদহনদুখ,
মরমক তিয়াষ নাশি।
রিঝমনভেদন বাঁশরিবাদন
কঁহা শিখলি রে কান ?
হানে থিরথির মরমঅবশকর
লহু লহু মধুময় বাণ।
ধসধস করতহ উরহ বিয়াকুলু,
ঢুলু ঢুলু অবশনয়ান ;
কত কত বরষক বাত সোঁয়ারয়
অধীর করয় পরান।
কত শত আশা পূরল না বঁধু,
কত সুখ করল পয়ান।
পহু গো কত শত পীরিতযাতন
হিয়ে বিঁধাওল বাণ।
হৃদয় উদাসয় নয়ন উছাসয়
দারুণ মধুময় গান।
সাধ যায় বঁধু যমুনাবারিম
ডারিব দগধপরান।

সাধ যায় পহু রাখি চরণ তব
হৃদয়মাঝ হৃদয়েশ,
হৃদয়জুড়াওন বদনচন্দ্র তব
হেরব জীবনশেষ।
সাধ যায় ইহ চন্দ্রমকিরণে
কুসুমিত কুঞ্জবিতানে
বসন্তবায়ে প্রাণ মিশায়ব
বাঁশিক সুমধুর গানে।
প্রাণ ভৈবে মঝু বেণুগীতময়,
রাধাময় তব বেণু।
জয় জয় মাধব, জয় জয় রাধা,
চরণে প্রণমে ভানু।

১১

আজু সখি মুহু মুহু
গাহে পিক কুহু কুহু,
কুঞ্জবনে দুঁহু দুঁহু
দোঁহার পানে চায়।
যুবনমদবিলসিত
পুলকে হিয়া উলসিত,
অবশ তনু অলসিত
মূরছি জনু যায়।
আজু মধু চাঁদনী
প্রাণউনমাদনী,
শিথিল সব বাঁধনী,
শিথিল ভই লাজ।

বচন মৃদু মরমর,
কাঁপে রিঝ থরথর,
শিহরে তনু জরজর
কুসুমবনমাঝ।
মলয় মৃদু কলয়িছে,
চরণ নহি চলয়িছে,
বচন মুহু খলয়িছে,
অঞ্চল লুটায়।
আধফুট শতদল
বায়ুভরে টলমল
আঁখি জনু ঢলঢল
চাহিতে নাহি চায়।
অলকে ফুল কাঁপয়ি
কপোলে পড়ে ঝাঁপয়ি,
মধু অনলে তাপয়ি
খসয়ি পড়ু পায়।
ঝরই শিরে ফুলদল,
যমুনা বহে কলকল,
হাসে শশি ঢলঢল—
ভানু মরি যায়।

১২

শ্যাম, মুখে তব মধুর অধরমে
হাস বিকাশত কায়,
কোন স্বপন অব দেখত মাধব,
কহবে কোন হমায় !
নীদমেঘ'পর স্বপনবিজলিসম
রাধা বিলসত হাসি ।
শ্যাম, শ্যাম মম, কৈসে শোধব
তুঁহুক প্রেমঋণরাশি ।
বিহঙ্গ, কাহ তু বোলন লাগলি ?
শ্যাম ঘুমায় হমারা ।
রহ রহ চন্দ্রম, ঢাল ঢাল তব
শীতল জোছনধারা ।
তারকমালিনী সুন্দর যামিনী
অবহুঁ ন যাও রে ভাগি ।
নিরদয় রবি, অব কাহ তু আওলি
জ্বাললি বিরহক আগি ।
ভানু কহত— অব রবি অতি নিষ্ঠুর
নলিনমিলনঅভিলাষে
কত নরনারীক মিলন টুটাওত,
ডারত বিরহহুতাশে ।

১৩

সজনি গো,

শাঙনগগনে ঘোর ঘনঘটা

নিশীথযামিনী রে।

কুঞ্জপথে, সখি, কৈসে যাওব

অবলা কামিনী রে।

উন্মদ পবনে যমুনা তর্জিত

ঘন ঘন গর্জিত মেহ।

দমকত বিদ্যুত, পথতরু লুণ্ঠত,

থরহর কম্পত দেহ।

ঘন ঘন রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্

বরখত নীরদপুঞ্জ।

ঘোর গহন ঘন তালতমালে

নিবিড় তিমিরময় কুঞ্জ।

বোল ত সজনী এ দুরুযোগে

কুঞ্জে নিরদয় কান

দারুণ বাঁশী কাহ বজায়ত

সকরুণ রাধা-নাম।

সজনি,

মোতিমহারে বেশ বনা দে

সীঁথি লগা দে ভালে।

উরহি বিলোলিত শিথিল চিকুর মম

বাঁধহ মালত'মালে।

খোল দুয়ার ত্বরা করি সখি রে,

ছোড় সকল ভয়লাজে—

হৃদয় বিহগসম ঝটপট করত হি

পঞ্জরপিঞ্জরমাঝে।

গহন রয়নমে ন যাও বালা
নওলকিশোরক পাশ—
গরজে ঘন ঘন, বহু ডর পাওব
কহে ভানু তব দাস।

১৪

বাদরবরখন নীরদগরজন
বিজুলীচমকন ঘোর
উপেখই কৈছে আও তু কুঞ্জে
নিতি নিতি মাধব মোর।
ঘন ঘন চপলা চমকয় যব পহু,
বজরপাত যব হোয়,
তুঁহুক বাত তব সমরয়ি প্রিয়তম
ডর অতি লাগত মোয়।
অঙ্গবসন তব ভীঁখত মাধব,
ঘন ঘন বরখত মেহ—
ক্ষুদ্র বালি হম, হমকো লাগয়
কাহ উপেখবি দেহ?
বইস বইস পহু কুসুমশয়ন'পর
পদযুগ দেহ পসারি—
সিক্ত চরণ তব মোছব যতনে
কুন্তলভার উঘারি।
শ্রান্ত অঙ্গ তব হে ব্রজসুন্দর
রাখ বক্ষ-'পর মোর,
তনু তব ঘেরব পুলকিত পরশে
বাহুমৃণালক ডোর।
ভানু কহে, বৃকভানুনন্দিনী,
প্রেমসিন্ধু মম কালা,
তোঁহার লাগয় প্রেমক লাগয়
সব কছু সহবে জালা।

১৫

মাধব, না কহ আদরবাণী,
না কর প্রেমক নাম।
জানয়ি মুঝকো অবলা সরলা
ছলনা না কর শ্যাম।
কপট, কাহ তুঁহু ঝূট বোলসি
পীরিত করসি তু মোয় ?
ভালে ভালে হম অলপে চিহ্ননু
না পতিয়াব রে তোয়।
ছিদল তরী-সম কপট প্রেম'পর
ডারনু যব মনপ্রাণ,
ডুবনু ডুবনু রে ঘোর সায়রে
অব কুত নাহিক ত্রাণ।
মাধব, কঠোর বাত হমারা
মনে লাগল কি তোর ?
মাধব, কাহ তু মলিন করলি মুখ,
ক্ষমহ গো কুবচন মোর!
নিদয় বাত অব কবহুঁ ন বোলব,
তুঁহু মম প্রাণক প্রাণ।
অতিশয় নির্মম ব্যথিনু হিয়া তব
ছোড়য়ি কুবচনবাণ।
মিটল মান অব— ভানু হাসতহি
হেরই পীরিতলীলা।
কভু অভিমানিনী আদরিণী কভু
পীরিতিসাগর বালা।

১৬

সখি লো, সখি লো, নিকরুণ মাধব
মথুরাপুর যব যায়,
করল বিষম পণ মানিনী রাধা,
রোয়বে না সো, না দিবে বাধা—
কঠিনহিয়া সই, হাসয়ি হাসয়ি
শ্যামক করব বিদায়।
মৃদু মৃদু গমনে আওল মাধা,
বয়নপান তছু চাহল রাধা,
চাহয়ি রহল স চাহয়ি রহল,
দণ্ড দণ্ড সখি চাহয়ি রহল,
মন্দ মন্দ সখি নয়নে বহল
বিন্দু বিন্দু জলধার।
মৃদু মৃদু হাসে বৈঠল পাশে,
কহল শ্যাম কত মৃদু মধু ভাষে,
টুটয়ি গইল পণ, টুটইল মান,
গদগদ আকুলব্যাকুলপ্রাণ
ফুকরয়ি উছসয়ি কাঁদল রাধা,
গদগদ ভাষ নিকাশল আধা,
শ্যামক চরণে বাহু পসারি,
কহল— শ্যাম রে, শ্যাম হমারি,
রহ তুঁহু, রহ তুঁহু, বঁধু গো রহ তুঁহু,
অনুখন সাথ সাথ রে রহ পঁহু,
তুঁহু বিনে মাধব, বল্লভ, বান্ধব,
আছয় কোন হমার!
পড়ল ভূমি'পর শ্যামচরণ ধরি,
রাখল মুখ তছু শ্যামচরণ'পরি,
উছসি উছসি কত কাঁদয়ি কাঁদয়ি
রজনী করল প্রভাত।

মাধব বৈসল, মৃদু মধু হাসল,
কত অশোয়াসবচন মিঠ ভাষল,
ধরইল বালিক হাত।
সখি লো, সখি লো, বোল ত সখি লো,
যত দুখ পাওল রাধা
নিঠুর শ্যাম কিয়ে আপন মনমে
পাওল তছু কছু আধা ?
হাসয়ি হাসয়ি নিকটে আসয়ি
বহুত স প্রবোধ দেল,
হাসয়ি হাসয়ি পলটয়ি চাহয়ি
দূর দূর চলি গেল।
অব সো মথুরাপুরক পন্থমে,
ইহ যব রোয়ত রাধা,
মরমে কি লাগল তিলভর বেদন
চরণে কি তিলভর বাধা ?
বরখি আঁখিজল ভানু কহে— অতি
দুখের জীবন ভাই।
হাসিবার তর সঙ্গ মিলে বহু,
কাঁদিবার কো নাই।

১৭

বার বার সখি বারণ করনু
ন যাও মথুরাধাম।
বিসরি প্রেমদুখ রাজভোগ যথি
করত হমারই শ্যাম।
ধিক তুঁহু দাম্ভিক, ধিক রসনা ধিক,
লইলি কাহারই নাম ?
বোল ত সজনি, মথুরাঅধিপতি
সো কি হমারই শ্যাম ?

ধনকো শ্যাম সো, মথুরাপুরকো,
রাজ্য-মানকো হোয় ।
নহ পীরিতিকো, ব্রজকামিনীকো,
নিচয় কহনু ময় তোয় ।
যব তুঁহু ঠারবি সো নব নরপতি
জনি রে করে অবমান,
ছিন্নকুসুমসম ঝরব ধরা 'পর,
পলকে খোয়ব প্রাণ ।
বিসরল বিসরল সো সব বিসরল
বৃন্দাবন, সুখসঙ্গ,
নব নগরে সখি নবীন নাগর
উপজল নব নব রঙ্গ ।
ভানু কহত— অয়ি বিরহকাতরা
মনমে বাঁধহ থেহ ।
মুগুধা বালা, বুঝই বুঝলি না,
হমার শ্যামক লেহ ।

১৮

হম যব না রব সজনী,
নিভৃত বসন্ত-নিকুঞ্জবিতানে
আসবে নির্মল রজনী,
মিলনপিপাসিত আসবে যব সখি
শ্যাম হমারি আশে,
ফুকারবে যব রাধা রাধা
মুরলী ঊরধ শ্বাসে,
যব সব গোপিনী আসবে ছুটই
যব হম আসব না,
যব সব গোপিনী জাগবে চমকই
যব হম জাগব না,

তব কি কুঞ্জপথ হমারি আশে
হেরবে আকুল শ্যাম ?
বন বন ফেরই সো কি ফুকারবে
রাধা রাধা নাম ?
না যমুনা, সো এক শ্যাম মম,
শ্যামক শত শত নারী—
হম যব যাওব শত শত রাধা
চরণে রহবে তারি।
তব সখি যমুনে, যাই নিকুঞ্জে,
কাহ তয়াগব দে ?
হমারি লাগি এ বৃন্দাবনমে
কহ সখি রোয়ব কে ?
ভানু কহে চুপি— মানভরে রহ,
আও বনে ব্রজনারী,
মিলবে শ্যামক থরথর আদর
ঝরঝর লোচনবারি।

১৯

মরণ রে,
তুঁহু মম শ্যামসমান।
মেঘবরণ তুঝ, মেঘজটাজুট,
রক্ত কমলকর, রক্ত অধরপুট,
তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু-অমৃত করে দান।
তুঁহু মম শ্যামসমান।

*

মরণ রে,
শ্যাম তোঁহারই নাম !
চির বিসরল যব নিরদয় মাধব
তুঁহু ন ভইবি মোয় বাম।
আকুল রাধা-রিঝ অতি জরজর,
ঝরই নয়ন দউ অনুখন ঝরঝর,
তুঁহু মম মাধব, তুঁহু মম দোসর,
তুঁহু মম তাপ ঘুচাও,
মরণ তু আও রে আও।
ভুজপাশে তব লহ সম্বোধয়ি,
আঁখিপাত মঝু আসব মোদয়ি,
কোরউপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি
নীদ ভরব সব দেহ।
তুঁহু নহি বিসরবি, তুঁহু নহি ছোড়বি,
রাধাহৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি,
হিয় হিয় রাখবি অনুদিন অনুখন,
অতুলন তোঁহার লেহ।
দূর সঙে তুঁহু বাঁশি বজাওসি,
অনুখন ডাকসি, অনুখন ডাকসি
রাধা রাধা রাধা !
দিবস ফুরাওল, অবহুঁ ম যাওব,
বিরহতাপ তব অবহুঁ ঘুচাওব,
কুঞ্জবাট'পর অবহুঁ ম ধাওব,
সব কছু টুটইব বাধা।
গগন সঘন অব, তিমিরমগন ভব,
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘরব,
শালতালতরু সভয় তবধ সব,
পন্থ বিজন অতি ঘোর—

একলি যাওব তুঝ অভিসারে,
যা'ক' পিয়া তুঁহু কি ভয় তাহারে,
ভয় বাধা সব অভয় মুরতি ধরি,
পন্থ দেখাওব মোর।
ভানুসিংহ কহে— ছিয়ে ছিয়ে রাধা
চঞ্চল হৃদয় তোহারি,
মাধব পহু মম, পিয় স মরণসে
অব তুঁহু দেখ বিচারি।

২০

কো তুঁহু বোলবি মোয়!
হৃদয়মাহ মঝু জাগসি অনুখন,
আঁখউপর তুঁহু রচলহি আসন,
অরুণ নয়ন তব মরমসঙে মম
নিমিখ ন অন্তর হোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

হৃদয়কমল তব চরণে টলমল,
নয়নযুগল মম উছলে ছলছল,
প্রেমপূর্ণ তনু পুলকে ঢলঢল
চাহে মিলাইতে তোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

বাঁশরিধ্বনি তুহ অমিয় গরল রে,
হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরল রে,
আকুল কাকলি ভুবন ভরল রে,

উতল প্রাণ উতরোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

হেরি হাসি তব মধুঋতু ধাওল,
শুনয়ি বাঁশি তব পিককুল গাওল,
বিকল ভ্রমরসম ত্রিভুবন আওল,
চরণকমলযুগ ছোঁয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

গোপবধূজন বিকশিতযৌবন,
পুলকিত যমুনা, মুকুলিত উপবন,
নীলনীর'পর ধীর সমীরণ,
পলকে প্রাণমন খোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

তৃষিত আঁখি তব মুখ'পরে বিহরই,
মধুর পরশ তব রাধা শিহরই,
প্রেমরতন ভরি হৃদয় প্রাণ লই
পদতলে অপনা থোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

কো তুঁহু কো তুঁহু সব জন পুছয়ি,
অনুদিন সঘন নয়নজল মুছয়ি,
যাচে ভানু— সব সংশয় ঘুচয়ি,
জনম চরণ 'পর গোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

কড়ি ও কোমল

কবির মন্তব্য

যৌবন হচ্ছে জীবনে সেই ঋতুপরিবর্তনের সময় যখন ফুল ও ফসলের প্রচ্ছন্ন প্রেরণা নানা বর্ণে ও রূপে অকস্মাৎ বাহিরে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। কড়ি ও কোমল আমার সেই নবযৌবনের রচনা। আত্মপ্রকাশের একটা প্রবল আবেগ তখন যেন প্রথম উপলব্ধি করেছিলুম। মনে পড়ে তখনকার দিনে নিজের মনের একটা উদ্‌বেল অবস্থা। তখন আমার বেশভূষায় আবরণ ছিল বিরল। গায়ে থাকত ধুতির সঙ্গে কেবল একটা পাতলা চাদর, তার খুঁটোয় বাঁধা ভোরবেলায় তোলা একমুঠো বেলফুল, পায়ে একজোড়া চটি। মনে আছে থ্যাকারের দোকানে বই কিনতে গেছি কিন্তু এর বেশি পরিচ্ছন্নতা নেই, এতে ইংরেজ দোকান-দারের স্বীকৃত আদবকায়দার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ হত। এই আত্ম-বিস্মৃত বেআইনী প্রমত্ততা কড়ি ও কোমলের কবিতায় অবাধে প্রকাশ পেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে এই রীতির কবিতা তখনো প্রচলিত ছিল না। সেইজন্যেই কাব্যবিশারদ প্রভৃতি সাহিত্যবিচারকদের কাছ থেকে কটুভাষায় ভর্ৎসনা সহ্য করেছিলুম। সে-সব যে উপেক্ষা করেছি অনায়াসে সে কেবল যৌবনের তেজে। আপনার মধ্যে থেকে যা প্রকাশ পাচ্ছিল, সে আমার কাছেও ছিল নূতন এবং আন্তরিক। তখন হেম বাঁড়ুজ্জে এবং নবীন সেন ছাড়া এমন কোনো দেশপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন না যাঁরা নূতন কবিদের কোনো-একটা কাব্য-রীতির বাঁধা পথে চালনা করতে পারতেন। কিন্তু আমি তাঁদের সম্পূর্ণই ভুলে ছিলুম। আমাদের পরিবারের বন্ধু কবি বিহারীলালকে ছেলেবেলা থেকে জানতুম এবং তাঁর কবিতার প্রতি অনুরাগ আমার ছিল অভ্যস্ত। তাঁর প্রবর্তিত কবিতার রীতি ইতিপূর্বেই আমার রচনা থেকে সম্পূর্ণ স্খলিত হয়ে গিয়েছিল। বড়োদাদার স্বপ্নপ্রয়াণের আমি ছিলুম অত্যন্ত ভক্ত, কিন্তু তাঁর বিশেষ কবিপ্রকৃতির সঙ্গে আমার বোধ হয় মিল ছিল না, সেইজন্যে ভালো লাগা সত্ত্বেও তাঁর প্রভাব আমার কবিতা গ্রহণ করতে পারে নি। তাই কড়ি ও কোমলের কবিতা মনের অন্তঃস্তরের উৎসের থেকে উছলে উঠেছিল। তার সঙ্গে বাহিরের কোনো মিশ্রণ যদি ঘটে

থাকে তো সে গৌণভাবে।

এই আমার প্রথম কবিতার বই যার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বহির্দৃষ্টিপ্রবণতা দেখা দিয়েছে। আর প্রথম আমি সেই কথা বলেছি যা পরবর্তী আমার কাব্যের অন্তরে অন্তরে বারবার প্রবাহিত হয়েছে—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,—

যা নৈবেদ্যে আর-এক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।

কড়ি ও কোমলে যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে আর-একটি প্রবল প্রবর্তনা প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব। যাঁরা আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ। কড়ি ও কোমলেই তার প্রথম উদ্ভব।

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
দাদা মহাশয়
করকমলেষু
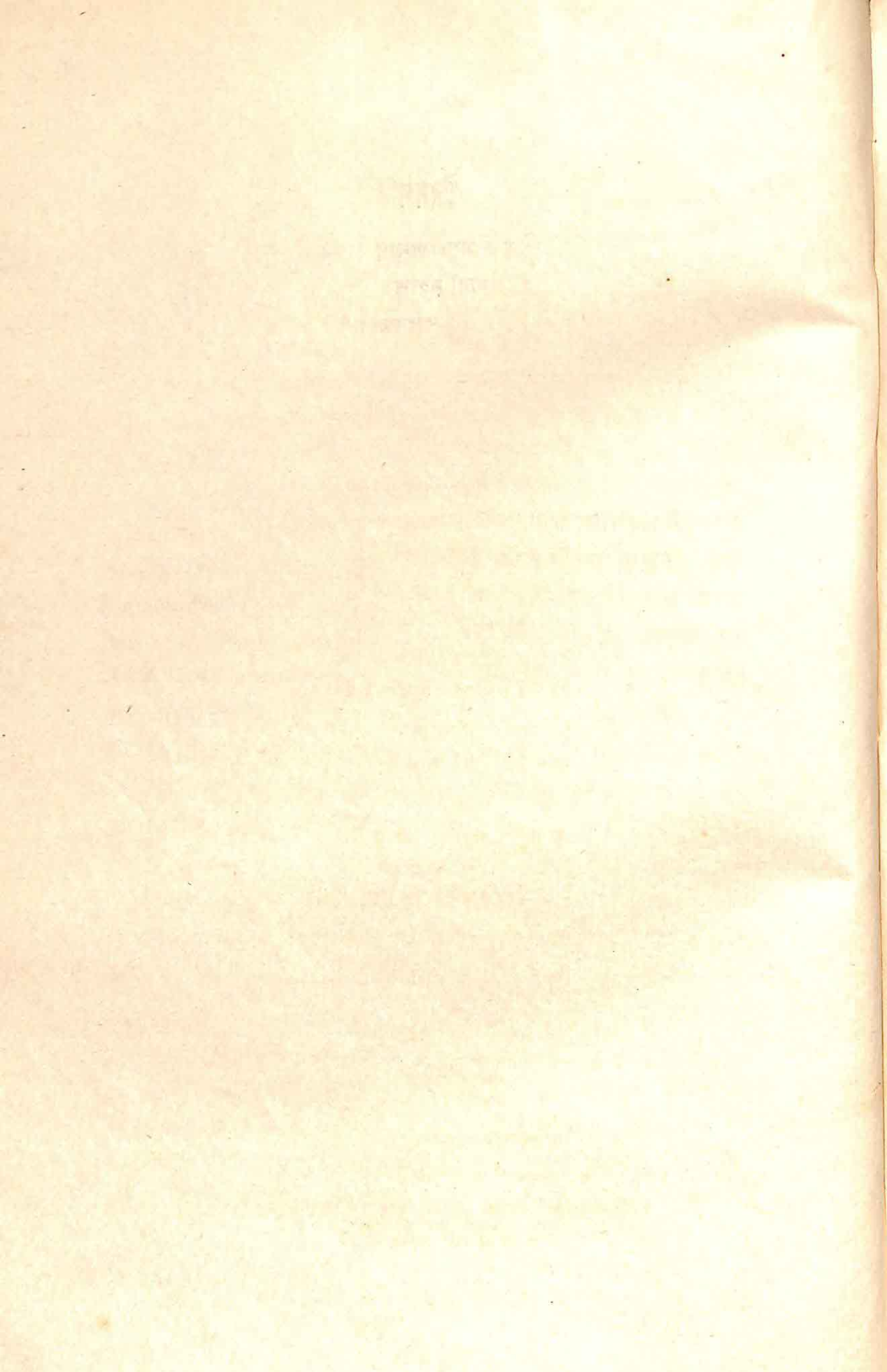
কড়ি ও কোমল

প্রাণ

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রু-ময়,
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর-আলয়।
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।
হাসিমুখে নিয়ো ফুল, তার পরে হায়
ফেলে দিয়ো ফুল, যদি সে ফুল শুকায়।

পুরাতন

হেথা হতে যাও পুরাতন!
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে।
আবার বাজিছে বাঁশি, আবার উঠিছে হাসি,
বসন্তের বাতাস বয়েছে।

সুনীল আকাশ-'পরে শুভ্র মেঘ থরে থরে
শ্রান্ত যেন রবির আলোকে,
পাখিরা ঝাড়িছে পাখা, কাঁপিছে তরুর শাখা,
খেলাইছে বালিকা বালকে।
সমুখের সরোবরে আলো ঝিকিমিকি করে,
ছায়া কাঁপিতেছে থরথর,
জলের পানেতে চেয়ে ঘাটে বসে আছে মেয়ে,
শুনিছে পাতার মরমর।
কী জানি কত কী আশে চলিয়াছে চারি পাশে
কত লোক কত সুখে দুখে,
সবাই তো ভুলে আছে কেহ হাসে কেহ নাচে,
তুমি কেন দাঁড়াও সমুখে।
বাতাস যেতেছে বহি তুমি কেন রহি রহি
তারি মাঝে ফেল দীর্ঘশ্বাস।
সুদূরে বাজিছে বাঁশি, তুমি কেন ঢাল আসি
তারি মাঝে বিলাপ-উচ্ছ্বাস।
উঠেছে প্রভাতরবি, আঁকিছে সোনার ছবি,
তুমি কেন ফেল তাহে ছায়া।
বারেক যে চলে যায় তারে তো কেহ না চায়,
তবু তার কেন এত মায়া।
তবু কেন সন্ধ্যাকালে জলদের অন্তরালে
লুকায়ে ধরার পানে চায়—
নিশীথের অন্ধকারে পুরানো ঘরের দ্বারে
কেন এসে পুন ফিরে যায়।
কী দেখিতে আসিয়াছ! যাহা কিছু ফেলে গেছ
কে তাদের করিবে যতন!
স্মরণের চিহ্ন যত ছিল পড়ে দিন-কত
ঝরে-পড়া পাতার মতন,
আজি বসন্তের বায় একেকটি করে হায়
উড়ায়ে ফেলিছে প্রতিদিন—

ধূলিতে মাটিতে রহি হাসির কিরণে দহি
ক্ষণে ক্ষণে হতেছে মলিন।
ঢাকো তবে ঢাকো মুখ নিয়ে যাও দুঃখ সুখ
চেয়ো না চেয়ো না ফিরে ফিরে।
হেথায় আলয় নাহি, অনন্তের পানে চাহি
আঁধারে মিলাও ধীরে ধীরে।

নূতন

হেথাও তো পশে সূর্যকর।
ঘোর ঝটিকার রাতে দারুণ অশনিপাতে
বিদীরিল যে গিরিশিখর—
বিশাল পর্বত কেটে, পাষাণহৃদয় ফেটে,
প্রকাশিল যে ঘোর গহ্বর—
প্রভাতে পুলকে ভাসি, বহিয়া নবীন হাসি,
হেথাও তো পশে সূর্যকর!
দুয়ারেতে উঁকি মেরে ফিরে তো যায় না সে রে,
শিহরি উঠে না আশঙ্কায়,
ভাঙা পাষাণের বুকে খেলা করে কোন্ সুখে,
হেসে আসে, হেসে চলে যায়।
হেরো হেরো, হায় হায়, যত প্রতিদিন যায়—
কে গাঁথিয়া দেয় তৃণজাল।
লতাগুলি লতাইয়া, বাহুগুলি বিথাইয়া
ঢেকে ফেলে বিদীর্ণ কঙ্কাল।
বজ্রদগ্ধ অতীতের, নিরাশার অতিথের
ঘোর স্তব্ধ সমাধি-আবাস,
ফুল এসে, পাতা এসে কেড়ে নেয় হেসে হেসে,
অন্ধকারে করে পরিহাস।

এরা সব কোথা ছিল, কেই বা সংবাদ দিল,
গৃহহারা আনন্দের দল—
বিশ্বে তিল শূন্য হলে, অনাহূত আসে চলে,
বাসা বাঁধে করি কোলাহল।
আনে হাসি, আনে গান, আনে রে নূতন প্রাণ,
সঙ্গে করে আনে রবিকর—
অশোক শিশুর প্রায় এত হাসে এত গায়
কাঁদিতে দেয় না অবসর।
বিষাদ বিশাল কায়া ফেলেছে আঁধার ছায়া
তারে এরা করে না তো ভয়—
চারিদিক হতে তারে ছোটো ছোটো হাসি মারে,
অবশেষে করে পরাজয়।
এই যে রে মরুস্থল, দাবদগ্ধ ধরাতল,
এইখানে ছিল 'পুরাতন'—
একদিন ছিল তার শ্যামল যৌবনভার,
ছিল তার দক্ষিণপবন।
যদি রে সে চলে গেল, সঙ্গে যদি নিয়ে গেল
গীত গান হাসি ফুল ফল—
শুষ্ক স্মৃতি কেন মিছে রেখে তবে গেল পিছে,
শুষ্ক শাখা শুষ্ক ফুলদল।
সে কি চায় শুষ্ক বনে গাহিবে বিহঙ্গগণে
আগে তারা গাহিত যেমন।
আগেকার মতো করে স্নেহে তার নাম ধরে
উচ্ছ্বসিবে বসন্তপবন ?
নহে নহে, সে কি হয় ! সংসার জীবনময়,
নাহি হেথা মরণের স্থান।
আয় রে, নূতন, আয়, সঙ্গে করে নিয়ে আয়
তোর সুখ, তোর হাসি গান।
ফোটা নব ফুলচয়, ওঠা নব কিশলয়,
নবীন বসন্ত আয় নিয়ে।

যে যায় সে চলে যাক, সব তার নিয়ে যাক,
নাম তার যাক মুছে দিয়ে।
এ কি ঢেউ-খেলা হায়, এক আসে, আর যায়,
কাঁদিতে কাঁদিতে আসে হাসি,
বিলাপের শেষ তান না হইতে অবসান
কোথা হতে বেজে ওঠে বাঁশি।
আয় রে কাঁদিয়া লই শুকাবে দু-দিন বই
এ পবিত্র অশ্রুবারিধারা।
সংসারে ফিরিব ভুলি, ছোটো ছোটো সুখগুলি
রচি দিবে আনন্দের কারা।
না রে, করিব না শোক, এসেছে নূতন লোক,
তারে কে করিবে অবহেলা।
সেও চলে যাবে কবে গীত গান সাঙ্গ হবে,
ফুরাইবে দু-দিনের খেলা।

উপকথা

মেঘের আড়ালে বেলা কখন যে যায়।
বৃষ্টি পড়ে সারাদিন থামিতে না চায়।
আর্দ্র-পাখা পাখিগুলি গীত গান গেছে ভুলি,
নিস্তব্ধে ভিজিছে তরুলতা।
বসিয়া আঁধার ঘরে বরষার ঝরঝরে
মনে পড়ে কত উপকথা।
কভু মনে লয় হেন এ সব কাহিনী যেন
সত্য ছিল নবীন জগতে।
উড়ন্ত মেঘের মতো ঘটনা ঘটিত কত,
সংসার উড়িত মনোরথে।

রাজপুত্র অবহেলে কোন্ দেশে যেত চলে
কত নদী কত সিন্ধু পার।
সরোবর-ঘাট আলা, মণি হাতে নাগবালা
বসিয়া বাঁধিত কেশভার।
সিন্ধুতীরে কত দূরে কোন্ রাক্ষসের পুরে
ঘুমাইত রাজার ঝিয়ারি।
হাসি তার মণিকণা কেহ তাহা দেখিত না,
মুকুতা ঢালিত অশ্রুবারি।
সাত ভাই একত্তরে চাঁপা হয়ে ফুটিত রে,
এক বোন ফুটিত পারুল।
সম্ভব কি অসম্ভব একত্রে আছিল সব
দুটি ভাই সত্য আর ভুল।
বিশ্ব নাহি ছিল বাঁধা, না ছিল কঠিন বাধা,
নাহি ছিল বিধির বিধান,
হাসিকান্না লঘুকায়া শরতের আলোছায়া
কেবল সে ছুঁয়ে যেত প্রাণ!
আজি ফুরায়েছে বেলা, জগতের ছেলেখেলা
গেছে আলো-আঁধারের দিন।
আর তো নাইরে ছুটি, মেঘরাজ্য গেছে টুটি,
পদে পদে নিয়ম-অধীন।
মধ্যাহ্নে রবির দাপে বাহিরে কে রবে তাপে,
আলয় গড়িতে সবে চায়।
যবে হায় প্রাণপণ করে তাহা সমাপন
খেলারই মতন ভেঙে যায়।

*

যোগিয়া

বহুদিন পরে আজি মেঘ গেছে চলে,
রবির কিরণসুধা আকাশে উথলে।
স্নিগ্ধ শ্যাম পত্রপুটে আলোক ঝলকি উঠে,
পুলক নাচিছে গাছে গাছে।
নবীন যৌবন যেন প্রেমের মিলনে কাঁপে,
আনন্দ বিদ্যুৎ-আলো নাচে।
জুঁই সরোবরতীরে নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে
ঝরিয়া পড়িতে চায় ভুঁয়ে,
অতি মৃদু হাসি তার, বরষার বৃষ্টিধার
গন্ধটুকু নিয়ে গেছে ধুয়ে।
আজিকে আপন প্রাণে না জানি বা কোন্‌খানে
যোগিয়া রাগিণী গায় কে রে।
ধীরে ধীরে সুর তার মিলাইছে চারিধার
আচ্ছন্ন করিছে প্রভাতেরে।
গাছপালা চারিভিতে সংগীতের মাধুরীতে
মগ্ন হয়ে ধরে স্বপ্নছবি।
এ প্রভাত মনে হয় আরেক প্রভাতময়,
রবি যেন আর কোনো রবি।
ভাবিতেছি মনে মনে কোথা কোন্ উপবনে
কী ভাবে সে গাইছে না জানি,
চোখে তার অশ্রুরেখা একটু দেছে কি দেখা,
ছড়ায়েছে চরণ দুখানি।
তার কি পায়ের কাছে বাঁশিটি পড়িয়া আছে—
আলোছায়া পড়েছে কপোলে।
মলিন মালাটি তুলি ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি
ভাসাইছে সরসীর জলে।

বিষাদ-কাহিনী তার সাধ যায় শুনিবার
কোন্‌খানে তাহার ভবন।
তাহার আঁখির কাছে যার মুখ জেগে আছে
তাহারে বা দেখিতে কেমন।
এ কী রে আকুল ভাষা! প্রাণের নিরাশ আশা
পল্লবের মর্মরে মিশালো।
না জানি কাহারে চায় তার দেখা নাহি পায়
ম্লান তাই প্রভাতের আলো।
এমন কত না প্রাতে চাহিয়া আকাশপাতে
কত লোক ফেলেছে নিশ্বাস,
সে সব প্রভাত গেছে তারা তার সাথে গেছে
লয়ে গেছে হৃদয়-হুতাশ।
এমন কত না আশা কত ম্লান ভালোবাসা
প্রতিদিন পড়িছে ঝরিয়া,
তাদের হৃদয়-ব্যথা তাদের মরণ-গাথা
কে গাইছে একত্র করিয়া।
পরস্পর পরস্পরে ডাকিতেছে নাম ধরে,
কেহ তাহা শুনিতে না পায়।
কাছে আসে বসে পাশে, তবুও কথা না ভাষে,
অশ্রুজলে ফিরে ফিরে যায়।
চায় তবু নাহি পায়, অবশেষে নাহি চায়,
অবশেষে নাহি গায় গান,
ধীরে ধীরে শূন্য হিয়া বনের ছায়ায় গিয়া
মুছে আসে সজল নয়ান।

কাঙালিনী

আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
হেরো ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।
উৎসবের হাসি-কোলাহল
শুনিতে পেয়েছে ভোরবেলা,
নিরানন্দ গৃহ তেয়াগিয়া
তাই আজ বাহির হইয়া
আসিয়াছে ধনীর দুয়ারে
দেখিবারে আনন্দের খেলা।
বাজিতেছে উৎসবের বাঁশি
কানে তাই পশিতেছে আসি,
ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে
দুরাশার সুখের স্বপন;
চারিদিকে প্রভাতের আলো
নয়নে লেগেছে বড়ো ভালো,
আকাশেতে মেঘের মাঝারে
শরতের কনক তপন।
কত কে যে আসে, কত যায়,
কেহ হাসে, কেহ গান গায়,
কত বরনের বেশভূষা—
ঝলকিছে কাঞ্চন-রতন,
কত পরিজন দাসদাসী,
পুষ্প পাতা কত রাশি রাশি,
চোখের উপরে পড়িতেছে
মরীচিকা-ছবির মতন।

হেরো তাই রহিয়াছে চেয়ে
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে।
শুনেছে সে মা এসেছে ঘরে,
তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে,
মার মায়া পায় নি কখনো,
মা কেমন দেখিতে এসেছে।
তাই বুঝি আঁখি ছলছল,
বাষ্পে ঢাকা নয়নের তারা!
চেয়ে যেন মার মুখপানে
বালিকা কাতর অভিমানে
বলে, 'মা গো এ কেমন ধারা।
এত বাঁশি, এত হাসিরাশি,
এত তোর রতন-ভূষণ,
তুই যদি আমার জননী
মোর কেন মলিন বসন!'

ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েগুলি
ভাইবোন করি গলাগলি
অঙ্গনেতে নাচিতেছে ওই ;
বালিকা দুয়ারে হাত দিয়ে
তাদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে,
ভাবিতেছে নিশ্বাস ফেলিয়ে—
আমি তো ওদের কেহ নই।
স্নেহ ক'রে আমার জননী
পরায়ে তো দেয় নি বসন,
প্রভাতে কোলেতে করে নিয়ে
মুছায়ে তো দেয় নি নয়ন।
আপনার ভাই নেই বলে
ওরে কি রে ডাকিবে না কেহ ?

আর কারো জননী আসিয়া
ওরে কি রে করিবে না স্নেহ ?
ও কি শুধু দুয়ার ধরিয়া
উৎসবের পানে রবে চেয়ে,
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে ?

ওর প্রাণ আঁধার যখন
করুণ শুনায় বড়ো বাঁশি,
দুয়ারেতে সজল নয়ন
এ বড়ো নিষ্ঠুর হাসিরাশি।
আজি এই উৎসবের দিনে
কত লোক ফেলে অশ্রুধার,
গেহ নেই, স্নেহ নেই, আহা,
সংসারেতে কেহ নেই তার।
শূন্য হাতে গৃহে যায় কেহ,
ছেলেরা ছুটিয়া আসে কাছে,
কী দিবে কিছুই নেই তার,
চোখে শুধু অশ্রুজল আছে।
অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা, আয় তোরা সব।
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব !
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস,
তবে মিছে সহকার-শাখা
তবে মিছে মঙ্গল-কলস।

ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি

সম্মুখে রয়েছে পড়ি যুগ-যুগান্তর।
অসীম নীলিমে লুটে ধরণী ধাইবে ছুটে,
প্রতিদিন আসিবে, যাইবে রবিকর।
প্রতিদিন প্রভাতে জাগিবে নরনারী,
প্রতিসন্ধ্যা শ্রান্তদেহে ফিরিয়া আসিবে গেহে,
প্রতিরাত্রে তারকা ফুটিবে সারি সারি।
কত আনন্দের ছবি, কত সুখ আশা,
আসিবে যাইবে হায়, সুখ-স্বপনের প্রায়
কত প্রাণে জাগিবে, মিলাবে ভালোবাসা।
তখনো ফুটিবে হেসে কুসুম-কানন,
তখনো রে কত লোকে কত স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে
আঁকিবে আকাশ-পটে সুখের স্বপন।
নিবিলে দিনের আলো, সন্ধ্যা হলে, নিতি
বিরহী নদীর ধারে না জানি ভাবিবে কারে,
না জানি সে কী কাহিনী, কী সুখ, কী স্মৃতি।

দূর হতে আসিতেছে, শুন কান পেতে—
কত গান, সেই মহা-রঙ্গভূমি হতে
কত যৌবনের হাসি, কত উৎসবের বাঁশি,
তরঙ্গের কলধ্বনি প্রমোদের স্রোতে।
কত মিলনের গীত, বিরহের শ্বাস,
তুলেছে মর্মর তান বসন্ত-বাতাস,
সংসারের কোলাহল ভেদ করি অবিরল
লক্ষ নব কবি ঢালে প্রাণের উচ্ছ্বাস।

ওই দূর খেলাঘরে খেলাইছ কারা!
উঠেছে মাথার 'পরে আমাদেরি তারা।

আমাদেরি ফুলগুলি সেথাও নাচিছে ছুলি,
আমাদেরি পাখিগুলি গেয়ে হল সারা।
ওই দূর খেলাঘরে করে আনাগোনা
হাসে কাঁদে কত কে যে নাহি যায় গণা।
আমাদের পানে হায় ভুলেও তো নাহি চায়,
মোদের ওরা তো কেউ ভাই বলিবে না।
ওই সব মধুমুখ অমৃত-সদন
না জানি রে আর কারা করিবে চুম্বন।
শরমময়ীর পাশে বিজড়িত আধ-ভাষে
আমরা তো শুনাব না প্রাণের বেদন।

আমাদের খেলাঘরে কারা খেলাইছ!
সাঙ্গ না হইতে খেলা চলে এনু সন্ধেবেলা,
ধূলির সে ঘর ভেঙে কোথা ফেলাইছ।
হোথা, যেথা বসিতাম মোরা দুই জন,
হাসিয়া কাঁদিয়া হত মধুর মিলন,
মাটিতে কাটিয়া রেখা কত লিখিতাম লেখা,
কে তোরা মুছিলি সেই সাধের লিখন।
সুধাময়ী মেয়েটি সে হোথায় লুটিত,
চুমো খেলে হাসিটুকু ফুটিয়া উঠিত।
তাই রে মাধবীলতা মাথা তুলেছিল হোথা,
ভেবেছিনু চিরদিন রবে মুকুলিত।
কোথায় রে, কে তাহারে করিলি দলিত।

ওই যে শুকানো ফুল ছুঁড়ে ফেলে দিলে
উহার মরম-কথা বুঝিতে নারিলে।
ও যেদিন ফুটেছিল নব রবি উঠেছিল,
কানন মাতিয়াছিল বসন্ত-অনিলে।
ওই যে শুকায় চাঁপা পড়ে একাকিনী
তোমরা তো জানিবে না উহার কাহিনী।

কবে কোন্ সন্ধেবেলা ওরে তুলেছিল বালা,
ওরি মাঝে বাজে কোন্ পুরবী রাগিণী।
যারে দিয়েছিল ওই ফুল উপহার,
কোথায় সে গেছে চলে, সে তো নেই আর।
একটু কুসুমকণা তাও নিতে পারিল না,
ফেলে রেখে যেতে হল মরণের পার ;
কত সুখ, কত ব্যথা, সুখের দুখের কথা
মিশিছে ধূলির সাথে ফুলের মাঝার।

মিছে শোক, মিছে এই বিলাপ কাতর,
সম্মুখে রয়েছে পড়ে যুগ-যুগান্তর।

মথুরায়

বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কই ?
বিহরিছে সমীরণ, কুহরিছে পিকগণ,
মথুরার উপবন কুসুমে সাজিল ওই।
বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কই ?

বিকচ বকুল ফুল দেখে যে হতেছে ভুল,
কোথাকার অলিকুল গুঞ্জরে কোথায়!
এ নহে কি বৃন্দাবন ? কোথা সেই চন্দ্রানন,
ওই কি নূপুরধ্বনি বনপথে শুনা যায় ?
একা আছি বনে বসি, পীত ধড়া পড়ে খসি,
সোঙরি সে মুখশশী পরান মজিল সই।
বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কই ?

এক বার রাধে রাধে ডাক্ বাঁশি মনোসাধে,
আজি এ মধুর চাঁদে মধুর যামিনী ভায়।

কোথা সে বিধুরা বালা, মলিন মালতীমালা,
হৃদয়ে বিরহ-জালা, এ নিশি পোহায়, হায়।
কবি যে হল আকুল, এ কি রে বিধির ভুল,
মথুরায় কেন ফুল ফুটেছে আজি লো সই ?
বাঁশরি বাজাতে গিয়ে বাঁশরি বাজিল কই ?

বনের ছায়া

কোথা রে তরুর ছায়া, বনের শ্যামল স্নেহ।
তট-তরু কোলে কোলে 	সারাদিন কলরোলে
স্রোতস্বিনী যায় চলে সুদূরে সাধের গেহ ;
কোথা রে তরুর ছায়া বনের শ্যামল স্নেহ।
কোথা রে সুনীল দিশে 	বনান্ত রয়েছে মিশে
অনন্তের অনিমিষে নয়ন নিমেষ-হারা।
দূর হতে বায়ু এসে 	চলে যায় দূর-দেশে,
গীত-গান যায় ভেসে কোন্ দেশে যায় তারা।
হাসি, বাঁশি, পরিহাস, 	বিমল সুখের শ্বাস,
মেলামেশা বারো মাস নদীর শ্যামল তীরে ;
কেহ খেলে, কেহ দোলে, 	ঘুমায় ছায়ার কোলে,
বেলা শুধু যায় চলে কুলুকুলু নদীনীরে।
বকুল কুড়োয় কেহ, কেহ গাঁথে মালাখানি ;
ছায়াতে ছায়ার প্রায় 	বসে বসে গান গায়,
করিতেছে কে কোথায় চুপিচুপি কানাকানি।
খুলে গেছে চুলগুলি, 	বাঁধিতে গিয়েছে ভুলি,
আঙুলে ধরেছে তুলি আঁখি পাছে ঢেকে যায়,
কাঁকন খসিয়া গেছে খুঁজিছে গাছের ছায়।
বনের মর্মের মাঝে 	বিজনে বাঁশরি বাজে,
তারি সুরে মাঝে মাঝে ঘুঘু দুটি গান গায়।

ঝুরু ঝুরু কত পাতা গাহিছে বনের গাথা,
কত না মনের কথা তারি সাথে মিশে যায়।
লতাপাতা কত শত খেলে কাঁপে কত মতো
ছোটো ছোটো আলোছায়া ঝিকিমিকি বন ছেয়ে,
তারি সাথে তারি মতো খেলে কত ছেলেমেয়ে।

কোথায় সে গুন গুন ঝরঝর মরমর,
কোথা সে মাথার 'পরে লতাপাতা থরথর।
কোথায় সে ছায়া আলো, ছেলেমেয়ে খেলাধূলি,
কোথা সে ফুলের মাঝে এলোচুলে হাসিগুলি।
কোথা রে সরল প্রাণ, গভীর আনন্দ-গান,
অসীম শান্তির মাঝে প্রাণের সাধের গেহ,
তরুর শীতল ছায়া, বনের শ্যামল স্নেহ।

কোথায়

হায় কোথা যাবে!
অনন্ত অজানা দেশ, নিতান্ত যে একা তুমি,
পথ কোথা পাবে!
হায়, কোথা যাবে!

কঠিন বিপুল এ জগৎ,
খুঁজে নেয় যে যাহার পথ।
স্নেহের পুতলি তুমি সহসা অসীমে গিয়ে
কার মুখে চাবে।
হায়, কোথা যাবে!

মোরা কেহ সাথে রহিব না,
মোরা কেহ কথা কহিব না।
নিমেষ যেমনি যাবে, আমাদের ভালোবাসা

আর নাহি পাবে।
হায়, কোথা যাবে!

মোরা বসে কাঁদিব হেথায়,
শূন্যে চেয়ে ডাকিব তোমায় ;
মহা সে বিজন মাঝে হয়তো বিলাপধ্বনি
মাঝে মাঝে শুনিবারে পাবে,
হায়, কোথা যাবে!

দেখো, এই ফুটিয়াছে ফুল,
বসন্তেরে করিছে আকুল ,
পুরানো সুখের স্মৃতি বাতাস আনিছে নিতি
কত স্নেহভাবে,
হায়, কোথা যাবে!

খেলাধুলা পড়ে না কি মনে,
কত কথা স্নেহের স্মরণে।
সুখে দুখে শত ফেরে সে-কথা জড়িত যে রে,
সেও কি ফুরাবে!
হায়, কোথা যাবে!

চিরদিন তরে হবে পর,
এ-ঘর রবে না তব ঘর।
যারা ওই কোলে যেত তারাও পরের মতো,
বারেক ফিরেও নাহি চাবে।
হায়, কোথা যাবে!

হায়, কোথা যাবে!
যাবে যদি, যাও যাও, অশ্রু তব মুছে যাও,
এইখানে দুঃখ রেখে যাও।
যে বিশ্রাম চেয়েছিলে, তাই যেন সেথা মিলে—

আরামে ঘুমাও।
যাবে যদি, যাও।

শান্তি

থাক্ থাক্ চুপ কর্ তোরা, ও আমার ঘুমিয়ে পড়েছে।
আবার যদি জেগে ওঠে বাছা কান্না দেখে কান্না পাবে যে।
কত হাসি হেসে গেছে ও, মুছে গেছে কত অশ্রুধার,
হেসে কেঁদে আজ ঘুমাল, ওরে তোরা কাঁদাসনে আর।

কত রাত গিয়েছিল হায়, বয়েছিল বসন্তের বায়,
পুবের জানালাখানি দিয়ে চন্দ্রালোক পড়েছিল গায় ;
কত রাত গিয়েছিল হায়, দূর হতে বেজেছিল বাঁশি,
সুরগুলি কেঁদে ফিরেছিল বিছানার কাছে কাছে আসি।
কত রাত গিয়েছিল হায়, কোলেতে শুকানো ফুলমালা
নত মুখে উলটি পালটি চেয়ে চেয়ে কেঁদেছিল বালা।
কত দিন ভোরে শুকতারা উঠেছিল ওর আঁখি 'পরে,
সমুখের কুসুম-কাননে ফুল ফুটেছিল থরে থরে।
একটি ছেলেরে কোলে নিয়ে বলেছিল সোহাগের ভাষা,
কারেও বা ভালোবেসেছিল, পেয়েছিল কারো ভালোবাসা!
হেসে হেসে গলাগলি করে খেলেছিল যাহাদের নিয়ে
আজো তারা ওই খেলা করে, ওর খেলা গিয়েছে ফুরিয়ে।
সেই রবি উঠেছে সকালে, ফুটেছে সুমুখে সেই ফুল,
ও কখন খেলাতে খেলাতে মাঝখানে ঘুমিয়ে আকুল।
শ্রান্ত দেহ, নিস্পন্দ নয়ন, ভুলে গেছে হৃদয়-বেদনা।
চুপ করে চেয়ে দেখো ওরে, থামো থামো, হেসো না কেঁদো না।

পাষাণী মা

হে ধরণী, জীবের জননী,
শুনেছি যে মা তোমায় বলে,
তবে কেন তোর কোলে সবে
কেঁদে আসে কেঁদে যায় চলে।
তবে কেন তোর কোলে এসে
সন্তানের মেটে না পিয়াসা।
কেন চায়, কেন কাঁদে সবে,
কেন কেঁদে পায় না ভালোবাসা।
কেন হেথা পাষাণ-পরান,
কেন সবে নীরস নিষ্ঠুর।
কেঁদে কেঁদে দুয়ারে যে আসে
কেন তারে করে দেয় দূর।
কাঁদিয়া যে ফিরে চলে যায়
তার তরে কাঁদিসনে কেহ,
এই কি মা জননীর প্রাণ,
এই কি মা জননীর স্নেহ!

হৃদয়ের ভাষা

হৃদয়, কেন গো মোরে ছলিছ সতত,
আপনার ভাষা তুমি শিখাও আমায়।
প্রত্যহ আকুল কণ্ঠে গাহিতেছি কত,
ভগ্ন বাঁশরিতে শ্বাস করে হায় হায়!
সন্ধ্যাকালে নেমে যায় নীরব তপন
সুনীল আকাশ হতে সুনীল সাগরে।

আমার মনের কথা, প্রাণের স্বপন
ভাসিয়া উঠিছে যেন আকাশের 'পরে।
ধ্বনিছে সন্ধ্যার মাঝে কার শান্ত বাণী,
ও কি রে আমারি গান? ভাবিতেছি তাই।
প্রাণের যে কথাগুলি আমি নাহি জানি
সে-কথা কেমন করে জেনেছে সবাই।
মোর হৃদয়ের গান সকলেই গায়,
গাহিতে পারিনে তাহা আমি শুধু হায়।

পত্র

নৌকাযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়া লিখিত

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন স্থলচরবরেষু

জলে বাসা বেঁধেছিলেম, ডাঙায় বড়ো কিচিমিচি।
সবাই গলা জাহির করে, চেঁচায় কেবল মিছিমিছি।
সস্তা লেখক কোকিয়ে মরে, ঢাক নিয়ে সে খালি পিটোয়,
ভদ্রলোকের গায়ে পড়ে কলম নেড়ে কালী ছিটোয়।
এখানে যে বাস করা দায় ভনভনানির বাজারে,
প্রাণের মধ্যে গুলিয়ে উঠে হট্টগোলের মাঝারে।
কানে যখন তালা ধরে উঠি যখন হাঁপিয়ে
কোথায় পালাই, কোথায় পালাই— জলে পড়ি ঝাঁপিয়ে।
গঙ্গাপ্রাপ্তির আশা করে গঙ্গাযাত্রা করেছিলেম।
তোমাদের না বলে কয়ে আস্তে আস্তে সরেছিলেম।

দুনিয়ার এ মজলিসেতে এসেছিলেম গান শুনতে;
আপন মনে গুনগুনিয়ে রাগ-রাগিণীর জাল বুনতে।
গান শোনে সে কাহার সাধ্যি, ছোঁড়াগুলো বাজায় বাশি,
বিদ্যেখানা ফাটিয়ে ফেলে থাকে তারা তুলো ধুনতে।
ডেকে বলে, হেঁকে বলে, ভঙ্গি করে বেঁকে বলে—

"আমার কথা শোনো সবাই, গান শোনো আর নাই শোনো !
গান যে কাকে বলে সেইটে বুঝিয়ে দেব, তাই শোনো ।"

টীকে করেন, ব্যাখ্যা করেন, জেঁকে ওঠে বক্তিমে—
কে দেখে তার হাত-পা নাড়া, চক্ষু দুটোর রক্তিমে !
চন্দ্রসূর্য জলছে মিছে আকাশখানার চালাতে—
তিনি বলেন, "আমিই আছি জলতে এবং জ্বালাতে।"
কুঞ্জবনের তানপুরোতে স্বর বেঁধেছে বসন্ত,
সেটা শুনে নাড়েন কর্ণ, হয় নাকো তাঁর পছন্দ ।
তাঁরি সুরে গাক-না সবাই টপ্পা খেয়াল ধ্রুবোদ—
গায় না যে কেউ, আসল কথা নাইকো কারো স্বর-বোধ !
কাগজওয়ালা সারি সারি নাড়ছে কাগজ হাতে নিয়ে—
বাঙলা থেকে শান্তি বিদায় তিন-শো কুলোর বাতাস দিয়ে ।
কাগজ দিয়ে নৌকো বানায় বেকার যত ছেলেপিলে,
কর্ণ ধরে পার করবেন দু-এক পয়সা খেয়া দিলে ।
সস্তা শুনে ছুটে আসে যত দীর্ঘকর্ণগুলো—
বঙ্গদেশের চতুর্দিকে তাই উড়েছে এত ধুলো ।
খুদে খুদে 'আর্য'গুলো ঘাসের মতো গজিয়ে ওঠে,
ছুঁচোলো সব জিবের ডগা কাঁটার মতো পায়ে ফোটে ।
তাঁরা বলেন,"আমিই কল্কি"— গাঁজার কল্কি হবে বুঝি !
অবতারে ভরে গেল যত রাজ্যের গলিঘুঁজি ।

পাড়ায় এমন কত আছে কত কব তার !
বঙ্গদেশে মেলাই এল বরা'-অবতার ।
দাঁতের জোরে হিন্দুশাস্ত্র তুলবে তারা পাঁকের থেকে,
দাঁতকপাটি লাগে তাদের দাঁত-খিঁচুনির ভঙ্গি দেখে ।
আগাগোড়াই মিথ্যে কথা, মিথ্যেবাদীর কোলাহল,
জিব নাচিয়ে বেড়ায় যত জিহ্বাওয়ালা সঙের দল ।
বাক্যবন্যা ফেনিয়ে আসে, ভাসিয়ে নে যায় তোড়ে—
কোনোক্রমে রক্ষে পেলেম মা-গঙ্গারই ক্রোড়ে ।

হেথায় কিবা শান্তি-ঢালা কুলুকুলু তান !
সাগর-পানে বহন করে গিরিরাজের গান।
ধীরি ধীরি বাতাসটি দেয় জলের গায়ে কাঁটা।
আকাশেতে আলো-আঁধার খেলে জোয়ারভাঁটা।
তীরে তীরে গাছের সারি পল্লবেরই ঢেউ।
সারাদিবস হেলে দোলে, দেখে না তো কেউ।
পূর্বতীরে তরুশিরে অরুণ হেসে চায়—
পশ্চিমেতে কুঞ্জমাঝে সন্ধ্যা নেমে যায়।
তীরে ওঠে শঙ্খধ্বনি, ধীরে আসে কানে,
সন্ধ্যাতারা চেয়ে থাকে ধরণীর পানে।
ঝাউবনের আড়ালেতে চাঁদ ওঠে ধীরে,
ফোটে সন্ধ্যাদীপগুলি অন্ধকার তীরে।
এই শান্তি-সলিলেতে দিয়েছিলেম ডুব,
হট্টগোলটা ভুলেছিলেম, সুখে ছিলেম খুব।

জান তো ভাই আমি হচ্ছি জলচরের জাত,
আপন মনে সাঁৎরে বেড়াই— ভাসি যে দিনরাত।
রোদ পোহাতে ডাঙায় উঠি, হাওয়াটি খাই চোখ বুজে,
ভয়ে ভয়ে কাছে এগোই তেমন তেমন লোক বুঝে।
গতিক মন্দ দেখলে আবার ডুবি অগাধ জলে,
এমনি করেই দিনটা কাটাই লুকোচুরির ছলে।
তুমি কেন ছিপ ফেলেছ শুকনো ডাঙায় বসে ?
বুকের কাছে বিদ্ধ করে টান মেরেছ কষে।
আমি তোমায় জলে টানি, তুমি ডাঙায় টানো—
অটল হয়ে বসে আছ, হার তো নাহি মানো।
আমারি নয় হার হয়েছে, তোমারি নয় জিত—
খাবি খাচ্ছি ডাঙায় পড়ে হয়ে পড়ে চিত।
আর কেন ভাই, ঘরে চলো, ছিপ গুটিয়ে নাও,
রবীন্দ্রনাথ পড়ল ধরা ঢাক পিটিয়ে দাও।

*

বিরহীর পত্র

হয় কি না হয় দেখা, ফিরি কি না ফিরি,
দূরে গেলে এই মনে হয়;
দুজনার মাঝখানে অন্ধকারে ঘিরি
জেগে থাকে সতত সংশয়।
এত লোক, এত জন, এত পথ গলি,
এমন বিপুল এ সংসার—
ভয়ে ভয়ে হাতে হাতে বেঁধে বেঁধে চলি,
ছাড়া পেলে কে আর কাহার।

তারায় তারায় সদা থাকে চোখে চোখে
অন্ধকারে অসীম গগনে।
ভয়ে ভয়ে অনিমেষে কম্পিত আলোকে
বাঁধা থাকে নয়নে নয়নে।
চৌদিকে অটল স্তব্ধ সুগভীর রাত্রি,
তরুহীন মরুময় ব্যোম—
মুখে মুখে চেয়ে তাই চলে যত যাত্রী
চলে গ্রহ রবি তারা সোম।

নিমেষের অন্তরালে কী আছে কে জানে,
নিমেষে অসীম পড়ে ঢাকা—
অন্ধ কালতুরঙ্গম রাশ নাহি মানে,
বেগে ধায় অদৃষ্টের চাকা।
কাছে কাছে পাছে পাছে চলিবারে চাই,
জেগে জেগে দিতেছি পাহারা,
একটু এসেছে ঘুম— চমকি তাকাই
গেছে চলে কোথায় কাহারা!

ছাড়িয়া চলিয়া গেলে কাঁদি তাই একা
বিরহের সমুদ্রের তীরে।
অনন্তের মাঝখানে ছু-দণ্ডের দেখা
তাও কেন রাহু এসে ঘিরে!
মৃত্যু যেন মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যায়,
পাঠায় সে বিরহের চর।
সকলেই চলে যাবে, পড়ে রবে হায়
ধরণীর শূন্য খেলাঘর।

গ্রহ তারা ধূমকেতু কত রবি শশী
শূন্য ঘেরি জগতের ভিড়,
তারি মাঝে যদি ভাঙে, যদি যায় খসি
আমাদের ছু-দণ্ডের নীড়—
কোথায় কে হারাইব! কোন্ রাত্রিবেলা
কে কোথায় হইব অতিথি!
তখন কি মনে রবে ছু-দিনের খেলা,
দরশের পরশের স্মৃতি!

তাই মনে করে কি রে চোখে জল আসে
একটুকু চোখের আড়ালে!
প্রাণ যারে প্রাণের অধিক ভালোবাসে
সেও কি রবে না এক কালে!
আশা নিয়ে এ কি শুধু খেলাই কেবল—
সুখ ছুঃখ মনের বিকার!
ভালোবাসা কাঁদে, হাসে, মোছে অশ্রুজল,
চায়, পায়, হারায় আবার।

মঙ্গলগীত

শ্রীমতী ইন্দিরা। প্রাণাধিকাসু। নাসিক

এতবড়ো এ ধরণী মহাসিন্ধু-ঘেরা
দুলিতেছে আকাশসাগরে—
দিন-দুই হেথা রহি মোরা মানবেরা
শুধু কি, মা, যাব খেলা করে।
তাই কি ধাইছে গঙ্গা ছাড়ি হিমগিরি,
অরণ্য বহিছে ফুল-ফল,—
শত কোটি রবি তারা আমাদের ঘিরি
গণিতেছে প্রতি দণ্ড পল!

শুধু কি, মা, হাসিখেলা প্রতি দিন রাত
দিবসের প্রত্যেক প্রহর!
প্রভাতের পরে আসি নূতন প্রভাত
লিখিছে কি একই অক্ষর!
কানাকানি হাসাহাসি কোণেতে গুটায়ে,
অলস নয়ননিমীলন,
দণ্ড-দুই ধরণীর ধূলিতে লুটায়ে
ধূলি হয়ে ধূলিতে শয়ন!

নাই কি, মা, মানবের গভীর ভাবনা,
হৃদয়ের সীমাহীন আশা!
জেগে নাই অন্তরেতে অনন্ত চেতনা,
জীবনের অনন্ত পিপাসা!
হৃদয়েতে শুষ্ক কি, মা, উৎস করুণার,
শুনি না কি দুখীর ক্রন্দন!
জগৎ শুধু কি, মা গো, তোমার আমার
ঘুমাবার কুসুম-আসন!

শুনো না কাহারা ওই করে কানাকানি
অতি তুচ্ছ ছোটো ছোটো কথা।
পরের হৃদয় লয়ে করে টানাটানি
শকুনির মতো নির্মমতা।
শুনো না করিছে কারা কথা-কাটাকাটি
মাতিয়া জ্ঞানের অভিমানে,
রসনায় রসনায় ঘোর লাঠালাঠি,
আপনার বুদ্ধিরে বাখানে।

তুমি এস দূরে এস, পবিত্র নিভৃতে,
ক্ষুদ্র অভিমান যাও ভুলি।
সযতনে ঝেড়ে ফেলো বসন হইতে
প্রতি নিমেষের যত ধূলি।
নিমেষের ক্ষুদ্র কথা ক্ষুদ্র রেণুজাল
আচ্ছন্ন করিছে মানবেরে,
উদার অনন্ত তাই হতেছে আড়াল
তিল তিল ক্ষুদ্রতার ঘেরে।

আছে, মা, তোমার মুখে স্বর্গের কিরণ,
হৃদয়েতে উষার আভাস,
খুঁজিছে সরল পথ ব্যাকুল নয়ন—
চারিদিকে মর্তের প্রবাস।
আপনার ছায়া ফেলি আমরা সকলে
পথ তোর অন্ধকারে ঢাকি—
ক্ষুদ্র কথা, ক্ষুদ্র কাজে, ক্ষুদ্র শত ছলে,
কেন তোরে ভুলাইয়া রাখি।

কেন, মা, তোমারে কেহ চাহে না জানাতে
মানবের উচ্চ কুলশীল—
অনন্তজগৎ-ব্যাপী ঈশ্বরের সাথে
তোমার যে সুগভীর মিল।

কেন কেহ দেখায় না— চারি দিকে তব
ঈশ্বরের বাহুর বিস্তার !
ঘেরি তোরে ভোগসুখ ঢালি নব নব
গৃহ বলি রচে কারাগার।

অনন্তের মাঝখানে দাঁড়াও, মা, আসি,
চেয়ে দেখো আকাশের পানে—
পড়ুক বিমলবিভা পূর্ণ রূপরাশি
স্বর্গমুখী কমলনয়ানে।
আনন্দে ফুটিয়া ওঠো শুভ্র সূর্যোদয়ে
প্রভাতের কুসুমের মতো,
দাঁড়াও সায়াহ্নমাঝে পবিত্র হৃদয়ে
মাথাখানি করিয়া আনত।

শোনো শোনো উঠিতেছে সুগম্ভীর বাণী,
ধ্বনিতেছে আকাশ পাতাল।
বিশ্ব-চরাচর গাহে কাহারে বাখানি
আদিহীন অন্তহীন কাল !
যাত্রী সবে ছুটিয়াছে শূন্যপথ দিয়া,
উঠেছে সংগীতকোলাহল,
ওই নিখিলের সাথে কণ্ঠ মিলাইয়া
মা, আমরা যাত্রা করি চল্।

যাত্রা করি বৃথা যত অহংকার হতে,
যাত্রা করি ছাড়ি হিংসাদ্বেষ,
যাত্রা করি স্বর্গময়ী করুণার পথে,
শিরে ধরি সত্যের আদেশ।
যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে
প্রাণে লয়ে প্রেমের আলোক,
আয়, মা গো, যাত্রা করি জগতের কাজে
তুচ্ছ করি নিজ দুঃখশোক।

জেনো, মা, এ সুখে-দুঃখে-আকুল সংসারে
মেটে না সকল তুচ্ছ আশ—
তা বলিয়া অভিমানে অনন্ত তাঁহারে
কোরো না, কোরো না অবিশ্বাস।
সুখ ব'লে যাহা চাই সুখ তাহা নয়,
কী যে চাই জানি না আপনি—
আঁধারে জলিছে ওই ওরে কোরো ভয়,
ভুজঙ্গের মাথার ও মণি।

ক্ষুদ্র সুখ ভেঙে যায় না সহে নিশ্বাস,
ভাঙে বালুকার খেলাঘর—
ভেঙে গিয়ে বলে দেয় এ নহে আবাস,
জীবনের এ নহে নির্ভর।
সকলে শিশুর মতো কত আবদার
আনিছে তাঁহার সন্নিধান—
পূর্ণ যদি নাহি হল, অমনি তাহার
ঈশ্বরে করিছে অপমান!

কিছুই চাব না, মা গো, আপনার তরে,
পেয়েছি যা শুধিব সে ঋণ—
পেয়েছি যে প্রেমসুধা হৃদয়-ভিতরে,
ঢালিয়া তা দিব নিশিদিন।
সুখ শুধু পাওয়া যায় সুখ না চাহিলে,
প্রেম দিলে প্রেমে পুরে প্রাণ,
নিশিদিশি আপনার ক্রন্দন গাহিলে
ক্রন্দনের নাহি অবসান।

মধুপাত্রে হতপ্রাণ পিপীলির মতো
ভোগসুখে জীর্ণ হয়ে থাকা,
ঝুলে থাকা বাদুড়ের মতো শির নত
আঁকড়িয়া সংসারের শাখা,

জগতের হিসাবেতে শূন্য হয়ে হায়
আপনারে আপনি ভক্ষণ,
ফুলে উঠে ফেটে যাওয়া জলবিম্ব প্রায়—
এই কি রে সুখের লক্ষণ !

এই অহিফেনসুখ কে চায় ইহাকে !
মানবত্ব এ নয় এ নয়।
রাহুর মতন সুখ গ্রাস করে রাখে
মানবের মানবহৃদয়।
মানবেরে বল দেয় সহস্র বিপদ,
প্রাণ দেয় সহস্র ভাবনা,
দারিদ্র্যে খুঁজিয়া পাই মনের সম্পদ,
শোকে পাই অনন্ত সান্ত্বনা।

চিরদিবসের সুখ রয়েছে গোপন
আপনার আত্মার মাঝার।
চারি দিকে সুখ খুঁজে শ্রান্ত প্রাণমন—
হেথা আছে, কোথা নেই আর।
বাহিরের সুখ সে, সুখের মরীচিকা—
বাহিরেতে নিয়ে যায় ছ'লে,
যখন মিলায়ে যায় মায়াকুহেলিকা
কেন কাঁদি সুখ নেই ব'লে !

দাঁড়াও সে অন্তরের শান্তিনিকেতনে
চিরজ্যোতি চিরছায়াময়—
ঝড়হীন রৌদ্রহীন নিভৃত সদনে
জীবনের অনন্ত আলয়।
পুণ্যজ্যোতি মুখে লয়ে পুণ্য হাসিখানি,
অন্নপূর্ণা জননী -সমান,
মহাসুখে সুখ দুঃখ কিছু নাহি মানি
করো সবে সুখশান্তি দান।

মা, আমার এই জেনো হৃদয়ের সাধ
তুমি হও লক্ষ্মীর প্রতিমা—
মানবেরে জ্যোতি দাও, করো আশীর্বাদ,
অকলঙ্ক মূর্তি মধুরিমা।
কাছে থেকে এত কথা বলা নাহি হয়,
হেসে খেলে দিন যায় কেটে,
দূরে ভয় হয় পাছে না পাই সময়,
বলিবার সাধ নাহি মেটে।

কত কথা বলিবারে চাহি প্রাণপণে,
কিছুতে, মা, বলিতে না পারি—
স্নেহমুখখানি তোর পড়ে মোর মনে,
নয়নে উথলে অশ্রুবারি।
সুন্দর মুখেতে তোর মগ্ন আছে ঘুমে
একখানি পবিত্র জীবন।
ফলুক সুন্দর ফল সুন্দর কুসুমে
আশীর্বাদ করো, মা, গ্রহণ।

বান্দোরা

২

শ্রীমতী ইন্দিরা। প্রাণাধিকাসু। নাসিক

চারি দিকে তর্ক উঠে সাঙ্গ নাহি হয়,
কথায় কথায় বাড়ে কথা।
সংশয়ের উপরেতে চাপিছে সংশয়,
কেবলি বাড়িছে ব্যাকুলতা।
ফেনার উপরে ফেনা, ঢেউ 'পরে ঢেউ,
গরজনে বধির শ্রবণ—
তীর কোন্ দিকে আছে নাহি জানে কেউ,
হা হা করে আকুল পবন।

এই কল্লোলের মাঝে নিয়ে এসো কেহ
পরিপূর্ণ একটি জীবন,
নীরবে মিটিয়া যাবে সকল সন্দেহ,
থেমে যাবে সহস্র বচন।
তোমার চরণে আসি মাগিবে মরণ
লক্ষ্যহারা শত শত মত,
যেদিকে ফিরাবে তুমি দুখানি নয়ন
সেদিকে হেরিবে সবে পথ।

অন্ধকার নাহি যায় বিবাদ করিলে,
মানে না বাহুর আক্রমণ।
একটি আলোকশিখা সমুখে ধরিলে
নীরবে করে সে পলায়ন।
এসো, মা, উষার আলো, অকলঙ্ক প্রাণ,
দাঁড়াও এ সংসার-আঁধারে।
জাগাও জাগ্রত হৃদে আনন্দের গান,
কূল দাও নিদ্রার পাথারে।

চারি দিকে নৃশংসতা করে হানাহানি,
মানবের পাষাণ পরান।
শাণিত ছুরীর মতো বিঁধাইয়া বাণী
হৃদয়ের রক্ত করে পান।
তৃষিত কাতর প্রাণী মাগিতেছে জল,
উল্কাধারা করিছে বর্ষণ—
শ্যামল আশার ক্ষেত্র করিয়া বিফল
স্বার্থ দিয়ে করিছে কর্ষণ।

শুধু এসে একবার দাঁড়াও কাতরে
মেলি দুটি সকরুণ চোখ,
পড়ুক দু-ফোঁটা অশ্রু জগতের 'পরে
যেন দুটি বাল্মীকির শ্লোক।

ব্যথিত করুক স্নান তোমার নয়নে,
করুণার অমৃতনির্ঝরে,
তোমারে কাতর হেরি মানবের মনে
দয়া হবে মানবের 'পরে।

সমুদয় মানবের সৌন্দর্যে ডুবিয়া
হও তুমি অক্ষয় সুন্দর।
ক্ষুদ্র রূপ কোথা যায় বাতাসে উবিয়া
দুই-চারি পলকের পর।
তোমার সৌন্দর্যে হোক মানব সুন্দর,
প্রেমে তব বিশ্ব হোক আলো।
তোমারে হেরিয়া যেন মুগ্ধ-অন্তর
মানুষে মানুষ বাসে ভালো।

বান্দোরা

৩

শ্রীমতী ইন্দিরা। প্রাণাধিকাসু। নাসিক

আমার এ গান, মা গো, শুধু কি নিমেষে
মিলাইবে হৃদয়ের কাছাকাছি এসে?
আমার প্রাণের কথা
নিদ্রাহীন আকুলতা
শুধু নিশ্বাসের মতো যাবে কি, মা, ভেসে!

এ গান তোমারে সদা ঘিরে যেন রাখে,
সত্যের পথের 'পরে নাম ধরে ডাকে।
সংসারের সুখে দুখে
চেয়ে থাকে তোর মুখে,
চির-আশীর্বাদ-সম কাছে কাছে থাকে।

বিজনে সঙ্গীর মতো করে যেন বাস,
অনুক্ষণ শোনে তোর হৃদয়ের আশ।
পড়িয়া সংসারঘোরে
কাঁদিতে হেরিলে তোরে
ভাগ করে নেয় যেন দুখের নিশ্বাস।

সংসারের প্রলোভন যবে আসি হানে
মধুমাখা বিষবাণী দুর্বল পরানে,
এ গান আপন সুরে
মন তোর রাখে পূরে,
ইষ্টমন্ত্রসম সদা বাজে তোর কানে।

আমার এ গান যেন সুদীর্ঘ জীবন
তোমার বসন হয়, তোমার ভূষণ।
পৃথিবীর ধূলিজাল
করে দেয় অন্তরাল,
তোমারে করিয়া রাখে সুন্দর শোভন।

আমার এ গান যেন নাহি মানে মানা,
উদার বাতাস হয়ে এলাইয়া ডানা
সৌরভের মতো তোরে
নিয়ে যায় চুরি করে—
খুঁজিয়া দেখাতে যায় স্বর্গের সীমানা।

এ গান যেন রে হয় তোর ধ্রুবতারা,
অন্ধকারে অনিমেষে নিশি করে সারা।
তোমার মুখের 'পরে
জেগে থাকে স্নেহভরে,
অকূলে নয়ন মেলি দেখায় কিনারা।

আমার এ গান যেন পশি তোর কানে
মিলায়ে মিশায়ে যায় সমস্ত পরানে।
তপ্ত শোণিতের মতো
বহে শিরে অবিরত,
আনন্দে নাচিয়া উঠে মহত্ত্বের গানে।

এ গান বাঁচিয়া থাকে যেন তোর মাঝে,
আঁখিতারা হয়ে তোর আঁখিতে বিরাজে।
এ যেন রে করে দান
সতত নূতন প্রাণ,
এ যেন জীবন পায় জীবনের কাজে।

যদি যাই, মৃত্যু যদি নিয়ে যায় ডাকি,
এই গানে রেখে যাব মোর স্নেহ-আঁখি।
যবে হায় সব গান
হয়ে যাবে অবসান
এ গানের মাঝে আমি যেন বেঁচে থাকি।

খেলা

পথের ধারে অশথতলে
মেয়েটি খেলা করে;
আপন-মনে আপনি আছে
সারাটি দিন ধরে।
উপর-পানে আকাশ শুধু,
সমুখ-পানে মাঠ,
শরৎকালে রোদ পড়েছে,
মধুর পথঘাট।

দুটি-একটি পথিক চলে,
গল্প করে, হাসে।
লজ্জাবতী বধূটি গেল
ছায়াটি নিয়ে পাশে।
আকাশ-ঘেরা মাঠের ধারে
বিশাল খেলাঘরে
একটি মেয়ে আপন মনে
কতই খেলা করে।

মাথার 'পরে ছায়া পড়েছে,
রোদ পড়েছে কোলে,
পায়ের কাছে একটি লতা
বাতাস পেয়ে দোলে।
মাঠের থেকে বাছুর আসে,
দেখে নূতন লোক,
ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে থাকে
ড্যাবা ড্যাবা চোখ।
কাঠবিড়ালি উস্কখুস্ক
আশেপাশে ছোটে,
শব্দ পেলে লেজটি তুলে
চমক খেয়ে ওঠে।
মেয়েটি তাই চেয়ে দেখে
কত যে সাধ যায়—
কোমল গায়ে হাত বুলায়ে
চুমো খেতে চায়!

সাধ যেতেছে কাঠবিড়ালি
তুলে নিয়ে বুকে,
ভেঙে ভেঙে টুকুটুকু
খাবার দেবে মুখে।

মিষ্টি নামে ডাকবে তারে
গালের কাছে রেখে,
বুকের মধ্যে রেখে দেবে
আঁচল দিয়ে ঢেকে।
"আয় আয়" ডাকে সে তাই—
করুণ স্বরে কয়,
"আমি কিছু বলব না তো,
আমায় কেন ভয়!"
মাথা তুলে চেয়ে থাকে
উঁচু ডালের পানে—
কাঠবিড়ালি ছুটে পালায়,
ব্যথা সে পায় প্রাণে।

রাখাল ছেলের বাঁশি বাজে
সুদূর তরুছায়,
খেলতে খেলতে মেয়েটি তাই
খেলা ভুলে যায়।
তরুর মূলে মাথা রেখে
চেয়ে থাকে পথে,
না জানি কোন্ পরীর দেশে
ধায় সে মনোরথে।
একলা কোথায় ঘুরে বেড়ায়
মায়াদ্বীপে গিয়ে—
হেনকালে চাষী আসে
দুটি গোরু নিয়ে।
শব্দ শুনে কেঁপে ওঠে,
চমক ভেঙে চায়।
আঁখি হতে মিলায় মায়া,
স্বপন টুটে যায়।

বসন্ত-অবসান

কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গান!
কখন বকুল-মূল ছেয়েছিল ঝরা ফুল,
কখন যে ফুল-ফোটা হয়ে গেল অবসান!
কখন বসন্ত গেল এবার হল না গান!

এবার বসন্তে কি রে যূথীগুলি জাগে নি রে!
অলিকুল গুঞ্জরিয়া করে নি কি মধুপান!
এবার কি সমীরণ জাগায় নি ফুলবন,
সাড়া দিয়ে গেল না তো, চলে গেল ম্রিয়মাণ!
কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গান!

যতগুলি পাখি ছিল গেয়ে বুঝি চলে গেল,
সমীরণে মিলে গেল বনের বিলাপতান।
ভেঙেছে ফুলের মেলা, চলে গেছে হাসি-খেলা,
এতক্ষণে সন্ধ্যাবেলা জাগিয়া চাহিল প্রাণ।
কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গান!

বসন্তের শেষ রাতে এসেছি রে শূন্য হাতে,
এবার গাঁথি নি মালা কী তোমারে করি দান!
কাঁদিছে নীরব বাঁশি, অধরে মিলায় হাসি,
তোমার নয়নে ভাসে ছলছল অভিমান।
এবার বসন্ত গেল, হল না, হল না গান!

বাঁশি

ওগো, শোনো কে বাজায়!
বনফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায়।
অধর ছুঁয়ে বাঁশিখানি চুরি করে হাসিখানি,
বঁধুর হাসি মধুর গানে প্রাণের পানে ভেসে যায়।
ওগো শোনো কে বাজায়!

কুঞ্জবনের ভ্রমর বুঝি বাঁশির মাঝে গুঞ্জরে,
বকুলগুলি আকুল হয়ে বাঁশির গানে মুঞ্জরে।
যমুনারই কলতান কানে আসে, কাঁদে প্রাণ,
আকাশে ঐ মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায়!
ওগো শোনো কে বাজায়!

বিরহ

আমি নিশি-নিশি কত রচিব শয়ন
আকুলনয়ন রে!
কত নিতি-নিতি বনে করিব যতনে
কুসুমচয়ন রে!
কত শারদ যামিনী হইবে বিফল,
বসন্ত যাবে চলিয়া!
কত উদিবে তপন আশার স্বপন,
প্রভাতে যাইবে ছলিয়া!
এই যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া,
মরিব কাঁদিয়া রে!
সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব
সাধিয়া সাধিয়া রে।

*

আমি কার পথ চাহি এ জনম বাহি,
কার দরশন যাচি রে!
যেন আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া,
তাই আমি বসে আছি রে।
তাই মালাটি গাঁথিয়া পরেছি মাথায়
নীলবাসে তনু ঢাকিয়া,
তাই বিজন আলয়ে প্রদীপ জ্বালায়ে
একেলা রয়েছি জাগিয়া।
ওগো তাই কত নিশি চাঁদ ওঠে হাসি,
তাই কেঁদে যায় প্রভাতে।
ওগো তাই ফুলবনে মধুসমীরণে
ফুটে ফুল কত শোভাতে!

ওই বাঁশিস্বর তার আসে বারবার,
সেই শুধু কেন আসে না!
এই হৃদয়-আসন শূন্য যে থাকে,
কেঁদে মরে শুধু বাসনা।
মিছে পরশিয়া কায় বায়ু বহে যায়,
বহে যমুনার লহরী,
কেন কুহু কুহু পিক কুহরিয়া ওঠে—
যামিনী যে ওঠে শিহরি।
ওগো যদি নিশিশেষে আসে হেসে হেসে,
মোর হাসি আর রবে কি!
এই জাগরণে ক্ষীণ বদন মলিন
আমারে হেরিয়া কবে কী!
আমি সারা রজনীর গাঁথা ফুলমালা
প্রভাতে চরণে ঝরিব,
ওগো আছে সুশীতল যমুনার জল—
দেখে তারে আমি মরিব।

বাকি

কুসুমের গিয়েছে সৌরভ,
জীবনের গিয়েছে গৌরব।
এখন যা-কিছু সব ফাঁকি,
ঝরিতে মরিতে শুধু বাকি।

বিলাপ

ওগো এত প্রেম-আশা প্রাণের তিয়াষা
কেমনে আছে সে পাসরি!
তবে সেথা কি হাসে না চাঁদিনী যামিনী,
সেথা কি বাজে না বাঁশরি!
সখী, হেথা সমীরণ লুটে ফুলবন,
সেথা কি পবন বহে না!
সে যে তার কথা মোরে কহে অনুক্ষণ,
মোর কথা তারে কহে না!
যদি আমারে আজি সে ভুলিবে সজনী
আমারে ভুলালে কেন সে!
ওগো এ চির জীবন করিব রোদন
এই ছিল তার মানসে!
যবে কুসুমশয়নে নয়নে নয়নে
কেটেছিল সুখরাতি রে,
তবে কে জানিত তার বিরহ আমার
হবে জীবনের সাথি রে!
যদি মনে নাহি রাখে, সুখে যদি থাকে,
তোরা একবার দেখে আয়—
এই নয়নের তৃষা পরানের আশা
চরণের তলে রেখে আয়।

আর নিয়ে যা রাধার বিরহের ভার,
কত আর ঢেকে রাখি বল্।
আর পারিস যদি তো আনিস হরিয়ে
এক-ফোঁটা তার আঁখিজল।
না না, এত প্রেম সখী ভুলিতে যে পারে
তারে আর কেহ সেধো না।
আমি কথা নাহি কব, দুখ লয়ে রব,
মনে মনে স'ব বেদনা।
ওগো মিছে, মিছে সখী, মিছে এই প্রেম,
মিছে পরানের বাসনা।
ওগো সুখদিন হায় যবে চলে যায়
আর ফিরে আর আসে না।

সারাবেলা

হেলাফেলা সারাবেলা
এ কী খেলা আপন-সনে!
এই বাতাসে ফুলের বাসে
মুখখানি কার পড়ে মনে!
আঁখির কাছে বেড়ায় ভাসি
কে জানে গো কাহার হাসি!
দুটি-ফোঁটা নয়নসলিল
রেখে যায় এই নয়নকোণে।
কোন্ ছায়াতে কোন্ উদাসী
দূরে বাজায় অলস বাঁশি,
মনে হয় কার মনের বেদন
কেঁদে বেড়ায় বাঁশির গানে।

সারাদিন গাঁথি গান
কারে চাহে, গাহে প্রাণ,
তরুতলের ছায়ার মতন
বসে আছি ফুলবনে।

আকাঙ্ক্ষা

আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে
কী জানি পরান কী যে চায়!
ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে
বিহগবিহগী কী যে গায়!
আজি মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে,
রহে না আবাসে মন হায়!
কোন্ কুসুমের আশে কোন্ ফুলবাসে
সুনীল আকাশে মন ধায়!

আজি কে যেন গো নাই, এ প্রভাতে তাই
জীবন বিফল হয় গো!
তাই চারি দিকে চায়, মন কেঁদে গায়—
'এ নহে, এ নহে, নয় গো!'
কোন্ স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে
কোন্ ছায়াময়ী অমরায়!
আজি কোন্ উপবনে বিরহবেদনে
আমারি কারণে কেঁদে যায়!

আমি যদি গাঁথি গান অথির-পরান
সে গান শুনাব কারে আর!
আমি যদি গাঁথি মালা লয়ে ফুলডালা
কাহারে পরাব ফুলহার!

আমি   আমার এ প্রাণ যদি করি দান
            দিব প্রাণ তবে কার পায় !
সদা   ভয় হয় মনে পাছে অযতনে
            মনে মনে কেহ ব্যথা পায় !

তুমি

তুমি   কোন্ কাননের ফুল,
    তুমি   কোন্ গগনের তারা !
তোমায়   কোথায় দেখেছি
    যেন   কোন্ স্বপনের পারা !
কবে তুমি গেয়েছিলে,
আঁখির পানে চেয়েছিলে
ভুলে গিয়েছি ।
শুধু   মনের মধ্যে জেগে আছে
    ঐ নয়নের তারা ।
তুমি   কথা কোয়ো না,
    তুমি   চেয়ে চলে যাও ।
এই   চাঁদের আলোতে
    তুমি   হেসে গলে যাও ।
আমি   ঘুমের ঘোরে চাঁদের পানে
চেয়ে থাকি মধুর প্রাণে,
তোমার   আঁখির মতন দুটি তারা
ঢালুক কিরণ-ধারা ।

সহসা থামিল থমকিয়া আকাশের মাঝখানে এসে।
দোঁহাপানে চাহিল দুজনে চতুর্থীর চাঁদের আলোতে।
ক্ষীণালোকে বুঝি মনে পড়ে দুই অচেনার চেনাশোনা,
মনে পড়ে কোন্ ছায়াদ্বীপে, কোন্ কুহেলিকা-ঘেরা দেশে,
কোন্ সন্ধ্যাসাগরের কূলে দুজনের ছিল আনাগোনা!
মেলে দোঁহে তবু ও মেলে না, তিলেক বিরহ রহে মাঝে—
চেনা বলে মিলিবারে চায়, অচেনা বলিয়া মরে লাজে।
মিলনের বাসনার মাঝে আধখানি চাঁদের বিকাশ—
দুটি চুম্বনের ছোঁয়াছুঁয়ি, মাঝে যেন শরমের হাস!
দুখানি অলস আঁখিপাতা, মাঝে সুখস্বপন-আভাস!
দোঁহার পরশ লয়ে দোঁহে ভেসে গেল, কহিল না কথা—
বলে গেল সন্ধ্যার কাহিনী, লয়ে গেল উষার বারতা।

গীতোচ্ছ্বাস

নীরব বাঁশরিখানি বেজেছে আবার।
প্রিয়ার বারতা বুঝি এসেছে আমার
বসন্তকাননমাঝে বসন্তসমীরে!
তাই বুঝি মনে পড়ে ভোলা গান যত!
তাই বুঝি ফুলবনে জাহ্নবীর তীরে
পুরাতন হাসিগুলি ফুটে শত শত!
তাই বুঝি হৃদয়ের বিস্মৃত বাসনা
জাগিছে নবীন হয়ে পল্লবের মতো!
জগতকমলবনে কমল-আসনা
কতদিন পরে বুঝি তাই এল ফিরে!
সে এল না, এল তার মধুর মিলন!
বসন্তের গান হয়ে এল তার স্বর!
দৃষ্টি তার ফিরে এল, কোথা সে নয়ন?
চুম্বন এসেছে তার, কোথা সে অধর?

স্তন

১

নারীর প্রাণের প্রেম মধুর কোমল,
বিকশিত যৌবনের বসন্তসমীরে
কুসুমিত হয়ে ওই ফুটেছে বাহিরে,
সৌরভসুধায় করে পরান পাগল।
মরমের কোমলতা তরঙ্গ তরল
উথলি উঠেছে যেন হৃদয়ের তীরে।
কী যেন বাঁশির ডাকে জগতের প্রেমে
বাহিরিয়া আসিতেছে সলাজ হৃদয়,
সহসা আলোতে এসে গেছে যেন থেমে—
শরমে মরিতে চায় অঞ্চল-আড়ালে।
প্রেমের সংগীত যেন বিকশিয়া রয়,
উঠিছে পড়িছে ধীরে হৃদয়ের তালে।
হেরো গো কমলাসন জননী লক্ষ্মীর—
হেরো নারীহৃদয়ের পবিত্র মন্দির।

২

পবিত্র সুমেরু বটে এই সে হেথায়,
দেবতাবিহারভূমি কনক-অচল।
উন্নত সতীর স্তন স্বরগপ্রভায়
মানবের মর্ত্যভূমি করেছে উজ্জ্বল।
শিশু রবি হোথা হতে ওঠে সুপ্রভাতে,
শ্রান্ত রবি সন্ধ্যাবেলা হোথা অস্ত যায়।
দেবতার আঁখিতারা জেগে থাকে রাতে,
বিমল পবিত্র দুটি বিজন শিখরে।
চিরস্নেহ-উৎসধারে অমৃতনির্ঝরে
সিক্ত করি তুলিতেছে বিশ্বের অধর।

জাগে সদা সুখসুপ্ত ধরণীর 'পরে,
অসহায় জগতের অসীম নির্ভর।
ধরণীর মাঝে থাকি স্বর্গ আছে তুমি,
দেবশিশু মানবের ওই মাতৃভূমি ॥

চুম্বন

অধরের কানে যেন অধরের ভাষা।
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে।
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালোবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধরসংগমে।
দুইটি তরঙ্গ উঠি প্রেমের নিয়মে
ভাঙিয়া মিলিয়া যায় দুইটি অধরে।
ব্যাকুল বাসনা দুটি চাহে পরস্পরে,
দেহের সীমায় আসি দুজনের দেখা।
প্রেম লিখিতেছে গান কোমল আখরে
অধরেতে থরে থরে চুম্বনের লেখা।
দুখানি অধর হতে কুসুমচয়ন,
মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে।
দুটি অধরের এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসরশয়ন।

বিবসনা

ফেলো গো বসন ফেলো— ঘুচাও অঞ্চল।
পরো শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ
সুরবালিকার বেশ কিরণবসন।
পরিপূর্ণ তনুখানি বিকচ কমল,
জীবনের যৌবনের লাবণ্যের মেলা।
বিচিত্র বিশ্বের মাঝে দাঁড়াও একেলা।

সর্বাঙ্গে পড়ুক তব চাঁদের কিরণ,
সর্বাঙ্গে মলয়-বায়ু করুক সে খেলা।
অসীম নীলিমামাঝে হও নিমগন
তারাময়ী বিবসনা প্রকৃতির মতো।
অতনু ঢাকুক মুখ বসনের কোণে
তনুর বিকাশ হেরি লাজে শির নত।
আসুক বিমল উষা মানবভবনে,
লাজহীনা পবিত্রতা— শুভ্র বিবসনে।

বাহু

কাহারে জড়াতে চাহে দুটি বাহুলতা,
কাহারে কাঁদিয়া বলে 'যেয়ো না যেয়ো না' !
কেমনে প্রকাশ করে ব্যাকুল বাসনা,
কে শুনেছে বাহুর নীরব আকুলতা।
কোথা হতে নিয়ে আসে হৃদয়ের কথা,
গায়ে লিখে দিয়ে যায় পুলক-অক্ষরে।
পরশে বহিয়া আনে মরমবারতা,
মোহ মেখে রেখে যায় প্রাণের ভিতরে।
কণ্ঠ হতে উতারিয়া যৌবনের মালা
দুইটি আঙুলে ধরি তুলি দেয় গলে।
দুটি বাহু বহি আনে হৃদয়ের ডালা,
রেখে দিয়ে যায় যেন চরণের তলে।
লতায়ে থাকুক বুকে চির আলিঙ্গন,
ছিঁড়ো না ছিঁড়ো না দুটি বাহুর বন্ধন।

চরণ

দুখানি চরণ পড়ে ধরণীর গায়—
দুখানি অলস রাঙা কোমল চরণ।

শত বসন্তের স্মৃতি জাগিছে ধরায়,
শত লক্ষ কুসুমের পরশস্বপন।
শত বসন্তের যেন ফুটন্ত অশোক
ঝরিয়া মিলিয়া গেছে দুটি রাঙা পায়।
প্রভাতের প্রদোষের দুটি সূর্যলোক
অস্ত গেছে যেন দুটি চরণছায়ায়।
যৌবনসংগীত পথে যেতেছে ছড়ায়ে,
নূপুর কাঁদিয়া মরে চরণ জড়ায়ে,
নৃত্য সদা বাঁধা যেন মধুর মায়ায়।
হোথা যে নিঠুর মাটি, শুষ্ক ধরাতল—
এসো গো হৃদয়ে এসো, ঝুরিছে হেথায়
লাজরক্ত লালসার রাঙা শতদল।

হৃদয়-আকাশ

আমি ধরা দিয়েছি গো আকাশের পাখি,
নয়নে দেখেছি তব নূতন আকাশ।
দুখানি আঁখির পাতে কী রেখেছ ঢাকি,
হাসিলে ফুটিয়া পড়ে উষার আভাস।
হৃদয় উড়িতে চায় হোথায় একাকী
আঁখিতারকার দেশে করিবারে বাস।
ওই গগনেতে চেয়ে উঠিয়াছে ডাকি,
হোথায় হারাতে চায় এ গীত-উচ্ছ্বাস।
তোমার হৃদয়াকাশ অসীম বিজন—
বিমল নীলিমা তার শান্ত সুকুমার,
যদি নিয়ে যাই ওই শূন্য হয়ে পার
আমার দুখানি পাখা কনকবরন।
হৃদয় চাতক হয়ে চাবে অশ্রুধার,
হৃদয়চকোর চাবে হাসির কিরণ।

অঞ্চলের বাতাস

পাশ দিয়ে গেল চলি চকিতের প্রায়,
অঞ্চলের প্রান্তখানি ঠেকে গেল গায়,
শুধু দেখা গেল তার আধখানি পাশ—
শিহরি পরশি গেল অঞ্চলের বায়।
অজানা হৃদয়বনে উঠেছে উচ্ছ্বাস,
অঞ্চলে বহিয়া এল দক্ষিণবাতাস,
সেথা যে বেজেছে বাঁশি তাই শুনা যায়,
সেথায় উঠিছে কেঁদে ফুলের সুবাস।
কার প্রাণখানি হতে করি হায়-হায়
বাতাসে উড়িয়া এল পরশ-আভাস!
ওগো কার তনুখানি হয়েছে উদাস,
ওগো কে জানাতে চাহে মরমবারতা!
দিয়ে গেল সর্বাঙ্গের আকুল নিশ্বাস,
বলে গেল সর্বাঙ্গের কানে কানে কথা।

দেহের মিলন

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ-তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ-'পরে।
তোমার নয়ন পানে ধাইছে নয়ন,
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে।
তৃষিত পরান আজি কাঁদিছে কাতরে
তোমারে সর্বাঙ্গ দিয়ে করিতে দর্শন।
হৃদয় লুকানো আছে দেহের সায়রে,
চিরদিন তীরে বসি করি গো ক্রন্দন।

সর্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে
দেহের রহস্য মাঝে হইব মগন।
আমার এ দেহমন চির রাত্রিদিন
তোমার সর্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।

তনু

ওই তনুখানি তব আমি ভালোবাসি।
এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী।
শিশিরেতে টলমল ঢলঢল ফুল
টুটে পড়ে থরে থরে যৌবন বিকাশি।
চারি দিকে গুঞ্জরিছে জগৎ আকুল,
সারানিশি সারাদিন ভ্রমর পিপাসী।
ভালোবেসে বায়ু এসে দুলাইছে দুল,
মুখে পড়ে মোহভরে পূর্ণিমার হাসি।
পূর্ণ দেহখানি হতে উঠিছে সুবাস।
মরি মরি, কোথা সেই নিভৃত নিলয়
কোমল শয়নে যেথা ফেলিছে নিশ্বাস
তনুঢাকা মধুমাখা বিজন হৃদয়।
ওই দেহখানি বুকে তুলে নেব বালা,
পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি মালা।

স্মৃতি

ওই দেহ-পানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
যেন কত শত পূর্বজনমের স্মৃতি।
সহস্র হারানো সুখ আছে ও নয়নে,
জন্মজন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি।

যেন গো আমারি তুমি আত্মবিস্মরণ,
অনন্ত কালের মোর সুখ দুঃখ শোক,
কত নব জগতের কুসুমকানন,
কত নব আকাশের চাঁদের আলোক।
কত দিবসের তুমি বিরহের ব্যথা,
কত রজনীর তুমি প্রণয়ের লাজ,
সেই হাসি সেই অশ্রু সেই সব কথা
মধুর মুরতি ধরি দেখা দিল আজ।
তোমার মুখেতে চেয়ে তাই নিশিদিন
জীবন সুদূরে যেন হতেছে বিলীন।

হৃদয়-আসন

কোমল দুখানি বাহু শরমে লতায়ে
বিকশিত স্তন দুটি আগুলিয়া রয়,
তারি মাঝখানে কি রে রয়েছে লুকায়ে
অতিশয় সযতন গোপন হৃদয়!
সেই নিরালায়, সেই কোমল আসনে,
দুইখানি স্নেহস্ফুট স্তনের ছায়ায়,
কিশোর প্রেমের মৃদু প্রদোষকিরণে
আনত আঁখির তলে রাখিবে আমায়!
কত-না মধুর আশা ফুটিছে সেথায়—
গভীর নিশীথে কত বিজন কল্পনা,
উদাস নিশ্বাসবায়ু বসন্তসন্ধ্যায়,
গোপনে চাঁদিনী রাতে দুটি অশ্রুকণা!
তারি মাঝে আমারে কি রাখিবে যতনে
হৃদয়ের সুমধুর স্বপন-শয়নে!

কল্পনার সাথি

যখন কুসুমবনে ফির একাকিনী,
ধরায় লুটায়ে পড়ে পূর্ণিমাযামিনী,
দক্ষিণবাতাসে আর তটিনীর গানে
শোন যবে আপনার প্রাণের কাহিনী—
যখন শিউলি ফুলে কোলখানি ভরি
দুটি পা ছড়ায়ে দিয়ে আনতবয়ানে
ফুলের মতন দুটি অঙ্গুলিতে ধরি
মালা গাঁথ ভোরবেলা গুন গুন তানে—
মধ্যাহ্নে একেলা যবে বাতায়নে ব'সে
নয়নে মিলাতে চায় সুদূর আকাশ,
কখন আঁচলখানি প'ড়ে যায় খ'সে,
কখন হৃদয় হতে উঠে দীর্ঘশ্বাস,
কখন অশ্রুটি কাঁপে নয়নের পাতে—
তখন আমি কি, সখী, থাকি তব সাথে !

হাসি

সুদূর প্রবাসে আজি কেন রে কী জানি
কেবলি পড়িছে মনে তার হাসিখানি।
কখন নামিয়া গেল সন্ধ্যার তপন,
কখন থামিয়া গেল সাগরের বাণী।
কোথায় ধরার ধারে বিরহবিজন
একটি মাধবীলতা আপন ছায়াতে
দুটি অধরের রাঙা কিশলয়-পাতে
হাসিটি রেখেছে ঢেকে কুঁড়ির মতন !
সারা রাত নয়নের সলিল সিঞ্চিয়া
রেখেছে কাহার তরে যতনে সঞ্চিয়া !

সে হাসিটি কে আসিয়া করিবে চয়ন,
লুব্ধ এই জগতের সবারে বঞ্চিয়া !
তখন দুখানি হাসি মরিয়া বাঁচিয়া
তুলিবে অমর করি একটি চুম্বন ।

নিদ্রিতার চিত্র

মায়ায় রয়েছে বাঁধা প্রদোষ-আঁধার,
চিত্রপটে সন্ধ্যাতারা অস্ত নাহি যায় ।
এলাইয়া ছড়াইয়া গুচ্ছ কেশভার
বাহুতে মাথাটি রেখে রমণী ঘুমায় ।
চারি দিকে পৃথিবীতে চিরজাগরণ,
কে ওরে পাড়ালে ঘুম তারি মাঝখানে !
কোথা হতে আহরিয়া নীরব গুঞ্জন
চিরদিন রেখে গেছে ওরই কানে কানে !
ছবির আড়ালে কোথা অনন্ত নির্ঝর
নীরব ঝর্ঝর-গানে পড়িছে ঝরিয়া ।
চিরদিন কাননের নীরব মর্মর,
লজ্জা চিরদিন আছে দাঁড়ায়ে সমুখে—
যেমনি ভাঙিবে ঘুম, মরমে মরিয়া
বুকের বসনখানি তুলে দিবে বুকে ॥

কল্পনামধুপ

প্রতিদিন প্রাতে শুধু গুন্ গুন্ গান,
লালসে অলস-পাখা অলির মতন ।
বিকল হৃদয় লয়ে পাগল পরান
কোথায় করিতে যায় মধু অন্বেষণ ।

বেলা বহে যায় চলে— শ্রান্ত দিনমান,
তরুতলে ক্লান্ত ছায়া করিছে শয়ন,
মুরছিয়া পড়িতেছে বাঁশরির তান,
সেঁউতি শিথিলবৃন্ত মুদিছে নয়ন।
কুসুমদলের বেড়া, তারি মাঝে ছায়া,
সেথা বসে করি আমি কল্পমধু পান—
বিজনে সৌরভময়ী মধুময়ী মায়া,
তাহারি কুহকে আমি করি আত্মদান—
রেণুমাখা পাখা লয়ে ঘরে ফিরে আসি
আপন সৌরভে থাকি আপনি উদাসী॥

পূর্ণ মিলন

নিশিদিন কাঁদি, সখী, মিলনের তরে
যে মিলন ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মতন।
লও লও বেঁধে লও কেড়ে লও মোরে—
লও লজ্জা, লও বস্ত্র, লও আবরণ।
এ তরুণ তনুখানি লহ চুরি করে—
আঁখি হতে লও ঘুম, ঘুমের স্বপন।
জাগ্রত বিপুল বিশ্ব লও তুমি হ'রে
অনন্তকালের মোর জীবন-মরণ।
বিজন বিশ্বের মাঝে মিলনশ্মশানে
নির্বাপিতসূর্যালোক লুপ্ত চরাচর,
লাজমুক্ত বাসমুক্ত দুটি নগ্ন প্রাণে
তোমাতে আমাতে হই অসীম সুন্দর।
এ কী দুরাশার স্বপ্ন হায় গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্‌খানে!

শ্রান্তি

সুখশ্রমে আমি, সখী, শ্রান্ত অতিশয় ;
পড়েছে শিথিল হয়ে শিরার বন্ধন।
অসহ্য কোমল ঠেকে কুসুমশয়ন,
কুসুমরেণুর সাথে হয়ে যাই লয়।
স্বপনের জালে যেন পড়েছি জড়ায়ে।
যেন কোন্ অস্তাচলে সন্ধ্যাস্বপ্নময়
রবির ছবির মতো যেতেছি গড়ায়ে,
সুদূরে মিলিয়া যায় নিখিলনিলয়।
ডুবিতে ডুবিতে যেন সুখের সাগরে
কোথাও না পাই ঠাঁই, শ্বাস রুদ্ধ হয়—
পরান কাঁদিতে থাকে মৃত্তিকার তরে।
এ যে সৌরভের বেড়া, পাষাণের নয়—
কেমনে ভাঙিতে হবে ভাবিয়া না পাই,
অসীম নিদ্রার ভারে পড়ে আছি তাই।

বন্দী

দাও খুলে দাও, সখী, ওই বাহুপাশ—
চুম্বনমদিরা আর করায়ো না পান।
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস—
ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরান।
কোথায় উষার আলো, কোথায় আকাশ—
এ চির পূর্ণিমারাত্রি হোক অবসান।
আমারে ঢেকেছে তব মুক্ত কেশপাশ,
তোমার মাঝারে আমি নাহি দেখি ত্রাণ।
আকুল অঙ্গুলিগুলি করি কোলাকুলি
গাঁথিছে সর্বাঙ্গে মোর পরশের ফাঁদ।

ঘুমঘোরে শূন্যপানে দেখি মুখ তুলি
শুধু অবিশ্রামহাসি একখানি চাঁদ।
স্বাধীন করিয়া দাও, বেঁধো না আমায়—
স্বাধীন হৃদয়খানি দিব তার পায়।

কেন

কেন গো এমন স্বরে বাজে তবে বাঁশি,
মধুর সুন্দর রূপে কেঁদে ওঠে হিয়া,
রাঙা অধরের কোণে হেরি মধুহাসি
পুলকে যৌবন কেন উঠে বিকশিয়া!
কেন তনু বাহুডোরে ধরা দিতে চায়,
ধায় প্রাণ দুটি কালো আঁখির উদ্দেশে,
হায় যদি এত লজ্জা কথায় কথায়,
হায় যদি এত শ্রান্তি নিমেষে নিমেষে!
কেন কাছে ডাকে যদি মাঝে অন্তরাল,
কেন রে কাঁদায় প্রাণ সবই যদি ছায়া,
আজ হাতে তুলে নিয়ে ফেলে দিবে কাল—
এরি তরে এত তৃষ্ণা, এ কাহার মায়া!
মানবহৃদয় নিয়ে এত অবহেলা,
খেলা যদি, কেন হেন মর্মভেদী খেলা!

মোহ

এ মোহ ক'দিন থাকে, এ মায়া মিলায়,
কিছুতে পারে না আর বাঁধিয়া রাখিতে।
কোমল বাহুর ডোর ছিন্ন হয়ে যায়,
মদিরা উথলে নাকো মদির আঁখিতে।

কেহ কারে নাহি চিনে আঁধার নিশায়।
ফুল ফোটা সাঙ্গ হলে গাহে না পাখিতে।
কোথা সেই হাসিপ্রান্ত চুম্বনতৃষিত
রাঙা পুষ্পটুকু যেন প্রস্ফুট অধর!
কোথা কুসুমিত তনু পূর্ণবিকশিত,
কম্পিত পুলকভরে, যৌবনকাতর!
তখন কি মনে পড়ে সেই ব্যাকুলতা,
সেই চিরপিপাসিত যৌবনের কথা,
সেই প্রাণপরিপূর্ণ মরণ-অনল—
মনে পড়ে হাসি আসে? চোখে আসে জল?

পবিত্র প্রেম

ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না ওরে, দাঁড়াও সরিয়া।
ম্লান করিয়ো না আর মলিন পরশে।
ওই দেখো তিলে তিলে যেতেছে মরিয়া,
বাসনানিশ্বাস তব গরল বরষে।
জান না কি হৃদিমাঝে ফুটেছে যে ফুল,
ধুলায় ফেলিলে তারে ফুটিবে না আর।
জান না কি সংসারের পাথার অকূল,
জান না কি জীবনের পথ অন্ধকার।
আপনি উঠেছে ওই তব ধ্রুবতারা,
আপনি ফুটেছে ফুল বিধির কৃপায়,
সাধ করে কে আজি রে হবে পথহারা—
সাধ করে এ কুসুম কে দলিবে পায়!
যে প্রদীপ আলো দেবে তাহে ফেল শ্বাস,
যারে ভালোবাস তারে করিছ বিনাশ!

পবিত্র জীবন

মিছে হাসি, মিছে বাঁশি, মিছে এ যৌবন,
মিছে এই দরশের পরশের খেলা।
চেয়ে দেখো, পবিত্র এ মানবজীবন,
কে ইহারে অকাতরে করে অবহেলা!
ভেসে ভেসে এই মহা চরাচরস্রোতে
কে জানে গো আসিয়াছে কোন্‌খান হতে,
কোথা হতে নিয়ে এল প্রেমের আভাস,
কোন্ অন্ধকার ভেদি উঠিল আলোতে!
এ নহে খেলার ধন, যৌবনের আশ—
বোলো না ইহার কানে আবেশের বাণী!
নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস,
তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিয়ো না টানি!
এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল-আশ্বাস,
স্বর্গের আলোক তব এই মুখখানি।

মরীচিকা

এসো, ছেড়ে এসো, সখী, কুসুমশয়ন।
বাজুক কঠিন মাটি চরণের তলে।
কত আর করিবে গো বসিয়া বিরলে
আকাশকুসুমবনে স্বপন চয়ন।
দেখো ওই দূর হতে আসিছে ঝটিকা,
স্বপ্নরাজ্য ভেসে যাবে খর অশ্রুজলে।
দেবতার বিদ্যুতের অভিশাপশিখা
দহিবে আঁধার নিদ্রা বিমল অনলে।

চলো গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে,
সুখদুঃখ লয়ে সবে গাঁথিছে আলয়—
হাসি-কান্না ভাগ করি ধরি হাতে হাতে
সংসারসংশয়রাত্রি রহিব নির্ভয়।
সুখরৌদ্রমরীচিকা নহে বাসস্থান,
মিলায় মিলায় বলি ভয়ে কাঁপে প্রাণ॥

গান-রচনা

এ শুধু অলস মায়া, এ শুধু মেঘের খেলা,
এ শুধু মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জন—
এ শুধু আপন মনে মালা গেঁথে ছিঁড়ে ফেলা,
নিমেষের হাসিকান্না গান গেয়ে সমাপন।
শ্যামল পল্লবপাতে রবিকরে সারাবেলা
আপনার ছায়া লয়ে খেলা করে ফুলগুলি,
এও সেই ছায়া-খেলা বসন্তের সমীরণে।
কুহকের দেশে যেন সাধ করে পথ ভুলি
হেথা হোথা ঘুরি ফিরি সারাদিন আনমনে।
কারে যেন দেব ব'লে কোথা যেন ফুল তুলি,
সন্ধ্যায় মলিন ফুল উড়ে যায় বনে বনে।
এ খেলা খেলিবে হায় খেলার সাথি কে আছে?
ভুলে ভুলে গান গাই— কে শোনে, কে নাই শোনে—
যদি কিছু মনে পড়ে, যদি কেহ আসে কাছে!

সন্ধ্যার বিদায়

সন্ধ্যা যায়, সন্ধ্যা ফিরে চায়, শিথিল কবরী পড়ে খুলে—
যেতে যেতে কনক-আঁচল বেধে যায় বকুলকাননে,
চরণের পরশরাঙিমা রেখে যায় যমুনার কূলে—
নীরবে-বিদায়-চাওয়া চোখে, গ্রন্থি-বাঁধা রক্তিম দুকূলে
আঁধারের ম্লানবধূ যায় বিষাদের বাসরশয়নে।
সন্ধ্যাতারা পিছনে দাঁড়ায়ে চেয়ে থাকে আকুল নয়নে।
যমুনা কাঁদিতে চাহে বুঝি, কেন রে কাঁদে না কণ্ঠ তুলে—
বিস্ফারিত হৃদয় বহিয়া চলে যায় আপনার মনে।
মাঝে মাঝে ঝাউবন হতে গভীর নিশ্বাস ফেলে ধরা।
সপ্ত ঋষি দাঁড়াইল আসি নন্দনের সুরতরুমূলে—
চেয়ে থাকে পশ্চিমের পথে, ভুলে যায় আশীর্বাদ করা।
নিশীথিনী রহিল জাগিয়া বদন ঢাকিয়া এলোচুলে।
কেহ আর কহিল না কথা, একটিও বহিল না শ্বাস—
আপনার সমাধি-মাঝারে নিরাশা নীরবে করে বাস॥

রাত্রি

জগতেরে জড়াইয়া শত পাকে যামিনীনাগিনী
আকাশ-পাতাল জুড়ি ছিল পড়ে নিদ্রায় মগনা,
আপনার হিম দেহে আপনি বিলীনা একাকিনী।
মিটি মিটি তারকায় জলে তার অন্ধকার ফণা।
উষা আসি মন্ত্র পড়ি বাজাইল ললিত রাগিণী।
রাঙা আঁখি পাকালিয়া সাপিনী উঠিল তাই জাগি—
একে একে খুলে পাক, আঁকি বাঁকি কোথা যায় ভাগি।

পশ্চিমসাগরতলে আছে বুঝি বিরাট গহ্বর,
সেথায় ঘুমাবে বলে ডুবিতেছে বাসুকিভগিনী
মাথায় বহিয়া তার শত লক্ষ রতনের কণা।
শিয়রেতে সারাদিন জেগে রবে বিপুল সাগর—
নিভৃতে স্তিমিত দীপে চুপি চুপি কহিয়া কাহিনী
মিলি কত নাগবালা স্বপ্নমালা করিবে রচনা॥

বৈতরণী

অশ্রুস্রোতে স্ফীত হয়ে বহে বৈতরণী,
চৌদিকে চাপিয়া আছে আঁধার রজনী।
পূর্ব তীর হতে হুহু আসিছে নিশ্বাস,
যাত্রী লয়ে পশ্চিমেতে চলেছে তরণী।
মাঝে মাঝে দেখা দেয় বিদ্যুৎ-বিকাশ,
কেহ কারে নাহি চেনে ব'সে নতশিরে।
গলে ছিল বিদায়ের অশ্রুকণা-হার,
ছিন্ন হয়ে একে একে ঝ'রে পড়ে নীরে।
ওই বুঝি দেখা যায় ছায়া-পরপার,
অন্ধকারে মিটি মিটি তারা-দীপ জ্বলে।
হোথায় কি বিস্মরণ, নিঃস্বপ্ন নিদ্রার
শয়ন রচিয়া দিবে ঝরা ফুলদলে!
অথবা অকূলে শুধু অনন্ত রজনী
ভেসে চলে কর্ণধারবিহীন তরণী!

মানবহৃদয়ের বাসনা

নিশীথে রয়েছি জেগে ; দেখি অনিমিখে,
লক্ষ হৃদয়ের সাধ শূন্যে উড়ে যায়।
কত দিক হতে তারা ধায় কত দিকে !
কত-না অদৃশ্যকায়া ছায়া-আলিঙ্গন
বিশ্বময় কারে চাহে, করে হায়-হায়।
কত স্মৃতি খুঁজিতেছে শ্মশানশয়ন—
অন্ধকারে হেরো শত তৃষিত নয়ন
ছায়াময় পাখি হয়ে কার পানে ধায়।
ক্ষীণশ্বাস মুমূর্ষুর অতৃপ্ত বাসনা
ধরণীর কূলে কূলে ঘুরিয়া বেড়ায়।
উদ্দেশে ঝরিছে কত অশ্রুবারিকণা,
চরণ খুঁজিয়া তারা মরিবারে চায়।
কে শুনিছে শত কোটি হৃদয়ের ডাক !
নিশীথিনী স্তব্ধ হয়ে রয়েছে অবাক।

সিন্ধুগর্ভ

উপরে স্রোতের ভরে ভাসে চরাচর
নীল সমুদ্রের 'পরে নৃত্য ক'রে সারা।
কোথা হতে ঝরে যেন অনন্ত নির্ঝর,
ঝরে আলোকের কণা রবি শশী তারা।
ঝরে প্রাণ, ঝরে গান, ঝরে প্রেমধারা—
পূর্ণ করিবারে চায় আকাশ সাগর।
সহসা কে ডুবে যায় জলবিম্বপারা,
দু-একটি আলো-রেখা যায় মিলাইয়া,

তখন ভাবিতে বসি কোথায় কিনারা—
কোন্ অতলের পানে ধাই তলাইয়া !
নিম্নে জাগে সিন্ধুগর্ভ স্তব্ধ অন্ধকার।
কোথা নিবে যায় আলো, থেমে যায় গীত—
কোথা চিরদিন তরে অসীম আড়াল !
কোথায় ডুবিয়া গেছে অনন্ত অতীত !

ক্ষুদ্র অনন্ত

অনন্ত দিবসরাত্রি কালের উচ্ছ্বাস—
তারি মাঝখানে শুধু একটি নিমেষ,
একটি মধুর সন্ধ্যা, একটু বাতাস,
মৃদু আলো-আঁধারের মিলন-আবেশ—
তারি মাঝখানে শুধু একটুকু জুঁই
একটুকু হাসিমাখা সৌরভের লেশ,
একটু অধর তার ছুঁই কি না-ছুঁই,
আপন আনন্দ লয়ে উঠিতেছে ফুটে
আপন আনন্দ লয়ে পড়িতেছে টুটে।
সমগ্র অনন্ত ওই নিমেষের মাঝে
একটি বনের প্রান্তে জুঁই হয়ে উঠে।
পলকের মাঝখানে অনন্ত বিরাজে।
যেমনি পলক টুটে ফুল ঝরে যায়,
অনন্ত আপনা-মাঝে আপনি মিলায় ॥

সমুদ্র

কিসের অশান্তি এই মহাপারাবারে,
সতত ছিঁড়িতে চাহে কিসের বন্ধন!
অব্যক্ত অস্ফুট বাণী ব্যক্ত করিবারে
শিশুর মতন সিন্ধু করিছে ক্রন্দন।
যুগযুগান্তর ধরি যোজন যোজন
ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে উত্তাল উচ্ছ্বাস—
অশান্ত বিপুল প্রাণ করিছে গর্জন,
নীরবে শুনিছে তাই প্রশান্ত আকাশ।
আছাড়ি চূর্ণিতে চাহে সমগ্র হৃদয়
কঠিন পাষাণময় ধরণীর তীরে,
জোয়ারে সাধিতে চায় আপন প্রলয়,
ভাঁটায় মিলাতে চায় আপনার নীরে।
অন্ধ প্রকৃতির হৃদে মৃত্তিকায় বাঁধা
সতত দুলিছে ওই অশ্রুর পাথার,
উন্মুখী বাসনা পায় পদে পদে বাধা,
কাঁদিয়া ভাসাতে চাহে জগৎ-সংসার।
সংসারের কণ্ঠ হতে কেড়ে নিয়ে কথা
সাধ যায় ব্যক্ত করি মানবভাষায়—
শান্ত করে দিই ওই চির-ব্যাকুলতা,
সমুদ্রবায়ুর ওই চির হায়-হায়।
সাধ যায় মোর গীতে দিবস-রজনী
ধ্বনিবে পৃথিবী-ঘেরা সংগীতের ধ্বনি॥

অস্তমান রবি

আজ কি, তপন, তুমি যাবে অস্তাচলে
না শুনে আমার মুখে একটিও গান !
দাঁড়াও গো, বিদায়ের দুটি কথা বলে
আজিকার দিন আমি করি অবসান।
থামো ওই সমুদ্রের প্রান্তরেখা-'পরে,
মুখে মোর রাখো তব একমাত্র আঁখি।
দিবসের শেষ পলে নিমেষের তরে
তুমি চেয়ে থাকো আর আমি চেয়ে থাকি।
দুজনের আঁখি-'পরে সায়াহ্ন-আঁধার
আঁখির পাতার মতো আসুক মুদিয়া,
গভীর তিমিরস্নিগ্ধ শান্তির পাথার
নিবায়ে ফেলুক আজি দুটি দীপ্ত হিয়া।
শেষ গান সাঙ্গ করে থেমে গেছে পাখি,
আমার এ গানখানি ছিল শুধু বাকি।

অস্তাচলের পরপারে

সন্ধ্যাসূর্যের প্রতি

আমার এ গান তুমি যাও সাথে করে
নূতন সাগরতীরে দিবসের পানে।
সায়াহ্নের কূল হতে যদি ঘুমঘোরে
এ গান উষার কূলে পশে কারো কানে
সারা রাত্রি নিশীথের সাগর বাহিয়া
স্বপনের পরপারে যদি ভেসে যায়,
প্রভাত-পাখিরা যবে উঠিবে গাহিয়া
আমার এ গান তারা যদি খুঁজে পায়।

গোধূলির তীরে বসে কেঁদেছে যে জন,
ফেলেছে আকাশে চেয়ে অশ্রুজল কত,
তার অশ্রু পড়িবে কি হইয়া নূতন
নবপ্রভাতের মাঝে শিশিরের মতো।
সায়াহ্নের কুঁড়িগুলি আপনা টুটিয়া
প্রভাতে কি ফুল হয়ে উঠে না ফুটিয়া!

প্রত্যাশা

সকলে আমার কাছে যত কিছু চায়
সকলেরে আমি তাহা পেরেছি কি দিতে!
আমি কি দিই নি ফাঁকি কত জনে হায়,
রেখেছি কত-না ঋণ এই পৃথিবীতে।
আমি তবে কেন বকি সহস্র প্রলাপ,
সকলের কাছে চাই ভিক্ষা কুড়াইতে!
এক তিল না পাইলে দিই অভিশাপ,
অমনি কেন রে বসি কাতরে কাঁদিতে!
হা ঈশ্বর, আমি কিছু চাহি নাকো আর,
ঘুচাও আমার এই ভিক্ষার বাসনা।
মাথায় বহিয়া লয়ে চির ঋণভার
'পাইনি' 'পাইনি' বলে আর কাঁদিব না।
তোমারেও মাগিব না, অলস কাঁদনি—
আপনারে দিলে তুমি আসিবে আপনি।

স্বপ্নরুদ্ধ

নিষ্ফল হয়েছি আমি সংসারের কাজে,
লোকমাঝে আঁখি তুলে পারি না চাহিতে।
ভাসায়ে জীবনতরী সাগরের মাঝে
তরঙ্গ লঙ্ঘন করি পারি না বাহিতে।
পুরুষের মতো যত মানবের সাথে
যোগ দিতে পারি নাকো লয়ে নিজ বল,
সহস্র সংকল্প শুধু ভরা দুই হাতে
বিফলে শুকায় যেন লক্ষ্মণের ফল।
আমি গাঁথি আপনার চারি দিক ঘিরে
সূক্ষ্ম রেশমের জাল কীটের মতন।
মগ্ন থাকি আপনার মধুর তিমিরে,
দেখি না এ জগতের প্রকাণ্ড জীবন।
কেন আমি আপনার অন্তরালে থাকি!
মুদ্রিত পাতার মাঝে কাঁদে অন্ধ আঁখি।

অক্ষমতা

এ যেন রে অভিশপ্ত প্রেতের পিপাসা—
সলিল রয়েছে প'ড়ে, শুধু দেহ নাই।
এ কেবল হৃদয়ের দুর্বল দুরাশা
সাধের বস্তুর মাঝে করে চাই-চাই।
দুটি চরণেতে বেঁধে ফুলের শৃঙ্খল
কেবল পথের পানে চেয়ে বসে থাকা!
মানবজীবন যেন সকলি নিষ্ফল—
বিশ্ব যেন চিত্রপট, আমি যেন আঁকা!
চিরদিন বুভুক্ষিত প্রাণহুতাশন
আমারে করিছে ছাই প্রতি পলে পলে,

মহত্ত্বের আশা শুধু ভারের মতন
আমারে ডুবায়ে দেয় জড়ত্বের তলে।
কোথা সংসারের কাজে জাগ্রত হৃদয়!
কোথা রে সাহস মোর অস্থিমজ্জাময়!

জাগিবার চেষ্টা

মা কেহ কি আছ মোর, কাছে এসো তবে,
পাশে বসে স্নেহ ক'রে জাগাও আমায়।
স্বপ্নের সমাধি মাঝে বাঁচিয়া কী হবে,
যুঝিতেছি জাগিবারে— আঁখি রুদ্ধ হায়!
ডেকো না ডেকো না মোরে ক্ষুদ্রতার মাঝে,
স্নেহময় আলস্যেতে রেখো না বাঁধিয়া,
আশীর্বাদ করে মোরে পাঠাও গো কাজে—
পিছনে ডেকো না আর কাতরে কাঁদিয়া।
মোর বলে কাহারেও দেব না কি বল!
মোর প্রাণে পাবে না কি কেহ নবপ্রাণ!
করুণা কি শুধু ফেলে নয়নের জল,
প্রেম কি ঘরের কোণে গাহে শুধু গান!
তবেই ঘুচিবে মোর জীবনের লাজ
যদি মা করিতে পারি কারো কোনো কাজ।

কবির অহংকার

গান গাহি বলে কেন অহংকার করা!
শুধু গাহি বলে কেন কাঁদি না শরমে!
খাঁচার পাখির মতো গান গেয়ে মরা,
এই কি, মা, আদি অন্ত মানবজনমে!

*

সুখ নাই, সুখ নাই, শুধু মর্মব্যথা—
মরীচিকা-পানে শুধু মরি পিপাসায়।
কে দেখালে প্রলোভন, শূন্য অমরতা—
প্রাণে ম'রে গানে কি রে বেঁচে থাকা যায়!
কে আছ মলিন হেথা, কে আছ দুর্বল,
মোরে তোমাদের মাঝে করো গো আহ্বান—
বারেক একত্রে বসে ফেলি অশ্রুজল,
দূর করি হীন গর্ব, শূন্য অভিমান
তার পরে একসাথে এসো কাজ করি
কেবলি বিলাপগান দূরে পরিহরি॥

বিজনে

আমারে ডেকো না আজি, এ নহে সময়—
একাকী রয়েছি হেথা গভীর বিজন,
রুধিয়া রেখেছি আমি অশান্ত হৃদয়,
দুরন্ত হৃদয় মোর করিব শাসন।
মানবের মাঝে গেলে এ যে ছাড়া পায়,
সহস্রের কোলাহলে হয় পথহারা,
লুব্ধ মুষ্টি যাহা পায় আঁকড়িতে চায়,
চিরদিন চিররাত্রি কেঁদে কেঁদে সারা।
ভর্ৎসনা করিব তারে বিজনে বিরলে,
একটুকু ঘুমাক সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
শ্যামল বিপুল কোলে আকাশ-অঞ্চলে
প্রকৃতি জননী তারে রাখুন বাঁধিয়া।
শান্ত স্নেহকোলে বসে শিখুক সে স্নেহ,
আমারে আজিকে তোরা ডাকিস নে কেহ।

সিন্ধুতীরে

হেথা নাই ক্ষুদ্র কথা, তুচ্ছ কানাকানি,
ধ্বনিত হতেছে চির-দিবসের বাণী।
চিরদিবসের রবি ওঠে, অস্ত যায়,
চিরদিবসের কবি গাহিছে হেথায়।
ধরণীর চারি দিকে সীমাশূন্য গানে
সিন্ধু শত তটিনীরে করিছে আহ্বান—
হেথায় দেখিলে চেয়ে আপনার পানে
দুই চোখে জল আসে, কেঁদে ওঠে প্রাণ।
শত যুগ হেথা বসে মুখপানে চায়,
বিশাল আকাশে পাই হৃদয়ের সাড়া।
তীব্র বক্র ক্ষুদ্র হাসি পায় যদি ছাড়া
রবির কিরণে এসে মরে সে লজ্জায়।
সবারে আনিতে বুকে বুক বেড়ে যায়,
সবারে করিতে ক্ষমা আপনারে ছাড়া।

সত্য

ভয়ে ভয়ে ভ্রমিতেছি মানবের মাঝে
হৃদয়ের আলোটুকু নিবে গেছে ব'লে!
কে কী বলে তাই শুনে মরিতেছি লাজে,
কী হয় কী হয় ভেবে ভয়ে প্রাণ দোলে!
'আলো' 'আলো' খুঁজে মরি পরের নয়নে,
'আলো' 'আলো' খুঁজে খুঁজে কাঁদি পথে পথে,
অবশেষে শুয়ে পড়ি ধূলির শয়নে—
ভয় হয় এক পদ অগ্রসর হতে!

বজ্রের আলোক দিয়ে ভাঙো অন্ধকার,
হৃদি যদি ভেঙে যায় সেও তবু ভালো।
যে গৃহে জানালা নাই সে তো কারাগার—
ভেঙে ফেলো, আসিবেক স্বরগের আলো।
হায় হায় কোথা সেই অখিলের জ্যোতি!
চলিব সরল পথে অশঙ্কিতগতি।

২

জ্বালায়ে আঁধার শূন্যে কোটি রবিশশী
দাঁড়ায়ে রয়েছ একা অসীমসুন্দর।
সুগভীর শান্ত নেত্র রয়েছে বিকশি,
চিরস্থির শুভ্র হাসি, প্রসন্ন অধর।
আনন্দে আঁধার মরে চরণ পরশি,
লাজ ভয় লাজে ভয়ে মিলাইয়া যায়—
আপন মহিমা হেরি আপনি হরষি
চরাচর শির তুলি তোমাপানে চায়।
আমার হৃদয়দীপ আঁধার হেথায়,
ধূলি হতে তুলি এরে দাও জ্বালাইয়া—
ওই ধ্রুবতারাখানি রেখেছ যেথায়
সেই গগনের প্রান্তে রাখো ঝুলাইয়া।
চিরদিন জেগে রবে নিবিবে না আর,
চিরদিন দেখাইবে আঁধারের পার।

আত্মাভিমান

আপনি কণ্টক আমি, আপনি জর্জর।
আপনার মাঝে আমি শুধু ব্যথা পাই।
সকলের কাছে কেন যাচি গো নির্ভর—
গৃহ নাই, গৃহ নাই, মোর গৃহ নাই!

অতি তীক্ষ্ণ অতি ক্ষুদ্র আত্ম-অভিমান
সহিতে পারে না হায় তিল অসম্মান।
আগেভাগে সকলের পায়ে ফুটে যায়
ক্ষুদ্র ব'লে পাছে কেহ জানিতে না পায়।
বরঞ্চ আঁধারে রব ধুলায় মলিন,
চাহি না চাহি না এই দীন অহংকার—
আপন দারিদ্র্যে আমি রহিব বিলীন,
বেড়াব না চেয়ে চেয়ে প্রসাদ সবার।
আপনার মাঝে যদি শান্তি পায় মন
বিনীত ধুলার শয্যা সুখের শয়ন।

আত্ম-অপমান

মোছো তবে অশ্রুজল, চাও হাসিমুখে
বিচিত্র এ জগতের সকলের পানে।
মানে আর অপমানে সুখে আর দুখে
নিখিলেরে ডেকে লও প্রসন্ন পরানে।
কেহ ভালোবাসে কেহ নাহি ভালোবাসে,
কেহ দূরে যায় কেহ কাছে চলে আসে—
আপনার মাঝে গৃহ পেতে চাও যদি
আপনারে ভুলে তবে থাকো নিরবধি।
ধনীর সন্তান আমি, নহি গো ভিখারি,
হৃদয়ে লুকানো আছে প্রেমের ভাণ্ডার—
আমি ইচ্ছা করি যদি বিলাইতে পারি
গভীর সুখের উৎস হৃদয় আমার।
দুয়ারে দুয়ারে ফিরি মাগি অন্নপান
কেন আমি করি তবে আত্ম-অপমান!

ক্ষুদ্র আমি

বুঝেছি বুঝেছি, সখা, কেন হাহাকার,
আপনার 'পরে মোর কেন সদা রোষ।
বুঝেছি বিফল কেন জীবন আমার—
আমি আছি, তুমি নাই, তাই অসন্তোষ।
সকল কাজের মাঝে আমারেই হেরি—
ক্ষুদ্র আমি জেগে আছে ক্ষুধা লয়ে তার,
শীর্ণবাহু-আলিঙ্গনে আমারেই ঘেরি
করিছে আমার হায় অস্থিচর্ম সার।
কোথা, নাথ, কোথা তব সুন্দর বদন—
কোথায় তোমার, নাথ, বিশ্ব-ঘেরা হাসি।
আমারে কাড়িয়া লও, করো গো গোপন—
আমারে তোমার মাঝে করো গো উদাসী।
ক্ষুদ্র আমি করিতেছে বড়ো অহংকার,
ভাঙো নাথ, ভাঙো নাথ, অভিমান তার।

প্রার্থনা

তুমি কাছে নাই ব'লে হেরো, সখা, তাই
'আমি বড়ো' 'আমি বড়ো' করিছে সবাই।
সকলেই উঁচু হয়ে দাঁড়ায়ে সমুখে
বলিতেছে, 'এ জগতে আর কিছু নাই।'
নাথ, তুমি একবার এসো হাসিমুখে
এরা সবে ম্লান হয়ে লুকাক লজ্জায়—
সুখদুঃখ টুটে যাক তব মহাসুখে,
যাক আলো-অন্ধকার তোমার প্রভায়।
নহিলে ডুবেছি আমি, মরেছি হেথায়,
নহিলে ঘুচে না আর মর্মের ক্রন্দন—

শুষ্ক ধূলি তুলি শুধু সুধাপিপাসায়,
প্রেম ব'লে পরিয়াছি মরণবন্ধন।
কভু পড়ি কভু উঠি, হাসি আর কাঁদি—
খেলাঘর ভেঙে প'ড়ে রচিবে সমাধি।

বাসনার ফাঁদ

যারে চাই তার কাছে আমি দিই ধরা,
সে আমার না হইতে আমি হই তার।
পেয়েছি বলিয়ে মিছে অভিমান করা,
অন্যেরে বাঁধিতে গিয়ে বন্ধন আমার।
নিরখিয়া দ্বারমুক্ত সাধের ভাণ্ডার
দুই হাতে লুটে নিই রত্ন ভূরি ভূরি—
নিয়ে যাব মনে করি, ভারে চলা ভার,
চোরা দ্রব্য বোঝা হয়ে চোরে করে চুরি।
চিরদিন ধরণীর কাছে ঋণ চাই,
পথের সম্বল ব'লে জমাইয়া রাখি,
আপনারে বাঁধা রাখি সেটা ভুলে যাই—
পাথেয় লইয়া শেষে কারাগারে থাকি।
বাসনার বোঝা নিয়ে ডোবে-ডোবে তরী—
ফেলিতে সরে না মন, উপায় কী করি!

চিরদিন

কোথা রাত্রি, কোথা দিন, কোথা ফুটে চন্দ্র সূর্য তারা,
কে বা আসে কে বা যায়, কোথা বসে জীবনের মেলা,
কে বা হাসে কে বা গায়, কোথা খেলে হৃদয়ের খেলা,
কোথা পথ, কোথা গৃহ, কোথা পান্থ, কোথা পথহারা!

কোথা খ'সে পড়ে পত্র জগতের মহাবৃক্ষ হতে,
উড়ে উড়ে ঘুরে মরে অসীমেতে না পায় কিনারা,
বহে যায় কালবায়ু অবিশ্রাম আকাশের পথে,
ঝর ঝর মর মর শুষ্ক পত্র শ্যাম পত্রে মিলে !
এত ভাঙা এত গড়া, আনাগোনা জীবন্ত নিখিলে,
এত গান এত তান এত কান্না এত কলরব—
কোথা কে বা, কোথা সিন্ধু, কোথা ঊর্মি, কোথা তার বেলা—
গভীর অসীম গর্ভে নির্বাসিত নির্বাপিত সব !
জনপূর্ণ সুবিজনে, জ্যোতির্বিদ্ধ আঁধারে বিলীন
আকাশমণ্ডপে শুধু বসে আছে এক 'চিরদিন'।

২

কী লাগিয়া বসে আছ, চাহিয়া রয়েছ কার লাগি,
প্রলয়ের পরপারে নেহারিছ কার আগমন,
কার দূর পদধ্বনি চিরদিন করিছ শ্রবণ,
চিরবিরহীর মতো চিররাত্রি রহিয়াছ জাগি !
অসীম অতৃপ্তি লয়ে মাঝে মাঝে ফেলিছ নিশ্বাস,
আকাশপ্রান্তরে তাই কেঁদে উঠে প্রলয়বাতাস,
জগতের ঊর্ণাজাল ছিঁড়ে টুটে কোথা যায় ভাগি !
অনন্ত আঁধার-মাঝে কেহ তব নাহিক দোসর,
পশে না তোমার প্রাণে আমাদের হৃদয়ের আশ,
পশে না তোমার কানে আমাদের পাখিদের স্বর।
সহস্র জগতে মিলি রচে তব বিজন প্রবাস,
সহস্র শবদে মিলি বাঁধে তব নিঃশব্দের ঘর—
হাসি, কাঁদি, ভালোবাসি, নাই তব হাসি কান্না মায়া—
আসি, থাকি, চলে যাই কত ছায়া কত উপছায়া !

৩

তাই কি ? সকলি ছায়া ? আসে, থাকে, আর মিলে যায় ?
তুমি শুধু একা আছ, আর সব আছে আর নাই ?

যুগযুগান্তর ধরে ফুল ফুটে, ফুল ঝরে তাই ?
প্রাণ পেয়ে প্রাণ দিই, সে কি শুধু মরণের পায় ?
এ ফুল চাহে না কেহ ? লহে না এ পূজা-উপহার ?
এ প্রাণ, প্রাণের আশা, টুটে কি অসীম শূন্যতায় ?
বিশ্বের উঠিছে গান, বধিরতা বসি সিংহাসনে ?
বিশ্বের কাঁদিছে প্রাণ, শূন্যে ঝরে অশ্রুবারিধার ?
যুগযুগান্তের প্রেম কে লইবে, নাই ত্রিভুবনে ?
চরাচর মগ্ন আছে নিশিদিন আশার স্বপনে—
বাঁশি শুনি চলিয়াছে, সে কি হায় বৃথা অভিসার !
বোলো না সকলি স্বপ্ন, সকলি এ মায়ার ছলন—
বিশ্ব যদি স্বপ্ন দেখে, সে স্বপন কাহার স্বপন ?
সে কি এই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকার ?

৪

ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ।
জগৎ আপনা দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান।
অসীমে উঠিছে প্রেম শুধিবারে অসীমের ঋণ—
যত দেয় তত পায়, কিছুতে না হয় অবসান।
যত ফুল দেয় ধরা তত ফুল পায় প্রতিদিন—
যত প্রাণ ফুটাইছে ততই বাড়িয়া উঠে প্রাণ।
যাহা আছে তাই দিয়ে ধনী হয়ে উঠে দীনহীন,
অসীমে জগতে একি পিরিতির আদান-প্রদান !
কাহারে পূজিছে ধরা শ্যামল যৌবন-উপহারে,
নিমেষে নিমেষে তাই ফিরে পায় নবীন যৌবন।
প্রেমে টেনে আনে প্রেম, সে প্রেমের পাথার কোথা রে !
প্রাণ দিলে প্রাণ আসে, কোথা সেই অনন্ত জীবন !
ক্ষুদ্র আপনারে দিলে, কোথা পাই অসীম আপন—
সে কি ওই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকারে !

বঙ্গভূমির প্রতি

কেন চেয়ে আছ, গো মা, মুখপানে !
এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে,
আপন মায়েরে নাহি জানে !
এরা তোমায় কিছু দেবে না, দেবে না—
মিথ্যা কহে শুধু কত কী ভাণে !
তুমি তো দিতেছ, মা, যা আছে তোমারি—
স্বর্ণশস্য তব, জাহ্নবীবারি,
জ্ঞান ধর্ম কত পুণ্যকাহিনী।
এরা কি দেবে তোরে, কিছু না, কিছু না—
মিথ্যা কবে শুধু হীন পরানে !
মনের বেদনা রাখো, মা, মনে,
নয়নবারি নিবারো নয়নে,
মুখ লুকাও, মা, ধূলিশয়নে—
ভুলে থাকো যত হীন সন্তানে।
শূন্যপানে চেয়ে প্রহর গণি গণি
দেখো কাটে কি না দীর্ঘ রজনী—
দুঃখ জানায়ে কী হবে, জননী,
নির্মম চেতনহীন পাষাণে !

বঙ্গবাসীর প্রতি

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।
এ কি শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা !
আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস,
কলঙ্কের কথা দরিদ্রের আশ,

এ যে বুক-ফাটা দুখে গুমরিছে বুকে
গভীর মরমবেদনা।
এ কি শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা!
এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি,
মিছে কথা কয়ে মিছে যশ লয়ে
মিছে কাজে নিশিযাপনা!
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ—
কাতরে কাঁদিবে, মা'র পায়ে দিবে
সকল প্রাণের কামনা।
এ কি শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা!

আহ্বানগীত

পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ,
শুনিতে পেয়েছি ওই—
সবাই এসেছে লইয়া নিশান,
কই রে বাঙালি কই!
সুগভীর স্বর কাঁদিয়া বেড়ায়
বঙ্গসাগরের তীরে,
'বাঙালির ঘরে কে আছিস আয়'
ডাকিতেছে ফিরে ফিরে।
ঘরে ঘরে কেন দুয়ার ভেজানো,
পথে কেন নাই লোক,
সারা দেশ ব্যাপি মরেছে কে যেন—
বেঁচে আছে শুধু শোক।

গঙ্গা বহে শুধু আপনার মনে,
চেয়ে থাকে হিমগিরি,
রবি শশী উঠে অনন্ত গগনে
আসে যায় ফিরি ফিরি।
কত-না সংকট, কত-না সন্তাপ
মানবশিশুর তরে,
কত-না বিবাদ কত-না বিলাপ
মানবশিশুর ঘরে!
কত ভায়ে ভায়ে নাহি যে বিশ্বাস,
কেহ কারে নাহি মানে,
ঈর্ষা নিশাচরী ফেলিছে নিশ্বাস
হৃদয়ের মাঝখানে।
হৃদয়ে লুকানো হৃদয়বেদনা,
সংশয়-আঁধারে যুঝে,
কে কাহারে আজি দিবে গো সান্ত্বনা—
কে দিবে আলয় খুঁজে!
মিটাতে হইবে শোক তাপ ত্রাস,
করিতে হইবে রণ,
পৃথিবী হইতে উঠেছে উচ্ছ্বাস—
শোনো শোনো সৈন্যগণ!
পৃথিবী ডাকিছে আপন সন্তানে,
বাতাস ছুটেছে তাই—
গৃহ তেয়াগিয়া ভায়ের সন্ধানে
চলিয়াছে কত ভাই।
বঙ্গের কুটিরে এসেছে বারতা,
শুনেছে কি তাহা সবে?
জেগেছে কি কবি শুনাতে সে কথা
জলদগম্ভীর রবে?
হৃদয় কি কারো উঠেছে উথলি?
আঁখি খুলেছে কি কেহ?

ভেঙেছে কি কেহ সাধের পুতলি ?
ছেড়েছে খেলার গেহ ?
কেন কানাকানি, কেন রে সংশয় ?
কেন মরো ভয়ে লাজে ?
খুলে ফেলো দ্বার, ভেঙে ফেলো ভয়,
চলো পৃথিবীর মাঝে।
ধরাপ্রান্তভাগে ধূলিতে লুটায়ে
জড়িমাজড়িততনু
আপনার মাঝে আপনি গুটায়ে
ঘুমায় কীটের অণু।
চারি দিকে তার আপন উল্লাসে
জগৎ ধাইছে কাজে,
চারি দিকে তার অনন্ত আকাশে
স্বরগসংগীত বাজে !
চারি দিকে তার মানবমহিমা
উঠিছে গগনপানে,
খুঁজিছে মানব আপনার সীমা
অসীমের মাঝখানে !
সে কিছুই তার করে না বিশ্বাস,
আপনারে জানে বড়ো—
আপনি গণিছে আপন নিশ্বাস,
ধুলা করিতেছে জড়ো।
সুখদুঃখ লয়ে অনন্ত সংগ্রাম,
জগতের রঙ্গভূমি—
হেথায় কে চায় ভীরুর বিশ্রাম,
কেন গো ঘুমাও তুমি।
ডুবিছ ভাসিছ অশ্রুর হিল্লোলে,
শুনিতেছ হাহাকার—
তীর কোথা আছে দেখো মুখ তুলে,
এ সমুদ্র করো পার।

মহা কলরবে সেতু বাঁধে সবে,
তুমি এসো, দাও যোগ—
বাধার মতন জড়াও চরণ
একি রে করম-ভোগ।
তা যদি না পারো সরো তবে সরো,
ছেড়ে দাও তবে স্থান,
ধুলায় পড়িয়া মরো তবে মরো—
কেন এ বিলাপগান!

ওরে চেয়ে দেখ্ মুখ আপনার,
ভেবে দেখ্ তোরা কারা।
মানবের মতো ধরিয়া আকার,
কেন রে কীটের পারা?
আছে ইতিহাস, আছে কুলমান,
আছে মহত্ত্বের খনি—
পিতৃপিতামহ গেয়েছে যে গান
শোন্ তার প্রতিধ্বনি।
খুঁজেছেন তাঁরা চাহিয়া আকাশে
গ্রহতারকার পথ,
জগৎ ছাড়ায়ে অসীমের আশে
উড়াতেন মনোরথ।
চাতকের মতো সত্যের লাগিয়া
তৃষিত-আকুল-প্রাণে
দিবসরজনী ছিলেন জাগিয়া
চাহিয়া বিশ্বের পানে।
তবে কেন সবে বধির হেথায়,
কেন অচেতন প্রাণ—
বিফল উচ্ছ্বাসে কেন ফিরে যায়
বিশ্বের আহ্বানগান!

মহত্ত্বের গাথা পশিতেছে কানে,
কেন রে বুঝি নে ভাষা ?
তীর্থযাত্রী যত পথিকের গানে
কেন রে জাগে না আশা ?
উন্নতির ধ্বজা উড়িছে বাতাসে,
কেন রে নাচে না প্রাণ ?
নবীন কিরণ ফুটেছে আকাশে,
কেন রে জাগে না গান ?
কেন আছি শুয়ে, কেন আছি চেয়ে,
পড়ে আছি মুখোমুখি—
মানবের স্রোত চলে গান গেয়ে,
জগতের সুখে সুখী !
চলো দিবালোকে, চলো লোকালয়ে,
চলো জনকোলাহলে—
মিশাব হৃদয় মানবহৃদয়ে
অসীম আকাশতলে।
তরঙ্গ তুলিব তরঙ্গের 'পরে,
নৃত্যগীত নব নব—
বিশ্বের কাহিনী কোটি কণ্ঠস্বরে
এককণ্ঠ হয়ে কব।
মানবের সুখ মানবের আশা
বাজিবে আমার প্রাণে,
শত লক্ষ কোটি মানবের ভাষা
ফুটিবে আমার গানে।
মানবের কাজে মানবের মাঝে
আমরা পাইব ঠাঁই,
বঙ্গের দুয়ারে তাই শিঙা বাজে—
শুনিতে পেয়েছি ভাই !
মুছে ফেলো ধুলা, মুছ অশ্রুজল,
ফেলো ভিখারির চীর—

পরো নব সাজ, ধরো নব বল,
তোলো তোলো নত শির।
তোমাদের কাছে আজি আসিয়াছে
জগতের নিমন্ত্রণ—
দীনহীন বেশ ফেলে যেয়ো পাছে,
দাসত্বের আভরণ।
সভার মাঝারে দাঁড়াবে যখন,
হাসিয়া চাহিবে ধীরে,
পুরবরবির হিরণ কিরণ
পড়িবে তোমার শিরে।
বাঁধন টুটিয়া উঠিবে ফুটিয়া
হৃদয়ের শতদল,
জগতমাঝারে যাইবে লুটিয়া
প্রভাতের পরিমল।
উঠ বঙ্গকবি, মায়ের ভাষায়
মুমূর্ষুরে দাও প্রাণ—
জগতের লোক সুধার আশায়
সে ভাষা করিবে পান।
চাহিবে মোদের মায়ের বদনে,
ভাসিবে নয়নজলে—
বাঁধিবে জগৎ গানের বাঁধনে
মায়ের চরণতলে।
বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই বলে
কাঁদিতেছে বঙ্গভূমি,
গান গেয়ে কবি জগতের তলে
স্থান কিনে দাও তুমি।
একবার কবি মায়ের ভাষায়
গাও জগতের গান—
সকল জগৎ ভাই হয়ে যায়,
ঘুচে যায় অপমান।

শেষ কথা

মনে হয় কী একটি শেষ কথা আছে,
সে কথা হইলে বলা সব বলা হয়।
কল্পনা কাঁদিয়া ফিরে তারি পাছে পাছে,
তারি তরে চেয়ে আছে সমস্ত হৃদয়।
শত গান উঠিতেছে তারি অন্বেষণে,
পাখির মতন ধায় চরাচরময়।
শত গান ম'রে গিয়ে নূতন জীবনে
একটি কথায় চাহে হইতে বিলয়।
সে কথা হইলে বলা নীরব বাঁশরি,
আর বাজাব না বীণা চিরদিন-তরে।
সে কথা শুনিতে সবে আছে আশা করি,
মানব এখনো তাই ফিরিছে না ঘরে।
সে কথায় আপনারে পাইব জানিতে,
আপনি কৃতার্থ হব আপন বাণীতে।

*

মানসী

সূচনা

বাল্যকাল থেকে পশ্চিম-ভারত আমার কাছে রোম্যাণ্টিক কল্পনার বিষয় ছিল। এইখানেই নিরবচ্ছিন্নকাল বিদেশীয়দের সঙ্গে এ দেশের সংযোগ ও সংঘর্ষ ঘটে এসেছে। বহু শতাব্দী ধরে এইখানেই ইতিহাসের বিপুল পটভূমিকায় বহু সাম্রাজ্যের উত্থান পতন এবং নব নব ঐশ্বর্যের বিকাশ ও বিলয় আপন বিচিত্র বর্ণের ছবির ধারা অঙ্কিত করে চলেছে। অনেক দিন ইচ্ছা করেছি এই পশ্চিম-ভারতের কোনো-এক জায়গায় আশ্রয় নিয়ে ভারতবর্ষের বিরাট বিক্ষুব্ধ অতীত যুগের স্পর্শলাভ করব মনের মধ্যে। অবশেষে এক সময়ে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলুম। এত দেশ থাকতে কেন যে গাজিপুর বেছে নিয়েছিলুম তার দুটো কারণ আছে। শুনেছিলুম গাজিপুরে আছে গোলাপের খেত। আমি যেন মনের মধ্যে গোলাপবিলাসী সিরাজের ছবি এঁকে নিয়েছিলুম। তারই মোহ আমাকে প্রবলভাবে টেনেছিল। সেখানে গিয়ে দেখলুম ব্যাবসাদারের গোলাপের খেত, এখানে বুলবুলের আমন্ত্রণ নেই, কবিরও নেই। হারিয়ে গেল সেই ছবি। অপর পক্ষে, গাজিপুরে মহিমান্বিত প্রাচীন ইতিহাসের স্বাক্ষর কোথাও বড়ো রেখায় ছাপ দেয় নি। আমার চোখে এর চেহারা ঠেকল সাদা-কাপড়-পরা বিধবার মতো, সেও কোনো বড়োঘরের ঘরণী নয়।

তবু গাজিপুরেই রয়ে গেলুম, তার একটা কারণ এখানে ছিলেন আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয় গগনচন্দ্র রায়, আফিম-বিভাগের একজন বড়ো কর্মচারী। এখানে আমার সমস্ত ব্যবস্থা সহজ হল তাঁরই সাহায্যে। একখানা বড়ো বাংলা পাওয়া গেল, গঙ্গার ধারেও বটে, কিন্তু গঙ্গার ধারেও নয়। প্রায় মাইলখানেক চর পড়ে গেছে, সেখানে যবের ছোলার শর্ষের খেত; দূর থেকে দেখা যায় গঙ্গার জলধারা, গুণ-টানা নৌকো চলেছে মন্থর গতিতে। বাড়ির সংলগ্ন অনেকখানি জমি, অনাদৃত, বাংলাদেশের মাটি হলে জঙ্গল হয়ে উঠত। ইঁদারা থেকে পূর চলছে নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কলকল শব্দে। গোলকচাঁপার ঘনপল্লব থেকে কোকিলের ডাক আসত রৌদ্রতপ্ত প্রহরের ক্লান্ত হাওয়ায়। পশ্চিম কোণে প্রাচীন একটা মহানিম গাছ, তার বিস্তীর্ণ ছায়াতলে বসবার জায়গা। সাদা

ধুলোর রাস্তা চলেছে বাড়ির গা ঘেঁষে, দূরে দেখা যায় খোলার-চাল-ওয়ালা পল্লী।

গাজিপুর আগ্রা-দিল্লীর সমকক্ষ নয়, সিরাজ-সমরখন্দের সঙ্গেও এর তুলনা হয় না— তবু মন নিমগ্ন হল অক্ষুণ্ণ অবকাশের মধ্যে। আমার গানে আমি বলেছি, আমি সুদূরের পিয়াসী। পরিচিত সংসার থেকে এখানে আমি সেই দূরত্বের দ্বারা বেষ্টিত হলুম, অভ্যাসের স্থূলহস্তাবলেপ দূর হবামাত্র মুক্তি এল মনোরাজ্যে। এই আবহাওয়ায় আমার কাব্য-রচনার একটা নতুন পর্ব আপনি প্রকাশ পেল। আমার কল্পনার উপর নূতন পরিবেষ্টনের প্রভাব বারবার দেখেছি। এইজন্যেই আলমোড়ায় যখন ছিলুম আমার লেখনী হঠাৎ নতুন পথ নিল 'শিশু'র কবিতায়, অথচ সে-জাতীয় কবিতার কোনো প্রেরণা কোনো উপলক্ষই সেখানে ছিল না। পূর্বতন রচনাধারা থেকে স্বতন্ত্র এ একটা নূতন কাব্যরূপের প্রকাশ। 'মানসী'ও সেই রকম। নূতন আবেষ্টনে এই কবিতাগুলি সহসা যেন নবদেহ ধারণ করল। পূর্ববর্তী 'কড়ি ও কোমল'এর সঙ্গে এর বিশেষ মিল পাওয়া যাবে না। আমার রচনার এই পর্বেই যুক্ত অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নূতন শক্তি দিতে পেরেছি। মানসী'তেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।

উপহার

নিভৃত এ চিত্তমাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ-আঘাত,
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারা দিনরাত।
সুখ দুঃখ গীতস্বর ফুটিতেছে নিরন্তর—
ধ্বনি শুধু, সাথে নাই ভাষা।
বিচিত্র সে কলরোলে ব্যাকুল করিয়া তোলে
জাগাইয়া বিচিত্র দুরাশা।
এ চিরজীবন তাই আর কিছু কাজ নাই,
রচি শুধু অসীমের সীমা।
আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী-প্রতিমা।

বাহিরে পাঠায় বিশ্ব কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে,
বিরহী সে ঘুরে ঘুরে ব্যথাভরা কত সুরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে।
সেই মোহমন্ত্র গানে কবির গভীর প্রাণে
জেগে ওঠে বিরহী ভাবনা,
ছাড়ি অন্তঃপুরবাসে সলজ্জ চরণে আসে
মূর্তিমতী মর্মের কামনা।
অন্তরে বাহিরে সেই ব্যাকুলিত মিলনেই
কবির একান্ত সুখোচ্ছ্বাস।
সেই আনন্দমুহূর্তগুলি তব করে দিনু তুলি
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ।

জোড়াসাঁকো
৩০ বৈশাখ ১৮৯০ [খৃস্টাব্দ]

মানসী

ভুলে

কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া,
এসেছি ভুলে।
তবু একবার চাও মুখপানে
নয়ন তুলে।
দেখি, ও নয়নে নিমেষের তরে
সেদিনের ছায়া পড়ে কি না পড়ে,
সজল আবেগে আঁখিপাতা দুটি
পড়ে কি ঢুলে।
ক্ষণেকের তরে ভুল ভাঙায়ো না,
এসেছি ভুলে।

বেল-কুঁড়ি দুটি করে ফুটি-ফুটি
অধর খোলা।
মনে পড়ে গেল সেকালের সেই
কুসুম তোলা।
সেই শুকতারা সেই চোখে চায়,
বাতাস কাহারে খুঁজিয়া বেড়ায়,
উষা না ফুটিতে হাসি ফুটে তার
গগনমূলে।
সেদিন যে গেছে ভুলে গেছি, তাই
এসেছি ভুলে।

ব্যথা দিয়ে কবে কথা কয়েছিলে
পড়ে না মনে,
দূরে থেকে কবে ফিরে গিয়েছিলে
নাই স্মরণে।
শুধু মনে পড়ে হাসিমুখখানি,
লাজে বাধো-বাধো সোহাগের বাণী,
মনে পড়ে সেই হৃদয়-উছাস
নয়নকূলে।
তুমি যে ভুলেছ ভুলে গেছি, তাই
এসেছি ভুলে।

কাননের ফুল, এরা তো ভোলে নি,
আমরা ভুলি?
সেই তো ফুটেছে পাতায় পাতায়
কামিনীগুলি!
চাঁপা কোথা হতে এনেছে ধরিয়া
অরুণকিরণ কোমল করিয়া,
বকুল ঝরিয়া মরিবারে চায়
কাহার চুলে?
কেহ ভোলে, কেউ ভোলে না যে, তাই
এসেছি ভুলে।

এমন করিয়া কেমনে কাটিবে
মাধবী রাতি?
দখিনে বাতাসে কেহ নেই পাশে
সাথের সাথি!
চারি দিক হতে বাঁশি শোনা যায়,
সুখে আছে যারা তারা গান গায়—

আকুল বাতাসে, মদির স্থবাসে,
বিকচ ফুলে,
এখনো কি কেঁদে চাহিবে না কেউ
আসিলে ভুলে ?

বৈশাখ ১৮৮৭

ভুল-ভাঙা

বুঝেছি আমার নিশার স্বপন
হয়েছে ভোর।
মালা ছিল, তার ফুলগুলি গেছে,
রয়েছে ডোর।
নেই আর সেই চুপি-চুপি চাওয়া,
ধীরে কাছে এসে ফিরে ফিরে যাওয়া—
চেয়ে আছে আঁখি, নাই ও আঁখিতে
প্রেমের ঘোর।
বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশ
বাহুতে মোর।

হাসিটুকু আর পড়ে না তো ধরা
অধরকোণে।
আপনারে আর চাহ না লুকাতে
আপন মনে।
স্বর শুনে আর উতলা হৃদয়
উথলি উঠে না সারা দেহময়,
গান শুনে আর ভাসে না নয়নে
নয়নলোর।

আঁখিজলরেখা ঢাকিতে চাহে না
শরম চোর।

বসন্ত নাহি এ ধরায় আর
আগের মতো,
জ্যোৎস্নাযামিনী যৌবনহারা
জীবনহত।
আর বুঝি কেহ বাজায় না বীণা,
কে জানে কাননে ফুল ফোটে কি না—
কে জানে সে ফুল তোলে কি না কেউ
ভরি আঁচোর!
কে জানে সে ফুলে মালা গাঁথে কি না
সারা প্রহর!

বাঁশি বেজেছিল, ধরা দিনু যেই
থামিল বাঁশি—
এখন কেবল চরণে শিকল
কঠিন ফাঁসি।
মধু নিশা গেছে, স্মৃতি তারি আজ
মর্মে মর্মে হানিতেছে লাজ—
সুখ গেছে, আছে সুখের ছলনা
হৃদয়ে তোর।
প্রেম গেছে, শুধু আছে প্রাণপণ
মিছে আদর।

কতই না জানি জেগেছ রজনী
করুণ দুখে,
সদয় নয়নে চেয়েছ আমার
মলিন মুখে।

পরদুখভার সহে নাকো আর,
লতায়ে পড়িছে দেহ সুকুমার—
তবু আসি আমি পাষাণহৃদয়
বড়ো কঠোর।
ঘুমাও, ঘুমাও, আঁখি ঢুলে আসে
ঘুমে কাতর।

৪৯ পার্কস্ট্রীট
বৈশাখ ১৮৮৭

বিরহানন্দ

এই ছন্দে যে যে স্থানে ফাঁক সেইখানে দীর্ঘ যতিপতন আবশ্যক

ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী
বিরহতপোবনে আনমনে উদাসী।
আঁধারে আলো মিশে দিশে দিশে খেলিত,
অটবী বায়ুবশে উঠিত সে উছাসি।
কখনো ফুল দুটো আঁখিপুট মেলিত,
কখনো পাতা ঝরে পড়িত রে নিশাসি।

তবু সে ছিনু ভালো আধা-আলো- আঁধারে,
গহন শত-ফের বিষাদের মাঝারে।
নয়নে কত ছায়া কত মায়া ভাসিত,
উদাস বায়ু সে তো ডেকে যেত আমারে।
ভাবনা কত সাজে হৃদিমাঝে আসিত,
খেলাত অবিরত কত শত আকারে!

বিরহপরিপূত ছায়াযুত শয়নে
ঘুমের সাথে স্মৃতি আসে নিতি নয়নে।

কপোত দুটি ডাকে বসি শাখে মধুরে,
দিবস চলে যায় গলে যায় গগনে।
কোকিল কুহুতানে ডেকে আনে বধূরে,
নিবিড় শীতলতা তরুলতা গহনে।

আকাশে চাহিতাম গাহিতাম একাকী,
মনের যত কথা ছিল সেথা লেখা কি?
দিবসনিশি ধ'রে ধ্যান ক'রে তাহারে
নীলিমা-পরপার পাব তার দেখা কি?
তটিনী অনুখন ছোটে কোন্ পাথারে,
আমি যে গান গাই তারি ঠাঁই শেখা কি?

বিরহে তারি নাম শুনিতাম পবনে,
তাহারি সাথে থাকা মেঘে ঢাকা ভবনে।
পাতার মরমর কলেবর হরষে,
তাহারি পদধ্বনি যেন গণি কাননে।
মুকুল সুকুমার যেন তার পরশে,
চাঁদের চোখে ক্ষুধা তারি সুধা -স্বপনে।

করুণা অনুখন প্রাণ মন ভরিত,
ঝরিলে ফুলদল চোখে জল ঝরিত।
পবন হুহু ক'রে করিত রে হাহাকার,
ধরার তরে যেন মোর প্রাণ ঝুরিত।
হেরিলে দুখে শোকে কারো চোখে আঁখিধার
তোমারি আঁখি কেন মনে যেন পড়িত।

শিশুরে কোলে নিয়ে জুড়াইয়ে যেত বুক,
আকাশে বিকশিত তোরি মতো স্নেহমুখ।

দেখিলে আঁখি-রাঙা পাখা-ভাঙা পাখিটি
'আহাহা' ধ্বনি তোর প্রাণে মোর দিত দুখ।
মুছালে দুখনীর দুখিনীর আঁখিটি,
জাগিত মনে ত্বরা দয়া-ভরা তোর সুখ।

সারাটা দিনমান রচি গান কত-না!
তোমারি পাশে রহি যেন কহি বেদনা।
কানন মরমরে কত স্বরে কহিত,
ধ্বনিত যেন দিশে তোমারি সে রচনা।
সতত দূরে কাছে আগে পাছে বহিত
তোমারি যত কথা পাতা-লতা ঝরনা।

তোমারে আঁকিতাম, রাখিতাম ধরিয়া
বিরহ ছায়াতল সুশীতল করিয়া।
কখনো দেখি যেন ম্লান-হেন মুখানি,
কখনো আঁখিপুটে হাসি উঠে ভরিয়া।
কখনো সারা রাত ধরি হাত দুখানি
রহি গো বেশবাসে কেশপাশে মরিয়া।

বিরহ সুমধুর হল দূর কেন রে?
মিলনদাবানলে গেল জলে যেন রে।
কই সে দেবী কই? হেরো ওই একাকার,
শ্মশানবিলাসিনী বিবাসিনী বিহরে।
নাই গো দয়ামায়া স্নেহছায়া নাহি আর—
সকলি করে ধুধু, প্রাণ শুধু শিহরে।

জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৭

ক্ষণিক মিলন

একদা এলোচুলে কোন্ ভুলে ভুলিয়া
আসিল সে আমার ভাঙা দ্বার খুলিয়া।
জ্যোৎস্না অনিমিখ, চারি দিক সুবিজন,
চাহিল একবার আঁখি তার তুলিয়া।
দখিনবায়ুভরে থরথরে কাঁপে বন,
উঠিল প্রাণ মম তারি সম দুলিয়া।

আবার ধীরে ধীরে গেল ফিরে আলসে,
আমার সব হিয়া মাড়াইয়া গেল সে।
আমার যাহা ছিল সব নিল আপনায়,
হরিল আমাদের আকাশের আলো সে।
সহসা এ জগৎ ছায়াবৎ হয়ে যায়,
তাহারি চরণের শরণের লালসে।

যে জন চলিয়াছে তারি পাছে সবে ধায়,
নিখিলে যত প্রাণ যত গান ঘিরে তায়।
সকল রূপহার উপহার চরণে,
ধায় গো উদাসিয়া যত হিয়া পায় পায়।
যে জন পড়ে থাকে একা ডাকে মরণে,
সুদূর হতে হাসি আর বাঁশি শোনা যায়।

শবদ নাহি আর, চারি ধার প্রাণহীন—
কেবল ধুক্ ধুক্ করে বুক নিশিদিন।
যেন গো ধ্বনি এই তারি সেই চরণের
কেবলি বাজে শুনি, তাই গুনি দুই তিন।
কুড়ায়ে সব-শেষ অবশেষ স্মরণের
বসিয়া একজন আনমন উদাসীন।

জোড়াসাঁকো
৯ ভাদ্র ১৮৮৯

শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা

আবার মোরে পাগল করে
দিবে কে ?
হৃদয় যেন পাষাণ-হেন
বিরাগ-ভরা বিবেকে।
আবার প্রাণে নূতন টানে
প্রেমের নদী
পাষাণ হতে উছল স্রোতে
বহায় যদি !
আবার দুটি নয়নে লুটি
হৃদয় হরে নিবে কে ?
আবার মোরে পাগল করে
দিবে কে ?

আবার কবে ধরণী হবে
তরুণা ?
কাহার প্রেমে আসিবে নেমে
স্বরগ হতে করুণা ?
নিশীথনভে শুনিব কবে
গভীর গান,
যে দিকে চাব দেখিতে পাব
নবীন প্রাণ,
নূতন প্রীতি আনিবে নিতি
কুমারী উষা অরুণা—
আবার কবে ধরণী হবে
তরুণা ?

কোথা এ মোর জীবন-ডোর
বাঁধা রে ?
প্রেমের ফুল ফুটে' আকুল
কোথায় কোন্ আঁধারে ?
গভীরতম বাসনা মম
কোথায় আছে ?
আমার গান আমার প্রাণ
কাহার কাছে ?
কোন্ গগনে মেঘের কোণে
লুকায়ে কোন্ চাঁদা রে ?
কোথায় মোর জীবন-ডোর
বাঁধা রে ?

অনেক দিন পরানহীন
ধরণী।
বসনাবৃত খাঁচার মতো
তামসঘনবরনী।
নাই সে শাখা, নাই সে পাখা,
নাই সে পাতা,
নাই সে ছবি, নাই সে রবি,
নাই সে গাথা—
জীবন চলে আঁধার জলে
আলোকহীন তরণী।
অনেক দিন পরানহীন
ধরণী।

মায়াকারায় বিভোর প্রায়
সকলি,
শতেক পাকে জড়ায়ে রাখে
ঘুমের ঘোর শিকলি।

*

দানব-হেন আছে কে যেন
দুয়ার আঁটি।
কাহার কাছে না জানি আছে
সোনার কাঠি ?
পরশ লেগে উঠিবে জেগে
হরষ-রস-কাকলি !
মায়াকারায় বিভোর-প্রায়
সকলি।

দিবে সে খুলি এ ঘোর ধূলি-
আবরণ।
তাহার হাতে আঁখির পাতে
জগতজাগা জাগরণ।
সে হাসিখানি আনিবে টানি
সবার হাসি,
গড়িবে গেহ, জাগাবে স্নেহ
জীবনরাশি।
প্রকৃতিবধূ চাহিবে মধু,
পরিবে নব আভরণ।
সে দিবে খুলি এ ঘোর ধূলি-
আবরণ।

পাগল করে দিবে সে মোরে
চাহিয়া,
হৃদয়ে এসে মধুর হেসে
প্রাণের গান গাহিয়া।
আপনা থাকি ভাসিবে আঁখি
আকুল নীরে,
ঝরনা-সম জগৎ মম
ঝরিবে শিরে।

তাহার বাণী দিবে গো আনি
সকল বাণী বাহিয়া।
পাগল করে দিবে সে মোরে
চাহিয়া।

৪৯ পার্ক স্ট্রীট
আষাঢ় ১৮৮৭

আত্মসমর্পণ

আমি এ কেবল মিছে বলি,
শুধু আপনার মন ছলি।
কঠিন বচন শুনায়ে তোমারে
আপন মর্মে জ্বলি।
থাক্ তবে থাক্ ক্ষীণ প্রতারণা,
কী হবে লুকায়ে বাসনা বেদনা,
যেমন আমার হৃদয়-পরান
তেমনি দেখাব খুলি।

আমি মনে করি যাই দূরে,
তুমি রয়েছ বিশ্ব জুড়ে।
যত দূরে যাই ততই তোমার
কাছাকাছি ফিরি ঘুরে।
চোখে চোখে থেকে কাছে নহ তবু,
দূরেতে থেকেও দূর নহ কভু,
সৃষ্টি ব্যাপিয়া রয়েছ তবুও
আপন অন্তঃপুরে।

আমি যেমনি করিয়া চাই,
আমি যেমনি করিয়া গাই,

বেদনাবিহীন ওই হাসিমুখ
সমান দেখিতে পাই।
ওই রূপরাশি আপনা বিকাশি
রয়েছে পূর্ণ গৌরবে ভাসি,
আমার ভিখারি প্রাণের বাসনা
হোথায় না পায় ঠাঁই।

শুধু ফুটন্ত ফুলমাঝে
দেবী, তোমার চরণ সাজে।
অভাবকঠিন মলিন মর্ত
কোমল চরণে বাজে।
জেনে শুনে তবু কী ভ্রমে ভুলিয়া
আপনারে আমি এনেছি তুলিয়া,
বাহিরে আসিয়া দরিদ্র আশা
লুকাতে চাহিছে লাজে।

তবু থাক্ পড়ে ওইখানে,
চেয়ে তোমার চরণপানে।
যা দিয়েছি তাহা গেছে চিরকাল,
আর ফিরিবে না প্রাণে।
তবে ভালো করে দেখো একবার
দীনতা হীনতা যা আছে আমার,
ছিন্ন মলিন অনাবৃত হিয়া
অভিমান নাহি জানে।

তবে লুকাব না আমি আর
এই ব্যথিত হৃদয়ভার।
আপনার হাতে চাব না রাখিতে
আপনার অধিকার।

বাঁচিলাম প্রাণে তেয়াগিয়া লাজ,
বদ্ধ বেদনা ছাড়া পেল আজ,
আশা-নিরাশায় তোমারি যে আমি
জানাইনু শত বার।

জোড়াসাঁকো
১১ ভাদ্র ১৮৮৯

নিষ্ফল কামনা

বৃথা এ ক্রন্দন!
বৃথা এ অনল-ভরা দুরন্ত বাসনা!

রবি অস্ত যায়।
অরণ্যেতে অন্ধকার আকাশেতে আলো।
সন্ধ্যা নত-আঁখি
ধীরে আসে দিবার পশ্চাতে।
বহে কি না বহে
বিদায়বিষাদশ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস।
দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে
চেয়ে আছি দুটি আঁখি-মাঝে।
খুঁজিতেছি, কোথা তুমি,
কোথা তুমি!
যে অমৃত লুকানো তোমায়
সে কোথায়!
অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড়তিমিরতলে কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্যশিখা।

তাই চেয়ে আছি।
প্রাণ মন সব লয়ে তাই ডুবিতেছি
অতল আকাঙ্ক্ষা-পারাবারে।
তোমার আঁখির মাঝে,
হাসির আড়ালে,
বচনের সুধাস্রোতে,
তোমার বদনব্যাপী
করুণ শান্তির তলে
তোমারে কোথায় পাব—
তাই এ ক্রন্দন!

বৃথা এ ক্রন্দন!
হায় রে দুরাশা!
এ রহস্য এ আনন্দ তোর তরে নয়।
যাহা পাস তাই ভালো,
হাসিটুকু, কথাটুকু,
নয়নের দৃষ্টিটুকু,
প্রেমের আভাস।
সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,
এ কী দুঃসাহস!
কী আছে বা তোর,
কী পারিবি দিতে!
আছে কি অনন্ত প্রেম?
পারিবি মিটাতে
জীবনের অনন্ত অভাব?
মহাকাশ-ভরা
এ অসীম জগৎ-জনতা,
এ নিবিড় আলো অন্ধকার,
কোটি ছায়াপথ, মায়াপথ,
দুর্গম উদয়-অস্তাচল,

এরই মাঝে পথ করি
পারিবি কি নিয়ে যেতে
চিরসহচরে
চিররাত্রিদিন
একা অসহায় ?
যে জন আপনি ভীত, কাতর, দুর্বল,
ম্লান, ক্ষুধাতৃষাতুর, অন্ধ, দিশাহারা,
আপন হৃদয়ভারে পীড়িত জর্জর,
সে কাহারে পেতে চায় চিরদিন-তরে ?

ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব,
কেহ নহে তোমার আমার।
অতি সযতনে,
অতি সংগোপনে,
সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবসে,
বিপদে সম্পদে,
জীবনে মরণে,
শত ঋতু-আবর্তনে
বিশ্বজগতের তরে ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি ;
সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরী দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে ?
লও তার মধুর সৌরভ,
দেখো তার সৌন্দর্যবিকাশ,
মধু তার করো তুমি পান,
ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী,
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।

শান্ত সন্ধ্যা, স্তব্ধ কোলাহল।
নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে,
চলো ধীরে ঘরে ফিরে যাই।

১৩ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

সংশয়ের আবেগ

ভালোবাস কি না বাস বুঝিতে পারি নে,
তাই কাছে থাকি।
তাই তব মুখপানে রাখিয়াছি মেলি
সর্বগ্রাসী আঁখি।
তাই সারা রাত্রিদিন শ্রান্তি-তৃপ্তি-নিদ্রাহীন
করিতেছি পান
যতটুকু হাসি পাই, যতটুকু কথা,
যতটুকু গান।

তাই কভু ফিরে যাই, কভু ফেলি শ্বাস,
কভু ধরি হাত।
কখনো কঠিন কথা, কখনো সোহাগ,
কভু অশ্রুপাত।
তুলি ফুল দেব ব'লে, ফেলে দিই ভূমিতলে
করি' খান খান।
কখনো আপন মনে আপনার সাথে
করি অভিমান।

জানি যদি ভালোবাস চির-ভালোবাসা
জনমে বিশ্বাস,
যেথা তুমি যেতে বল সেথা যেতে পারি—
ফেলি নে নিশ্বাস।

তরঙ্গিত এ হৃদয় তরঙ্গিত সমুদয়
বিশ্বচরাচর
মুহূর্তে হইবে শান্ত, টলমল প্রাণ
পাইবে নির্ভর।

বাসনার তীব্র জ্বালা দূর হয়ে যাবে,
যাবে অভিমান—
হৃদয়দেবতা হবে, করিব চরণে
পুষ্প-অর্ঘ্য দান।
দিবানিশি অবিরল লয়ে শ্বাস অশ্রুজল
লয়ে হাহুতাশ
চির ক্ষুধাতৃষা লয়ে আঁখির সম্মুখে
করিব না বাস।

তোমার প্রেমের ছায়া আমারে ছাড়ায়ে
পড়িবে জগতে,
মধুর আঁখির আলো পড়িবে সতত
সংসারের পথে।
দূরে যাবে ভয় লাজ, সাধিব আপন কাজ
শতগুণ বলে—
বাড়িবে আমার প্রেম পেয়ে তব প্রেম,
দিব তা সকলে।

নহে তো আঘাত করো কঠোর কঠিন
কেঁদে যাই চলে।
কেড়ে লও বাহু তব, ফিরে লও আঁখি,
প্রেম দাও দ'লে।
কেন এ সংশয়ডোরে বাঁধিয়া রেখেছ মোরে,
বহে যায় বেলা।
জীবনের কাজ আছে— প্রেম নহে ফাঁকি,
প্রাণ নহে খেলা।

১৫ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

বিচ্ছেদের শান্তি

সেই ভালো, তবে তুমি যাও।
তবে আর কেন মিছে করুণনয়নে
আমার মুখের পানে চাও!
এ চোখে ভাসিছে জল, এ শুধু মায়ার ছল,
কেন কাঁদি তাও নাহি জানি।
নীরব আঁধার রাতি, তারকার ম্লানভাতি
মোহ আনে বিদায়ের বাণী।
নিশিশেষে দিবালোকে এ জল রবে না চোখে,
শান্ত হবে অধীর হৃদয়—
জাগ্রত জগতমাঝে ধাইব আপন কাজে,
কাঁদিবার রবে না সময়।

দেখেছি অনেক দিন বন্ধন হয়েছে ক্ষীণ,
ছেঁড় নাই করুণার বশে।
গানে লাগিত না সুর, কাছে থেকে ছিলে দূর—
যাও নাই কেবল আলসে।
পরান ধরিয়া তবু পারিতাম না তো কভু
তোমা ছেড়ে করিতে গমন।
প্রাণপণে কাছে থাকি দেখিতাম মেলি আঁখি
পলে পলে প্রেমের মরণ।
তুমি তো আপনা হতে এসেছ বিদায় ল'তে—
সেই ভালো, তবে তুমি যাও।
যে প্রেমেতে এত ভয় এত দুঃখ লেগে রয়
সে বন্ধন তুমি ছিঁড়ে দাও।

আমি রহি এক ধারে, তুমি যাও পরপারে,
মাঝখানে বহুক বিস্মৃতি—

একেবারে ভুলে যেয়ো, শতগুণে ভালো সেও,
ভালো নয় প্রেমের বিকৃতি।
কে বলে যায় না ভোলা! মরণের দ্বার খোলা,
সকলেরই আছে সমাপন।
নিবে যায় দাবানল, শুকায় সমুদ্রজল,
থেমে যায় ঝটিকার রণ।
থাকে শুধু মহা শান্তি, মৃত্যুর শ্যামল কান্তি,
জীবনের অনন্ত নির্ঝর—
শত সুখ দুঃখ দ'লে কালচক্র যায় চলে,
রেখা পড়ে যুগ-যুগান্তর।

যেখানে যে এসে পড়ে আপনার কাজ করে
সহস্র জীবন-মাঝে মিশে—
কত যায় কত থাকে, কত ভোলে কত রাখে,
চলে যায় বিষাদে হরিষে।
তুমি আমি যাব দূরে— তবুও জগৎ ঘুরে,
চন্দ্র সূর্য জাগে অবিরল,
থাকে সুখ দুঃখ লাজ, থাকে শত শত কাজ,
এ জীবন হয় না নিষ্ফল।
মিছে কেন কাটে কাল, ছিঁড়ে দাও স্বপ্নজাল,
চেতনার বেদনা জাগাও—
নূতন আশ্রয়-ঠাঁই, দেখি পাই কি না পাই—
সেই ভালো তবে তুমি যাও।

১৪ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

তবু

তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলি,
সেই পুরাতন প্রেম যদি এক কালে

হয়ে আসে দূরস্মৃত কাহিনী কেবলি—
ঢাকা পড়ে নব নব জীবনের জালে।
তবু মনে রেখো, যদি বড়ো কাছে থাকি,
নূতন এ প্রেম যদি হয় পুরাতন,
দেখে না দেখিতে পায় যদি শ্রান্ত আঁখি—
পিছনে পড়িয়া থাকি ছায়ার মতন।
তবু মনে রেখো, যদি তাহে মাঝে মাঝে
উদাস বিষাদভরে কাটে সন্ধ্যাবেলা,
অথবা শারদ প্রাতে বাধা পড়ে কাজে,
অথবা বসন্ত-রাতে থেমে যায় খেলা।
তবু মনে রেখো, যদি মনে প'ড়ে আর
আঁখিপ্রান্তে দেখা নাহি দেয় অশ্রুধার।

১৫ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

একাল ও সেকাল

বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী।
গাঢ় ছায়া সারাদিন,
মধ্যাহ্ন তপনহীন,
দেখায় শ্যামলতর শ্যাম বনশ্রেণী।

আজিকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে
সেই দিবা-অভিসার
পাগলিনী রাধিকার
না জানি সে কবেকার দূর বৃন্দাবনে।

সেদিনও এমনি বায়ু রহিয়া রহিয়া।
এমনি অশ্রান্ত বৃষ্টি,
তড়িতচকিত দৃষ্টি,
এমনি কাতর হায় রমণীর হিয়া।

বিরহিণী মর্মে-মরা মেঘমন্দ্র স্বরে।
নয়নে নিমেষ নাহি,
গগনে রহিত চাহি,
আঁকিত প্রাণের আশা জলদের স্তরে।

চাহিত পথিকবধূ শূন্য পথপানে।
মল্লার গাহিত কারা,
ঝরিত বরষাধারা,
নিতান্ত বাজিত গিয়া কাতর পরানে।

যক্ষনারী বীণা কোলে ভূমিতে বিলীন—
বক্ষে পড়ে রুক্ষ কেশ,
অযত্নশিথিল বেশ—
সেদিনও এমনিতর অন্ধকার দিন।

সেই কদম্বের মূল, যমুনার তীর,
সেই সে শিখীর নৃত্য
এখনো হরিছে চিত্ত—
ফেলিছে বিরহছায়া শ্রাবণতিমির।

আজও আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।
শরতের পূর্ণিমায়
শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।

এখনো সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে।
এখনো প্রেমের খেলা
সারানিশি, সারাবেলা—
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়কুটিরে।

২১ বৈশাখ ১৮৮৮

আকাঙ্ক্ষা

আর্দ্র তীব্র পূর্ববায়ু বহিতেছে বেগে,
ঢেকেছে উদয়পথ ঘননীল মেঘে।
দূরে গঙ্গা, নৌকা নাই, বালু উড়ে যায়,
বসে বসে ভাবিতেছি— আজি কে কোথায়!

শুষ্ক পাতা উড়ে পড়ে জনহীন পথে,
বনের উতল রোল আসে দূর হতে।
নীরব প্রভাতপাখি, কম্পিত কুলায়,
মনে জাগিতেছে সদা— আজি সে কোথায়!

কত কাল ছিল কাছে, বলি নি তো কিছু—
দিবস চলিয়া গেছে দিবসের পিছু।
কত হাস্যপরিহাস বাক্য-হানাহানি,
তার মাঝে রয়ে গেছে হৃদয়ের বাণী।

মনে হয় আজ যদি পাইতাম কাছে,
বলিতাম হৃদয়ের যত কথা আছে।
বচনে পড়িত নীল জলদের ছায়,
ধ্বনিতে ধ্বনিত আর্দ্র উতরোল বায়।

ঘনাইত নিস্তব্ধতা দূর ঝটিকার,
নদীতীরে মেঘে বনে হত একাকার।
এলোকেশ মুখে তার পড়িত নামিয়া,
নয়নে সজল বাষ্প রহিত থামিয়া।

জীবনমরণময় সুগম্ভীর কথা,
অরণ্যমর্মরসম মর্মব্যাকুলতা,
ইহপরকালব্যাপী সুমহান প্রাণ,
উচ্ছ্বসিত উচ্চ আশা, মহত্ত্বের গান—

বৃহৎ বিষাদছায়া, বিরহ গভীর,
প্রচ্ছন্ন হৃদয়রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা অধীর,
বর্ণন-অতীত যত অস্ফুট বচন—
নির্জন ফেলিত ছেয়ে মেঘের মতন।

যথা দিবা-অবসানে নিশীথনিলয়ে
বিশ্ব দেখা দেয় তার গ্রহতারা লয়ে,
হাস্যপরিহাসমুক্ত হৃদয়ে আমার
দেখিত সে অন্তহীন জগতবিস্তার।

নিম্নে শুধু কোলাহল খেলাধুলা হাস,
উপরে নির্লিপ্ত শান্ত অন্তর-আকাশ।
আলোকেতে দেখো শুধু ক্ষণিকের খেলা,
অন্ধকারে আছি আমি অসীম একেলা।

কতটুকু ক্ষুদ্র মোরে দেখে গেছে চলে,
কত ক্ষুদ্র সে বিদায় তুচ্ছ কথা ব'লে!
কল্পনার সত্যরাজ্য দেখাই নি তারে,
বসাই নি এ নির্জন আত্মার আঁধারে।

এ নিভৃতে, এ নিস্তব্ধে, এ মহত্ত্ব-মাঝে
দুটি চিত্ত চিরনিশি যদি রে বিরাজে—
হাসিহীন শব্দশূন্য ব্যোম দিশাহারা,
প্রেমপূর্ণ চারি চক্ষু জাগে চারি তারা!

শ্রান্তি নাই, তৃপ্তি নাই, বাধা নাই পথে,
জীবন ব্যাপিয়া যায় জগতে জগতে—
দুটি প্রাণতন্ত্রী হতে পূর্ণ একতানে
উঠে গান অসীমের সিংহাসন-পানে।

২০ বৈশাখ ১৮৮৮

নিষ্ঠুর সৃষ্টি

মনে হয় সৃষ্টি বুঝি বাঁধা নাই নিয়মনিগড়ে,
আনাগোনা মেলামেশা সবই অন্ধ দৈবের ঘটনা।
এই ভাঙে, এই গড়ে,
এই উঠে, এই পড়ে—
কেহ নাহি চেয়ে দেখে কার কোথা বাজিছে বেদনা।

মনে হয়, যেন ওই অবারিত শূন্যতলপথে
অকস্মাৎ আসিয়াছে সৃজনের বন্যা ভয়ানক—
অজ্ঞাত শিখর হতে
সহসা প্রচণ্ড স্রোতে
ছুটে আসে সূর্য চন্দ্র, ধেয়ে আসে লক্ষকোটি লোক।

কোথাও পড়েছে আলো, কোথাও বা অন্ধকার নিশি—
কোথাও সফেন শুভ্র, কোথাও বা আবর্ত আবিল—
সৃজনে প্রলয়ে মিশি
আক্রমিছে দশ দিশি—
অনন্ত প্রশান্ত শূন্য তরঙ্গিয়া করিছে ফেনিল।

মোরা শুধু খড়কুটো স্রোতোমুখে চলিয়াছি ছুটি,
অর্ধ পলকের তরে কোথাও দাঁড়াতে নাহি ঠাঁই।
এই ডুবি, এই উঠি,
ঘুরে ঘুরে পড়ি লুটি—
এই যারা কাছে আসে এই তারা কাছাকাছি নাই।

সৃষ্টিস্রোতকোলাহলে বিলাপ শুনিবে কেবা কার!
আপন গর্জনে বিশ্ব আপনারে করেছে বধির।
শতকোটি হাহাকার
কলধ্বনি রচে তার—
পিছু ফিরে চাহিবার কাল নাই, চলেছে অধীর।

হায় স্নেহ, হায় প্রেম, হায় তুই মানবহৃদয়,
খসিয়া পড়িলি কোন্ নন্দনের তটতরু হতে ?
যার লাগি সদা ভয়,
পরশ নাহিক সয়,
কে তারে ভাসালে হেন জড়ময় সৃজনের স্রোতে ?

তুমি কি শুনিছ বসি হে বিধাতা, হে অনাদি কবি,
ক্ষুদ্র এ মানবশিশু রচিতেছে প্রলাপজল্পনা ?
সত্য আছে স্তব্ধ ছবি
যেমন উষার রবি,
নিম্নে তারি ভাঙে গড়ে মিথ্যা যত কুহককল্পনা।

গাজিপুর
১৩ বৈশাখ ১৮৮৮

প্রকৃতির প্রতি

শত শত প্রেমপাশে টানিয়া হৃদয়
একি খেলা তোর ?
ক্ষুদ্র এ কোমল প্রাণ, ইহারে বাঁধিতে
কেন এত ডোর ?
ঘুরে ফিরে পলে পলে
ভালোবাসা নিস ছলে,
ভালো না বাসিতে চাস
হায় মনোচোর !

হৃদয় কোথায় তোর খুঁজিয়া বেড়াই
নিষ্ঠুরা প্রকৃতি !
এত ফুল, এত আলো, এত গন্ধ গান,
কোথায় পিরিতি !

*

আপন রূপের রাশে
আপনি লুকায়ে হাসে,
আমরা কাঁদিয়া মরি—
এ কেমন রীতি !

শূন্যক্ষেত্রে নিশিদিন আপনার মনে
কৌতুকের খেলা।
বুঝিতে পারি নে তোর কারে ভালোবাসা
কারে অবহেলা।
প্রভাতে যাহার 'পর
বড়ো স্নেহ সমাদর,
বিস্মৃত সে ধূলিতলে
সেই সন্ধ্যাবেলা।

তবু তোরে ভালোবাসি, পারি নে ভুলিতে
অয়ি মায়াবিনী !
স্নেহহীন আলিঙ্গন জাগায় হৃদয়ে
সহস্র রাগিণী।
এই সুখে দুঃখে শোকে
বেঁচে আছি দিবালোকে,
নাহি চাহি হিমশান্ত
অনন্ত যামিনী।

আধো-ঢাকা আধো-খোলা ওই তোর মুখ
রহস্যনিলয়
প্রেমের বেদনা আনে হৃদয়ের মাঝে,
সঙ্গে আনে ভয়।
বুঝিতে পারি নে তব
কত ভাব নব নব,
হাসিয়া কাঁদিয়া প্রাণ
পরিপূর্ণ হয়।

প্রাণমন পসারিয়া ধাই তোর পানে,
নাহি দিস ধরা।
দেখা যায় মৃদু মধু কৌতুকের হাসি
অরুণ-অধরা!
যদি চাই দূরে যেতে
কত ফাঁদ থাক পেতে—
কত ছল, কত বল
চপলা-মুখরা!

আপনি নাহিক জান আপনার সীমা,
রহস্য আপন।
তাই, অন্ধ রজনীতে যবে সপ্তলোক
নিদ্রায় মগন,
চুপি চুপি কৌতূহলে
দাঁড়াস আকাশতলে,
জ্বালাইয়া শত লক্ষ
নক্ষত্রকিরণ।

কোথাও বা বসে আছ চির-একাকিনী,
চিরমৌনব্রতা।
চারি দিকে সুকঠিন তৃণতরুহীন
মরুনির্জনতা।
রবি শশী শিরোপর
উঠে যুগ-যুগান্তর,
চেয়ে শুধু চলে যায়,
নাহি কয় কথা।

কোথাও বা খেলা কর বালিকার মতো,
উড়ে কেশ বেশ—
হাসিরাশি উচ্ছ্বসিত উৎসের মতন,
নাহি লজ্জালেশ।

রাখিতে পারে না প্রাণ
আপনার পরিমাণ,
এত কথা এত গান
নাহি তার শেষ।

কখনো বা হিংসাদীপ্ত উন্মাদ নয়ন
নিমেষনিহত
অনাথা ধরার বক্ষে অগ্নি-অভিশাপ
হানে অবিরত।
কখনো বা সন্ধ্যালোকে
উদাস উদার শোকে
মুখে পড়ে ম্লান ছায়া
করুণার মতো।

তবে তো করেছ বশ এমনি করিয়া
অসংখ্য পরান।
যুগ-যুগান্তর ধ'রে রয়েছে নূতন
মধুর বয়ান।
সাজি শত মায়াবাসে
আছ সকলেরই পাশে,
তবু আপনারে কারে
কর নাই দান।

যত অন্ত নাহি পাই তত জাগে মনে
মহা রূপরাশি।
তত বেড়ে যায় প্রেম যত পাই ব্যথা,
যত কাঁদি হাসি।
যত তুই দূরে যাস
তত প্রাণে লাগে ফাঁস,
যত তোরে নাহি বুঝি
তত ভালোবাসি।

১৫ বৈশাখ ১৮৮৮

মরণস্বপ্ন

কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ। প্রথম সন্ধ্যায়
ম্লান চাঁদ দেখা দিল গগনের কোণে।
ক্ষুদ্র নৌকা থরথরে চলিয়াছে পালভরে
কালস্রোতে যথা ভেসে যায়
অলস ভাবনাখানি আধোজাগা মনে।

এক পারে ভাঙা তীর ফেলিয়াছে ছায়া,
অন্য পারে ঢালু তট শুভ্র বালুকায়
মিশে যায় চন্দ্রালোকে— ভেদ নাহি পড়ে চোখে—
বৈশাখের গঙ্গা কৃশকায়া
তীরতলে ধীরগতি অলস লীলায়।

স্বদেশ পুরব হতে বায়ু বহে আসে
দূর স্বজনের যেন বিরহের শ্বাস।
জাগ্রত আঁখির আগে কখনো বা চাঁদ জাগে
কখনো বা প্রিয়মুখ ভাসে—
আধেক উলস প্রাণ আধেক উদাস।

ঘনচ্ছায়া আম্রকুঞ্জ উত্তরের তীরে—
যেন তারা সত্য নহে, স্মৃতি-উপবন।
তীর, তরু, গৃহ, পথ, জ্যোৎস্নাপটে চিত্রবৎ—
পড়িয়াছে নীলাকাশনীরে
দূর মায়াজগতের ছায়ার মতন।

স্বপ্নাকুল আঁখি মুদি ভাবিতেছি মনে—
রাজহংস ভেসে যায় অপার আকাশে
দীর্ঘ শুভ্র পাখা খুলি চন্দ্রালোক-পানে তুলি,
পৃষ্ঠে আমি কোমল শয়নে ;
সুখের মরণসম ঘুমঘোর আসে।

যেন রে প্রহর নাই, নাইক প্রহরী,
এ যেন রে দিবাহারা অনন্ত নিশীথ।
নিখিল নির্জন স্তব্ধ, শুধু শুনি জলশব্দ
কলকল-কল্লোল-লহরী—
নিদ্রাপারাবার যেন স্বপ্নচঞ্চলিত।

কত যুগ চলে যায় নাহি পাই দিশা—
বিশ্ব নিবু-নিবু, যেন দীপ তৈলহীন।
গ্রাসিয়া আকাশকায়া ক্রমে পড়ে মহাছায়া,
নতশিরে বিশ্বব্যাপী নিশা
গনিতেছে মৃত্যুপল এক দুই তিন।

চন্দ্র শীর্ণতর হয়ে লুপ্ত হয়ে যায়,
কলধ্বনি ক্ষীণ হয়ে মৌন হয়ে আসে।
প্রেতনয়নের মতো নির্নিমেষ তারা যত
সবে মিলে মোর পানে চায়,
একা আমি জনপ্রাণী অখণ্ড আকাশে।

চির যুগরাত্রি ধ'রে শতকোটি তারা
পরে পরে নিবে গেল গগনমাঝার।
প্রাণপণে চক্ষু চাহি আঁখিতে আলোক নাহি,
বিঁধিতে পারে না আঁখিতারা
তুষারকঠিন মৃত্যুহিম অন্ধকার।

অসাড় বিহঙ্গ-পাখা পড়িল ঝুলিয়া,
লুটায় সুদীর্ঘ গ্রীবা— নামিল মরাল।
ধরিয়া অযুত অব্দ হূহু পতনের শব্দ
কর্ণরন্ধ্রে উঠে আকুলিয়া—
দ্বিধা হয়ে ভেঙে যায় নিশীথ করাল।

সহসা এ জীবনের সমুদয় স্মৃতি
ক্ষণেক জাগ্রত হয়ে নিমেষে চকিতে
আমারে ছাড়িয়া দূরে পড়ে গেল ভেঙেচুরে,
পিছে পিছে আমি ধাই নিতি—
একটি কণাও আর পাই না লখিতে।

কোথাও রাখিতে নারি দেহ আপনার,
সর্বাঙ্গ অবশ ক্লান্ত নিজ লৌহভারে।
কাতরে ডাকিতে চাহি, শ্বাস নাহি, স্বর নাহি,
কণ্ঠেতে চেপেছে অন্ধকার—
বিশ্বের প্রলয় একা আমার মাঝারে।

দীর্ঘ তীক্ষ্ণ হই ক্রমে তীব্র গতিবলে
ব্যগ্রগামী ঝটিকার আর্তস্বরসম,
সূক্ষ্ম বাণ সূচিমুখ অনন্ত কালের বুক
বিদীর্ণ করিয়া যেন চলে—
রেখা হয়ে মিশে আসে দেহমন মম।

ক্রমে মিলাইয়া গেল সময়ের সীমা,
অনন্তে মুহূর্তে কিছু ভেদ নাহি আর।
ব্যাপ্তিহারা শূন্যসিন্ধু শুধু যেন এক বিন্দু
গাঢ়তম অন্তিম কালিমা—
আমারে গ্রাসিল সেই বিন্দুপারাবার।

অন্ধকারহীন হয়ে গেল অন্ধকার।
'আমি' ব'লে কেহ নাই, তবু যেন আছে।
অচৈতন্যতলে অন্ধ চৈতন্য হইল বন্ধ,
রহিল প্রতীক্ষা করি কার—
মৃত হয়ে প্রাণ যেন চিরকাল বাঁচে।

নয়ন মেলিনু, সেই বহিছে জাহ্নবী—
পশ্চিমে গৃহের মুখে চলেছে তরণী।
তীরে কুটিরের তলে   স্তিমিত প্রদীপ জ্বলে,
শূন্যে চাঁদ সুধামুখচ্ছবি।
সুপ্ত জীব কোলে লয়ে জাগ্রত ধরণী।

১৭ বৈশাখ ১৮৮৮

কুহুধ্বনি

প্রখর মধ্যাহ্নতাপে   প্রান্তর ব্যাপিয়া কাঁপে
বাষ্পশিখা অনলশ্বসনা—
অন্বেষিয়া দশ দিশা   যেন ধরণীর তৃষা
মেলিয়াছে লেলিহা রসনা।
ছায়া মেলি সারি সারি   স্তব্ধ আছে তিন-চারি
সিসুগাছ পাণ্ডুকিশলয়,
নিম্ববৃক্ষ ঘনশাখা   গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পে ঢাকা,
আম্রবন তাম্রফলময়।
গোলক-চাঁপার ফুলে   গন্ধের হিল্লোল তুলে,
বন হতে আসে বাতায়নে—
ঝাউগাছ ছায়াহীন   নিশ্বসিছে উদাসীন
শূন্যে চাহি আপনার মনে।
দূরান্ত প্রান্তর শুধু   তপনে করিছে ধূ ধূ,
বাঁকা পথ শুষ্ক তপ্তকায়া—
তারি প্রান্তে উপবন,   মৃদুমন্দ সমীরণ,
ফুলগন্ধ, শ্যামস্নিগ্ধ ছায়া।
ছায়ায় কুটিরখানা   দু ধারে বিছায়ে ডানা
পক্ষীসম করিছে বিরাজ,
তারি তলে সবে মিলি   চলিতেছে নিরিবিলি
সুখে দুঃখে দিবসের কাজ।

কোথা হতে নিদ্রাহীন রৌদ্রদগ্ধ দীর্ঘ দিন
কোকিল গাহিছে কুহুস্বরে।
সেই পুরাতন তান প্রকৃতির মর্মগান
পশিতেছে মানবের ঘরে।

বসি আঙিনার কোণে গম ভাঙে দুই বোনে,
গান গাহে শ্রান্তি নাহি মানি।
বাঁধা কূপ, তরুতল, বালিকা তুলিছে জল
খরতাপে ম্লানমুখখানি।
দূরে নদী, মাঝে চর— বসিয়া মাচার 'পর
শস্যখেত আগলিছে চাষি।
রাখালশিশুরা জুটে নাচে গায় খেলে ছুটে,
দূরে তরী চলিয়াছে ভাসি।
কত কাজ কত খেলা কত মানবের মেলা,
সুখদুঃখ ভাবনা অশেষ—
তারি মাঝে কুহুস্বর একতান সকাতর
কোথা হতে লভিছে প্রবেশ।
নিখিল করিছে মগ্ন— জড়িত মিশ্রিত ভগ্ন
গীতহীন কলরব কত,
পড়িতেছে তারি 'পর পরিপূর্ণ সুধাস্বর
পরিস্ফুট পুষ্পটির মতো।
এত কাণ্ড, এত গোল, বিচিত্র এ কলরোল
সংসারের আবর্তবিভ্রমে—
তবু সেই চিরকাল অরণ্যের অন্তরাল
কুহুধ্বনি ধ্বনিছে পঞ্চমে।
যেন কে বসিয়া আছে বিশ্বের বক্ষের কাছে
যেন কোন্ সরলা সুন্দরী,
যেন সেই রূপবতী সংগীতের সরস্বতী
সম্মোহন বীণা করে ধরি'—

সুকুমার কর্ণে তার ব্যথা দেয় অনিবার
গণ্ডগোল দিবসে নিশীথে,
জটিল সে ঝঞ্ঝনায় বাঁধিয়া তুলিতে চায়
সৌন্দর্যের সরল সংগীতে।
তাই ওই চিরদিন ধ্বনিতেছে শ্রান্তিহীন
কুহুতান, করিছে কাতর—
সংগীতের ব্যথা বাজে, মিশিয়াছে তার মাঝে
করুণার অনুনয়স্বর।

কেহ বসে গৃহমাঝে, কেহ বা চলেছে কাজে,
কেহ শোনে, কেহ নাহি শোনে—
তবুও সে কী মায়ায় ওই ধ্বনি থেকে যায়
বিশ্বব্যাপী মানবের মনে।
তবু যুগ-যুগান্তর মানবজীবনস্তর
ওই গানে আর্দ্র হয়ে আসে,
কত কোটি কুহুতান মিশায়েছে নিজ প্রাণ
জীবের জীবন-ইতিহাসে।
সুখে দুঃখে উৎসবে গান উঠে কলরবে
বিরল গ্রামের মাঝখানে,
তারি সাথে সুধাস্বরে মিশে ভালোবাসাভরে
পাখি-গানে মানবের গানে।
কোজাগর পূর্ণিমায় শিশু শূন্যে হেসে চায়,
ঘিরে হাসে জনকজননী—
সুদূর বনান্ত হতে দক্ষিণসমীরস্রোতে
ভেসে আসে কুহুকুহু ধ্বনি।
প্রচ্ছায় তমসাতীরে শিশু কুশলব ফিরে,
সীতা হেরে বিষাদে হরিষে—
ঘন সহকারশাখে মাঝে মাঝে পিক ডাকে,
কুহুতানে করুণা বরিষে।

লতাকুঞ্জে তপোবনে বিজনে দুষ্মন্তসনে
শকুন্তলা লাজে থরথর,
তখনো সে কুহুভাষা রমণীর ভালোবাসা
করেছিল সুমধুরতর।

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে তাই অতীতের মাঝে ধাই
শুনিয়া আকুল কুহুরব—
বিশাল মানবপ্রাণ মোর মাঝে বর্তমান
দেশ কাল করি অভিভব।
অতীতের দুঃখসুখ, দূরবাসী প্রিয়মুখ,
শৈশবের স্বপ্নশ্রুত গান,
ওই কুহুমন্ত্রবলে জাগিতেছে দলে দলে
লভিতেছে নূতন পরান।

গাজিপুর
২২ বৈশাখ ১৮৮৮
শান্তিনিকেতন
৫ কার্তিক ১৮৮৮। সংশোধন

পত্র

বাসস্থানপরিবর্তন-উপলক্ষে

বন্ধুবর,

দক্ষিণে বেঁধেছি নীড়, চুকেছে লোকের ভিড়,
বকুনির বিড় বিড় গেছে থেমে-থুমে।
আপনারে করে জড়ো কোণে বসে আছি দড়ো,
আর সাধ নেই বড়ো আকাশকুসুমে।
সুখ নেই, আছে শান্তি, ঘুচেছে মনের ভ্রান্তি,
'বিমুখা বান্ধবা যান্তি' বুঝিয়াছি সার।
কাছে থেকে কাটে সুখে গল্প ও গুড়ুক ফুঁকে,
গেলে দক্ষিণের মুখে দেখা নেই আর।

কাজ কী এ মিছে নাট, তুলেছি দোকান-হাট,
গোলমাল চণ্ডীপাঠ আছি ভাই ভুলি।
তবু কেন খিটিমিটি, মাঝে মাঝে কড়া চিঠি,
থেকে থেকে দু-চারিটি চোখা চোখা বুলি!
'পেটে খেলে পিঠে সয়' এই তো প্রবাদে কয়,
ভুলে যদি দেখা হয় তবু সয়ে থাকি।
হাত করে নিশপিশ, মাঝে রেখে পোস্টাপিস
ছাড় শুধু দশ-বিশ শব্দভেদী ফাঁকি।
বিষম উৎপাত এ কী! হায় নারদের ঢেঁকি!
শেষকালে এ যে দেখি ঝগড়ার মতো।
মেলা কথা হল জমা, এইখানে দিই 'কমা',
আমার স্বভাব ক্ষমা— নির্বিবাদ ব্রত।
কেদারার 'পরে চাপি ভাবি শুধু ফিলজাফি,
নিতান্তই চুপিচাপি মাটির মানুষ।
লেখা তো লিখেছি ঢের, এখন পেয়েছি টের
সে কেবল কাগজের রঙিন ফানুস।
আঁধারের কূলে কূলে ক্ষীণশিখা মরে দুলে,
পথিকেরা মুখ তুলে চেয়ে দেখে তাই।
নকল নক্ষত্র হায় ধ্রুবতারা পানে ধায়,
ফিরে আসে এ ধরায় একরত্তি ছাই।
সবারে সাজে না ভালো, হৃদয়ে স্বর্গের আলো
আছে যার সেই জ্বালো আকাশের ভালে—
মাটির প্রদীপ যার নিভে-নিভে বারবার
সে দীপ জলুক তার গৃহের আড়ালে।
যারা আছে কাছাকাছি তাহাদের নিয়ে আছি—
শুধু ভালোবেসে বাঁচি, বাঁচি যত কাল।
আশা কভু নাহি মেটে ভূতের বেগার খেটে—
কাগজে আঁচড় কেটে সকাল বিকাল।
কিছু নাহি করি দাওয়া, ছাতে বসে খাই হাওয়া,
যতটুকু পড়ে-পাওয়া ততটুকু ভালো—

যারা মোরে ভালোবাসে ঘুরে ফিরে কাছে আসে,
হাসিখুশি আশেপাশে নয়নের আলো।
বাহবা যে জন চায় বসে থাক্ চৌমাথায়,
নাচুক তৃণের প্রায় পথিকের স্রোতে—
পরের মুখের বুলি ভরুক ভিক্ষার ঝুলি,
নাই চাল নাই চুলি ধূলির পর্বতে।

বেড়ে যায় দীর্ঘ ছন্দ, লেখনী না হয় বন্ধ,
বক্তৃতার নামগন্ধ পেলে রক্ষে নেই।
ফেনা ঢোকে নাকে চোখে, প্রবল মিলের ঝোঁকে
ভেসে যাই একরোখে বুঝি দক্ষিণেই।
বাহিরেতে চেয়ে দেখি দেবতাদুর্যোগ এ কী!
বসে বসে লিখিতে কি আর সরে মন!
আর্দ্র বায়ু বহে বেগে, গাছপালা ওঠে জেগে—
ঘনঘোর স্নিগ্ধ মেঘে আঁধার গগন।
বেলা যায়, বৃষ্টি বাড়ে, বসি আলিসার আড়ে
ভিজে কাক ডাক ছাড়ে মনের অসুখে।
রাজপথ জনহীন, শুধু পান্থ দুই তিন
ছাতার ভিতরে লীন ধায় গৃহমুখে।
বৃষ্টি-ঘেরা চারি ধার, ঘনশ্যাম অন্ধকার,
ঝুপ-ঝুপ শব্দ আর ঝরঝর পাতা।
থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে গুরু গুরু গরজনে
মেঘদূত পড়ে মনে আষাঢ়ের গাথা।
পড়ে মনে বরিষার বৃন্দাবন-অভিসার
একাকিনী রাধিকার চকিতচরণ—
শ্যামল তমালতল, নীল যমুনার জল,
আর, দুটি ছলছল নলিননয়ন!
এ ভরা বাদর দিনে কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে,
কাননের পথ চিনে মন যেতে চায়।

বিজন যমুনাকূলে বিকশিত নীপমূলে
কাঁদিয়া পরান বুলে বিরহব্যথায়।

দোহাই কল্পনা তোর, ছিন্ন কর্ মায়াডোর,
কবিতায় আর মোর নাই কোনো দাবি।
বিরহ, বকুল, আর বৃন্দাবন স্তূপাকার—
সেগুলো চাপাই কার স্কন্ধে তাই ভাবি।
এখন ঘরের ছেলে বাঁচি ঘরে ফিরে গেলে,
ছু-দণ্ড সময় পেলে নাবার খাবার।
কলম হাঁকিয়ে ফেরা সকল রোগের সেরা,
তাই কবি-মানুষেরা অস্থিচর্মসার।
কলমের গোলামিটা আর নাহি লাগে মিঠা,
তার চেয়ে ছুধ-ঘি'টা বহুগুণে শ্রেয়।
সাঙ্গ করি এইখানে— শেষে বলি কানে কানে,
পুরানো বন্ধুর পানে মুখ তুলে চেয়ো।

বৈশাখ ১৮৮৭

সিন্ধুতরঙ্গ

পুরী-তীর্থযাত্রী তরণীর নিমজ্জন-উপলক্ষে

দোলে রে প্রলয় দোলে অকূল সমুদ্র-কোলে
উৎসব ভীষণ।
শত পক্ষ ঝাপটিয়া বেড়াইছে দাপটিয়া
ছুর্দম পবন।
আকাশ সমুদ্র-সাথে প্রচণ্ড মিলনে মাতে,
অখিলের আঁখিপাতে আবরি তিমির।
বিদ্যুৎ চমকে ত্রাসি, হা হা করে ফেনরাশি,
তীক্ষ্ণ শ্বেত রুদ্র হাসি জড়-প্রকৃতির।

চক্ষুহীন কর্ণহীন গেহহীন স্নেহহীন
মত্ত দৈত্যগণ
মরিতে ছুটেছে কোথা, ছিঁড়েছে বন্ধন।

হারাইয়া চারি ধার নীলাম্বুধি অন্ধকার
কল্লোলে, ক্রন্দনে,
রোষে, ত্রাসে, ঊর্ধ্বশ্বাসে, অট্টরোলে, অট্টহাসে,
উন্মাদ গর্জনে,
ফাটিয়া ফুটিয়া উঠে— চূর্ণ হয়ে যায় টুটে—
খুঁজিয়া মরিছে ছুটে আপনার কূল—
যেন রে পৃথিবী ফেলি বাসুকি করিছে কেলি
সহস্রৈক ফণা মেলি, আছাড়ি লাঙ্গুল।
যেন রে তরল নিশি টলমলি দশ দিশি
উঠেছে নড়িয়া,
আপন নিদ্রার জাল ফেলিছে ছিঁড়িয়া।

নাই সুর, নাই ছন্দ, অর্থহীন, নিরানন্দ
জড়ের নর্তন।
সহস্র জীবনে বেঁচে ওই কি উঠেছে নেচে
প্রকাণ্ড মরণ?
জল বাষ্প বজ্র বায়ু লভিয়াছে অন্ধ আয়ু,
নূতন জীবনস্নায়ু টানিছে হতাশে—
দিগ্বিদিক নাহি জানে, বাধাবিঘ্ন নাহি মানে,
ছুটেছে প্রলয়-পানে আপনারি ত্রাসে!
হেরো, মাঝখানে তারি আট শত নরনারী
বাহু বাঁধি বুকে,
প্রাণে আঁকড়িয়া প্রাণ চাহিয়া সম্মুখে।

তরণী ধরিয়া ঝাঁকে— রাক্ষসী ঝটিকা হাঁকে,
'দাও, দাও, দাও!'
সিন্ধু ফেনোচ্ছল ছলে কোটি ঊর্ধ্বকরে বলে,
'দাও, দাও, দাও!'
বিলম্ব দেখিয়া রোষে ফেনায়ে ফেনায়ে ফোঁষে,
নীল মৃত্যু মহাক্রোশে শ্বেত হয়ে উঠে।
ক্ষুদ্র তরী গুরুভার সহিতে পারে না আর,
লৌহবক্ষ ওই তার যায় বুঝি টুটে।
অধ ঊর্ধ্ব এক হয়ে ক্ষুদ্র এ খেলেনা লয়ে
খেলিবারে চায়।
দাঁড়াইয়া কর্ণধার তরীর মাথায়।

নরনারী কম্পমান ডাকিতেছে, ভগবান!
হায় ভগবান!
দয়া করো, দয়া করো!— উঠিছে কাতর স্বর—
রাখো রাখো প্রাণ!
কোথা সেই পুরাতন রবি শশী তারাগণ
কোথা আপনার ধন ধরণীর কোল!
আজন্মের স্নেহসার কোথা সেই ঘরদ্বার,
পিশাচী এ বিমাতার হিংস্র উতরোল!
যে দিকে ফিরিয়া চাই পরিচিত কিছু নাই,
নাই আপনার—
সহস্র করাল মুখ সহস্র-আকার।

ফেটেছে তরণীতল, সবেগে উঠিছে জল,
সিন্ধু মেলে গ্রাস।
নাই তুমি, ভগবান, নাই দয়া, নাই প্রাণ—
জড়ের বিলাস।

ভয় দেখে ভয় পায়, শিশু কাঁদে উভরায়—
নিদারুণ হায়-হায় থামিল চকিতে।
নিমেষেই ফুরাইল, কখন জীবন ছিল
কখন জীবন গেল নারিল লখিতে।
যেন রে একই ঝড়ে নিবে গেল একত্তরে
শত দীপ আলো,
চকিতে সহস্র গৃহে আনন্দ ফুরালো।

প্রাণহীন এ মত্ততা না জানে পরের ব্যথা,
না জানে আপন।
এর মাঝে কেন রয় ব্যথাভরা স্নেহময়
মানবের মন!
মা কেন রে এইখানে, শিশু চায় তার পানে,
ভাই সে ভায়ের টানে কেন পড়ে বুকে!
মধুর রবির করে কত ভালোবাসা-ভরে
কতদিন খেলা করে কত সুখে দুখে!
কেন করে টলমল দুটি ছোটো অশ্রুজল,
সকরুণ আশা!
দীপশিখাসম কাঁপে ভীত ভালোবাসা।

এমন জড়ের কোলে কেমনে নির্ভয়ে দোলে
নিখিল মানব!
সব সুখ সব আশ কেন নাহি করে গ্রাস
মরণ দানব!
ওই-যে জন্মের তরে জননী ঝাঁপায়ে পড়ে
কেন বাঁধে বক্ষ-'পরে সন্তান আপন!
মরণের মুখে ধায়, সেথাও দিবে না তায়—
কাড়িয়া রাখিতে চায় হৃদয়ের ধন!

*

আকাশেতে পারাবারে দাঁড়ায়েছে এক ধারে,
এক ধারে নারী—
দুর্বল শিশুটি তার কে লইবে কাড়ি ?

এ বল কোথায় পেলে ! আপন কোলের ছেলে
এত ক'রে টানে !
এ নিষ্ঠুর জড়স্রোতে প্রেম এল কোথা হতে
মানবের প্রাণে !
নৈরাশ্য কভু না জানে, বিপত্তি কিছু না মানে,
অপূর্বঅমৃতপানে অনন্ত নবীন—
এমন মায়ের প্রাণ যে বিশ্বের কোনোখান
তিলেক পেয়েছে স্থান, সে কি মাতৃহীন ?
এ প্রলয়-মাঝখানে অবলা জননী-প্রাণে
স্নেহ মৃত্যুজয়ী—
এ স্নেহ জাগায়ে রাখে কোন্ স্নেহময়ী ?

পাশাপাশি এক ঠাঁই দয়া আছে, দয়া নাই—
বিষম সংশয়।
মহাশঙ্কা মহা-আশা একত্র বেঁধেছে বাসা,
এক-সাথে রয়।
কেবা সত্য, কেবা মিছে, নিশিদিন আকুলিছে,
কভু ঊর্ধ্বে কভু নীচে টানিছে হৃদয়।
জড় দৈত্য শক্তি হানে, মিনতি নাহিক মানে—
প্রেম এসে কোলে টানে, দূর করে ভয়।
এ কি দুই দেবতার দ্যূতখেলা অনিবার
ভাঙাগড়াময় ?
চিরদিন অন্তহীন জয়পরাজয় ?

৪৯ পার্ক্ স্ট্রীট
আষাঢ় ১৮৮৭

শ্রাবণের পত্র

বন্ধু হে,

পরিপূর্ণ বরষায় আছি তব ভরসায়,
কাজকর্ম করো সায়, এসো চট্‌পট্‌ !
শাম্‌লা আঁটিয়া নিত্য তুমি কর ডেপুটিত্ব,
একা প'ড়ে মোর চিত্ত করে ছট্‌ফট্‌ ।
যখন যা সাজে, ভাই, তখন করিবে তাই—
কালাকাল মানা নাই কলির বিচার !
শ্রাবণে ডেপুটিপনা এ তো কভু নয় সনা-
তন প্রথা, এ যে অনা-সৃষ্টি অনাচার।
ছুটি লয়ে কোনোমতে পোট্‌মাণ্টো তুলি রথে
সেজেগুজে রেলপথে করো অভিসার।
লয়ে দাড়ি লয়ে হাসি অবতীর্ণ হও আসি,
রুধিয়া জানালা শাসি বসি একবার।
বজ্ররবে সচকিত কাঁপিবে গৃহের ভিত,
পথে শুনি কদাচিৎ চক্র খড়্‌খড়্‌ ।
হা রে রে ইংরাজ-রাজ, এ সাধে হানিলি বাজ—
শুধু কাজ, শুধু কাজ, শুধু ধড়্‌ফড়্‌ ।
আম্‌লা-শাম্‌লা-স্রোতে ভাসাইলি এ ভারতে,
যেন নেই ত্রিজগতে হাসি গল্প গান—
নেই বাঁশি, নেই বঁধু, নেই রে যৌবনমধু,
মুছেছে পথিকবধূ সজল নয়ান !
যেন রে শরম টুটে কদম্ব আর না ফুটে,
কেতকী শিহরি উঠে করে না আকুল—
কেবল জগৎটাকে জড়ায়ে সহস্র পাকে
গবর্মেণ্ট পড়ে থাকে বিরাট বিপুল।
বিষম রাক্ষস ওটা, মেলিয়া আপিস-কোটা
গ্রাস করে গোটা গোটা বন্ধুবান্ধবেরে—

বৃহৎ বিদেশে দেশে কে কোথা তলায় শেষে
কোথাকার সর্বনেশে সর্বিসের ফেরে।
এ দিকে বাদর ভরা, নবীন শ্যামল ধরা,
নিশিদিন জল-ঝরা সঘন গগন।
এ দিকে ঘরের কোণে বিরহিণী বাতায়নে,
দিগন্তে তমালবনে নয়ন মগন।
হেঁট মুণ্ড করি হেঁট মিছে কর agitate,
খালি রেখে খালি পেট ভরিছ কাগজ।
এ দিকে যে গোরা মিলে কালা বন্ধু লুটে নিলে,
তার বেলা কী করিলে নাই কোনো খোঁজ।
দেখিছ না আঁখি খুলে ম্যাঞ্চেস্টর লিভারপুলে
দেশী শিল্প জলে গুলে করিল finish।
'আষাঢ়ে গল্প' সে কই! সেও বুঝি গেল ওই
আমাদের নিতান্তই দেশের জিনিস।
তুমি আছ কোথা গিয়া, আমি আছি শূন্যহিয়া,
কোথায় বা সে তাকিয়া শোকতাপহরা।
সে তাকিয়া— গল্পগীতি সাহিত্যচর্চার স্মৃতি
কত হাসি কত প্রীতি কত তুলো -ভরা!
কোথায় সে যদুপতি, কোথা মথুরার গতি,
অথ, চিন্তা করি ইতি কুরু মনস্থির—
মায়াময় এ জগৎ নহে সৎ নহে সৎ,
যেন পদ্মপত্রবৎ, তদুপরি নীর।
অতএব ত্বরা ক'রে উত্তর লিখিবে মোরে,
সর্বদা নিকটে ঘোরে কাল সে করাল—
(সুধী তুমি ত্যজি নীর গ্রহণ করিয়ো ক্ষীর)
এই তত্ত্ব এ চিঠির জানিয়ো moral।

শ্রাবণ ১৮৮৭

নিষ্ফল প্রয়াস

ওই-যে সৌন্দর্য লাগি পাগল ভুবন,
ফুটন্ত অধরপ্রান্তে হাসির বিলাস,
গভীরতিমিরমগ্ন আঁখির কিরণ,
লাবণ্যতরঙ্গভঙ্গ গতির উচ্ছ্বাস,
যৌবনললিতলতা বাহুর বন্ধন,
এরা তো তোমারে ঘিরে আছে অনুক্ষণ—
তুমি কি পেয়েছ নিজ সৌন্দর্য-আভাস?
মধুরাতে ফুলপাতে করিয়া শয়ন
বুঝিতে পার কি নিজ মধু-আলিঙ্গন?
আপনার প্রস্ফুটিত তনুর উল্লাস
আপনারে করেছে কি মোহনিমগন?
তবে মোরা কী লাগিয়া করি হাহুতাশ।
দেখ' শুধু ছায়াখানি মেলিয়া নয়ন;
রূপ নাহি ধরা দেয়— বৃথা সে প্রয়াস।

৪৯ পার্ক্ স্ট্রীট
১৮ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

হৃদয়ের ধন

কাছে যাই, ধরি হাত, বুকে লই টানি—
তাহার সৌন্দর্য লয়ে আনন্দে মাখিয়া
পূর্ণ করিবারে চাহি মোর দেহখানি,
আঁখিতলে বাহুপাশে কাড়িয়া রাখিয়া।
অধরের হাসি লব করিয়া চুম্বন,
নয়নের দৃষ্টি লব নয়নে আঁকিয়া,
কোমল পরশখানি করিয়া বসন
রাখিব দিবসনিশি সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া।

নাই, নাই, কিছু নাই, শুধু অন্বেষণ—
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া।
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে— শ্রান্ত করে হিয়া।
প্রভাতে মলিনমুখে ফিরে যাই গেহে,
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে ?

১৮ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

নিভৃত আশ্রম

সন্ধ্যায় একেলা বসি বিজন ভবনে
অনুপম জ্যোতির্ময়ী মাধুরীমুরতি
স্থাপনা করিব যত্নে হৃদয়-আসনে।
প্রেমের প্রদীপ লয়ে করিব আরতি।
রাখিব দুয়ার রুধি আপনার মনে,
তাহার আলোকে রব আপন ছায়ায়—
পাছে কেহ কুতূহলে কৌতুকনয়নে
হৃদয়দুয়ারে এসে দেখে হেসে যায়।
ভ্রমর যেমন থাকে কমলশয়নে,
সৌরভসদনে, কারো পথ নাহি চায়,
পদশব্দ নাহি গণে, কথা নাহি শোনে,
তেমনি হইব মগ্ন পবিত্র মায়ায়।
লোকালয়-মাঝে থাকি রব তপোবনে,
একেলা থেকেও তবু রব সাথি-সনে।

১৮ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

নারীর উক্তি

মিছে তর্ক— থাক্ তবে থাক্।
কেন কাঁদি বুঝিতে পার না?
তর্কেতে বুঝিবে তা কি? এই মুছিলাম আঁখি—
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা।

আমি কি চেয়েছি পায়ে ধরে
ওই তব আঁখি-তুলে চাওয়া—
ওই কথা, ওই হাসি, ওই কাছে আসা-আসি,
অলক দুলায়ে দিয়ে হেসে চলে যাওয়া?

কেন আন বসন্তনিশীথে
আঁখিভরা আবেশ বিহ্বল—
যদি বসন্তের শেষে শ্রান্তমনে ম্লান হেসে
কাতরে খুঁজিতে হয় বিদায়ের ছল?

আছি যেন সোনার খাঁচায়
একখানি পোষ-মানা প্রাণ।
এও কি বুঝাতে হয় প্রেম যদি নাহি রয়
হাসিয়ে সোহাগ করা শুধু অপমান?

মনে আছে সেই এক দিন
প্রথম প্রণয় সে তখন।
বিমল শরতকাল, শুভ্র ক্ষীণ মেঘজাল,
মৃদু শীতবায়ে স্নিগ্ধ রবির কিরণ।

কাননে ফুটিত শেফালিকা,
ফুলে ছেয়ে যেত তরুমূল।
পরিপূর্ণ সুরধুনী, কুলুকুলু ধ্বনি শুনি,
পরপারে বনশ্রেণী কুয়াশা-আকুল।

আমা-পানে চাহিয়ে তোমার
আঁখিতে কাঁপিত প্রাণখানি।
আনন্দে বিষাদে মেশা সেই নয়নের নেশা
তুমি তো জান না তাহা, আমি তাহা জানি।

সে কি মনে পড়িবে তোমার—
সহস্র লোকের মাঝখানে
যেমনি দেখিতে মোরে কোন্ আকর্ষণডোরে
আপনি আসিতে কাছে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে!

ক্ষণিক বিরহ-অবসানে
নিবিড় মিলন-ব্যাকুলতা।
মাঝে মাঝে সব ফেলি রহিতে নয়ন মেলি,
আঁখিতে শুনিতে যেন হৃদয়ের কথা।

কোনো কথা না রহিলে তবু
শুধাইতে নিকটে আসিয়া।
নীরবে চরণ ফেলে চুপিচুপি কাছে এলে
কেমনে জানিতে পেতে, ফিরিতে হাসিয়া।

আজ তুমি দেখেও দেখ না,
সব কথা শুনিতে না পাও।
কাছে আস আশা ক'রে আছি সারাদিন ধ'রে,
আনমনে পাশ দিয়ে তুমি চলে যাও।

দীপ জেলে দীর্ঘ ছায়া লয়ে
বসে আছি সন্ধ্যায় ক'জনা—
হয়তো বা কাছে এস, হয়তো বা দূরে বস,
সে সকলই ইচ্ছাহীন দৈবের ঘটনা।

এখন হয়েছে বহু কাজ,
সতত রয়েছ অন্যমনে।
সর্বত্র ছিলাম আমি— এখন এসেছি নামি
হৃদয়ের প্রান্তদেশে, ক্ষুদ্র গৃহকোণে!

দিয়েছিলে হৃদয় যখন
পেয়েছিলে প্রাণমন দেহ—
আজ সে হৃদয় নাই, যতই সোহাগ পাই
শুধু তাই অবিশ্বাস বিষাদ সন্দেহ।

জীবনের বসন্তে যাহারে
ভালোবেসেছিলে একদিন,
হায় হায় কী কুগ্রহ, আজ তারে অনুগ্রহ—
মিষ্ট কথা দিবে তারে গুটি দুই-তিন!

অপবিত্র ও করপরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে।
মনে কি করেছ, বঁধু, ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে, শুধু হাসি দিলে।

তুমিই তো দেখালে আমায়
(স্বপ্নেও ছিল না এত আশা)
প্রেমে দেয় কতখানি কোন্ হাসি কোন্ বাণী,
হৃদয় বাসিতে পারে কত ভালোবাসা।

তোমারি সে ভালোবাসা দিয়ে
বুঝেছি আজি এ ভালোবাসা—
আজি এই দৃষ্টি হাসি, এ আদর রাশি রাশি,
এই দূরে চলে-যাওয়া, এই কাছে আসা।

বুক ফেটে কেন অশ্রু পড়ে
তবুও কি বুঝিতে পার' না ?
তর্কেতে বুঝিবে তা কি ! এই মুছিলাম আঁখি—
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা ।

২১ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

পুরুষের উক্তি

যেদিন সে প্রথম দেখিনু
সে তখন প্রথম যৌবন ।
প্রথম জীবনপথে বাহিরিয়া এ জগতে
কেমনে বাঁধিয়া গেল নয়নে নয়ন ।

তখন উষার আধো আলো
পড়েছিল মুখে দুজনার ।
তখন কে জানে কারে, কে জানিত আপনারে,
কে জানিত সংসারের বিচিত্র ব্যাপার !

কে জানিত শ্রান্তি তৃপ্তি ভয়,
কে জানিত নৈরাশ্যযাতনা !
কে জানিত শুধু ছায়া যৌবনের মোহমায়া,
আপনার হৃদয়ের সহস্র ছলনা !

আঁখি মেলি যারে ভালো লাগে
তাহারেই ভালো বলে জানি ।
সব প্রেম প্রেম নয় ছিল না তো সে সংশয়,
যে আমারে কাছে টানে তারে কাছে টানি ।

অনন্ত বাসরসুখ যেন
নিত্যহাসি প্রকৃতিবধূর—
পুষ্প যেন চিরপ্রাণ, পাখির অশ্রান্ত গান,
বিশ্ব করেছিল ভাণ অনন্ত মধুর।

সেই গানে, সেই ফুল্ল ফুলে,
সেই প্রাতে প্রথম যৌবনে,
ভেবেছিনু এ হৃদয় অনন্ত অমৃতময়,
প্রেম চিরদিন রয় এ চিরজীবনে।

তাই সেই আশার উল্লাসে
মুখ তুলে চেয়েছিনু মুখে।
সুধাপাত্র লয়ে হাতে কিরণকিরীট মাথে
তরুণ দেবতাসম দাঁড়ানু সম্মুখে।

পত্রপুষ্প-গ্রহতারা-ভরা
নীলাম্বরে মগ্ন চরাচর,
তুমি তারি মাঝখানে কী মূর্তি আঁকিলে প্রাণে—
কী ললাট, কী নয়ন, কী শান্ত অধর!

সুগভীর কলধ্বনিময়
এ বিশ্বের রহস্য অকুল,
মাঝে তুমি শতদল ফুটেছিলে ঢলঢল—
তীরে আমি দাঁড়াইয়া সৌরভে আকুল।

পরিপূর্ণ পূর্ণিমার মাঝে
ঊর্ধ্বমুখে চকোর যেমন
আকাশের ধারে যায়, ছিঁড়িয়া দেখিতে চায়
অগাধ-স্বপন-ছাওয়া জোৎস্না-আবরণ—

তেমনি সভয়ে প্রাণ মোর
তুলিতে যাইত কত বার
একান্ত নিকটে গিয়ে সমস্ত হৃদয় দিয়ে
মধুর রহস্যময় সৌন্দর্য তোমার।

হৃদয়ের কাছাকাছি সেই
প্রেমের প্রথম আনাগোনা,
সেই হাতে হাতে ঠেকা, সেই আধো চোখে দেখা,
চুপিচুপি প্রাণের প্রথম জানাশোনা!

অজানিত সকলি নূতন,
অবশ চরণ টলমল!
কোথা পথ কোথা নাই, কোথা যেতে কোথা যাই,
কোথা হতে উঠে হাসি কোথা অশ্রুজল!

অতৃপ্ত বাসনা প্রাণে লয়ে
অবারিত প্রেমের ভবনে
যাহা পাই তাই তুলি, খেলাই আপনা ভুলি—
কী যে রাখি কী যে ফেলি বুঝিতে পারি নে।

ক্রমে আসে আনন্দ-আলস—
কুসুমিত ছায়াতরুতলে
জাগাই সরসীজল, ছিঁড়ি বসে ফুলদল,
ধূলি সেও ভালো লাগে খেলাবার ছলে।

অবশেষে সন্ধ্যা হয়ে আসে,
শ্রান্তি আসে হৃদয় ব্যাপিয়া—
থেকে থেকে সন্ধ্যাবায় করে ওঠে হায়-হায়,
অরণ্য মর্মরি ওঠে কাঁপিয়া কাঁপিয়া।

মনে হয় একি সব ফাঁকি !
এই বুঝি, আর কিছু নাই !
অথবা যে রত্ন-তরে এসেছিনু আশা ক'রে
অনেক লইতে গিয়ে হারাইনু তাই !

সুখের কাননতলে বসি
হৃদয়ের মাঝারে বেদনা—
নিরখি কোলের কাছে মৃৎপিণ্ড পড়িয়া আছে,
দেবতারে ভেঙে ভেঙে করেছি খেলনা।

এরই মাঝে ক্লান্তি কেন আসে,
উঠিবারে করি প্রাণপণ !
হাসিতে আসে না হাসি, বাজাতে বাজে না বাঁশি,
শরমে তুলিতে নারি নয়নে নয়ন।

কেন তুমি মূর্তি হয়ে এলে,
রহিলে না ধ্যান-ধারণার !
সেই মায়া-উপবন কোথা হল অদর্শন,
কেন হায় ঝাঁপ দিতে শুকালো পাথার !

স্বপ্নরাজ্য ছিল ও হৃদয়—
প্রবেশিয়া দেখিনু সেখানে
এই দিবা এই নিশা এই ক্ষুধা এই তৃষা,
প্রাণপাখি কাঁদে এই বাসনার টানে !

আমি চাই তোমারে যেমন
তুমি চাও তেমনি আমারে—
কৃতার্থ হইব আশে গেলেম তোমার পাশে,
তুমি এসে বসে আছ আমার দুয়ারে।

সৌন্দর্যসম্পদ-মাঝে বসি
কে জানিত কাঁদিছে বাসনা!
ভিক্ষা ভিক্ষা সব ঠাঁই— তবে আর কোথা যাই
ভিখারিনী হল যদি কমল-আসনা!

তাই আর পারি না সঁপিতে
সমস্ত এ বাহির অন্তর।
এ জগতে তোমা ছাড়া ছিল না তোমার বাড়া,
তোমারে ছেড়েও আজ আছে চরাচর।

কখনো বা চাঁদের আলোতে
কখনো বসন্তসমীরণে
সেই ত্রিভুবনজয়ী অপাররহস্যময়ী
আনন্দমুরতিখানি জেগে ওঠে মনে।

কাছে যাই তেমনি হাসিয়া
নবীন যৌবনময় প্রাণে—
কেন হেরি অশ্রুজল হৃদয়ের হলাহল,
রূপ কেন রাহুগ্রস্ত মানে অভিমানে।

প্রাণ দিয়ে সেই দেবীপূজা
চেয়ো না চেয়ো না তবে আর।
এসো থাকি দুই জনে সুখে দুঃখে গৃহকোণে,
দেবতার তরে থাক্ পুষ্প-অর্ঘ্যভার।

পার্ক্ স্ট্রীট
২৩ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

শূন্য গৃহে

কে তুমি দিয়েছ স্নেহ মানবহৃদয়ে,
কে তুমি দিয়েছ প্রিয়জন !
বিরহের অন্ধকারে কে তুমি কাঁদাও তারে,
তুমিও কেন গো সাথে কর না ক্রন্দন !

প্রাণ যাহা চায় তাহা দাও বা না দাও,
তা বলে কি করুণা পাব না ?
দুর্লভ ধনের তরে শিশু কাঁদে সকাতরে,
তা বলে কি জননীর বাজে না বেদনা ?

দুর্বল মানবহিয়া বিদীর্ণ যেথায়,
মর্মভেদী যন্ত্রণা বিষম,
জীবন নির্ভরহারা ধুলায় লুটায়ে সারা,
সেথাও কেন গো তব কঠিন নিয়ম !

সেথাও জগৎ তব চিরমৌনী কেন,
নাহি দেয় আশ্বাসের সুখ।
ছিন্ন করি অন্তরাল অসীম রহস্যজাল
কেন না প্রকাশ পায় গুপ্ত স্নেহমুখ !

ধরণী জননী কেন বলিয়া উঠে না
—করুণমর্মর কণ্ঠস্বর—
'আমি শুধু ধূলি নই, বৎস, আমি প্রাণময়ী
জননী, তোদের লাগি অন্তর কাতর !

'নহ তুমি পরিত্যক্ত অনাথ সন্তান
চরাচর নিখিলের মাঝে—
তোমার ব্যাকুল স্বর উঠিছে আকাশ-'পর,
তারায় তারায় তার ব্যথা গিয়ে বাজে।'

কাল ছিল প্রাণ জুড়ে, আজ কাছে নাই—
নিতান্ত সামান্য এ কি নাথ ?
তোমার বিচিত্র ভবে কত আছে কত হবে—
কোথাও কি আছে, প্রভু, হেন বজ্রপাত ?

আছে সেই সূর্যালোক, নাই সেই হাসি—
আছে চাঁদ, নাই চাঁদমুখ।
শূন্য পড়ে আছে গেহ, নাই কেহ, নাই কেহ—
রয়েছে জীবন, নেই জীবনের সুখ।

সেইটুকু মুখখানি, সেই দুটি হাত,
সেই হাসি অধরের ধারে,
সে নহিলে এ জগৎ শুষ্ক মরুভূমিবৎ—
নিতান্ত সামান্য এ কি এ বিশ্বব্যাপারে ?

এ আর্তস্বরের কাছে রহিবে অটুট
চৌদিকের চিরনীরবতা ?
সমস্ত মানবপ্রাণ বেদনায় কম্পমান,
নিয়মের লৌহবক্ষে বাজিবে না ব্যথা !

গাজিপুর
১১ বৈশাখ ১৮৮৮

জীবনমধ্যাহ্ন

জীবন আছিল লঘু প্রথম বয়সে,
চলেছিনু আপনার বলে,
সুদীর্ঘ জীবনযাত্রা নবীন প্রভাতে
আরম্ভিনু খেলিবার ছলে।

অশ্রুতে ছিল না তাপ, হাস্তে উপহাস,
বচনে ছিল না বিষানল—
ভাবনাভ্রূকুটিহীন সরল ললাট
সুপ্রশান্ত আনন্দ-উজ্জ্বল।

কুটিল হইল পথ, জটিল জীবন,
বেড়ে গেল জীবনের ভার—
ধরণীর ধূলিমাঝে গুরু আকর্ষণ,
পতন হইল কত বার।
আপনার 'পরে আর কিসের বিশ্বাস,
আপনার মাঝে আশা নাই—
দর্প চূর্ণ হয়ে গেছে, ধূলি-সাথে মিশে
লজ্জাবস্ত্র জীর্ণ শত ঠাঁই।

তাই আজ বার বার ধাই তব পানে,
ওহে তুমি নিখিলনির্ভর!
অনন্ত এ দেশকাল আচ্ছন্ন করিয়া
আছ তুমি আপনার 'পর।
ক্ষণেক দাঁড়ায়ে পথে দেখিতেছি চেয়ে
তোমার এ ব্রহ্মাণ্ড বৃহৎ—
কোথায় এসেছি আমি, কোথায় যেতেছি,
কোন্ পথে চলেছে জগৎ!

প্রকৃতির শান্তি আজি করিতেছি পান
চিরস্রোত সান্ত্বনার ধারা—
নিশীথ-আকাশ-মাঝে নয়ন তুলিয়া
দেখিতেছি কোটি গ্রহতারা—
সুগভীর তামসীর ছিদ্রপথে যেন
জ্যোতির্ময় তোমার আভাস
ওহে মহা-অন্ধকার, ওহে মহাজ্যোতি,
অপ্রকাশ, চির-স্বপ্রকাশ!

*

যখন জীবনভার ছিল লঘু অতি,
যখন ছিল না কোনো পাপ,
তখন তোমার পানে দেখি নাই চেয়ে,
জানি নাই তোমার প্রতাপ—
তোমার অগাধ শান্তি, রহস্য অপার,
সৌন্দর্য অসীম অতুলন।
স্তব্ধভাবে মুগ্ধনেত্রে নিবিড় বিস্ময়ে
দেখি নাই তোমার ভুবন।

কোমল সায়াহ্নলেখা বিষণ্ণ উদার
প্রান্তরের প্রান্ত-আম্রবনে,
বৈশাখের নীলধারা বিমলবাহিনী
ক্ষীণগঙ্গা সৈকতশয়নে,
শিরোপরি সপ্ত ঋষি যুগ-যুগান্তের
ইতিহাসে নিবিষ্ট-নয়ান,
নিদ্রাহীন পূর্ণচন্দ্র নিস্তব্ধ নিশীথে
নিদ্রার সমুদ্রে ভাসমান—

নিত্যনিশ্বসিত বায়ু, উন্মেষিত উষা,
কনকে শ্যামলে সম্মিলন,
দূরদূরান্তরশায়ী মধ্যাহ্ন উদাস,
বনচ্ছায়া নিবিড় গহন,
যতদূর নেত্র যায় শস্যশীর্ষরাশি
ধরার অঞ্চলতল ভরি—
জগতের মর্ম হতে মোর মর্মস্থলে
আনিতেছে জীবনলহরী।

বচন-অতীত ভাবে ভরিছে হৃদয়,
নয়নে উঠিছে অশ্রুজল,
বিরহবিষাদ মোর গলিয়া ঝরিয়া
ভিজায় বিশ্বের বক্ষস্থল।

প্রশান্ত গভীর এই প্রকৃতির মাঝে
আমার জীবন হয় হারা,
মিশে যায় মহাপ্রাণসাগরের বুকে
ধূলিম্লান পাপতাপধারা।

শুধু জেগে উঠে প্রেম মঙ্গল মধুর,
বেড়ে যায় জীবনের গতি,
ধূলিধৌত দুঃখশোক শুভ্রশান্ত বেশে
ধরে যেন আনন্দমুরতি।
বন্ধন হারায়ে গিয়ে স্বার্থ ব্যাপ্ত হয়
অবারিত জগতের মাঝে,
বিশ্বের নিশ্বাস লাগি জীবনকুহরে
মঙ্গল-আনন্দধ্বনি বাজে।

১৪ বৈশাখ ১৮৮৮

শ্রান্তি

কত বার মনে করি পূর্ণিমানিশীথে
স্নিগ্ধ সমীরণ,
নিদ্রালস আঁখি-সম ধীরে যদি মুদে আসে
এ শ্রান্ত জীবন।
গগনের অনিমেষ জাগ্রত চাঁদের পানে
মুক্ত দুটি বাতায়নদ্বার—
সুদূরে প্রহর বাজে, গঙ্গা কোথা বহে চলে,
নিদ্রায় সুষুপ্ত দুই পার।
মাঝি গান গেয়ে যায় বৃন্দাবনগাথা
আপনার মনে,
চিরজীবনের স্মৃতি অশ্রু হয়ে গ'লে আসে
নয়নের কোণে।

স্বপ্নের সুধীর স্রোতে দূরে ভেসে যায় প্রাণ
স্বপ্ন হতে নিঃস্বপ্ন অতলে,
ভাসানো প্রদীপ যথা নিবে গিয়ে সন্ধ্যাবায়ে
ডুবে যায় জাহ্নবীর জলে।

১৬ বৈশাখ ১৮৮৮

বিচ্ছেদ

ব্যাকুল নয়ন মোর, অস্তমান রবি,
সায়াহ্ন মেঘাবনত পশ্চিম গগনে,
সকলে দেখিতেছিল সেই মুখচ্ছবি—
একা সে চলিতেছিল আপনার মনে।

ধরণী ধরিতেছিল কোমল চরণ,
বাতাস লভিতেছিল বিমল নিশ্বাস,
সন্ধ্যার-আলোক-আঁকা দুখানি নয়ন
ভুলায়ে লইতেছিল পশ্চিম আকাশ।

রবি তারে দিতেছিল আপন কিরণ,
মেঘ তারে দিতেছিল স্বর্ণময় ছায়া,
মুগ্ধহিয়া পথিকের উৎসুক নয়ন
মুখে তার দিতেছিল প্রেমপূর্ণ মায়া।

চারি দিকে শস্যরাশি চিত্রসম স্থির,
প্রান্তে নীল নদীরেখা, দূর পরপারে
শুভ্র চর, আরো দূরে বনের তিমির
দহিতেছে অগ্নিদীপ্তি দিগন্ত-মাঝারে।

দিবসের শেষ দৃষ্টি— অন্তিম মহিমা—
সহসা ঘেরিল তারে কনক-আলোকে,

বিষণ্ণ কিরণপটে মোহিনী প্রতিমা
উঠিল প্রদীপ্ত হয়ে অনিমেষ চোখে।

নিমেষে ঘুরিল ধরা, ডুবিল তপন,
সহসা সম্মুখে এল ঘোর অন্তরাল—
নয়নের দৃষ্টি গেল, রহিল স্বপন,
অনন্ত আকাশ, আর ধরণী বিশাল।

১৯ বৈশাখ ১৮৮৮

মানসিক অভিসার

মনে হয় সেও যেন রয়েছে বসিয়া
চাহি বাতায়ন হতে নয়ন উদাস—
কপোলে, কানের কাছে, যায় নিশ্বসিয়া
কে জানে কাহার কথা বিষণ্ণ বাতাস।

ত্যজি তার তনুখানি কোমল হৃদয়
বাহির হয়েছে যেন দীর্ঘ অভিসারে,
সম্মুখে অপার ধরা কঠিন নিদয়—
একাকিনী দাঁড়ায়েছে তাহারি মাঝারে।

হয়তো বা এখনি সে এসেছে হেথায়,
মৃদুপদে পশিতেছে এই বাতায়নে,
মানসমুরতিখানি আকুল আমায়
বাঁধিতেছে দেহহীন স্বপ্ন-আলিঙ্গনে।

তারি ভালোবাসা, তারি বাহু সুকোমল,
উৎকণ্ঠ চকোর-সম বিরহতিয়াষ,

বহিয়া আনিছে এই পুষ্পপরিমল—
কাঁদায়ে তুলিছে এই বসন্তবাতাস।

২১ বৈশাখ ১৮৮৮

পত্রের প্রত্যাশা

চিঠি কই! দিন গেল! বইগুলো ছুঁড়ে ফেলো,
আর তো লাগে না ভালো ছাইপাঁশ পড়া।
মিটায়ে মনের খেদ গেঁথে গেছে অবিচ্ছেদ
পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদ মিছে মন-গড়া।
কাননপ্রান্তের কাছে ছায়া পড়ে গাছে গাছে,
ম্লান আলো শুয়ে আছে বালুকার তীরে।
বায়ু উঠে ঢেউ তুলি, টলমল পড়ে ঢুলি
কূলে বাঁধা নৌকাগুলি জাহ্নবীর নীরে।

চিঠি কই! হেথা এসে একা বসে দূর দেশে
কী পড়িব দিনশেষে সন্ধ্যার আলোকে!
গোধূলির ছায়াতলে কে বলো গো মায়াবলে
সেই মুখ অশ্রুজলে এঁকে দেবে চোখে!
গভীর গুঞ্জনস্বনে ঝিল্লিরব উঠে বনে,
কে মিশাবে তারি সনে স্মৃতিকণ্ঠস্বর!
তীরতরু-ছায়ে-ছায়ে কোমল সন্ধ্যার বায়ে
কে আনিয়া দিবে গায়ে সুকোমল কর!

পাখি তরুশিরে আসে, দূর হতে নীড়ে আসে,
তরীগুলি তীরে আসে, ফিরে আসে সবে—
তার সেই স্নেহস্বর ভেদি দূর-দূরান্তর
কেন এ কোলের 'পর আসে না নীরবে!
দিনান্তে স্নেহের স্মৃতি একবার আসে নিতি
কলরব-ভরা প্রীতি লয়ে তার মুখে—

দিবসের ভার যত তবে হয় অপগত,
নিশি নিমেষের মতো কাটে স্বপ্নসুখে।

সকলই তো মনে আছে যতদিন ছিল কাছে
কত কথা বলিয়াছে কত ভালোবেসে—
কত কথা শুনি নাই, হৃদয়ে পায় নি ঠাঁই,
মুহূর্ত শুনিয়া তাই ভুলেছি নিমেষে।
পাতা পোরাবার ছলে আজ সে যা-কিছু বলে
তাই শুনে মন গলে, চোখে আসে জল—
তারি লাগি কত ব্যথা, কত মনোব্যাকুলতা,
দু-চারিটি তুচ্ছ কথা জীবনসম্বল!

দিবা যেন আলোহীনা এই দুটি কথা বিনা
'তুমি ভালো আছ কি না' 'আমি ভালো আছি'।
স্নেহ যেন নাম ডেকে কাছে এসে যায় দেখে,
দুটি কথা দূর থেকে করে কাছাকাছি।
দরশ পরশ যত সকল বন্ধন গত,
মাঝে ব্যবধান কত নদীগিরিপারে—
স্মৃতি শুধু স্নেহ বয়ে দুঁহু করস্পর্শ লয়ে
অক্ষরের মালা হয়ে বাঁধে দুজনারে।

কই চিঠি! এল নিশা, তিমিরে ডুবিল দিশা,
সারা দিবসের তৃষা রয়ে গেল মনে—
অন্ধকার নদীতীরে বেড়াতেছি ফিরে ফিরে,
প্রকৃতির শান্তি ধীরে পশিছে জীবনে।
ক্রমে আঁখি ছলছল্, দুটি ফোঁটা অশ্রুজল
ভিজায় কপোলতল, শুকায় বাতাসে—
ক্রমে অশ্রু নাহি বয়, ললাট শীতল হয়
রজনীর শান্তিময় শীতল নিশ্বাসে।

আকাশে অসংখ্য তারা চিন্তাহারা ক্লান্তিহারা,
হৃদয় বিস্ময়ে সারা হেরি একদিঠি—
আর যে আসে না আসে মুক্ত এই মহাকাশে
প্রতি সন্ধ্যা পরকাশে অসীমের চিঠি।
অনন্ত বারতা বহে— অন্ধকার হতে কহে,
'যে রহে যে নাহি রহে কেহ নহে একা—
সীমাপরপারে থাকি সেথা হতে সবে ডাকি
প্রতি রাত্রে লিখে রাখি জ্যোতিপত্রলেখা।'

২৩ বৈশাখ ১৮৮৮

বধূ

'বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল্!'—
পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে,
কোথা সে ছায়া সখী, কোথা সে জল!
কোথা সে বাঁধা ঘাট, অশথতল!
ছিলাম আনমনে একেলা গৃহকোণে,
কে যেন ডাকিল রে 'জলকে চল্'।

কলসী লয়ে কাঁখে— পথ সে বাঁকা,
বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধূ ধূ,
ডাহিনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা।
দিঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে,
দু ধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা।
গভীর থির নীরে ভাসিয়া যাই ধীরে,
পিক কুহরে তীরে অমিয়-মাখা।
পথে আসিতে ফিরে, আঁধার তরুশিরে
সহসা দেখি চাঁদ আকাশে আঁকা।

অশথ উঠিয়াছে প্রাচীর টুটি,
সেখানে ছুটিতাম সকালে উঠি।

শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল,
করবী থোলো থোলো রয়েছে ফুটি।
প্রাচীর বেয়ে বেয়ে সবুজে ফেলে ছেয়ে
বেগুনি-ফুলে-ভরা লতিকা দুটি।
ফাটলে দিয়ে আঁখি আড়ালে বসে থাকি,
আঁচল পদতলে পড়েছে লুটি।

মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে
সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে।
এ ধারে পুরাতন শ্যামল তালবন
সঘন সারি দিয়ে দাঁড়ায় ঘেঁষে।
বাঁধের জলরেখা ঝলসে যায় দেখা,
জটলা করে তীরে রাখাল এসে।
চলেছে পথখানি কোথায় নাহি জানি,
কে জানে কত শত নূতন দেশে।

হায় রে রাজধানী পাষাণকায়া!
বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে
ব্যাকুল বালিকারে, নাহিকো মায়া!
কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথঘাট,
পাখির গান কই, বনের ছায়া!

কে যেন চারি দিকে দাঁড়িয়ে আছে,
খুলিতে নারি মন শুনিবে পাছে!
হেথায় বৃথা কাঁদা, দেয়ালে পেয়ে বাধা
কাঁদন ফিরে আসে আপন-কাছে।

আমার আঁখিজল কেহ না বোঝে,
অবাক্ হয়ে সবে কারণ খোঁজে।
'কিছুতে নাহি তোষ, এ তো বিষম দোষ
গ্রাম্য বালিকার স্বভাব ও যে!

স্বজন প্রতিবেশী এত যে মেশামেশি,
ও কেন কোণে বসে নয়ন বোজে ?'

কেহ বা দেখে মুখ কেহ বা দেহ—
কেহ বা ভালো বলে, বলে না কেহ।
ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি,
পরখ করে সবে, করে না স্নেহ।

সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা।
কেমন করে কাটে সারাটা বেলা!
ইটের 'পরে ইট, মাঝে মানুষ-কীট—
নাইকো ভালোবাসা, নাইকো খেলা।

কোথায় আছ তুমি কোথায় মা গো!
কেমনে ভুলে তুই আছিস হাঁ গো!
উঠিলে নব শশী ছাদের 'পরে বসি
আর কি রূপকথা বলিবি না গো!
হৃদয়বেদনায় শূন্য বিছানায়
বুঝি, মা, আঁখিজলে রজনী জাগো!
কুসুম তুলি লয়ে প্রভাতে শিবালয়ে
প্রবাসী তনয়ার কুশল মাগো।

হেথাও ওঠে চাঁদ ছাদের পারে,
প্রবেশ মাগে আলো ঘরের দ্বারে।
আমারে খুঁজিতে সে ফিরিছে দেশে দেশে,
যেন সে ভালোবেসে চাহে আমারে।

নিমেষতরে তাই আপনা ভুলি
ব্যাকুল ছুটে যাই দুয়ার খুলি।
অমনি চারি ধারে নয়ন উঁকি মারে,
শাসন ছুটে আসে ঝটিকা তুলি।

দেবে না ভালোবাসা, দেবে না আলো।
সদাই মনে হয় আঁধার ছায়াময়
দিঘির সেই জল শীতল কালো,
তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভালো।

ডাক্ লো ডাক্ তোরা, বল্ লো বল্—
'বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল্!'
কবে পড়িবে বেলা, ফুরাবে সব খেলা,
নিবাবে সব জ্বালা শীতল জল,
জানিস যদি কেহ আমায় বল্।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮
সংশোধন-পরিবর্ধন :
শান্তিনিকেতন। ৭ কার্তিক

ব্যক্ত প্রেম

কেন তবে কেড়ে নিলে লাজ-আবরণ?
হৃদয়ের দ্বার হেনে বাহিরে আনিলে টেনে,
শেষে কি পথের মাঝে করিবে বর্জন?

আপন অন্তরে আমি ছিলাম আপনি—
সংসারের শত কাজে ছিলাম সবার মাঝে,
সকলে যেমন ছিল আমিও তেমনি।

তুলিতে পূজার ফুল যেতেম যখন
সেই পথ ছায়া-করা, সেই বেড়া লতা-ভরা,
সেই সরসীর তীরে করবীর বন—

সেই কুহরিত পিক শিরীষের ডালে,
প্রভাতে সখীর মেলা, কত হাসি কত খেলা—
কে জানিত কী ছিল এ প্রাণের আড়ালে!

বসন্তে উঠিত ফুটে বনে বেলফুল,
কেহ বা পরিত মালা, কেহ বা ভরিত ডালা,
করিত দক্ষিণবায়ু অঞ্চল আকুল।

বরষায় ঘনঘটা, বিজুলি খেলায়—
প্রান্তরের প্রান্তদিশে মেঘে বনে যেত মিশে,
জুঁইগুলি বিকশিত বিকাল বেলায়।

বর্ষ আসে বর্ষ যায়, গৃহকাজ করি—
সুখদুঃখ ভাগ লয়ে প্রতিদিন যায় বয়ে,
গোপন স্বপন লয়ে কাটে বিভাবরী।

লুকানো প্রাণের প্রেম পবিত্র সে কত!
আঁধার হৃদয়তলে মানিকের মতো জ্বলে,
আলোতে দেখায় কালো কলঙ্কের মতো।

ভাঙিয়া দেখিলে ছিছি নারীর হৃদয়!
লাজে ভয়ে থর্থর্ ভালোবাসা-সকাতর
তার লুকাবার ঠাঁই কাড়িলে নিদয়!

আজিও তো সেই আসে বসন্ত শরৎ।
বাঁকা সেই চাঁপা-শাখে সোনা-ফুল ফুটে থাকে,
সেই তারা তোলে এসে— সেই ছায়াপথ!

সবাই যেমন ছিল, আছে অবিকল—
সেই তারা কাঁদে হাসে, কাজ করে, ভালোবাসে,
করে পূজা, জ্বালে দীপ, তুলে আনে জল।

কেহ উঁকি মারে নাই তাহাদের প্রাণে—
ভাঙিয়া দেখে নি কেহ হৃদয় গোপন গেহ,
আপন মরম তারা আপনি না জানে।

আমি আজ ছিন্ন ফুল রাজপথে পড়ি,
পল্লবের সুচিকন ছায়াস্নিগ্ধ আবরণ
তেয়াগি ধুলায় হায় যাই গড়াগড়ি।

নিতান্ত ব্যথার ব্যথী ভালোবাসা দিয়ে
সযতনে চিরকাল রচি দিবে অন্তরাল,
নগ্ন করেছিনু প্রাণ সেই আশা নিয়ে।

মুখ ফিরাতেছ, সখা, আজ কী বলিয়া!
ভুল করে এসেছিলে? ভুলে ভালোবেসেছিলে?
ভুল ভেঙে গেছে তাই যেতেছ চলিয়া?

তুমি তো ফিরিয়া যাবে আজ বই কাল—
আমার যে ফিরিবার পথ রাখ নাই আর,
ধূলিসাৎ করেছ যে প্রাণের আড়াল।

একি নিদারুণ ভুল! নিখিলনিলয়ে
এত শত প্রাণ ফেলে ভুল করে কেন এলে
অভাগিনী রমণীর গোপন হৃদয়ে!

ভেবে দেখো আনিয়াছ মোরে কোন্‌খানে—
শত লক্ষ আঁখিভরা কৌতুককঠিন ধরা
চেয়ে রবে অনাবৃত কলঙ্কের পানে!

ভালোবাসা তাও যদি ফিরে নেবে শেষে,
কেন লজ্জা কেড়ে নিলে, একাকিনী ছেড়ে দিলে
বিশাল ভবের মাঝে বিবসনাবেশে!

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

পরিবর্ধন : শান্তিনিকেতন। ৭ কার্তিক

গুপ্ত প্রেম

তবে পরানে ভালোবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে!
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তারে গিয়া কী দিয়ে!

মনে গোপনে থাকে প্রেম, যায় না দেখা,
কুসুম দেয় তাই দেবতায়।
দাঁড়ায়ে থাকি দ্বারে, চাহিয়া দেখি তারে,
কী ব'লে আপনারে দিব তায়!

ভালো বাসিলে ভালো যারে দেখিতে হয়
সে যেন পারে ভালো বাসিতে।
মধুর হাসি তার দিক সে উপহার
মাধুরী ফুটে যার হাসিতে!

যার নবনীসুকুমার কপোলতল
কী শোভা পায় প্রেমলাজে গো!
যাহার ঢলঢল নয়নশতদল
তারেই আঁখিজল সাজে গো!

তাই লুকায়ে থাকি সদা পাছে সে দেখে,
ভালোবাসিতে মরি শরমে।
রুধিয়া মনোদ্বার প্রেমের কারাগার
রচেছি আপনার মরমে।

আহা এ তনু-আবরণ শ্রীহীন ম্লান
ঝরিয়া পড়ে যদি শুকায়ে,
হৃদয়মাঝে মম দেবতা মনোরম
মাধুরী নিরুপম লুকায়ে।

যত গোপনে ভালোবাসি পরান ভরি
পরান ভরি উঠে শোভাতে—
যেমন কালো মেঘে অরুণ-আলো লেগে
মাধুরী উঠে জেগে প্রভাতে।

আমি সে শোভা কাহারে তো দেখাতে নারি,
এ পোড়া দেহ সবে দেখে যায়—
প্রেম যে চুপে চুপে ফুটিতে চাহে রূপে,
মনেরই অন্ধকূপে থেকে যায়।

দেখো, বনের ভালোবাসা আঁধারে বসি
কুসুমে আপনারে বিকাশে,
তারকা নিজ হিয়া তুলিছে উজলিয়া
আপন আলো দিয়া লিখা সে।

ভবে প্রেমের আঁখি প্রেম কাড়িতে চাহে,
মোহন রূপ তাই ধরিছে।
আমি যে আপনায় ফুটাতে পারি নাই,
পরান কেঁদে তাই মরিছে।

আমি আপন মধুরতা আপনি জানি
পরানে আছে যাহা জাগিয়া,
তাহারে লয়ে সেথা দেখাতে পারিলে তা
যেত এ ব্যাকুলতা ভাগিয়া।

আমি রূপসী নহি, তবু আমারো মনে
প্রেমের রূপ সে তো সুমধুর।
ধন সে যতনের শয়ন-স্বপনের,
করে সে জীবনের তমোদূর।

আমি আমার অপমান সহিতে পারি,
প্রেমের সহে না তো অপমান।
অমরাবতী ত্যেজে হৃদয়ে এসেছে যে,
তাহারো চেয়ে সে যে মহীয়ান।

পাছে কুরূপ কভু তারে দেখিতে হয়
কুরূপ দেহমাঝে উদিয়া,
প্রাণের এক ধারে দেহের পরপারে
তাই তো রাখি তারে রুধিয়া।

তাই আঁখিতে প্রকাশিতে চাহি নে তারে,
নীরবে থাকে তাই রসনা।
মুখে সে চাহে যত নয়ন করি নত,
গোপনে মরে কত বাসনা।

তাই যদি সে কাছে আসে পালাই দূরে,
আপন মনোআশা দলে যাই,
পাছে সে মোরে দেখে থমকি বলে 'এ কে!'
দু হাতে মুখ ঢেকে চলে যাই।

পাছে নয়নে বচনে সে বুঝিতে পারে
আমার জীবনের কাহিনী—
পাছে সে মনে ভাবে, 'এও কি প্রেম জানে!
আমি তো এর পানে চাহি নি!'

তবে পরানে ভালোবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে!
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তারে গিয়া কী দিয়ে!

১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

অপেক্ষা

সকল বেলা কাটিয়া গেল
বিকাল নাহি যায়।
দিনের শেষে শ্রান্তছবি
কিছুতে যেতে চায় না রবি,
চাহিয়া থাকে ধরণী-পানে,
বিদায় নাহি চায়।

মেঘেতে দিন জড়ায়ে থাকে,
মিলায়ে থাকে মাঠে—
পড়িয়া থাকে তরুর শিরে,
কাঁপিতে থাকে নদীর নীরে,
দাঁড়ায়ে থাকে দীর্ঘ ছায়া
মেলিয়া ঘাটে বাটে।

এখনো ঘুঘু ডাকিছে ডালে
করুণ একতানে।
অলস দুখে দীর্ঘ দিন
ছিল সে বসে মিলনহীন,
এখনো তার বিরহগাথা
বিরাম নাহি মানে।

বধূরা দেখো আইল ঘাটে,
এল না ছায়া তবু।
কলস-ঘায়ে ঊর্মি টুটে,
রশ্মিরাশি চূর্ণি উঠে,
শ্রান্ত বায়ু প্রান্তনীর
চুম্বি যায় কভু।

*

দিবসশেষে বাহিরে এসে
সেও কি এতখনে
নীলাম্বরে অঙ্গ ঘিরে
নেমেছে সেই নিভৃত নীরে,
প্রাচীরে-ঘেরা ছায়াতে-ঢাকা
বিজন ফুলবনে ?

স্নিগ্ধ জল মুগ্ধভাবে
ধরেছে তনুখানি।
মধুর দুটি বাহুর ঘায়
অগাধ জল টুটিয়া যায়,
গ্রীবার কাছে নাচিয়া উঠি
করিছে কানাকানি।

কপোলে তার কিরণ প'ড়ে
তুলেছে রাঙা করি।
মুখের ছায়া পড়িয়া জলে
নিজেরে যেন খুঁজিছে ছলে,
জলের 'পরে ছড়ায়ে পড়ে
আঁচল খসি পড়ি।

জলের 'পরে এলায়ে দিয়ে
আপন রূপখানি
শরমহীন আরামসুখে
হাসিটি ভাসে মধুর মুখে,
বনের ছায়া ধরার চোখে
দিয়েছে পাতা টানি।

সলিলতলে সোপান-'পরে
　　উদাস বেশবাস।
আধেক কায়া আধেক ছায়া
জলের 'পরে রচিছে মায়া,
দেহেরে যেন দেহের ছায়া
　　করিছে পরিহাস।

আম্রবন মুকুলে ভরা
　　গন্ধ দেয় তীরে।
গোপন শাখে বিরহী পাখি
আপন-মনে উঠিছে ডাকি,
বিবশ হয়ে বকুল ফুল
　　খসিয়া পড়ে নীরে।

দিবস ক্রমে মুদিয়া আসে,
　　মিলায়ে আসে আলো।
নিবিড় ঘন বনের রেখা
আকাশশেষে যেতেছে দেখা,
নিদ্রালস আঁখির 'পরে
　　ভুরুর মতো কালো।

বুঝি বা তীরে উঠিয়াছে সে
　　জলের কোল ছেড়ে।
ত্বরিত পদে চলেছে গেহে,
সিক্ত বাস লিপ্ত দেহে—
যৌবনলাবণ্য যেন
　　লইতে চাহে কেড়ে।

মাজিয়া তনু যতন ক'রে
পরিবে নব বাস।
কাঁচল পরি আঁচল টানি
আঁটিয়া লয়ে কাঁকনখানি
নিপুণ করে রচিয়া বেণী
বাঁধিবে কেশপাশ।

উরসে পরি যূথীর হার
বসনে মাথা ঢাকি
বনের পথে নদীর তীরে
অন্ধকারে বেড়াবে ধীরে
গন্ধটুকু সন্ধ্যাবায়ে
রেখার মতো রাখি।

বাজিবে তার চরণধ্বনি
বুকের শিরে শিরে।
কখন, কাছে না আসিতে সে
পরশ যেন লাগিবে এসে,
যেমন ক'রে দখিন বায়ু
জাগায় ধরণীরে।

যেমনি কাছে দাঁড়াব গিয়ে
আর কি হবে কথা ?
ক্ষণেক শুধু অবশ কায়
থমকি রবে ছবির প্রায়,
মুখের পানে চাহিয়া শুধু
সুখের আকুলতা।

দোঁহার মাঝে ঘুচিয়া যাবে
আলোর ব্যবধান।
আঁধারতলে গুপ্ত হয়ে
বিশ্ব যাবে লুপ্ত হয়ে,
আসিবে মুদে লক্ষকোটি
জাগ্রত নয়ান।

অন্ধকারে নিকট করে,
আলোতে করে দূর।
যেমন, দুটি ব্যথিত প্রাণে
দুঃখনিশি নিকটে টানে,
সুখের প্রাতে যাহারা রহে
আপনা-ভরপুর।

আঁধারে যেন দুজনে আর
দুজন নাহি থাকে।
হৃদয়মাঝে যতটা চাই
ততটা যেন পুরিয়া পাই,
প্রলয়ে যেন সকল যায়—
হৃদয় বাকি রাখে।

হৃদয় দেহ আঁধারে যেন
হয়েছে একাকার।
মরণ যেন অকালে আসি
দিয়েছে সব বাঁধন নাশি,
ত্বরিত যেন গিয়েছি দোঁহে
জগৎ-পরপার।

দু দিক হতে দুজনে যেন
বহিয়া খরধারে
আসিতেছিল দোঁহার পানে
ব্যাকুলগতি ব্যগ্রপ্রাণে,
সহসা এসে মিশিয়া গেল
নিশীথপারাবারে।

থামিয়া গেল অধীর স্রোত,
থামিল কলতান—
মৌন এক মিলনরাশি
তিমিরে সব ফেলিল গ্রাসি,
প্রলয়তলে দোঁহার মাঝে
দোঁহার অবসান।

১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

দুরন্ত আশা

মর্মে যবে মত্ত আশা
সর্পসম ফোঁষে,
অদৃষ্টের বন্ধনেতে
দাপিয়া বৃথা রোষে
তখনো ভালোমানুষ সেজে
বাঁধানো হুঁকা যতনে মেজে
মলিন তাস সজোরে ভেঁজে
খেলিতে হবে কষে!
অন্নপায়ী বঙ্গবাসী
স্তন্যপায়ী জীব
জন-দশেকে জটলা করি
তক্তপোষে ব'সে।

ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো,
পোষ-মানা এ প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নীচে
শান্তিতে শয়ান।
দেখা হলেই মিষ্ট অতি
মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলস দেহ ক্লিষ্টগতি—
গৃহের প্রতি টান।
তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু
নিদ্রারসে ভরা,
মাথায় ছোটো বহরে বড়ো
বাঙালি সন্তান।

ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুয়িন!
চরণতলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন।
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি,
জীবনস্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয়তলে বহ্নি জালি
চলেছি নিশিদিন।
বর্শা হাতে, ভর্‌সা প্রাণে,
সদাই নিরুদ্দেশ
মরুর ঝড় যেমন বহে
সকল-বাধা-হীন।

বিপদ-মাঝে ঝাঁপায়ে প'ড়ে
শোণিত উঠে ফুটে,
সকল দেহে সকল মনে
জীবন জেগে উঠে—

অন্ধকারে সূর্যালোতে
সন্তরিয়া মৃত্যুস্রোতে
নৃত্যময় চিত্ত হতে
মত্ত হাসি টুটে।
বিশ্বমাঝে মহান যাহা
সঙ্গী পরানের,
ঝঞ্ঝামাঝে ধায় সে প্রাণ
সিন্ধুমাঝে লুটে।

নিমেষতরে ইচ্ছা করে
বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে
জীবন-উচ্ছ্বাসে—
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্যসম করিতে পান
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ
ঊর্ধ্ব নীলাকাশে।
থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোণে
আম্রবনছায়ে
সুপ্ত হয়ে লুপ্ত হয়ে
গুপ্ত গৃহবাসে।

বেহালাখানা বাঁকায়ে ধরি
বাজাও ওকি সুর—
তবলা-বাঁয়া কোলেতে টেনে
বাদ্যে ভরপুর!
কাগজ নেড়ে উচ্চস্বরে
পোলিটিকাল তর্ক করে,
জানলা দিয়ে পশিছে ঘরে
বাতাস ঝুরুঝুর্।

পানের বাটা, ফুলের মালা,
তবলা-বাঁয়া দুটো,
দম্ভ-ভরা কাগজগুলো
করিয়া দাও দূর !

কিসের এত অহংকার !
দম্ভ নাহি সাজে—
বরং থাকো মৌন হয়ে
সসংকোচ লাজে ।
অত্যাচারে মত্ত-পারা
কভু কি হও আত্মহারা ?
তপ্ত হয়ে রক্তধারা
ফুটে কি দেহমাঝে ?
অহর্নিশি হেলার হাসি
তীব্র অপমান
মর্মতল বিদ্ধ করি
বজ্রসম বাজে ?

দাস্যসুখে হাস্যমুখ,
বিনীত জোড়-কর,
প্রভুর পদে সোহাগ-মদে
দোদুল কলেবর !
পাদুকাতলে পড়িয়া লুটি
ঘৃণায়-মাখা অন্ন খুঁটি
ব্যগ্র হয়ে ভরিয়া মুঠি
যেতেছ ফিরি ঘর ।
ঘরেতে ব'সে গর্ব কর
পূর্বপুরুষের,
আর্যতেজদর্পভরে
পৃথ্বী থরহর !

হেলায়ে মাথা, দাঁতের আগে
মিষ্ট হাসি টানি
বলিতে আমি পারিব না তো
ভদ্রতার বাণী।
উচ্ছ্বসিত রক্ত আসি
বক্ষতল ফেলিছে গ্রাসি,
প্রকাশহীন চিন্তারাশি
করিছে হানাহানি।
কোথাও যদি ছুটিতে পাই
বাঁচিয়া যাই তবে—
ভব্যতার গণ্ডিমাঝে
শান্তি নাহি মানি।

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

দেশের উন্নতি

বক্তৃতাটা লেগেছে বেশ,
রয়েছে রেশ কানে—
কী যেন করা উচিত ছিল,
কী করি কে তা জানে!
অন্ধকারে ওই রে শোন্
ভারতমাতা করেন 'গ্রোন',
এ হেন কালে ভীষ্ম দ্রোণ
গেলেন কোন্‌খানে!
দেশের দুখে সতত দহি
মনের ব্যথা সবারে কহি,
এসো তো করি নামটা সহি
লম্বা পিটিশানে।
আয় রে ভাই, সবাই মাতি
যতটা পারি ফুলাই ছাতি,

নহিলে গেল আর্যজাতি
রসাতলের পানে।

উৎসাহেতে জলিয়া উঠি
দু হাতে দাও তালি।
আমরা বড়ো এ যে না বলে
তাহারে দাও গালি।
কাগজ ভ'রে লেখো রে লেখো,
এমনি করে যুদ্ধ শেখো,
হাতের কাছে রেখো রে রেখো
কলম আর কালী!
চারটি করে অন্ন খেয়ো,
দুপুরবেলা আপিস যেয়ো,
তাহার পরে সভায় ধেয়ো
বাক্যানল জ্বালি—
কাঁদিয়া লয়ে দেশের দুখে
সন্ধেবেলা বাসায় ঢুকে
শ্যালীর সাথে হাস্যমুখে
করিয়ো চতুরালি।

দূর হউক এ বিড়ম্বনা,
বিদ্রূপের ভাণ।
সবারে চাহে বেদনা দিতে
বেদনা-ভরা প্রাণ।
আমার এই হৃদয়তলে
শরম-তাপ সতত জলে,
তাই তো চাহি হাসির ছলে
করিতে লাজ দান।
আয়-না, ভাই, বিরোধ ভুলি—
কেন রে মিছে লাথিয়ে তুলি

পথের যত মতের ধূলি
আকাশপরিমাণ ?
পরের মাঝে ঘরের মাঝে
মহৎ হব সকল কাজে,
নীরবে যেন মরে গো লাজে
মিথ্যা অভিমান।

ক্ষুদ্রতার মন্দিরেতে
বসায়ে আপনারে
আপন পায়ে না দিই যেন
অর্ঘ্য ভারে ভারে।
জগতে যত মহৎ আছে
হইব নত সবার কাছে,
হৃদয় যেন প্রসাদ যাচে
তাঁদের দ্বারে দ্বারে।
যখন কাজ ভুলিয়া যাই
মর্মে যেন লজ্জা পাই,
নিজেরে নাহি ভুলাতে চাই
বাক্যের আঁধারে।
ক্ষুদ্র কাজ ক্ষুদ্র নয়
এ কথা মনে জাগিয়া রয়,
বৃহৎ ব'লে না মনে হয়
বৃহৎ কল্পনারে।

পরের কাছে হইব বড়ো
এ কথা গিয়ে ভুলে
বৃহৎ যেন হইতে পারি
নিজের প্রাণমূলে।
অনেক দূরে লক্ষ্য রাখি
চুপ করে না বসিয়া থাকি

স্বপ্নাতুর দুইটি আঁখি
শূন্যপানে তুলে।
ঘরের কাজ রয়েছে পড়ি,
তাহাই যেন সমাধা করি,
‘কী করি’ বলে ভেবে না মরি
সংশয়েতে দুলে।
করিব কাজ নীরবে থেকে,
মরণ যবে লইবে ডেকে
জীবনরাশি যাইব রেখে
ভবের উপকূলে।

সবাই বড়ো হইলে তবে
স্বদেশ বড়ো হবে,
যে কাজে মোরা লাগাব হাত
সিদ্ধ হবে তবে।
সত্যপথে আপন বলে
তুলিয়া শির সকলে চলে,
মরণভয় চরণতলে
দলিত হয়ে রবে।
নহিলে শুধু কথাই সার,
বিফল আশা লক্ষবার,
দলাদলি ও অহংকার
উচ্চ কলরবে।
আমোদ করা কাজের ভাণে—
পেখম তুলি গগন-পানে
সবাই মাতে আপন মানে
আপন গৌরবে।

বাহবা কবি! বলিছ ভালো,
শুনিতে লাগে বেশ।

এমনি ভাবে বলিলে হবে
উন্নতি বিশেষ।
'ওজস্বিতা' 'উদ্দীপনা'
ছুটাও ভাষা অগ্নিকণা,
আমরা করি' সমালোচনা
জাগায়ে তুলি দেশ!
বীর্যবল বাঙ্গালার
কেমনে বলো টিঁকিবে আর,
প্রেমের গানে করেছে তার
দুর্দশার শেষ।
যাক-না দেখা দিন-কতক
যেখানে যত রয়েছে লোক
সকলে মিলে লিখুক শ্লোক
'জাতীয়' উপদেশ।
নয়ন বাহি অনর্গল
ফেলিব সবে অশ্রুজল,
উৎসাহেতে বীরের দল
লোমাঞ্চিতকেশ।

রক্ষা করো! উৎসাহের
যোগ্য আমি কই!
সভা-কাঁপানো করতালিতে
কাতর হয়ে রই।
দশ জনাতে যুক্তি ক'রে
দেশের যারা মুক্তি করে,
কাঁপায় ধরা বসিয়া ঘরে,
তাদের আমি নই।
'জাতীয়' শোকে সবাই জুটে
মরিছে যবে মাথাটা কুটে,

দশ দিকেতে উঠিছে ফুটে
বক্তৃতার খই—
হয়তো আমি শয্যা পেতে
মুগ্ধহিয়া আলস্যেতে
ছন্দ গেঁথে নেশায় মেতে
প্রেমের কথা কই।
শুনিয়া যত বীরশাবক
দেশের যাঁরা অভিভাবক
দেশের কানে হস্ত হানে,
ফুকারে হৈ-হৈ!

চাহি না আমি অনুগ্রহ-
বচন এত শত।
'ওজস্বিতা' 'উদ্দীপনা'
থাকুক আপাতত।
স্পষ্ট তবে খুলিয়া বলি—
তুমিও চলো আমিও চলি,
পরস্পরে কেন এ ছলি
নির্বোধের মতো?

ঘরেতে ফিরে খেলো গে তাস,
লুটায়ে ভুঁয়ে মিটায়ে আশ
মরিয়া থাকো বারোটি মাস
আপন আঙিনায়।
পরের দোষে নাসিকা গুঁজে
গল্প খুঁজে গুজব খুঁজে
আরামে আঁখি আসিবে বুজে
মলিনপশুপ্রায়।
তরল হাসি-লহরী তুলি
রচিয়ো বসি বিবিধ বুলি,

সকল কিছু যাইয়ো ভুলি,
ভুলো না আপনায় !

আমিও রব তোমারি দলে
পড়িয়া এক-ধার !
মাদুর পেতে ঘরের ছাতে
ডাবা হুঁকোটি ধরিয়া হাতে
করিব আমি সবার সাথে
দেশের উপকার ।
বিজ্ঞভাবে নাড়িব শির,
অসংশয়ে করিব স্থির
মোদের বড়ো এ পৃথিবীর
কেহই নহে আর !
নয়ন যদি মুদিয়া থাকো
সে ভুল কভু ভাঙিবে নাকো,
নিজেরে বড়ো করিয়া রাখো
মনেতে আপনার !
বাঙালি বড়ো চতুর, তাই
আপনি বড়ো হইয়া যাই,
অথচ কোনো কষ্ট নাই
চেষ্টা নাই তার ।
হোথায় দেখো খাটিয়া মরে,
দেশে বিদেশে ছড়ায়ে পড়ে,
জীবন দেয় ধরার তরে
ম্লেচ্ছসংসার !
ফুকারো তবে উচ্চরবে
বাঁধিয়া এক-সার—
মহৎ মোরা বঙ্গবাসী
আর্যপরিবার !

১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮
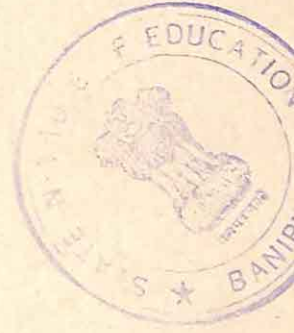
বঙ্গবীর

ভুলুবাবু বসি পাশের ঘরেতে
নামতা পড়েন উচ্চস্বরেতে—
হিষ্ট্রি কেতাব লইয়া করেতে
কেদারা হেলান দিয়ে
দুই ভাই মোরা সুখে সমাসীন,
মেজের উপরে জ্বলে কেরাসিন,
প'ড়িয়া ফেলেছি চ্যাপ্টার তিন—
দাদা এমে, আমি বিএ।

যত পড়ি তত পুড়ে যায় তেল,
মগজে গজিয়ে উঠে আক্কেল,
কেমন করিয়া বীর ক্রমোয়েল
পাড়িল রাজার মাথা
বালক যেমন ঠেঙার বাড়িতে
পাকা আমগুলো রহে গো পাড়িতে—
কৌতুক ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে
উলটি ব'য়ের পাতা।

কেহ মাথা ফেলে ধর্মের তরে,
পরহিতে কারো মাথা খ'সে পড়ে,
রণভূমে কেহ মাথা রেখে মরে
কেতাবে রয়েছে লেখা।
আমি কেদারায় মাথাটি রাখিয়া
এই কথাগুলি চাখিয়া চাখিয়া
সুখে পাঠ করি থাকিয়া থাকিয়া,
পড়ে কত হয় শেখা!

*

পড়িয়াছি বসে জানালার কাছে
জ্ঞান খুঁজে কারা ধরা ভ্রমিয়াছে,
কবে মরে তারা মুখস্থ আছে
কোন্ মাসে কী তারিখে।
কর্তব্যের কঠিন শাসন
সাধ ক'রে কারা করে উপাসন,
গ্রহণ করেছে কণ্টকাসন—
খাতায় রেখেছি লিখে।

বড়ো কথা শুনি, বড়ো কথা কই,
জড়ো করে নিয়ে পড়ি বড়ো বই,
এমনি করিয়া ক্রমে বড়ো হই—
কে পারে রাখিতে চেপে!
কেদারায় বসে সারাদিন ধ'রে
বই প'ড়ে প'ড়ে মুখস্থ ক'রে
কভু মাথা ধরে কভু মাথা ঘোরে,
বুঝি বা যাইব ক্ষেপে।

ইংরেজ চেয়ে কিসে মোরা কম!
আমরা যে ছোটো সেটা ভারী ভ্রম;
আকারপ্রকার রকম-সকম
এতেই যা কিছু ভেদ।
যাহা লেখে তারা তাই ফেলি শিখে,
তাহাই আবার বাংলায় লিখে
করি কতমতো গুরুমারা টীকে,
লেখনীর ঘুচে খেদ।

মোক্ষমুলর বলেছে 'আর্য',
সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য,
মোরা বড়ো বলে করেছি ধার্য,
আরামে পড়েছি শুয়ে।

মনু নাকি ছিল আধ্যাত্মিক,
আমরাও তাই— করিয়াছি ঠিক,
এ যে নাহি বলে ধিক্ তারে ধিক্,
শাপ দি' পইতে ছুঁয়ে।

কে বলিতে চায় মোরা নহি বীর,
প্রমাণ যে তার রয়েছে গভীর,
পূর্বপুরুষ ছুঁড়িতেন তীর
সাক্ষী বেদব্যাস।
আর-কিছু তবে নাহি প্রয়োজন,
সভাতলে মিলে বারো-তেরো জন
শুধু তরজন আর গরজন
এই করো অভ্যাস।

আলো-চাল আর কাঁচকলা-ভাতে
মেখেচুখে নিয়ে কদলীর পাতে
ব্রহ্মচর্য পেত হাতে হাতে
ঋষিগণ তপ ক'রে।
আমরা যদিও পাতিয়াছি মেজ,
হোটেলে ঢুকেছি পালিয়ে কালেজ,
তবু আছে সেই ব্রাহ্মণ-তেজ
মনু-তর্জমা প'ড়ে।

সংহিতা আর মুর্গি -জবাই
এই দুটো কাজে লেগেছি সবাই,
বিশেষত এই আমরা ক' ভাই
নিমাই নেপাল ভুতো।
দেশের লোকের কানের গোড়াতে
বিদ্যেটা নিয়ে লাঠিম ঘোরাতে,
বক্তৃতা আর কাগজ পোরাতে
শিখেছি হাজার ছুতো।

ম্যারাথন আর থর্মপলিতে
কী যে হয়েছিল বলিতে বলিতে
শিরায় শোণিত রহে গো জ্বলিতে
পাটের পলিতে -সম।
মূর্খ যাহারা কিছু পড়ে নাই
তারা এত কথা কী বুঝিবে ছাই—
হাঁ করিয়া থাকে, কভু তোলে হাই—
বুক ফেটে যায় মম।

আগাগোড়া যদি তাহারা পড়িত
গারিবাল্‌ডির জীবনচরিত
না জানি তা হলে কী তারা করিত
কেদারায় দিয়ে ঠেস!
মিল ক'রে ক'রে কবিতা লিখিত,
দু-চারটে কথা বলিতে শিখিত,
কিছুদিন তবু কাগজ টিঁকিত—
উন্নত হত দেশ।

না জানিল তারা সাহিত্যরস,
ইতিহাস নাহি করিল পরশ,
ওয়াশিংটনের জন্ম-বরষ
মুখস্থ হল নাকো।
ম্যাট্‌সিনি-লীলা এমন সরেস
এরা সে কথার না জানিল লেশ—
হা অশিক্ষিত অভাগা স্বদেশ,
লজ্জায় মুখ ঢাকো।

আমি দেখো ঘরে চৌকি টানিয়ে
লাইব্রেরি হতে হিষ্ট্রি আনিয়ে
কত পড়ি, লিখি বানিয়ে বানিয়ে
শানিয়ে শানিয়ে ভাষা।

জলে ওঠে প্রাণ, মরি পাখা করে,
উদ্দীপনায় শুধু মাথা ঘোরে—
তবুও যা হোক স্বদেশের তরে
একটুকু হয় আশা।

যাক, পড়া যাক 'ন্যাস্‌বি' সমর—
আহা, ক্রমোয়েল, তুমিই অমর!
থাক্‌ এইখেনে, ব্যথিছে কোমর—
কাহিল হতেছে বোধ।
ঝি কোথায় গেল, নিয়ে আয় সাবু।
আরে, আরে এসো! এসো ননিবাবু,
তাস পেড়ে নিয়ে খেলা যাক গ্রাবু—
কালকের দেব শোধ!

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

সুরদাসের প্রার্থনা

ঢাকো ঢাকো মুখ টানিয়া বসন,
আমি কবি সুরদাস।
দেবী, আসিয়াছি ভিক্ষা মাগিতে,
পুরাতে হইবে আশ।
অতি অসহন বহ্নিদহন
মর্মমাঝারে করি যে বহন,
কলঙ্করাহু প্রতি পলে পলে
জীবন করিছে গ্রাস।
পবিত্র তুমি, নির্মল তুমি,
তুমি দেবী, তুমি সতী—
কুৎসিত দীন অধম পামর
পঙ্কিল আমি অতি।

তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই শক্তি,
হৃদয়ে আমার পাঠাও ভক্তি—
পাপের তিমির পুড়ে যায় জ্বলে
    কোথা সে পুণ্যজ্যোতি !
দেবের করুণা মানবী-আকারে,
আনন্দধারা বিশ্বমাঝারে,
পতিতপাবনী গঙ্গা যেমন
    এলেন পাপীর কাজে—
তোমার চরিত রবে নির্মল,
তোমার ধর্ম রবে উজ্জ্বল,
আমার এ পাপ করি দাও লীন
    তোমার পুণ্যমাঝে।

তোমারে কহিব লজ্জাকাহিনী
    লজ্জা নাহিকো তায়।
তোমার আভায় মলিন লজ্জা
    পলকে মিলায়ে যায়।
যেমন রয়েছ তেমনি দাঁড়াও,
আঁখি নত করি আমা-পানে চাও,
খুলে দাও মুখ আনন্দময়ী—
    আবরণে নাহি কাজ।
নিরখি তোমারে ভীষণ মধুর,
আছ কাছে তবু আছ অতিদূর—
উজ্জ্বল যেন দেবরোষানল,
    উদ্যত যেন বাজ।

জান কি আমি এ পাপ-আঁখি মেলি
    তোমারে দেখেছি চেয়ে,
গিয়েছিল মোর বিভোর বাসনা
    ওই মুখপানে ধেয়ে !

তুমি কি তখন পেরেছ জানিতে ?
বিমল হৃদয়-আরশিখানিতে
চিহ্ন কিছু কি পড়েছিল এসে
নিশ্বাসরেখাছায়া ?
ধরার কুয়াশা ম্লান করে যথা
আকাশ উষার কায়া !
লজ্জা সহসা আসি অকারণে
বসনের মতো রাঙা আবরণে
চাহিয়াছিল কি ঢাকিতে তোমায়
লুব্ধ নয়ন হতে ?
মোহচঞ্চল সে লালসা মম
কৃষ্ণবরন ভ্রমরের সম
ফিরিতেছিল কি গুন-গুন কেঁদে
তোমার দৃষ্টিপথে ?

আনিয়াছি ছুরী তীক্ষ্ণ দীপ্ত
প্রভাতরশ্মিসম—
লও, বিঁধে দাও বাসনাসঘন
এ কালো নয়ন মম।
এ আঁখি আমার শরীরে তো নাই,
ফুটেছে মর্মতলে—
নির্বাণহীন অঙ্গারসম
নিশিদিন শুধু জ্বলে।
সেথা হতে তারে উপাড়িয়া লও
জ্বালাময় দুটো চোখ,
তোমার লাগিয়া তিয়াষ যাহার
সে আঁখি তোমারি হোক।

অপার ভুবন, উদার গগন,
শ্যামল কাননতল,

বসন্ত অতি মুগ্ধমুরতি,
স্বচ্ছ নদীর জল,
বিবিধবরন সন্ধ্যানীরদ,
গ্রহতারাময়ী নিশি,
বিচিত্রশোভা শস্যক্ষেত্র
প্রসারিত দূরদিশি,
সুনীল গগনে ঘনতর নীল
অতিদূর গিরিমালা,
তারি পরপারে রবির উদয়
কনককিরণ-জ্বালা,
চকিততড়িৎ সঘন বরষা,
পূর্ণ ইন্দ্রধনু,
শরৎ-আকাশে অসীমবিকাশ
জ্যোৎস্না শুভ্রতনু—
লও, সব লও, তুমি কেড়ে লও,
মাগিতেছি অকপটে,
তিমিরতূলিকা দাও বুলাইয়া
আকাশ-চিত্রপটে।

ইহারা আমারে ভুলায় সতত,
কোথা নিয়ে যায় টেনে!
মাধুরীমদিরা পান করে শেষে
প্রাণ পথ নাহি চেনে।
সবে মিলে যেন বাজাইতে চায়
আমার বাঁশরি কাড়ি,
পাগলের মতো রচি নব গান,
নব নব তান ছাড়ি।
আপন ললিত রাগিণী শুনিয়া
আপনি অবশ মন—

ডুবাইতে থাকে কুসুমগন্ধ
বসন্তসমীরণ।
আকাশ আমারে আকুলিয়া ধরে,
ফুল মোরে ঘিরে বসে,
কেমনে না জানি জ্যোৎস্নাপ্রবাহ
সর্বশরীরে পশে।
ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে
ভুবনমোহিনী মায়া,
যৌবন-ভরা বাহুপাশে তার
বেষ্টন করে কায়া।
চারি দিকে ঘিরি করে আনাগোনা
কল্পমুরতি কত,
কুসুমকাননে বেড়াই ফিরিয়া
যেন বিভোরের মতো।
শ্লথ হয়ে আসে হৃদয়তন্ত্রী,
বীণা খসে যায় পড়ি,
নাহি বাজে আর হরিনামগান
বরষ বরষ ধরি।
হরিহীন সেই অনাথ বাসনা
পিয়াসে জগতে ফিরে—
বাড়ে তৃষা, কোথা পিপাসার জল
অকূল লবণনীরে।
গিয়েছিল, দেবী, সেই ঘোর তৃষা
তোমার রূপের ধারে—
আঁখির সহিতে আঁখির পিপাসা
লোপ করো একেবারে।

ইন্দ্রিয় দিয়ে তোমার মূর্তি
পশেছে জীবনমূলে,

এই ছুরী দিয়ে সে মুরতিখানি
কেটে কেটে লও তুলে।
তারি সাথে হায় আঁধারে মিশাবে
নিখিলের শোভা যত—
লক্ষ্মী যাবেন, তাঁরি সাথে যাবে
জগৎ ছায়ার মতো।

যাক, তাই যাক, পারি নে ভাসিতে
কেবলি মুরতিস্রোতে!
লহো মোরে তুলি আলোকমগন
মুরতিভুবন হতে।
আঁখি গেলে মোর সীমা চলে যাবে—
একাকী অসীম ভরা,
আমারি আঁধারে মিলাবে গগন
মিলাবে সকল ধরা।
আলোহীন সেই বিশাল হৃদয়ে
আমার বিজন বাস,
প্রলয়-আসন জুড়িয়া বসিয়া
রব আমি বারো মাস।

থামো একটুকু, বুঝিতে পারি নে,
ভালো করে ভেবে দেখি—
বিশ্ববিলোপ বিমল আঁধার
চিরকাল রবে সে কি?
ক্রমে ধীরে ধীরে নিবিড় তিমিরে
ফুটিয়া উঠিবে না কি
পবিত্র মুখ, মধুর মূর্তি,
স্নিগ্ধ আনত আঁখি?

এখন যেমন রয়েছ দাঁড়ায়ে
দেবীর প্রতিমা-সম,
স্থিরগম্ভীর করুণ নয়নে
চাহিছ হৃদয়ে মম,
বাতায়ন হতে সন্ধ্যাকিরণ
পড়েছে ললাটে এসে,
মেঘের আলোক লভিছে বিরাম
নিবিড়তিমির কেশে,
শান্তিরূপিণী এ মুরতি তব
অতি অপূর্ব সাজে
অনলরেখায় ফুটিয়া উঠিবে
অনন্তনিশি-মাঝে।
চৌদিকে তব নূতন জগৎ
আপনি সৃজিত হবে,
এ সন্ধ্যাশোভা তোমারে ঘিরিয়া
চিরকাল জেগে রবে।
এই বাতায়ন, ওই চাঁপা গাছ,
দূর সরযূর রেখা
নিশিদিনহীন অন্ধ হৃদয়ে
চিরদিন যাবে দেখা।
সে নব জগতে কালস্রোত নাই,
পরিবর্তন নাহি—
আজি এই দিন অনন্ত হয়ে
চিরদিন রবে চাহি।

তবে তাই হোক, হোয়ো না বিমুখ,
দেবী, তাহে কিবা ক্ষতি—
হৃদয়-আকাশে থাক্-না জাগিয়া
দেহহীন তব জ্যোতি।

বাসনামলিন আঁখিকলঙ্ক
ছায়া ফেলিবে না তায়,
আঁধার হৃদয়-নীল-উৎপল
চিরদিন রবে পায়।
তোমাতে হেরিব আমার দেবতা,
হেরিব আমার হরি—
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব
অনন্ত বিভাবরী।

২২।২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

নিন্দুকের প্রতি নিবেদন

হউক ধন্য তোমার যশ,
লেখনী ধন্য হোক,
তোমার প্রতিভা উজ্জ্বল হয়ে
জাগাক সপ্তলোক।
যদি পথে তব দাঁড়াইয়া থাকি
আমি ছেড়ে দিব ঠাঁই—
কেন হীন ঘৃণা, ক্ষুদ্র এ দ্বেষ,
বিদ্রূপ কেন ভাই?
আমার এ লেখা কারো ভালো লাগে
তাহা কি আমার দোষ?
কেহ কবি বলে (কেহ বা বলে না)—
কেন তাহে তব রোষ?

কত প্রাণপণ, দগ্ধ হৃদয়,
বিনিদ্র বিভাবরী,
জান কি, বন্ধু, উঠেছিল গীত
কত ব্যথা ভেদ করি?

রাঙা ফুল হয়ে উঠিছে ফুটিয়া
হৃদয়শোণিতপাত,
অশ্রু ঝলিছে শিশিরের মতো
পোহাইয়ে দুখরাত।
উঠিতেছে কত কণ্টকলতা,
ফুলে পল্লবে ঢাকে—
গভীর গোপন বেদনা-মাঝারে
শিকড় আঁকড়ি থাকে।
জীবনে যে সাধ হয়েছে বিফল
সে সাধ ফুটিছে গানে—
মরীচিকা রচি মিছে সে তৃপ্তি,
তৃষ্ণা কাঁদিছে প্রাণে।
এনেছি তুলিয়া পথের প্রান্তে
মর্মকুসুম মম—
আসিছে পান্থ, যেতেছে লইয়া
স্মরণচিহ্নসম।
কোনো ফুল যাবে দু দিনে ঝরিয়া,
কোনো ফুল বেঁচে রবে—
কোনো ছোটো ফুল আজিকার কথা
কালিকার কানে কবে।

তুমি কেন, ভাই, বিমুখ এমন—
নয়নে কঠোর হাসি।
দূর হতে যেন ফুঁষিছ সবেগে
উপেক্ষা রাশি রাশি—
কঠিন বচন জরিছে অধরে
উপহাস হলাহলে,
লেখনীর মুখে করিতে দগ্ধ
ঘৃণার অনল জলে।

ভালোবেসে যাহা ফুটেছে পরানে
সবার লাগিবে ভালো,
যে জ্যোতি হরিছে আমার আঁধার
সবারে দিবে সে আলো—
অন্তরমাঝে সবাই সমান,
বাহিরে প্রভেদ ভবে,
একের বেদনা করুণাপ্রবাহে
সান্ত্বনা দিবে সবে।
এই মনে করে ভালোবেসে আমি
দিয়েছিনু উপহার—
ভালো নাহি লাগে ফেলে যাবে চলে,
কিসের ভাবনা তার!

তোমার দেবার যদি কিছু থাকে
তুমিও দাও-না এনে।
প্রেম দিলে সবে নিকটে আসিবে
তোমারে আপন জেনে।
কিন্তু জানিয়ো আলোক কখনো
থাকে না তো ছায়া বিনা,
ঘৃণার টানেও কেহ বা আসিবে,
তুমি করিয়ো না ঘৃণা!
এতই কোমল মানবের মন
এমনি পরের বশ,
নিষ্ঠুর বাণে সে প্রাণ ব্যথিতে
কিছুই নাহিক যশ।
তীক্ষ্ণ হাসিতে বাহিরে শোণিত,
বচনে অশ্রু উঠে,
নয়নকোণের চাহনি-ছুরীতে
মর্মতন্তু টুটে।

সান্ত্বনা দেওয়া নহে তো সহজ,
দিতে হয় সারা প্রাণ,
মানবমনের অনল নিভাতে
আপনারে বলিদান।
ঘৃণা জ্ব'লে মরে আপনার বিষে,
রহে না সে চিরদিন—
অমর হইতে চাহ যদি, জেনো
প্রেম সে মরণহীন।
তুমিও রবে না, আমিও রব না,
দু দিনের দেখা ভবে—
প্রাণ খুলে প্রেম দিতে পারো যদি
তাহা চিরদিন রবে।

দুর্বল মোরা, কত ভুল করি,
অপূর্ণ সব কাজ।
নেহারি আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতা
আপনি যে পাই লাজ।
তা বলে যা পারি তাও করিব না?
নিষ্ফল হব ভবে?
প্রেমফুল ফোটে, ছোটো হল বলে
দিব না কি তাহা সবে?
হয়তো এ ফুল সুন্দর নয়,
ধরেছি সবার আগে—
চলিতে চলিতে আঁখির পলকে
ভুলে কারো ভালো লাগে।
যদি ভুল হয় ক' দিনের ভুল!
দু দিনে ভাঙিবে তবে।
তোমার এমন শাণিত বচন
সেই কি অমর হবে?

২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

কবির প্রতি নিবেদন

হেথা কেন দাঁড়ায়েছ, কবি,
যেন কাষ্ঠপুত্তলছবি ?
চারি দিকে লোকজন চলিতেছে সারাখন,
আকাশে উঠিছে খর রবি।

কোথা তব বিজন ভবন,
কোথা তব মানসভুবন ?
তোমারে ঘেরিয়া ফেলি কোথা সেই করে কেলি
কল্পনা, মুক্ত পবন ?

নিখিলের আনন্দধাম
কোথা সেই গভীর বিরাম ?
জগতের গীতধার কেমনে শুনিবে আর ?
শুনিতেছ আপনারই নাম।

আকাশের পাখি তুমি ছিলে,
ধরণীতে কেন ধরা দিলে ?
বলে সবে বাহা-বাহা, সকলে পড়ায় যাহা
তুমি তাই পড়িতে শিখিলে !

প্রভাতের আলোকের সনে
অনাবৃত প্রভাতগগনে
বহিয়া নূতন প্রাণ ঝরিয়া পড়ে না গান
ঊর্ধ্বনয়ন এ ভুবনে।

পথ হতে শত কলরবে
'গাও গাও' বলিতেছে সবে।
ভাবিতে সময় নাই— গান চাই, গান চাই,
থামিতে চাহিছে প্রাণ যবে।

থামিলে চলিয়া যাবে সবে,
দেখিতে কেমনতর হবে !
উচ্চ আসনে লীন প্রাণহীন গানহীন
পুতলির মতো বসে রবে।

শ্রান্তি লুকাতে চাও ত্রাসে,
কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে আসে।
শুনে যারা যায় চলে দু-চারিটা কথা ব'লে
তারা কি তোমায় ভালোবাসে ?

কতমতো পরিয়া মুখোষ
মাগিছ সবার পরিতোষ।
মিছে হাসি আনো দাঁতে, মিছে জল আঁখিপাতে,
তবু তারা ধরে কত দোষ।

মন্দ কহিছে কেহ ব'সে,
কেহ বা নিন্দা তব ঘোষে।
তাই নিয়ে অবিরত তর্ক করিছ কত,
জ্বলিয়া মরিছ মিছে রোষে।

মূর্খ, দম্ভ-ভরা দেহ,
তোমারে করিয়া যায় স্নেহ।
হাত বুলাইয়া পিঠে কথা বলে মিঠে মিঠে,
শাবাশ-শাবাশ বলে কেহ।

হায় কবি, এত দেশ ঘুরে
আসিয়া পড়েছ কোন্ দূরে !
এ যে কোলাহলমরু— নাই ছায়া, নাই তরু,
যশের কিরণে মরো পুড়ে।

*

দেখো, হোথা নদী-পর্বত,
অবারিত অসীমের পথ।
প্রকৃতি শান্তমুখে ছুটায় গগনবুকে
গ্রহতারাময় তার রথ।

সবাই আপন কাজে ধায়,
পাশে কেহ ফিরিয়া না চায়।
ফুটে চিররূপরাশি চিরমধুময় হাসি,
আপনারে দেখিতে না পায়।

হোথা দেখো একেলা আপনি
আকাশের তারা গণি গণি
ঘোর নিশীথের মাঝে কে জাগে আপন কাজে,
সেথায় পশে না কলধ্বনি।

দেখো হোথা নূতন জগৎ—
ওই কারা আত্মহারাবৎ
যশ-অপযশ-বাণী কোনো কিছু নাহি মানি
রচিছে সুদূর ভবিষ্যৎ।

ওই দেখো না পুরিতে আশ
মরণ করিল কারে গ্রাস।
নিশি না হইতে সারা খসিয়া পড়িল তারা,
রাখিয়া গেল না ইতিহাস।

ওই কারা গিরির মতন
আপনাতে আপনি বিজন—
হৃদয়ের স্রোত উঠি গোপন আলয় টুটি
দূর দূর করিছে মগন।

ওই কারা বসে আছে দূরে
কল্পনা-উদয়াচল-পুরে—
অরুণপ্রকাশ-প্রায় আকাশ ভরিয়া যায়
প্রতিদিন নব নব সুরে।

হোথা উঠে নবীন তপন,
হোথা হতে বহিছে পবন।
হোথা চির ভালোবাসা— নব গান, নব আশা—
অসীম বিরামনিকেতন।
হোথা মানবের জয় উঠিছে জগৎময়,
ওইখানে মিলিয়াছে নরনারায়ণ।

হেথা, কবি, তোমারে .ক সাজে
ধূলি আর কলরোল -মাঝে?

২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

পরিত্যক্ত

বন্ধু,
মনে আছে সেই প্রথম বয়স,
নূতন বঙ্গভাষা
তোমাদের মুখে জীবন লভিছে
বহিয়া নূতন আশা।
নিমেষে নিমেষে আলোকরশ্মি
অধিক জাগিয়া উঠে,
বঙ্গহৃদয় উন্মীলি যেন
রক্তকমল ফুটে।

প্রতিদিন যেন পূর্বগগনে
চাহি রহিতাম একা,
কখন ফুটিবে তোমাদের ওই
লেখনী-অরুণ-লেখা।
তোমাদের ওই প্রভাত-আলোক
প্রাচীন তিমির নাশি
নবজাগ্রত নয়নে আনিবে
নূতন জগৎরাশি।

একদা জাগিনু, সহসা দেখিনু
প্রাণমন আপনার—
হৃদয়ের মাঝে জীবন জাগিছে
পরশ লভিনু তার।
ধন্য হইল মানবজনম,
ধন্য তরুণ প্রাণ—
মহৎ আশায় বাড়িল হৃদয়,
জাগিল হর্ষগান।
দাঁড়ায়ে বিশাল ধরণীর তলে
ঘুচে গেল ভয় লাজ,
বুঝিতে পারিনু এ জগৎমাঝে
আমারও রয়েছে কাজ।
স্বদেশের কাছে দাঁড়ায়ে প্রভাতে
কহিলাম জোড়করে,
'এই লহ, মাতঃ, এ চিরজীবন
সঁপিনু তোমারি তরে।'

বন্ধু, এ দীন হয়েছে বাহির
তোমাদেরই কথা শুনে।
সেইদিন হতে কণ্টকপথে
চলিয়াছি দিন গুনে।

পদে পদে জাগে নিন্দা ও ঘৃণা
ক্ষুদ্র অত্যাচার,
একে একে সবে পর হয়ে যায়
ছিল যারা আপনার।
ধ্রুবতারা-পানে রাখিয়া নয়ন
চলিয়াছি পথ ধরি,
সত্য বলিয়া জানিয়াছি যাহা
তাহাই পালন করি।

কোথা গেল সেই প্রভাতের গান,
কোথা গেল সেই আশা!
আজিকে, বন্ধু, তোমাদের মুখে
এ কেমনতর ভাষা!
আজি বলিতেছ, 'বসে থাকো, বাপু,
ছিল যাহা তাই ভালো।
যা হবার তাহা আপনি হইবে,
কাজ কী এতই আলো!'
কলম মুছিয়া তুলিয়া রেখেছ,
বন্ধ করেছ গান,
সহসা সবাই প্রাচীন হয়েছ
নিতান্ত সাবধান।
আনন্দে যারা চলিতে চাহিছে
ছিঁড়ি অসত্যপাশ,
ঘর হতে বসি করিছ তাদের
উপহাস পরিহাস।
এত দূরে এনে ফিরিয়া দাঁড়ায়ে
হাসিছ নিঠুর হাসি,
চিরজীবনের প্রিয়তম ব্রত
চাহিছ ফেলিতে নাশি।

তোমরা আনিয়া প্রাণের প্রবাহ
ভেঙেছ মাটির আল,
তোমরা আবার আনিছ বঙ্গে
উজান স্রোতের কাল।
নিজের জীবন মিশায়ে যাহারে
আপনি তুলেছ গড়ি
হাসিয়া হাসিয়া আজিকে তাহারে
ভাঙিছ কেমন করি!
তবে সেই ভালো, কাজ নেই তবে,
তবে ফিরে যাওয়া যাক—
গৃহকোণে এই জীবন-আবেগ
করি বসে পরিপাক!
সানাই বাজিয়ে ঘরে নিয়ে আসি
আট বরষের বধূ,
শৈশবকুঁড়ি ছিঁড়িয়া বাহির
করি যৌবনমধু!
ফুটন্ত নবজীবনের 'পরে
চাপায়ে শাস্ত্রভার
জীর্ণ যুগের ধূলিসাথে তারে
করে দিই একাকার!

বন্ধু, এ তব বিফল চেষ্টা,
আর কি ফিরিতে পারি?
শিখরগুহায় আর ফিরে যায়
নদীর প্রবল বারি?
জীবনের স্বাদ পেয়েছি যখন,
চলেছি যখন কাজে,
কেমনে আবার করিব প্রবেশ
মৃত বরষের মাঝে?

সে নবীন আশা নাইকো যদিও
তবু যাব এই পথে,
পাব না শুনিতে আশিস্‌-বচন
তোমাদের মুখ হতে।
তোমাদের ওই হৃদয় হইতে
নূতন পরান আনি
প্রতি পলে পলে আসিবে না আর
সেই আশ্বাসবাণী।
শত হৃদয়ের উৎসাহ মিলি
টানিয়া লবে না মোরে,
আপনার বলে চলিতে হইবে
আপনার পথ ক'রে।
আকাশে চাহিব, হায়, কোথা সেই
পুরাতন শুকতারা!
তোমাদের মুখ ভ্রূকুটিকুটিল,
নয়ন আলোকহারা।
মাঝে মাঝে শুধু শুনিতে পাইব
হা-হা-হা অট্টহাসি,
শ্রান্ত হৃদয়ে আঘাত করিবে
নিঠুর বচন আসি।
ভয় নাই যার কী করিবে তার
এই প্রতিকূল স্রোতে!
তোমারি শিক্ষা করিবে রক্ষা
তোমারি বাক্য হতে।

২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

ভৈরবী গান

ওগো, কে তুমি বসিয়া উদাসমুরতি
বিষাদশান্ত শোভাতে!
ওই ভৈরবী আর গেয়ো নাকো এই
প্রভাতে—
মোর গৃহছাড়া এই পথিক-পরান
তরুণ হৃদয় লোভাতে।

ওই মন-উদাসীন ওই আশাহীন
ওই ভাষাহীন কাকলি
দেয় ব্যাকুল পরশে সকল জীবন
বিকলি।
দেয় চরণে বাঁধিয়া প্রেমবাহু-ঘেরা
অশ্রুকোমল শিকলি।
হায়, মিছে মনে হয় জীবনের ব্রত,
মিছে মনে হয় সকলি।

যারে ফেলিয়া এসেছি, মনে করি, তারে
ফিরে দেখে আসি শেষ বার।
ওই কাঁদিছে সে যেন এলায়ে আকুল
কেশভার।
যারা গৃহছায়ে বসি সজলনয়ন
মুখ মনে পড়ে সে সবার।

এই সংকটময় কর্মজীবন
মনে হয় মরু সাহারা,
দূরে মায়াময় পুরে দিতেছে দৈত্য
পাহারা।

তবে ফিরে যাওয়া ভালো তাহাদের পাশে
পথ চেয়ে আছে যাহারা।

সেই ছায়াতে বসিয়া সারা দিনমান
তরুমর্মর পবনে,
সেই মুকুল-আকুল বকুলকুঞ্জ-
ভবনে,
সেই কুহুকুহরিত বিরহরোদন
থেকে থেকে পশে শ্রবণে।

সেই চিরকলতান উদার গঙ্গা
বহিছে আঁধারে আলোকে,
সেই তীরে চিরদিন খেলিছে বালিকা-
বালকে
ধীরে সারা দেহ যেন মুদিয়া আসিছে
স্বপ্নপাখির পালকে।

হায়, অতৃপ্ত যত মহৎ বাসনা
গোপনমর্মদাহিনী,
এই আপনা-মাঝারে শুষ্ক জীবন-
বাহিনী!
ওই ভৈরবী দিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া
রচিব নিরাশাকাহিনী।

সদা করুণ কণ্ঠ কাঁদিয়া গাহিবে,—
'হল না, কিছুই হবে না।
এই মায়াময় ভবে চিরদিন কিছু
রবে না।

কেহ জীবনের যত গুরুভার ব্রত
ধূলি হতে তুলি লবে না।

'এই সংশয়মাঝে কোন্ পথে যাই,
কার তরে মরি খাটিয়া!
আমি কার মিছে দুখে মরিতেছি বুক
ফাটিয়া!
ভবে সত্য মিথ্যা কে করেছে ভাগ,
কে রেখেছে মত আঁটিয়া!

'যদি কাজ নিতে হয়, কত কাজ আছে,
একা কি পারিব করিতে!
কাঁদে শিশিরবিন্দু জগতের তৃষা
হরিতে!
কেন অকূল সাগরে জীবন সঁপিব
একেলা জীর্ণ তরীতে!

'শেষে দেখিব— পড়িল সুখযৌবন
ফুলের মতন খসিয়া,
হায় বসন্তবায়ু মিছে চলে গেল
শ্বসিয়া,
সেই যেখানে জগৎ ছিল এক কালে
সেইখানে আছে বসিয়া!

'শুধু আমারি জীবন মরিল ঝুরিয়া
চিরজীবনের তিয়াষে।
এই দগ্ধ হৃদয় এত দিন আছে
কী আশে!

সেই ডাগর নয়ন, সরস অধর
গেল চলি কোথা দিয়া সে !'

ওগো, থামো, যারে তুমি বিদায় দিয়েছ
তারে আর ফিরে চেয়ো না।
ওই অশ্রুসজল ভৈরবী আর
গেয়ো না।
আজি প্রথম প্রভাতে চলিবার পথ
নয়নবাষ্পে ছেয়ো না।

ওই কুহকরাগিণী এখনি কেন গো
পথিকের প্রাণ বিবশে !
পথে এখনো উঠিবে প্রখর তপন
দিবসে।
পথে রাক্ষসী সেই তিমিররজনী
না জানি কোথায় নিবসে !

থামো, শুধু একবার ডাকি নাম তাঁর
নবীন জীবন ভরিয়া—
যাব যাঁর বল পেয়ে সংসারপথ
তরিয়া,
যত মানবের গুরু মহৎজনের
চরণচিহ্ন ধরিয়া।

যাও তাহাদের কাছে ঘরে যারা আছে
পাষাণে পরান বাঁধিয়া,
গাও তাদের জীবনে তাদের বেদনে
কাঁদিয়া।

তারা পʼড়ে ভূমিতলে ভাসে আঁখিজলে
নিজ সাধে বাদ সাধিয়া।

হায়, উঠিতে চাহিছে পরান, তবুও
পারে না তাহারা উঠিতে।
তারা পারে না ললিতলতার বাঁধন
টুটিতে।
তারা পথ জানিয়াছে, দিবানিশি তবু
পথপাশে রহে লুটিতে!

তারা অলস বেদন করিবে যাপন
অলস রাগিণী গাহিয়া,
রবে দূর আলো-পানে আবিষ্টপ্রাণে
চাহিয়া।
ওই মধুর রোদনে ভেসে যাবে তারা
দিবসরজনী বাহিয়া।

সেই আপনার গানে আপনি গলিয়া
আপনারে তারা ভুলাবে,
স্নেহে আপনার দেহে সকরুণ কর
বুলাবে।
সুখে কোমল শয়নে রাখিয়া জীবন
ঘুমের দুলায় দুলাবে।

ওগো, এর চেয়ে ভালো প্রখর দহন,
নিঠুর আঘাত চরণে।
যাব আজীবন কাল পাষাণকঠিন
সরণে।
যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ,
সুখ আছে সেই মরণে।

২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

ধর্মপ্রচার

কলিকাতার এক বাসায়

ওই শোনো ভাই বিশু,
পথে শুনি 'জয় যিশু' !
কেমনে এ নাম করিব সহ্য
আমরা আর্যশিশু !

কূর্ম, কল্কি, স্কন্দ
এখন করো তো বন্ধ ।
যদি যিশু ভজে রবে না ভারতে
পুরাণের নামগন্ধ ।

ওই দেখো ভাই, শুনি—
যাজ্ঞবল্ক্য মুনি,
বিষ্ণু, হারীত, নারদ, অত্রি
কেঁদে হল খুনোখুনি !

কোথায় রহিল কর্ম,
কোথা সনাতন ধর্ম !
সম্প্রতি তবু কিছু শোনা যায়
বেদ-পুরাণের মর্ম !

ওঠো, ওঠো ভাই, জাগো,
মনে মনে খুব রাগো !
আর্যশাস্ত্র উদ্ধার করি,
কোমর বাঁধিয়া লাগো !

কাছাকোঁচা লও আঁটি,
হাতে তুলে লও লাঠি।
হিন্দুধর্ম করিব রক্ষা,
খৃস্টানি হবে মাটি।

কোথা গেল ভাই ভজা
হিন্দুধর্মধ্বজা ?
যণ্ডা ছিল সে, সে যদি থাকিত
আজ হত দুশো মজা !

এস মোনো, এস ভুতো,
প'রে লও বুট জুতো।
পাদ্রি বেটার পা মাড়িয়ে দিয়ো
পাও যদি কোনো ছুতো !

আগে দেব দুয়ো তালি,
তার পরে দেব গালি।
কিছু না বলিলে পড়িব তখন
বিশ-পঁচিশ বাঙালি।

তুমি আগে যেয়ো তেড়ে,
আমি নেব টুপি কেড়ে।
গোলেমালে শেষে পাঁচজনে প'ড়ে
মাটিতে ফেলিয়ো পেড়ে।

কাঁচি দিয়ে তার চুল
কেটে দেব বিলকুল।
কোটের বোতাম আগাগোড়া তার
করে দেব নির্মূল।

তবে উঠ, সবে উঠ—
বাঁধো কটি, আঁটো মুঠো
দেখো, ভাই, যেন ভুলো না, অমনি
সাথে নিয়ো লাঠি ছুটো !

দলপতির শিষ ও গান :

প্রাণসই রে,
মনোজ্বালা কারে কই রে !

কোমরে চাদর বাঁধিয়া, লাঠি হস্তে, মহোৎসাহে সকলের প্রস্থান। পথে বিশু হারু মোনো ভুতোর সমাগম। গেরুয়াবস্ত্রাচ্ছাদিত অনাবৃতপদ মুক্তিফৌজের প্রচারক :

ধন্য হউক তোমার প্রেম,
ধন্য তোমার নাম,
ভুবনমাঝারে হউক উদয়
নূতন জেরুজিলাম।
ধরণী হইতে যাক ঘৃণাদ্বেষ,
নিঠুরতা দূর হোক—
মুছে দাও, প্রভু, মানবের আঁখি,
ঘুচাও মরণশোক।
তৃষিত যাহারা, জীবনের বারি
করো তাহাদের দান !
দয়াময় যিশু, তোমার দয়ায়
পাপীজনে করো ত্রাণ।

‘ওরে ভাই বিশু, এ কে,
জুতো কোথা এল রেখে !
গোরা বটে, তবু হতেছে ভরসা
গেরুয়া বসন দেখে।’

'হারু, তবে তুই এগো!
বল্— বাছা, তুমি কে গো!
কিচিমিচি রাখো, খিদে পেয়েছে কি?
দুটো কলা এনে দে গো!'

বধির নিদয় কঠিনহৃদয়
তারে প্রভু দাও কোল!
অক্ষম আমি কি করিতে পারি—
'হরিবোল হরিবোল!'

'আরে, রেখে দাও খৃস্ট!
এখনি দেখাও পৃষ্ঠ!
দাঁড়ে উঠে চড়ো, পড়ো বাবা পড়ো
হরে হরে হরে কৃষ্ট!'

তুমি যা সয়েছ তাহাই স্মরিয়া
সহিব সকল ক্লেশ,
ক্রুস গুরুভার করিব বহন—
'বেশ, বাবা, বেশ বেশ!'

দাও ব্যথা, যদি কারো মুছে পাপ
আমার নয়ননীরে।
প্রাণ দিব, যদি এ জীবন দিলে
পাপীর জীবন ফিরে।
আপনার জন- আপনার দেশ-
হয়েছি সর্ব- ত্যাগী।
হৃদয়ের প্রেম সব ছেড়ে যায়
তোমার প্রেমের লাগি।

সুখ, সভ্যতা, রমণীর প্রেম,
বন্ধুর কোলাকুলি—
ফেলি দিয়া পথে তব মহাব্রত
মাথায় লয়েছি তুলি।
এখনো তাদের ভুলিতে পারি নে,
মাঝে মাঝে জাগে প্রাণে—
চিরজীবনের সুখবন্ধন
সেই গৃহমাঝে টানে।
তখন তোমার রক্তসিক্ত
ওই মুখপানে চাহি,
ও প্রেমের কাছে স্বদেশ বিদেশ
আপনা ও পর নাহি।
ওই প্রেম তুমি করো বিতরণ
আমার হৃদয় দিয়ে,
বিষ দিতে যারা এসেছে তাহারা
ঘরে যাক সুধা নিয়ে।
পাপ লয়ে প্রাণে এসেছিল যারা
তাহারা আসুক বুকে—
পড়ুক প্রেমের মধুর আলোক
ভ্রূকুটিকুটিল মুখে!

'আর প্রাণে নাহি সহে,
আর্যরক্ত দহে!'
'ওহে হারু, ওহে মাধু, লাঠি নিয়ে
ঘা-কতক দাও তো হে!'

'যদি চাস তুই ইষ্ট
বল্ মুখে বল্ কৃষ্ট।'

ধন্য হউক তোমার নাম
দয়াময় যিশুখৃস্ট!

*

'তবেরে ! লাগাও লাঠি
কোমরে কাপড় আঁটি।'
'হিন্দুধর্ম হউক রক্ষা
খৃস্টানি হোক মাটি।'

প্রচারকের মাথায় লাঠি-প্রহার। মাথা ফাটিয়া রক্তপাত। রক্ত মুছিয়া :

প্রভু তোমাদের করুন কুশল,
দিন তিনি শুভমতি।
আমি তাঁর দীন অধম ভৃত্য,
তিনি জগতের পতি।

'ওরে শিবু, ওরে হারু,
ওরে ননি, ওরে চারু,
তামাশা দেখার এই কি সময়—
প্রাণে ভয় নেই কারু !'

'পুলিস আসিছে গুঁতা উচাইয়া,
এইবেলা দাও দৌড় !'
'ধন্য হইল আর্য ধর্ম,
ধন্য হইল গৌড় !'

ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন। বাসায় ফিরিয়া :

সাহেব মেরেছি ! বঙ্গবাসীর
কলঙ্ক গেছে ঘুচি।
মেজবউ কোথা, ডেকে দাও তারে—
কোথা ছোকা, কোথা লুচি !
এখনো আমার তপ্ত রক্ত
উঠিতেছে উচ্ছ্বসি—
তাড়াতাড়ি আজ লুচি না পাইলে
কী জানি কী ক'রে বসি !

স্বামী ঘরে এল যুদ্ধ সারিয়া
ঘরে নেই লুচি ভাজা !
আর্যনারীর এ কেমন প্রথা,
সমুচিত দিব সাজা।
যাজ্ঞবল্ক্য অত্রি হারীত
জলে গুলে খেলে সবে—
মার্‌ধোর করে হিন্দুধর্ম
রক্ষা করিতে হবে।
কোথা পুরাতন পাতিব্রত্য,
সনাতন লুচি ছোকা—
বৎসরে শুধু সংসারে আসে
একখানি করে খোকা।

৩২ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

এই কবিতায় বর্ণিত ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ

বাসরশয়নে

বর। জীবনে জীবন প্রথম মিলন,
সে সুখের কোথা তুলা নাই।
এসো, সব ভুলে আজি আঁখি তুলে
শুধু দুঁহু দোঁহা মুখ চাই।
মরমে মরমে শরমে ভরমে
জোড়া লাগিয়াছে এক ঠাঁই।
যেন এক মোহে ভুলে আছি দোঁহে,
যেন এক ফুলে মধু খাই।
জনম অবধি বিরহে দগধি
এ পরান হয়ে ছিল ছাই—

তোমার অপার প্রেমপারাবার,
জুড়াইতে আমি এনু তাই।
বলো একবার, 'আমিও তোমার,
তোমা ছাড়া কারে নাহি চাই।'
ওঠ কেন, ওকি, কোথা যাও সখী?

সরোদনে

কনে। আইমার কাছে শুতে যাই!

দু-দিন পরে

বর। কেন, সখী, কোণে কাঁদিছ বসিয়া
চোখে কেন জল পড়ে?
উষা কি তাহার শুকতারা-হারা,
তাই কি শিশির ঝরে?
বসন্ত কি নাই, বনলক্ষ্মী তাই
কাঁদিছে আকুল স্বরে?
উদাসিনী স্মৃতি কাঁদিছে কি বসি
আশার সমাধি-'পরে?
খ'সে-পড়া তারা করিছে কি শোক
নীল আকাশের তরে?
কী লাগি কাঁদিছ?

কনে। পুষি মেনিটিরে
ফেলিয়া এসেছি ঘরে।

অন্দরের বাগানে

বর। কী করিছ বনে শ্যামল শয়নে
আলো করে বসে তরুমূল?
কোমল কপোলে যেন নানা ছলে
উড়ে এসে পড়ে এলোচুল।
পদতল দিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
বহে যায় নদী কুলুকুল্।

সারা দিনমান শুনি সেই গান
তাই বুঝি আঁখি ঢুলুঢুল্।
আঁচল ভরিয়া মরমে মরিয়া
পড়ে আছে বুঝি ঝুরো ফুল?
বুঝি মুখ কার মনে পড়ে, আর
মালা গাঁথিবারে হয় ভুল?
কার কথা বলি বায়ু পড়ে ঢলি,
কানে দুলাইয়া যায় দুল?
গুন্ গুন্ ছলে কার নাম বলে
চঞ্চল যত অলিকুল?
কানন নিরালা, আঁখি হাসি-ঢালা,
মন সুখস্মৃতি-সমাকুল—
কী করিছ বনে কুঞ্জভবনে?

কনে। খেতেছি বসিয়া টোপাকুল।

বর। আসিয়াছি কাছে মনে যাহা আছে
বলিবারে চাহি সমুদয়।
আপনার ভার বহিবারে আর
পারে না ব্যাকুল এ হৃদয়।
আজি মোর মন কী জানি কেমন,
বসন্ত আজি মধুময়,
আজি প্রাণ খুলে মালতীমুকুলে
বায়ু করে যায় অনুনয়।
যেন আঁখি দুটি মোর পানে ফুটি
আশা-ভরা দুটি কথা কয়,
ও হৃদয় টুটে যেন প্রেম উঠে
নিয়ে আধো-লাজ আধো-ভয়।
তোমার লাগিয়া পরান জাগিয়া
দিবসরজনী সারা হয়,
কোন্ কাজে তব দিবে তার সব
তারি লাগি যেন চেয়ে রয়।

জগৎ ছানিয়া কী দিব আনিয়া
জীবন যৌবন করি ক্ষয় ?
তোমা তরে, সখী, বলো করিব কী ?
কনে। আরো কুল পাড়ো গোটা ছয়।
বর। তবে যাই সখী, নিরাশাকাতর
শূন্য জীবন নিয়ে।
আমি চলে গেলে এক ফোঁটা জল
পড়িবে কি আঁখি দিয়ে ?
বসন্তবায়ু মায়ানিশ্বাসে
বিরহ জালাবে হিয়ে ?
ঘুমন্তপ্রায় আকাঙ্ক্ষা যত
পরানে উঠিবে জিয়ে ?
বিষাদিনী বসি বিজন বিপিনে
কী করিবে তুমি প্রিয়ে ?
বিরহের বেলা কেমনে কাটিবে ?
কনে। দেব পুতুলের বিয়ে।

গাজিপুর
২৩ আষাঢ় ১৮৮৮

প্রকাশবেদনা

আপন প্রাণের গোপন বাসনা
টুটিয়া দেখাতে চাহি রে—
হৃদয়বেদনা হৃদয়েই থাকে,
ভাষা থেকে যায় বাহিরে।

শুধু কথার উপরে কথা,
নিষ্ফল ব্যাকুলতা।
বুঝিতে বোঝাতে দিন চলে যায়,
ব্যথা থেকে যায় ব্যথা।

মর্মবেদন আপন আবেগে
স্বর হয়ে কেন ফোটে না ?
দীর্ণ হৃদয় আপনি কেন রে
বাঁশি হয়ে বেজে ওঠে না ?

আমি চেয়ে থাকি শুধু মুখে
ক্রন্দনহারা দুখে—
শিরায় শিরায় হাহাকার কেন
ধ্বনিয়া উঠে না বুকে ?

অরণ্য যথা চিরনিশিদিন
শুধু মর্মর স্বনিছে,
অনন্ত কালের বিজন বিরহ
সিন্ধুমাঝারে ধ্বনিছে—

যদি ব্যাকুল ব্যথিত প্রাণ
তেমনি গাহিত গান
চিরজীবনের বাসনা তাহার
হইত মূর্তিমান !

তীরের মতন পিপাসিত বেগে
ক্রন্দনধ্বনি ছুটিয়া
হৃদয় হইতে হৃদয়ে পশিত,
মর্মে রহিত ফুটিয়া ।

আজ মিছে এ কথার মালা,
মিছে এ অশ্রু ঢালা !
কিছু নেই পোড়া ধরণীমাঝারে
বোঝাতে মর্মজ্বালা !

সোলাপুর
৬ বৈশাখ ১৮৮৯

মায়া

বৃথা এ বিড়ম্বনা !
কিসের লাগিয়া এতই তিয়াষ,
কেন এত যন্ত্রণা !

ছায়ার মতন ভেসে চলে যায়
দরশন পরশন—
এই যদি পাই এই ভুলে যাই,
তৃপ্তি না মানে মন।
কত বার আসে, কত বার ভাসে,
মিশে যায় কত বার—
পেলেও যেমন না পেলে তেমন
শুধু থাকে হাহাকার।
সন্ধ্যাপবনে কুঞ্জভবনে
নির্জন নদীতীরে
ছায়ার মতন হৃদয়বেদন
ছায়ার লাগিয়া ফিরে।

কত দেখাশোনা কত আনাগোনা
চারি দিকে অবিরত,
শুধু তারি মাঝে একটি কে আছে
তারি তরে ব্যথা কত !
চিরদিন ধ'রে এমনি চলিছে,
যুগ-যুগ গেছে চ'লে !
মানবের মেলা করে গেছে খেলা
এই ধরণীর কোলে !
এই ছায়া লাগি কত নিশি জাগি
কাঁদায়েছে কাঁদিয়াছে—

মহাসুখ মানি প্রিয়তনুখানি
বাহুপাশে বাঁধিয়াছে !
নিশিদিন কত ভেবেছে সতত
নিয়ে কার হাসিকথা !
কোথা তারা আজ— সুখ দুখ লাজ,
কোথা তাহাদের ব্যথা ?
কোথা সেদিনের অতুলরূপসী
হৃদয়প্রেয়সীচয় ?
নিখিলের প্রাণে ছিল যে জাগিয়া,
আজ সে স্বপনও নয় !
ছিল সে নয়নে অধরের কোণে
জীবন মরণ কত—
বিকচ সরস তনুর পরশ
কোমল প্রেমের মতো।
এত সুখ দুখ তীব্র কামনা
জাগরণ হাহুতাশ
যে রূপজ্যোতিরে সদা ছিল ঘিরে
কোথা তার ইতিহাস ?
যমুনার ঢেউ সন্ধ্যারঙিন
মেঘখানি ভালোবাসে—
এও চলে যায়, সেও চলে যায়,
অদৃষ্ট বসে হাসে।

রোজ্‌ব্যাঙ্ক্‌। খিরকি
১ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৯

বর্ষার দিনে

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায় !

এমন মেঘস্বরে বাদল-ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়।

সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জন চারি ধার।
দুজনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখী,
আকাশে জল ঝরে অনিবার।
জগতে কেহ যেন নাহি আর।

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব।
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব।
আঁধারে মিশে গেছে আর সব।

বলিতে বাজিবে না নিজ কানে,
চমক লাগিবে না নিজ প্রাণে।
সে কথা আঁখিনীরে মিশিয়া যাবে ধীরে
এ ভরা বাদলের মাঝখানে।
সে কথা মিশে যাবে দুটি প্রাণে।

তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার
নামাতে পারি যদি মনোভার?
শ্রাবণবরিষনে একদা গৃহকোণে
দু কথা বলি যদি কাছে তার
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার?

আছে তো তার পরে বারো মাস,
উঠিবে কত কথা কত হাস।

আসিবে কত লোক কত-না দুখশোক,
সে কথা কোন্‌খানে পাবে নাশ।
জগৎ চলে যাবে বারো মাস।

ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।
যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়।

রোজ্‌ব্যাঙ্ক্‌। খিরকি
৩ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৯

মেঘের খেলা

স্বপ্ন যদি হ'ত জাগরণ,
সত্য যদি হ'ত কল্পনা,
তবে এ ভালোবাসা হ'ত না হত-আশা
কেবল কবিতার জল্পনা।

মেঘের খেলা-সম হ'ত সব
মধুর মায়াময় ছায়াময়।
কেবল আনাগোনা, নীরবে জানাশোনা,
জগতে কিছু আর কিছু নয়।

কেবল মেলামেশা গগনে,
সুনীল সাগরের পরপারে
সুদূরে ছায়াগিরি তাহারে ঘিরি ঘিরি,
শ্যামল ধরণীর ধারে ধারে।

কখনো ধীরে ধীরে ভেসে যায়,
কখনো মিশে যায় ভাঙিয়া—

কখনো ঘননীল বিজুলি-ঝিলিমিল,
কখনো উষারাগে রাঙিয়া।

যেমন প্রাণপণ বাসনা
তেমনি বাধা তার সুকঠিন—
সকলি লঘু হয়ে কোথায় যেত বয়ে,
ছায়ার মতো হত কায়াহীন।

চাঁদের আলো হত সুখহাস,
অশ্রু শরতের বরষণ।
সাক্ষী করি বিধু মিলন হত মৃদু
কেবল প্রাণে প্রাণে পরশন।

শান্তি পেত এই চিরতৃষা
চিত্ত চঞ্চল সকাতর,
প্রেমের থরে থরে বিরাম জাগিত রে—
দুখের ছায়া মাঝে রবিকর।

রোজ্‌ব্যাঙ্ক্। খিরকি
৭ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৯

ধ্যান

নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া
স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া
বরণ করি;
তুমি আছ মোর জীবন-মরণ
হরণ করি।

তোমার পাই নে কূল—

আপনা-মাঝারে আপনার প্রেম
তাহারো পাই নে তুল।
উদয়শিখরে সূর্যের মতো
সমস্ত প্রাণ মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষনিহত
একটি নয়ন-সম—
অগাধ অপার উদাস দৃষ্টি,
নাহিকো তাহার সীমা।
তুমি যেন ওই আকাশ উদার,
আমি যেন ওই অসীম পাথার,
আকুল করেছে মাঝখানে তার
আনন্দপূর্ণিমা।
তুমি প্রশান্ত চিরনিশিদিন,
আমি অশান্ত বিরামবিহীন
চঞ্চল অনিবার—
যত দূর হেরি দিগদিগন্তে
তুমি আমি একাকার।

জোড়াসাঁকো
২৬ শ্রাবণ ১৮৮৯

পূর্বকালে

প্রাণমন দিয়ে ভালোবাসিয়াছে
এত দিন এত লোক,
এত কবি এত গেঁথেছে প্রেমের শ্লোক,
তবু তুমি ভবে চিরগৌরবে
ছিলে না কি একেবারে
হৃদয় সবার করি অধিকার!
তোমা ছাড়া কেহ কারে
বুঝিতে পারি নে ভালো কি বাসিতে পারে!

1889 Aug. 10
জোড়াসাঁকো

নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া
স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া
~~[illegible]~~ বরণ করি।
জীবন মরণ
তুমি আছ মোর ~~জীবনে মরণে~~
~~[illegible]~~ হরণ করি।। —
তোমার পাইনে কূল,
আপনা মাঝারে আপনার প্রেম
তাহারো পাইনে তুল।
সমস্ত প্রাণ মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষ নিহত
একটি নয়ন সম;—
অগাধ, অপার, উদাস দৃষ্টি
নাহিক তাহার সীমা।
তুমি যেন ওই আকাশ উদার,
আমি যেন এই অসীম পাথার,
আকুল করেছে মাঝখানে তার
আনন্দ পূর্ণিমা।
তুমি প্রশান্ত চির নিশিদিন,
আমি অশান্ত বিরাম বিহীন,
চঞ্চল অনিবার, —

স্তব্ধগম্ভীর তুমি অহোরাত্র অসীম [illegible],
[illegible]

"মানসী"র পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

গিয়েছে এসেছে কেঁদেছে হেসেছে
ভালো তো বেসেছে তারা,
আমি তত দিন কোথা ছিনু দলছাড়া ?
ছিনু বুঝি বসে কোন্ এক পাশে
পথপাদপের ছায়,
সৃষ্টিকালের প্রত্যুষ হতে
তোমারি প্রতীক্ষায়—
চেয়ে দেখি কত পথিক চলিয়া যায়।

অনাদি বিরহবেদনা ভেদিয়া
ফুটেছে প্রেমের সুখ
যেমনি আজিকে দেখেছি তোমার মুখ।
সে অসীম ব্যথা অসীম সুখের
হৃদয়ে হৃদয়ে রহে,
তাই তো আমার মিলনের মাঝে
নয়নে সলিল বহে।
এ প্রেম আমার সুখ নহে, দুখ নহে।

জোড়াসাঁকো
২ ভাদ্র ১৮৮৯

অনন্ত প্রেম

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শত রূপে শত বার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছে গীতহার,
কত রূপ ধরে পরেছ গলায়,
নিয়েছ সে উপহার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।

যত শুনি সেই অতীত কাহিনী,
প্রাচীন প্রেমের ব্যথা,
অতিপুরাতন বিরহমিলনকথা,
অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে
দেখা দেয় অবশেষে
কালের তিমিররজনী ভেদিয়া
তোমারি মুরতি এসে,
চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে।

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হতে।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহবিধুর নয়নসলিলে,
মিলনমধুর লাজে—
পুরাতন প্রেম নিত্যনূতন সাজে।

আজি সেই চিরদিবসের প্রেম
অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হয়ে তোমার পায়ের কাছে।
নিখিলের সুখ, নিখিলের দুখ,
নিখিল প্রাণের প্রীতি,
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে
সকল প্রেমের স্মৃতি—
সকল কালের সকল কবির গীতি।

জোড়াসাঁকো
২ ভাদ্র ১৮৮৯

আশঙ্কা

কে জানে এ কি ভালো !
আকাশ-ভরা কিরণধারা
আছিল মোর তপন-তারা,
আজিকে শুধু একেলা তুমি
আমার আঁখি-আলো—
কে জানে এ কি ভালো !

কত-না শোভা, কত-না সুখ,
কত-না ছিল অমিয়-মুখ,
নিত্য-নব পুষ্পরাশি
ফুটিত মোর দ্বারে—
ক্ষুদ্র আশা ক্ষুদ্র স্নেহ
মনের ছিল শতেক গেহ,
আকাশ ছিল, ধরণী ছিল
আমার চারি ধারে—
কোথায় তারা, সকলে আজি
তোমাতেই লুকালো।
কে জানে এ কি ভালো !

কম্পিত এ হৃদয়খানি
তোমার কাছে তাই।
দিবসনিশি জাগিয়া আছি,
নয়নে ঘুম নাই।
সকল গান সকল প্রাণ
তোমারে আমি করেছি দান—
তোমারে ছেড়ে বিশ্বে মোর
তিলেক নাহি ঠাঁই।

সকল পেয়ে তবুও যদি
তৃপ্তি নাহি মেলে,
তবুও যদি চলিয়া যাও
আমারে পাছে ফেলে,
নিমেষে সব শূন্য হবে
তোমারি এই আসন ভবে,
চিহ্নসম কেবল রবে
মৃত্যুরেখা কালো।
কে জানে এ কি ভালো!

জোড়াসাঁকো
১৪ ভাদ্র ১৮৮৯

ভালো করে বলে যাও

ওগো, ভালো করে বলে যাও।
বাঁশরি বাজায়ে যে কথা জানাতে
সে কথা বুঝায়ে দাও।
যদি না বলিবে কিছু, তবে কেন এসে
মুখপানে শুধু চাও!

আজি অন্ধতামসী নিশি।
মেঘের আড়ালে গগনের তারা
সবগুলি গেছে মিশি।
শুধু বাদলের বায় করি হায়-হায়
আকুলিছে দশ দিশি!

আমি কুন্তল দিব খুলে।
অঞ্চলমাঝে ঢাকিব তোমায়
নিশীথনিবিড় চুলে।

*

দুটি বাহুপাশে বাঁধি নত মুখখানি
বক্ষে লইব তুলে।

সেথা নিভৃতনিলয়সুখে
আপনার মনে বলে যেয়ো কথা
মিলনমুদিত বুকে।
আমি নয়ন মুদিয়া শুনিব কেবল,
চাহিব না মুখে মুখে।

যবে ফুরাবে তোমার কথা
যে যেমন আছি রহিব বসিয়া
চিত্রপুতলি যথা।
শুধু শিয়রে দাঁড়ায়ে করে কানাকানি
মর্মর তরুলতা।

শেষে রজনীর অবসানে
অরুণ উদিলে, ক্ষণেকের তরে
চাব দুঁহু দোঁহা-পানে।
ধীরে ঘরে যাব ফিরে দোঁহে দুই পথে
জলভরা দু'নয়ানে।

তবে ভালো করে বলে যাও।
আঁখিতে বাঁশিতে যে কথা ভাষিতে
সে কথা বুঝায়ে দাও।
শুধু কম্পিত সুরে আধো ভাষা পূরে
কেন এসে গান গাও!

শান্তিনিকেতন
৭ জ্যৈষ্ঠ ১৮৯০

মেঘদূত

কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত! মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘনসংগীতমাঝে পুঞ্জীভূত করে।

সেদিন সে উজ্জয়িনীপ্রাসাদশিখরে
কী না জানি ঘনঘটা, বিদ্যুৎ-উৎসব,
উদ্দামপবনবেগ, গুরুগুরু রব।
গম্ভীর নির্ঘোষ সেই মেঘসংঘর্ষের
জাগায়ে তুলিয়াছিল সহস্র বর্ষের
অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদক্রন্দন
এক দিনে। ছিন্ন করি কালের বন্ধন
সেই দিন ঝরে পড়েছিল অবিরল
চিরদিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রুজল
আর্দ্র করি তোমার উদার শ্লোকরাশি।
সেদিন কি জগতের যতেক প্রবাসী
জোড়হস্তে মেঘপানে শূন্যে তুলি মাথা
গেয়েছিল সমস্বরে বিরহের গাথা
ফিরি প্রিয়গৃহপানে? বন্ধনবিহীন
নবমেঘপক্ষ-'পরে করিয়া আসীন
পাঠাতে চাহিয়াছিল প্রেমের বারতা
অশ্রুবাষ্প-ভরা— দূর বাতায়নে যথা
বিরহিণী ছিল শুয়ে ভূতলশয়নে
মুক্তকেশে, ম্লান বেশে, সজল নয়নে?

তাদের সবার গান তোমার সংগীতে

পাঠায়ে কি দিলে, কবি, দিবসে নিশীথে
দেশে দেশান্তরে, খুঁজি' বিরহিণী প্রিয়া ?
শ্রাবণে জাহ্নবী যথা যায় প্রবাহিয়া
টানি লয়ে দিশ-দিশান্তের বারিধারা
মহাসমুদ্রের মাঝে হতে দিশাহারা।
পাষাণশৃঙ্খলে যথা বন্দী হিমাচল
আষাঢ়ে অনন্ত শূন্যে হেরি মেঘদল
স্বাধীন-গগনচারী, কাতরে নিশ্বাসি
সহস্র কন্দর হতে বাষ্প রাশি রাশি
পাঠায় গগন-পানে ; ধায় তারা ছুটি
উধাও কামনা-সম ; শিখরেতে উঠি
সকলে মিলিয়া শেষে হয় একাকার,
সমস্ত গগনতল করে অধিকার।

সেদিনের পরে গেছে কত শতবার
প্রথম দিবস স্নিগ্ধ নববরষার।
প্রতি বর্ষা দিয়ে গেছে নবীন জীবন
তোমার কাব্যের 'পরে করি বরিষন
নববৃষ্টিবারিধারা, করিয়া বিস্তার
নবঘনস্নিগ্ধচ্ছায়া, করিয়া সঞ্চার
নব নব প্রতিধ্বনি জলদমন্দ্রের,
স্ফীত করি স্রোতোবেগ তোমার ছন্দের
বর্ষাতরঙ্গিণীসম।

কত কাল ধরে
কত সঙ্গীহীন জন, প্রিয়াহীন ঘরে,
বৃষ্টিক্লান্ত বহুদীর্ঘ লুপ্ততারাশশী
আষাঢ়সন্ধ্যায়, ক্ষীণ দীপালোকে বসি
ওই ছন্দ মন্দ মন্দ করি উচ্চারণ
নিমগ্ন করেছে নিজ বিজনবেদন !

সে সবার কণ্ঠস্বর কর্ণে আসে মম
সমুদ্রের তরঙ্গের কলধ্বনি-সম
তব কাব্য হতে।

ভারতের পূর্বশেষে
আমি বসে আজি ; যে শ্যামল বঙ্গদেশে
জয়দেব কবি, আর এক বর্ষাদিনে
দেখেছিলা দিগন্তের তমালবিপিনে
শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর।

আজি অন্ধকার দিবা, বৃষ্টি ঝরঝর্,
দুরন্ত পবন অতি, আক্রমণে তার
অরণ্য উদ্যতবাহু করে হাহাকার।
বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ি মেঘভার
খরতর বক্র হাসি শূন্যে বরষিয়া।
অন্ধকার রুদ্ধগৃহে একেলা বসিয়া
পড়িতেছি মেঘদূত ; গৃহত্যাগী মন
মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে লয়েছে আসন,
উড়িয়াছে দেশদেশান্তরে। কোথা আছে
সানুমান আম্রকূট ; কোথা বহিয়াছে
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্যপদমূলে
উপলব্যথিতগতি ; বেত্রবতীকূলে
পরিণতফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা ;
পথতরুশাখে কোথা গ্রামবিহঙ্গেরা
বর্ষায় বাঁধিছে নীড়, কলরবে ঘিরে
বনস্পতি ; না জানি সে কোন্ নদীতীরে
যূথীবনবিহারিণী বনাঙ্গনা ফিরে,
তপ্ত কপোলের তাপে ক্লান্ত কর্ণোৎপল

মেঘের ছায়ার লাগি হতেছে বিকল ;
ভ্রূবিলাস শেখে নাই কারা সেই নারী
জনপদবধূজন, গগনে নেহারি
ঘনঘটা, ঊর্ধ্বনেত্রে চাহে মেঘপানে,
ঘননীল ছায়া পড়ে সুনীল নয়ানে ;
কোন্ মেঘশ্যামশৈলে মুগ্ধ সিদ্ধাঙ্গনা
স্নিগ্ধ নবঘন হেরি আছিল উন্মনা
শিলাতলে, সহসা আসিতে মহা ঝড়
চকিত চকিত হয়ে ভয়ে জড়সড়
সম্বরি বসন ফিরে গুহাশ্রয় খুঁজি,
বলে, 'মা গো, গিরিশৃঙ্গ উড়াইল বুঝি !'
কোথায় অবন্তিপুরী ; নির্বিন্ধ্যা তটিনী ;
কোথা শিপ্রানদীনীরে হেরে উজ্জয়িনী
স্বমহিমচ্ছায়া— সেথা নিশিদ্বিপ্রহরে
প্রণয়চাঞ্চল্য ভুলি ভবনশিখরে
সুপ্ত পারাবত, শুধু বিরহবিকারে
রমণী বাহির হয় প্রেম-অভিসারে
সূচিভেদ্য অন্ধকারে রাজপথমাঝে
ক্বচিৎ-বিদ্যুতালোকে ; কোথা সে বিরাজে
ব্রহ্মাবর্তে কুরুক্ষেত্র ; কোথা কন্‌খল,
যেথা সেই জহ্নুকন্যা যৌবনচঞ্চল,
গৌরীর ভ্রূকুটিভঙ্গী করি অবহেলা
ফেনপরিহাসচ্ছলে করিতেছে খেলা
লয়ে ধূর্জটির জটা চন্দ্রকরোজ্জ্বল।

এইমতো.মেঘরূপে ফিরি দেশে দেশে
হৃদয় ভাসিয়া চলে, উত্তরিতে শেষে
কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে,
বিরহিণী প্রিয়তমা যেথায় বিরাজে
সৌন্দর্যের আদিসৃষ্টি। সেথা কে পারিত

লয়ে যেতে, তুমি ছাড়া, করি অবারিত
লক্ষ্মীর বিলাসপুরী— অমর ভুবনে !
অনন্ত বসন্তে যেথা নিত্য পুষ্পবনে
নিত্য চন্দ্রালোকে, ইন্দ্রনীলশৈলমূলে
সুবর্ণসরোজফুল্ল সরোবরকূলে
মণিহর্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহবেদনা।
মুক্ত বাতায়ন হতে যায় তারে দেখা
শয্যাপ্রান্তে লীনতনু ক্ষীণ শশীরেখা
পূর্বগগনের মূলে যেন অস্তপ্রায়।
কবি, তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হয়ে যায়
রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা ;
লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক, যেথা
চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া
অনন্তসৌন্দর্যমাঝে একাকী জাগিয়া।

আবার হারায়ে যায়— হেরি চারি ধার
বৃষ্টি পড়ে অবিশ্রাম ; ঘনায়ে আঁধার
আসিছে নির্জননিশা ; প্রান্তরের শেষে
কেঁদে চলিয়াছে বায়ু অকূল-উদ্দেশে।
ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্রনয়ান,
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান ?
কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ ?
সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,
মানসসরসীতীরে বিরহশয়ানে,
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদী গিরি সকলের শেষে !

শান্তিনিকেতন
৭।৮ জ্যৈষ্ঠ ১৮৯০। অপরাহ্ণে। ঘনবর্ষায়

অহল্যার প্রতি

কী স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশি,
অহল্যা, পাষাণরূপে ধরাতলে মিশি,
নির্বাপিত-হোম-অগ্নি তাপসবিহীন
শূন্য তপোবনচ্ছায়ে ? আছিলে বিলীন
বৃহৎ পৃথ্বীর সাথে হয়ে এক-দেহ,
তখন কি জেনেছিলে তার মহাস্নেহ ?
ছিল কি পাষাণতলে অস্পষ্ট চেতনা ?
জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা,
মাতৃধৈর্যে মৌন মূক সুখদুঃখ যত
অনুভব করেছিলে স্বপনের মতো
সুপ্ত আত্মা-মাঝে ? দিবারাত্রি অহরহ
লক্ষ কোটি পরানীর মিলন, কলহ,
আনন্দবিষাদক্ষুব্ধ ক্রন্দন গর্জন,
অযুত পান্থের পদধ্বনি অনুক্ষণ—
পশিত কি অভিশাপ-নিদ্রা ভেদ করে
কর্ণে তোর ? জাগাইয়া রাখিত কি তোরে
নেত্রহীন মূঢ় রূঢ় অর্ধজাগরণে ?
বুঝিতে কি পেরেছিলে আপনার মনে
নিত্যনিদ্রাহীন ব্যথা মহাজননীর ?
যেদিন বহিত নব বসন্তসমীর,
ধরণীর সর্বাঙ্গের পুলকপ্রবাহ
স্পর্শ কি করিত তোরে ? জীবন-উৎসাহ
ছুটিত সহস্র পথে মরুদিগ্বিজয়ে
সহস্র আকারে, উঠিত সে ক্ষুব্ধ হয়ে
তোমার পাষাণ ঘেরি করিতে নিপাত
অনুর্বর-অভিশাপ তব, সে আঘাত
জাগাত কি জীবনের কম্প তব দেহে ?
যামিনী আসিত যবে মানবের গেহে

ধরণী লইত টানি শ্রান্ত তনুগুলি
আপনার বক্ষ-'পরে ; দুঃখশ্রম ভুলি
ঘুমাত অসংখ্য জীব— জাগিত আকাশ—
তাদের শিথিল অঙ্গ, সুষুপ্ত নিশ্বাস
বিভোর করিয়া দিত ধরণীর বুক—
মাতৃ-অঙ্গে সেই কোটিজীবস্পর্শসুখ
কিছু তার পেয়েছিলে আপনার মাঝে ?
যে গোপন অন্তঃপুরে জননী বিরাজে,
বিচিত্রিত যবনিকা পত্রপুষ্পজালে
বিবিধ বর্ণের লেখা, তারি অন্তরালে
রহিয়া অসূর্যস্পশ্য নিত্য চুপে চুপে
ভরিছে সন্তানগৃহ ধনধান্যরূপে
জীবনে যৌবনে, সেই গূঢ় মাতৃকক্ষে
সুপ্ত ছিলে এতকাল ধরণীর বক্ষে
চিররাত্রিসুশীতল বিস্মৃতি-আলয়ে,
যেথায় অনন্তকাল ঘুমায় নির্ভয়ে
লক্ষ জীবনের ক্লান্তি ধূলির শয্যায় ;
নিমেষে নিমেষে যেথা ঝরে পড়ে যায়
দিবসের তাপে শুষ্ক ফুল, দগ্ধ তারা,
জীর্ণ কীর্তি, শ্রান্ত সুখ, দুঃখ দাহহারা।

সেথা স্নিগ্ধ হস্ত দিয়ে পাপতাপরেখা
মুছিয়া দিয়াছে মাতা ; দিলে আজি দেখা
ধরিত্রীর সদ্যোজাত কুমারীর মতো
সুন্দর, সরল, শুভ্র ; হয়ে বাক্যহত
চেয়ে আছ প্রভাতের জগতের পানে।
যে শিশির পড়েছিল তোমার পাষাণে
রাত্রিবেলা, এখন সে কাঁপিছে উল্লাসে
আজানুচুম্বিত মুক্ত কৃষ্ণ কেশপাশে।
যে শৈবাল রেখেছিল ঢাকিয়া তোমায়

ধরণীর শ্যামশোভা অঞ্চলের প্রায়
বহু বর্ষ হতে, পেয়ে বহু বর্ষাধারা
সতেজ সরস ঘন, এখনো তাহারা
লগ্ন হয়ে আছে তব নগ্ন গৌর দেহে
মাতৃদত্ত বস্ত্রখানি সুকোমল স্নেহে।

হাসে পরিচিত হাসি নিখিল সংসার।
তুমি চেয়ে নির্নিমেষ ; হৃদয় তোমার
কোন্ দূর কালক্ষেত্রে চলে গেছে একা
আপনার ধূলিলিপ্ত পদচিহ্নরেখা
পদে পদে চিনে চিনে। দেখিতে দেখিতে
চারি দিক হতে সব এল চারি ভিতে
জগতের পূর্ব পরিচয় ; কৌতূহলে
সমস্ত সংসার ওই এল দলে দলে
সম্মুখে তোমার ; থেমে গেল কাছে এসে
চমকিয়া। বিস্ময়ে রহিল অনিমেষে।

অপূর্ব রহস্যময়ী মূর্তি বিবসন,
নবীন শৈশবে স্নাত সম্পূর্ণ যৌবন—
পূর্ণস্ফুট পুষ্প যথা শ্যামপত্রপুটে
শৈশবে যৌবনে মিশে উঠিয়াছে ফুটে
এক বৃন্তে। বিস্মৃতিসাগরনীলনীরে
প্রথম উষার মতো উঠিয়াছ ধীরে।
তুমি বিশ্ব-পানে চেয়ে মানিছ বিস্ময়,
বিশ্ব তোমা-পানে চেয়ে কথা নাহি কয় ;
দোঁহে মুখোমুখি। অপাররহস্যতীরে
চিরপরিচয়-মাঝে নব পরিচয়।

শান্তিনিকেতন
১১।১২ জ্যৈষ্ঠ ১৮৯০

গোধূলি

অন্ধকার তরুশাখা দিয়ে
 সন্ধ্যার বাতাস বহে যায়।
আয়, নিদ্রা, আয় ঘনাইয়ে
 শ্রান্ত এই আঁখির পাতায়।
কিছু আর নাহি যায় দেখা,
কেহ নাই, আমি শুধু একা—
মিশে যাক জীবনের রেখা
 বিস্মৃতির পশ্চিমসীমায়।
নিষ্ফল দিবস অবসান—
কোথা আশা, কোথা গীতগান!
শুয়ে আছে সঙ্গীহীন প্রাণ
 জীবনের তটবালুকায়।
দূরে শুধু ধ্বনিছে সতত
অবিশ্রাম মর্মরের মতো,
হৃদয়ের হত আশা যত
 অন্ধকারে কাঁদিয়া বেড়ায়।

আয় শান্তি, আয় রে নির্বাণ,
 আয় নিদ্রা, শ্রান্ত প্রাণে আয়!
মূর্ছাহত হৃদয়ের 'পরে
 চিরাগত প্রেয়সীর প্রায়
 আয়, নিদ্রা আয়!

সোলাপুর
১ ভাদ্র ১৮৯০

উচ্ছৃঙ্খল

এ মুখের পানে চাহিয়া রয়েছ
কেন গো অমন করে ?
তুমি চিনিতে নারিবে, বুঝিতে নারিবে মোরে।
আমি কেঁদেছি হেসেছি, ভালো যে বেসেছি,
এসেছি যেতেছি সরে
কী জানি কিসের ঘোরে।

কোথা হতে এত বেদনা বহিয়া
এসেছে পরান মম
বিধাতার এক অর্থবিহীন
প্রলাপবচন-সম।
প্রতিদিন যারা আছে সুখে দুখে
আমি তাহাদের নই—
আমি এসেছি নিমেষে, যাইব নিমেষ বই।
আমি আমারে চিনি নে, তোমারে জানি নে,
আমার আলয় কই !

জগৎ বেড়িয়া নিয়মের পাশ,
অনিয়ম শুধু আমি।
বাসা বেঁধে আছে কাছে কাছে সবে,
কত কাজ করে কত কলরবে,
চিরকাল ধরে দিবস চলিছে
দিবসের অনুগামী—
শুধু আমি নিজবেগ সামালিতে নারি
ছুটেছি দিবসযামী।

প্রতিদিন বহে মৃদু সমীরণ,
প্রতিদিন ফুটে ফুল।

ঝড় শুধু আসে ক্ষণেকের তরে
স্বজনের এক ভুল—
দুরন্ত সাধ কাতর বেদনা
ফুকারিয়া উভরায়
আঁধার হইতে আঁধারে ছুটিয়া যায়।

এ আবেগ নিয়ে কার কাছে যাব,
নিতে কে পারিবে মোরে!
কে আমারে পারে আঁকড়ি রাখিতে
দুখানি বাহুর ডোরে!

আমি কেবল কাতর গীত!
কেহ বা শুনিয়া ঘুমায় নিশীথে,
কেহ জাগে চমকিত।
কত-যে বেদনা সে কেহ বোঝে না,
কত-যে আকুল আশা,
কত-যে তীব্র পিপাসাকাতর ভাষা।

ওগো, তোমরা জগৎবাসী,
তোমাদের আছে বরষ বরষ
দরশ-পরশ-রাশি—
আমার কেবল একটি নিমেষ,
তারি তরে ধেয়ে আসি।

মহাসুন্দর একটি নিমেষ
ফুটেছে কাননশেষে,
আমি তারি পানে ধাই, ছিঁড়ে নিতে চাই,
ব্যাকুলবাসনাসংগীত গাই
অসীমকালের আঁধার হইতে
বাহির হইয়া এসে।

শুধু একটি মুখের এক নিমেষের
একটি মধুর কথা,
তারি তরে বহি চিরদিবসের
চিরমনোব্যাকুলতা।
কালের কাননে নিমেষ লুটিয়া
কে জানে চলেছি কোথা!
ওগো, মিটে না তাহাতে মিটে না প্রাণের ব্যথা।

অধিক সময় নাই।
ঝড়ের জীবন ছুটে চলে যায়
শুধু কেঁদে 'চাই চাই'—
যার কাছে আসি তার কাছে শুধু
হাহাকার রেখে যাই।

ওগো, তবে থাক্, যে যায় সে যাক—
তোমরা দিয়ো না ধরা!
আমি চলে যাব ত্বরা।
মোরে কেহ কোরো ভয়, কেহ কোরো ঘৃণা,
ক্ষমা কোরো যদি পারো!
বিস্মিত চোখে ক্ষণেক চাহিয়া
তার পরে পথ ছাড়ো!

তার পরদিনে উঠিবে প্রভাত,
ফুটিবে কুসুম কত,
নিয়মে চলিবে নিখিল জগৎ
প্রতিদিবসের মতো।
কোথাকার এই শৃঙ্খল-ছেঁড়া
সৃষ্টি-ছাড়া এ ব্যথা

কাঁদিয়া কাঁদিয়া, গাহিয়া গাহিয়া,
অজানা আঁধার-সাগর বাহিয়া,
মিশায়ে যাইবে কোথা !
এক রজনীর প্রহরের মাঝে
ফুরাবে সকল কথা।

সোলাপুর
৫ ভাদ্র ১৮৯০

আগন্তুক

ওগো সুখী প্রাণ, তোমাদের এই
ভব-উৎসব-ঘরে
অচেনা অজানা পাগল অতিথি
এসেছিল ক্ষণতরে।
ক্ষণেকের তরে বিস্ময়ভরে
চেয়েছিল চারি দিকে
বেদনা-বাসনা-ব্যাকুলতা-ভরা
তৃষাতুর অনিমিখে।
উৎসববেশ ছিল না তাহার,
কণ্ঠে ছিল না মালা,
কেশপাশ দিয়ে বাহিরিতেছিল
দীপ্ত অনলজ্বালা।
তোমাদের হাসি তোমাদের গান
থেমে গেল তারে দেখে—
শুধালে না কেহ পরিচয় তার,
বসালে না কেহ ডেকে।
কী বলিতে গিয়ে বলিল না আর,
দাঁড়ায়ে রহিল দ্বারে—
দীপালোক হতে বাহিরিয়া গেল
বাহির-অন্ধকারে।

তার পরে কেহ জান কি তোমরা
কী হইল তার শেষে ?
কোন্ দেশ হতে এসে চলে গেল
কোন্ গৃহহীন দেশে ?

সোলাপুর
৫ ভাদ্র ১৮৯০

বিদায়

অকূল সাগর-মাঝে চলেছে ভাসিয়া
জীবনতরণী। ধীরে লাগিছে আসিয়া
তোমার বাতাস, বহি আনি কোন্ দূর
পরিচিত তীর হতে কত সুমধুর
পুষ্পগন্ধ, কত সুখস্মৃতি, কত ব্যথা,
আশাহীন কত সাধ, ভাষাহীন কথা।
সম্মুখেতে তোমারি নয়ন জেগে আছে
আসন্ন আঁধার-মাঝে অস্তাচল-কাছে
স্থির ধ্রুবতারাসম ; সেই অনিমেষ
আকর্ষণে চলেছি কোথায়, কোন্ দেশ
কোন্ নিরুদ্দেশ -মাঝে ! এমনি করিয়া
চিহ্নহীন পথহীন অকূল ধরিয়া
দূর হতে দূরে ভেসে যাব— অবশেষে
দাঁড়াইব দিবসের সর্বপ্রান্তদেশে
এক মুহূর্তের তরে— সারাদিন ভেসে
মেঘখণ্ড যথা রজনীর তীরে এসে
দাঁড়ায় থমকি। ওগো, বারেক তখন
জীবনের খেলা রেখে করুণ নয়ন
পাঠায়ো পশ্চিম-পানে, দাঁড়ায়ো একাকী
ওই দূর তীরদেশে অনিমেষ-আঁখি।

মুহূর্তে আঁধার নামি দিবে সব ঢাকি
বিদায়ের পথ ; তোমার অজ্ঞাত দেশে
আমি চলে যাব ; তুমি ফিরে যেয়ো হেসে
সংসারের খেলাঘরে, তোমার নবীন
দিবালোকে। অবশেষে যবে একদিন—
বহুদিন পরে— তোমার জগৎ-মাঝে
সন্ধ্যা দেখা দিবে, দীর্ঘ জীবনের কাজে
প্রমোদের কোলাহলে শ্রান্ত হবে প্রাণ,
মিলায়ে আসিবে ধীরে স্বপন-সমান
চিররৌদ্রদগ্ধ এই কঠিন সংসার,
সেইদিন এইখানে আসিয়ো আবার ;
এই তটপ্রান্তে বসে শ্রান্ত দু'নয়ানে
চেয়ে দেখো ওই অস্ত-অচলের পানে
সন্ধ্যার তিমিরে, যেথা সাগরের কোলে
আকাশ মিশায়ে গেছে। দেখিবে তা হলে
আমার সে বিদায়ের শেষ চেয়ে-দেখা
এইখানে রেখে গেছে জ্যোতির্ময় রেখা।
সে অমর অশ্রুবিন্দু সন্ধ্যাতারকার
বিষণ্ণ আকার ধরি উদিবে তোমার
নিদ্রাতুর আঁখি-'পরে ; সারা রাত্রি ধরে
তোমার সে জনহীন বিশ্রামশিয়রে
একাকী জাগিয়া রবে। হয়তো স্বপনে
ধীরে ধীরে এনে দেবে তোমার স্মরণে
জীবনের প্রভাতের দু-একটি কথা।
এক ধারে সাগরের চিরচঞ্চলতা
তুলিবে অস্ফুট ধ্বনি, রহস্য অপার,
অন্য ধারে ঘুমাইবে সমস্ত সংসার।

কোল্‌ভিল টেরেস। লণ্ডন
আশ্বিন ১৮৯০। রাত্রি

*

সন্ধ্যায়

ওগো তুমি, অমনি সন্ধ্যার মতো হও।
সুদূর পশ্চিমাচলে কনক-আকাশতলে
অমনি নিস্তব্ধ চেয়ে রও।
অমনি সুন্দর শান্ত অমনি করুণ কান্ত
অমনি নীরব উদাসিনী,
ওইমতো ধীরে ধীরে আমার জীবনতীরে
বারেক দাঁড়াও একাকিনী।
জগতের পরপারে নিয়ে যাও আপনারে
দিবসনিশার প্রান্তদেশে।
থাক্ হাস্য-উৎসব, না আসুক কলরব
সংসারের জনহীন শেষে।
এসো তুমি চুপে চুপে শ্রান্তিরূপে নিদ্রারূপে,
এসো তুমি নয়ন-আনত।
এসো তুমি ম্লান হেসে দিবাদগ্ধ আয়ুশেষে
মরণের আশ্বাসের মতো।
আমি শুধু চেয়ে থাকি অশ্রুহীন-শ্রান্ত-আঁখি,
পড়ে থাকি পৃথিবীর 'পরে—
খুলে দাও কেশভার, ঘনস্নিগ্ধ অন্ধকার
মোরে ঢেকে দিক স্তরে স্তরে।
রাখো এ কপালে মম নিদ্রার আবেশ-সম
হিমস্নিগ্ধ করতলখানি।
বাক্যহীন স্নেহভরে অবশ দেহের 'পরে
অঞ্চলের প্রান্ত দাও টানি।
তার পরে পলে পলে করুণার অশ্রুজলে
ভরে যাক নয়নপল্লব।
সেই স্তব্ধ আকুলতা গভীর বিদায়ব্যথা
কায়মনে করি অনুভব।

রেড সী
৭ কার্তিক ১৮৯০

শেষ উপহার

আমি রাত্রি, তুমি ফুল। যতক্ষণ ছিলে কুঁড়ি
জাগিয়া চাহিয়া ছিনু আঁধার আকাশ জুড়ি
সমস্ত নক্ষত্র নিয়ে, তোমারে লুকায়ে বুকে।
যখন ফুটিলে তুমি সুন্দর-তরুণ-মুখে,
তখনি প্রভাত এল, ফুরালো আমার কাল ;
আলোকে ভাঙিয়া গেল রজনীর অন্তরাল।
এখন বিশ্বের তুমি ; গুন্ গুন্ মধুকর
চারি দিকে তুলিয়াছে বিস্ময়ব্যাকুল স্বর ;
গাহে পাখি, বহে বায়ু ; প্রমোদহিল্লোলধারা
নবস্ফুট জীবনেরে করিতেছে দিশাহারা।
এত আলো, এত সুখ, এত গান, এত প্রাণ
ছিল না আমার কাছে— আমি করেছিনু দান
শুধু নিদ্রা, শুধু শান্তি, সযতন নীরবতা,
শুধু চেয়ে-থাকা আঁখি, শুধু মনে মনে কথা।

আর কি দিই নি কিছু ? প্রলুব্ধ প্রভাত যবে
চাহিল তোমার পানে, শত পাখি শত রবে
ডাকিল তোমার নাম, তখন পড়িল ঝ'রে
আমার নয়ন হতে তোমার নয়ন-'পরে
একটি শিশিরকণা। চলে গেনু পরপার।
সেই বিষাদের বিন্দু, বিদায়ের উপহার,
প্রখর প্রমোদ হতে রাখিবে শীতল ক'রে
তোমার তরুণ মুখ ; রজনীর অশ্রু-'পরে
পড়ি প্রভাতের হাসি দিবে শোভা অনুপম,
বিকচ সৌন্দর্য তব করিবে সুন্দরতম।

রেড সী
৯ কার্তিক ১৮৯০

মৌন ভাষা

থাক্ থাক্, কাজ নাই, বলিয়ো না কোনো কথা।
চেয়ে দেখি, চলে যাই, মনে মনে গান গাই,
মনে মনে রচি বসে কত সুখ কত ব্যথা।
বিরহী পাখির প্রায় অজানা কানন-ছায়
উড়িয়া বেড়াক সদা হৃদয়ের কাতরতা—
তারে বাঁধিয়ো না ধরে, বলিয়ো না কোনো কথা।

আঁখি দিয়ে যাহা বলো সহসা আসিয়া কাছে
সেই ভালো, থাক্ তাই, তার বেশি কাজ নাই—
কথা দিয়ে বলো যদি মোহ ভেঙে যায় পাছে।
এত মৃদু এত আধো অশ্রুজলে-বাধো-বাধো
শরমে-সভয়ে-ম্লান এমন কি ভাষা আছে?
কথায় বোলো না তাহা আঁখি যাহা বলিয়াছে।

তুমি হয়তো বা পারো আপনারে বুঝাইতে—
মনের সকল ভাষা প্রাণের সকল আশা
পারো তুমি গেঁথে গেঁথে রচিতে মধুর গীতে।
আমি তো জানি নে মোরে, দেখি নাই ভালো করে
মনের সকল কথা পশিয়া আপন চিতে—
কী বুঝিতে কী বুঝেছি, কী বলিব কী বলিতে।

তবে থাক্। ওই শোনো, অন্ধকারে শোনা যায়
জলের কল্লোলস্বর পল্লবের মরমর—
বাতাসের দীর্ঘশ্বাস শুনিয়া শিহরে কায়।
আরো ঊর্ধ্বে দেখো চেয়ে অনন্ত আকাশ ছেয়ে
কোটি কোটি মৌন দৃষ্টি তারকায় তারকায়।
প্রাণপণ দীপ্ত ভাষা জলিয়া ফুটিতে চায়।

এসো চুপ করে শুনি এই বাণী স্তব্ধতার—
এই অরণ্যের তলে   কানাকানি জলে স্থলে,
মনে করি হল বলা ছিল যাহা বলিবার।
হয়তো তোমার ভাবে   তুমি এক বুঝে যাবে,
আমার মনের মতো আমি বুঝে যাব আর—
নিশীথের কণ্ঠ দিয়ে কথা হবে দুজনার।

মনে করি দুটি তারা জগতের এক ধারে
পাশাপাশি কাছাকাছি   তৃষাতুর চেয়ে আছি,
চিনিতেছি চিরযুগ, চিনি নাকো কেহ কারে।
দিবসের কোলাহলে   প্রতিদিন যাই চলে,
ফিরে আসি রজনীর ভাষাহীন অন্ধকারে—
বুঝিবার নহে যাহা চাই তাহা বুঝিবারে।

তোমার সাহস আছে, আমার সাহস নাই।
এই-যে শঙ্কিত আলো   অন্ধকারে জ্বলে ভালো,
কে বলিতে পারে বলো যাহা চাও এ কি তাই।
তবে ইহা থাক্ দূরে   কল্পনার স্বপ্নপুরে,
যার যাহা মনে লয় তাই মনে করে যাই—
এই চির-আবরণ খুলে ফেলে কাজ নাই।

এসো তবে বসি হেথা, বলিয়ো না কোনো কথা।
নিশীথের অন্ধকারে   ঘিরে দিক দুজনারে,
আমাদের দুজনের জীবনের নীরবতা।
দুজনের কোলে বুকে   আঁধারে বাড়ুক সুখে
দুজনের এক শিশু জনমের মনোব্যথা।
তবে আর কাজ নাই, বলিয়ো না কোনো কথা।

রেড সী
১০ কার্তিক ১৮৯০

আমার সুখ

ভালোবাসা-ঘেরা ঘরে কোমল শয়নে তুমি
যে সুখেই থাকো,
যে মাধুরী এ জীবনে আমি পাইয়াছি তাহা
তুমি পেলে নাকো।
এই-যে অলস বেলা, অলস মেঘের মেলা,
জলেতে আলোতে খেলা সারা দিনমান,
এরই মাঝে চারি পাশে কোথা হতে ভেসে আসে
ওই মুখ, ওই হাসি, ওই দু'নয়ান।
সদা শুনি কাছে দূরে মধুর কোমল সুরে
তুমি মোরে ডাকো—
তাই ভাবি, এ জীবনে আমি যাহা পাইয়াছি
তুমি পেলে নাকো।

কোনোদিন একদিন আপনার মনে, শুধু
এক সন্ধ্যাবেলা,
আমারে এমনি করে ভাবিতে পারিতে যদি
বসিয়া একেলা—
এমনি সুদূর বাঁশি শ্রবণে পশিত আসি,
বিষাদকোমল হাসি ভাসিত অধরে,
নয়নে জলের রেখা এক বিন্দু দিত দেখা,
তারি 'পরে সন্ধ্যালোক কাঁপিত কাতরে—
ভেসে যেত মনখানি কনকতরণীসম
গৃহহীন স্রোতে—
শুধু একদিন-তরে আমি ধন্য হইতাম
তুমি ধন্য হতে।

তুমি কি করেছ মনে দেখেছ, পেয়েছ তুমি
সীমারেখা মম ?
ফেলিয়া দিয়াছ মোরে আদি অন্ত শেষ করে
পড়া পুঁথি -সম ?
নাই সীমা আগে পাছে, যত চাও তত আছে,
যতই আসিবে কাছে তত পাবে মোরে।
আমারেও দিয়ে তুমি এ বিপুল বিশ্বভূমি
এ আকাশ এ বাতাস দিতে পারো ভরে।
আমাতেও স্থান পেত অবাধে সমস্ত তব
জীবনের আশা।
একবার ভেবে দেখো এ পরানে ধরিয়াছে
কত ভালোবাসা।

সহসা কী শুভক্ষণে অসীম হৃদয়রাশি
দৈবে পড়ে চোখে।
দেখিতে পাও নি যদি, দেখিতে পাবে না আর,
মিছে মরি বকে !
আমি যা পেয়েছি তাই সাথে নিয়ে ভেসে যাই,
কোনোখানে সীমা নাই ও মধু মুখের—
শুধু স্বপ্ন, শুধু স্মৃতি, তাই নিয়ে থাকি নিতি,
আর আশা নাহি রাখি সুখের দুখের।
আমি যাহা দেখিয়াছি, আমি যাহা পাইয়াছি
এ জনম-সই,
জীবনের সব শূন্য আমি যাহে ভরিয়াছি
তোমার তা কই !

রেড সী
১১ কার্তিক ১৮৯০

নাটক ও প্রহসন

বিসর্জন

উৎসর্গ

শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাণাধিকেষু

তোরি হাতে বাঁধা খাতা, তারি শ-খানেক পাতা
অক্ষরেতে ফেলিয়াছি ঢেকে,
মস্তিষ্ককোটরবাসী চিন্তাকীট রাশি রাশি
পদচিহ্ন গেছে যেন রেখে।
প্রবাসে প্রত্যহ তোরে হৃদয়ে স্মরণ করে
লিখিয়াছি নির্জন প্রভাতে,
মনে করি অবশেষে শেষ হলে ফিরে দেশে
জন্মদিনে দিব তোর হাতে।

বর্ণনাটা করি শোন্— একা আমি, গৃহকোণ,
কাগজ-পত্তর ছড়াছড়ি।
দশ দিকে বইগুলি সঞ্চয় করিছে ধূলি,
আলস্যে যেতেছে গড়াগড়ি।
শয্যাহীন খাটখানা এক পাশে দেয় থানা,
প্রকাশিয়া কাঠের পাঁজর।
তারি 'পরে অবিচারে যাহা-তাহা ভারে ভারে
স্তূপাকারে সহে অনাদর।

চেয়ে দেখি জানালায় খালখানা শুষ্কপ্রায়,
মাঝে মাঝে বেধে আছে জল,
এক ধারে রাশ রাশ অর্ধমগ্ন দীর্ঘ বাঁশ,
তারি 'পরে বালকের দল।
ধরে মাছ, মারে ঢেলা— সারাদিন করে খেলা
উভচর মানবশাবক।

মেয়েরা মাজিছে গাত্র অথবা কাঁসার পাত্র
সোনার মতন ঝক্ ঝক্ ।

উত্তরে যেতেছে দেখা পড়েছে পথের রেখা
শুষ্ক সেই জলপথ-মাঝে—
বহু কষ্টে ডাক ছাড়ি চলেছে গোরুর গাড়ি,
ঝিনি ঝিনি ঘণ্টা তারি বাজে ।
কেহ দ্রুত কেহ ধীরে কেহ যায় নতশিরে,
কেহ যায় বুক ফুলাইয়া,
কেহ জীর্ণ টাট্টু চড়ি চলিয়াছে তড়বড়ি
দুই ধারে দু-পা দুলাইয়া ।

পরপারে গায়ে গায় অভ্রভেদী মহাকায়
স্তব্ধচ্ছায় বট-অশত্থেরা,
স্নিগ্ধ বন-অঙ্কে তারি সুপ্তপ্রায় সারি সারি
কুঁড়েগুলি বেড়া দিয়ে ঘেরা—
বিহঙ্গে মানবে মিলি আছে হোথা নিরিবিলি,
ঘনশ্যাম পল্লবের ঘর—
সন্ধ্যাবেলা হোথা হতে ভেসে আসে বায়ুস্রোতে
গ্রামের বিচিত্র গীতস্বর ।

পূর্বপ্রান্তে বনশিরে সূর্যোদয় ধীরে ধীরে,
চারি দিকে পাখির কূজন ।
শঙ্খঘণ্টা ক্ষণপরে দূর মন্দিরের ঘরে
প্রচারিছে শিবের পূজন ।
যে প্রত্যূষে মধুমাছি বাহিরায় মধু যাচি
কুসুমকুঞ্জের দ্বারে দ্বারে
সেই ভোরবেলা আমি মানসকুহরে নামি
আয়োজন করি লিখিবারে ।

লিখিতে লিখিতে মাঝে পাখি-গান কানে বাজে,
মনে আনে কাল পুরাতন—
ওই গান, ওই ছবি, তরুশিরে রাঙা রবি
ওরা প্রকৃতির নিত্যধন।
আদিকবি বাল্মীকিরে এই সমীরণ ধীরে
ভক্তিভরে করেছে বীজন,
ওই মায়াচিত্রবৎ তরুলতা ছায়াপথ
ছিল তাঁর পুণ্য তপোবন।

রাজধানী কলিকাতা তুলেছে স্পর্ধিত মাথা,
পুরাতন নাহি ঘেঁষে কাছে।
কাষ্ঠ লোষ্ট্র চারি দিক, বর্তমান-আধুনিক
আড়ষ্ট হইয়া যেন আছে।
'আজ' 'কাল' দুটি ভাই মরিতেছে জন্মিয়াই,
কলরব করিতেছে কত।
নিশিদিন ধূলি প'ড়ে দিতেছে আচ্ছন্ন ক'রে
চিরসত্য আছে যেথা যত।

জীবনের হানাহানি, প্রাণ নিয়ে টানাটানি,
মত নিয়ে বাক্য-বরিষন,
বিদ্যা নিয়ে রাতারাতি পুঁথির প্রাচীর গাঁথি
প্রকৃতির গণ্ডি-বিরচন,
কেবলই নূতনে আশ, সৌন্দর্যেতে অবিশ্বাস,
উন্মাদনা চাহি দিনরাত—
সে-সকল ভুলে গিয়ে কোণে বসে খাতা নিয়ে
মহানন্দে কাটিছে প্রভাত।

দক্ষিণের বারান্দায় বেড়াই মুগ্ধের প্রায়,
অপরাহ্ণে পড়ে তরুচ্ছায়া—

কল্পনার ধনগুলি হৃদয়দোলায় দুলি
প্রতিক্ষণে লভিতেছে কায়া।
সেবি বাহিরের বায়ু বাড়ে তাহাদের আয়ু,
ভোগ করে চাঁদের অমিয়—
ভেদ করি মোর প্রাণ জীবন করিয়া পান
হইতেছে জীবনের প্রিয়।

এত তারা জেগে আছে নিশিদিন কাছে কাছে,
এত কথা কয় শত স্বরে,
তাহাদের তুলনায় আর-সবে ছায়াপ্রায়
আসে যায় নয়নের 'পরে।
আজ সব হল সারা, বিদায় লয়েছে তারা,
নূতন বেঁধেছে ঘরবাড়ি—
এখন স্বাধীন বলে বাহিরে এসেছে চ'লে
অন্তরের পিতৃগৃহ ছাড়ি।

তাই এতদিন পরে আজি নিজমূর্তি ধরে
প্রবাসের বিরহবেদনা,
তোদের কাছেতে যেতে তোদিকে নিকটে পেতে
জাগিতেছে একান্ত বাসনা।
সম্মুখে দাঁড়াব যবে 'কী এনেছ' বলি সবে
যদ্যপি শুধাস হাসিমুখ,
খাতাখানি বের করে বলিব 'এ পাতা ভরে
আনিয়াছি প্রবাসের সুখ'।

সেই ছবি মনে আসে— টেবিলের চারি পাশে
গুটিকত চৌকি টেনে আনি,
শুধু জন দুই-তিন, ঊর্ধ্বে জ্বলে কেরোসিন,
কেদারায় বসি ঠাকুরানী।

দক্ষিণের দ্বার দিয়ে বায়ু আসে গান নিয়ে,
কেঁপে কেঁপে উঠে দীপশিখা।
খাতা হাতে সুর ক'রে অবাধে যেতেছি প'ড়ে,
কেহ নাই করিবারে টীকা।

ঘণ্টা বাজে, বাড়ে রাত, ফুরায় ব'য়ের পাত,
বাহিরে নিস্তব্ধ চারি ধার—
তোদের নয়নে জল করে আসে ছলছল্
শুনিয়া কাহিনী করুণার।
তাই দেখে শুতে যাই, আনন্দের শেষ নাই,
কাটে রাত্রি স্বপ্ন-রচনায়—
মনে মনে প্রাণ ভরি অমরতা লাভ করি
নীরব সে সমালোচনায়।

তার পরে দিনকত কেটে যায় এইমতো,
তার পরে ছাপাবার পালা।
মুদ্রাযন্ত্র হতে শেষে বাহিরায় ভদ্রবেশে,
তার পরে মহা ঝালাপালা।
রক্তমাংস-গন্ধ পেয়ে ক্রিটিকেরা আসে ধেয়ে,
চারি দিকে করে কাড়াকাড়ি।
কেহ বলে, 'ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক,
লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি।'

শির নাড়ি কেহ কহে, 'সব-সুদ্ধ মন্দ নহে,
ভালো হ'ত আরো ভালো হলে।'
কেহ বলে, 'আয়ুহীন বাঁচিবে দু-চারি দিন,
চিরদিন রবে না তা ব'লে।'

কেহ বলে, 'এ বহিটা লাগিতে পারিত মিঠা
হ'ত যদি অন্য কোনোরূপ।'
যার মনে যাহা লয় সকলেই কথা কয়,
আমি শুধু বসে আছি চুপ।

ল'য়ে নাম, ল'য়ে জাতি বিদ্বানের মাতামাতি,
ও-সকল আনিস নে কানে।
আইনের লৌহ-ছাঁচে কবিতা কভু না বাঁচে,
প্রাণ শুধু পায় তাহা প্রাণে।
হাসিমুখে স্নেহভরে সঁপিলাম তোর করে,
বুঝিয়া পড়িবি অনুরাগে।
কে বোঝে কে নাই বোঝে ভাবুক তা নাহি খোঁজে,
ভালো যার লাগে তার লাগে।

—রবিকাকা

নাটকের পাত্রগণ

গোবিন্দমাণিক্য	ত্রিপুরার রাজা
নক্ষত্ররায়	গোবিন্দমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
রঘুপতি	রাজপুরোহিত
জয়সিংহ	রঘুপতির পালিত রাজপুত যুবক, রাজমন্দিরের সেবক
চাঁদপাল	দেওয়ান
নয়নরায়	সেনাপতি
ধ্রুব	রাজপালিত বালক
মন্ত্রী	
পৌরগণ	
গুণবতী	মহিষী
অপর্ণা	ভিখারিনী

বিসর্জন

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দির

গুণবতী

গুণবতী। মার কাছে কী করেছি দোষ! ভিখারি যে,
সন্তান বিক্রয় করে উদরের দায়ে,
তারে দাও শিশু— পাপিষ্ঠা যে, লোকলাজে
সন্তানেরে বধ করে, তার গর্ভে দাও
পাঠাইয়া অসহায় জীব। আমি হেথা
সোনার পালঙ্কে মহারানী, শত শত
দাস দাসী সৈন্য প্রজা ল'য়ে, বসে আছি
তপ্ত বক্ষে শুধু এক শিশুর পরশ
লালসিয়া, আপনার প্রাণের ভিতরে
আরেকটি প্রাণাধিক প্রাণ করিবারে
অনুভব— এই বক্ষ, এই বাহু দুটি,
এই কোল, এই দৃষ্টি দিয়ে, বিরচিতে
নিবিড় জীবন্ত নীড়, শুধু একটুকু
প্রাণকণিকার তরে। হেরিবে আমারে
একটি নূতন আঁখি প্রথম আলোকে,
ফুটিবে আমারি কোলে কথাহীন মুখে
অকারণ আনন্দের প্রথম হাসিটি!

কুমারজননী মাতঃ, কোন্ পাপে মোরে
করিলি বঞ্চিত মাতৃস্বর্গ হতে ?

রঘুপতির প্রবেশ

প্রভু,
চিরদিন মা'র পূজা করি। জেনে শুনে
কিছু তো করি নি দোষ। পুণ্যের-শরীর
মোর স্বামী মহাদেবসম— তবে কোন্
দোষ দেখে আমারে করিল মহামায়া
নিঃসন্তানশ্মশানচারিণী ?

রঘুপতি। মা'র খেলা
কে বুঝিতে পারে বলো ? পাষাণতনয়া
ইচ্ছাময়ী, সুখ দুঃখ তাঁরি ইচ্ছা। ধৈর্য
ধরো। এবার তোমার নামে মা'র পূজা
হবে। প্রসন্ন হইবে শ্যামা।

গুণবতী। এ বৎসর
পূজার বলির পশু আমি নিজে দিব।
করিনু মানত, মা যদি সন্তান দেন
বর্ষে বর্ষে দিব তাঁরে এক-শো মহিষ,
তিন শত ছাগ।

রঘুপতি। পূজার সময় হল।

[উভয়ের প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্য অপর্ণা ও জয়সিংহের প্রবেশ

জয়সিংহ। কী আদেশ মহারাজ ?

গোবিন্দমাণিক্য। ক্ষুদ্র ছাগশিশু
দরিদ্র এ বালিকার স্নেহের পুত্তলি,
তারে নাকি কেড়ে আনিয়াছ মা'র কাছে
বলি দিতে ? এ দান কি নেবেন জননী
প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে ?

জয়সিংহ। কেমনে জানিব,
মহারাজ, কোথা হতে অনুচরগণ
আনে পশু দেবীর পূজার তরে।— হাঁ গা,
কেন তুমি কাঁদিতেছ? আপনি নিয়েছে
যারে বিশ্বমাতা, তার তরে ক্রন্দন কি
শোভা পায়?

অপর্ণা। কে তোমার বিশ্বমাতা! মোর
শিশু চিনিবে না তারে। মা-হারা শাবক
জানে না সে আপন মায়েরে। আমি যদি
বেলা করে আসি, খায় না সে তৃণদল,
ডেকে ডেকে চায় পথপানে— কোলে করে
নিয়ে তারে, ভিক্ষা-অন্ন কয় জনে ভাগ
করে খাই। আমি তার মাতা।

জয়সিংহ। মহারাজ,
আপনার প্রাণ-অংশ দিয়ে যদি তারে
বাঁচাইতে পারিতাম, দিতাম বাঁচায়ে।
মা তাহারে নিয়েছেন— আমি তারে আর
ফিরাব কেমনে?

অপর্ণা। মা তাহারে নিয়েছেন?
মিছে কথা! রাক্ষসী নিয়েছে তারে!

জয়সিংহ। ছি ছি,
ও কথা এনো না মুখে।

অপর্ণা। মা, তুমি নিয়েছ
কেড়ে দরিদ্রের ধন! রাজা যদি চুরি
করে, শুনিয়াছি নাকি, আছে জগতের
রাজা— তুমি যদি চুরি করো, কে তোমার
করিবে বিচার! মহারাজ, বলো তুমি—

গোবিন্দমাণিক্য। বৎসে, আমি বাক্যহীন— এত ব্যথা কেন,
এত রক্ত কেন, কে বলিয়া দিবে মোরে?

অপর্ণা। এই-যে সোপান বেয়ে রক্তচিহ্ন দেখি

এ কি তারি রক্ত ? ওরে বাছনি আমার !
মরি মরি, মোরে ডেকে কেঁদেছিল কত,
চেয়েছিল চারি দিকে ব্যাকুল নয়নে,
কম্পিত কাতর বক্ষে, মোর প্রাণ কেন
যেথা ছিল সেথা হতে ছুটিয়া এল না !

প্রতিমার প্রতি

জয়সিংহ। আজন্ম পূজিনু তোরে, তবু তোর মায়া
বুঝিতে পারি নে। করুণায় কাঁদে প্রাণ
মানবের, দয়া নাই বিশ্বজননীর !

জয়সিংহের প্রতি

অপর্ণা। তুমি তো নিষ্ঠুর নহ— আঁখি-প্রান্তে তব
অশ্রু ঝরে মোর দুখে। তবে এসো তুমি,
এ মন্দির ছেড়ে এসো। তবে ক্ষম মোরে,
মিথ্যা আমি অপরাধী করেছি তোমায়।

প্রতিমার প্রতি

জয়সিংহ। তোমার মন্দিরে এ কী নূতন সংগীত
ধ্বনিয়া উঠিল আজি, হে গিরিনন্দিনী,
করুণাকাতর কণ্ঠস্বরে ! ভক্তহৃদি
অপরূপ বেদনায় উঠিল ব্যাকুলি।—
হে শোভনে, কোথা যাব এ মন্দির ছেড়ে ?
কোথায় আশ্রয় আছে ?

জনান্তিক হইতে

গোবিন্দমাণিক্য। যেথা আছে প্রেম। [প্রস্থান

জয়সিংহ। কোথা আছে প্রেম !—
অয়ি ভদ্রে, এসো তুমি
আমার কুটিরে। অতিথিরে দেবীরূপে
আজিকে করিব পূজা করিয়াছি পণ।

[জয়সিংহ ও অপর্ণার প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজসভা

রাজা রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়ের প্রবেশ

সভাসদ্‌গণ উঠিয়া

সকলে। জয় হোক মহারাজ!

রঘুপতি। রাজার ভাণ্ডারে
এসেছি বলির পশু সংগ্রহ করিতে।

গোবিন্দমাণিক্য। মন্দিরেতে জীববলি এ বৎসর হতে
হইল নিষেধ।

নয়নরায়। বলি নিষেধ!

মন্ত্রী। নিষেধ!

নক্ষত্ররায়। তাই তো! বলি নিষেধ!

রঘুপতি। এ কি স্বপ্নে শুনি?

গোবিন্দমাণিক্য। স্বপ্ন নহে প্রভু! এতদিন স্বপ্নে ছিনু,
আজ জাগরণ। বালিকার মূর্তি ধ'রে
স্বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন,
জীবরক্ত সহে না তাঁহার।

রঘুপতি। এতদিন
সহিল কী করে? সহস্র বৎসর ধ'রে
রক্ত করেছেন পান, আজি এ অরুচি!

গোবিন্দমাণিক্য। করেন নি পান। মুখ ফিরাতেন দেবী
করিতে শোণিতপাত তোমরা যখন।

রঘুপতি। মহারাজ, কী করিছ ভালো করে ভেবে
দেখো। শাস্ত্রবিধি তোমার অধীন নহে।

গোবিন্দমাণিক্য। সকল শাস্ত্রের বড়ো দেবীর আদেশ।

রঘুপতি। একে ভ্রান্তি, তাহে অহংকার! অজ্ঞ নর,
তুমি শুধু শুনিয়াছ দেবীর আদেশ,
আমি শুনি নাই?

নক্ষত্ররায়। তাই তো, কী বলো মন্ত্রী,—

এ বড়ো আশ্চর্য ! ঠাকুর শোনেন নাই ?

গোবিন্দমাণিক্য। দেবী-আজ্ঞা নিত্যকাল ধ্বনিছে জগতে।
সেই তো বধিরতম যেজন সে বাণী
শুনেও শুনে না।

রঘুপতি। পাষণ্ড, নাস্তিক তুমি !

গোবিন্দমাণিক্য। ঠাকুর, সময় নষ্ট হয়। যাও এবে
মন্দিরের কাজে। প্রচার করিয়া দিয়ো
পথে যেতে যেতে, আমার ত্রিপুররাজ্যে
যে করিবে জীবহত্যা জীবজননীর
পূজাচ্ছলে, তারে দিব নির্বাসনদণ্ড।

রঘুপতি। এই কি হইল স্থির ?

গোবিন্দমাণিক্য। স্থির এই।

উঠিয়া

রঘুপতি। তবে
উচ্ছন্ন ! উচ্ছন্ন যাও !

ছুটিয়া আসিয়া

চাঁদপাল। হাঁ হাঁ ! থামো ! থামো !

গোবিন্দমাণিক্য। বোসো চাঁদপাল। ঠাকুর, বলিয়া যাও।
মনোব্যথা লঘু করে যাও নিজ কাজে।

রঘুপতি। তুমি কি ভেবেছ মনে ত্রিপুর-ঈশ্বরী
ত্রিপুরার প্রজা ? প্রচারিবে তাঁর 'পরে
তোমার নিয়ম ? হরণ করিবে তাঁর
বলি ? হেন সাধ্য নাই তব। আমি আছি
মায়ের সেবক।

[প্রস্থান

নয়নরায়। ক্ষমা করো অধীনের
স্পর্ধা মহারাজ। কোন্ অধিকারে, প্রভু,
জননীর বলি—

চাঁদপাল। শান্ত হও সেনাপতি।

মন্ত্রী। মহারাজ, একেবারে করেছ কি স্থির ?

আজ্ঞা আর ফিরিবে না ?

গোবিন্দমাণিক্য। আর নহে মন্ত্রী,
বিলম্ব উচিত নহে বিনাশ করিতে
পাপ।

মন্ত্রী। পাপের কি এত পরমায়ু হবে ?
কত শত বর্ষ ধরে যে প্রাচীন প্রথা
দেবতাচরণতলে বৃদ্ধ হয়ে এল,
সে কি পাপ হতে পারে ?

রাজার নিরুত্তরে চিন্তা

নক্ষত্ররায়। তাই তো হে মন্ত্রী,
সে কি পাপ হতে পারে ?

মন্ত্রী। পিতামহগণ
এসেছে পালন করে যত্নে ভক্তিভরে
সনাতন রীতি। তাঁহাদের অপমান
তার অপমানে।

রাজার চিন্তা

নক্ষত্ররায়। ভেবে দেখো মহারাজ,
যুগে যুগে যে পেয়েছে শতসহস্রের
ভক্তির সম্মতি, তাহারে করিতে নাশ
তোমার কী আছে অধিকার।

সনিশ্বাসে

গোবিন্দমাণিক্য। থাক্‌ তর্ক !
যাও মন্ত্রী, আদেশ প্রচার করো গিয়ে—
আজ হতে বন্ধ বলিদান। [প্রস্থান

মন্ত্রী। একি হল !

নক্ষত্ররায়। তাই তো হে মন্ত্রী, এ কী হল ! শুনেছিনু
মগের মন্দিরে বলি নেই, অবশেষে
মগেতে হিন্দুতে ভেদ রহিল না কিছু।
কী বল হে চাঁদপাল, তুমি কেন চুপ ?

চাঁদপাল। ভীরু আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, বুদ্ধি কিছু কম,
না বুঝে পালন করি রাজার আদেশ।

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দির

জয়সিংহ

জয়সিংহ। মা গো, শুধু তুই আর আমি! এ মন্দিরে
সারাদিন আর কেহ নাই— সারা দীর্ঘ
দিন! মাঝে মাঝে কে আমারে ডাকে যেন।
তোর কাছে থেকে তবু একা মনে হয়!

নেপথ্যে গান

আমি একলা চলেছি এ ভবে,
আমায় পথের সন্ধান কে কবে?

জয়সিংহ। মা গো, একি মায়া! দেবতারে প্রাণ দেয়
মানবের প্রাণ! এইমাত্র ছিলে তুমি
নির্বাক্ নিশ্চল— উঠিলে জীবন্ত হয়ে
সন্তানের কণ্ঠস্বরে সজাগ জননী!

গান গাহিতে গাহিতে অপর্ণার প্রবেশ

আমি একলা চলেছি এ ভবে,
আমায় পথের সন্ধান কে কবে?
ভয় নেই, ভয় নেই, যাও আপন মনেই
যেমন একলা মধুপ ধেয়ে যায়
কেবল ফুলের সৌরভে।

জয়সিংহ। কেবলি একেলা! দক্ষিণ বাতাস যদি
বন্ধ হয়ে যায়, ফুলের সৌরভ যদি
নাহি আসে, দশ দিক জেগে ওঠে যদি
দশটি সন্দেহ-সম, তখন কোথায়
সুখ, কোথা পথ? জান কি একেলা কারে
বলে?

অপর্ণা। জানি। যবে বসে আছি ভরা মনে—
দিতে চাই, নিতে কেহ নাই!

জয়সিংহ। স্বজনের
আগে দেবতা যেমন একা! তাই বটে!
তাই বটে! মনে হয় এ জীবন বড়ো
বেশি আছে— যত বড়ো তত শূন্য, তত
আবশ্যকহীন।

অপর্ণা। জয়সিংহ, তুমি বুঝি
একা! তাই দেখিয়াছি, কাঙাল যে জন
তাহারো কাঙাল তুমি। যে তোমার সব
নিতে পারে, তারে তুমি খুঁজিতেছ যেন।
ভ্রমিতেছ দীনদুঃখী সকলের দ্বারে।
এতদিন ভিক্ষা মেগে ফিরিতেছি— কত
লোক দেখি, কত মুখপানে চাই, লোকে
ভাবে শুধু বুঝি ভিক্ষাতরে— দূর হতে
দেয় তাই মুষ্টিভিক্ষা ক্ষুদ্র দয়াভরে।
এত দয়া পাই নে কোথাও— যাহা পেয়ে
আপনার দৈন্য আর মনে নাহি পড়ে।

জয়সিংহ। যথার্থ যে দাতা, আপনি নামিয়া আসে
দানরূপে দরিদ্রের পানে ভূমিতলে।
যেমন আকাশ হতে বৃষ্টিরূপে মেঘ
নেমে আসে মরুভূমে— দেবী নেমে আসে
মানবী হইয়া, যারে ভালোবাসি তার
মুখে। দরিদ্র ও দাতা, দেবতা মানব
সমান হইয়া যায়।—
ওই আসিছেন
মোর গুরুদেব।

অপর্ণা। আমি তবে সরে যাই
অন্তরালে। ব্রাহ্মণেরে বড়ো ভয় করি।

কী কঠিন তীব্র দৃষ্টি ! কঠিন ললাট
পাষাণসোপান যেন দেবীমন্দিরের ।

[প্রস্থান

জয়সিংহ। কঠিন ? কঠিন বটে। বিধাতার মতো।
কঠিনতা নিখিলের অটল নির্ভর।

রঘুপতির প্রবেশ

পা ধুইবার জল প্রভৃতি অগ্রসর করিয়া

জয়সিংহ। গুরুদেব !
রঘুপতি। যাও, যাও !
জয়সিংহ। আনিয়াছি জল।
রঘুপতি। থাক্, রেখে দাও জল।
জয়সিংহ। বসন—
রঘুপতি। কে চাহে
বসন !
জয়সিংহ। অপরাধ করেছি কি ?
রঘুপতি। আবার !
কে নিয়েছে অপরাধ তব ?—
ঘোর কলি
এসেছে ঘনায়ে। বাহুবল রাহুসম
ব্রহ্মতেজ গ্রাসিবারে চায়— সিংহাসন
তোলে শির যজ্ঞবেদী-'পরে। হায় হায়,
কলির দেবতা, তোমরাও চাটুকার
সভাসদ্-সম, নতশিরে রাজ-আজ্ঞা
বহিতেছ ? চতুর্ভুজা, চারি হস্ত আছ
জোড় করি ! বৈকুণ্ঠ কি আবার নিয়েছে
কেড়ে দৈত্যগণ ! গিয়েছে দেবতা যত
রসাতলে ! শুধু, দানবে মানবে মিলে
বিশ্বের রাজত্ব দর্পে করিতেছে ভোগ !
দেবতা না যদি থাকে, ব্রাহ্মণ রয়েছে।

ব্রাহ্মণের রোষযজ্ঞে দণ্ড সিংহাসন
হবিকাষ্ঠ হবে।

জয়সিংহের নিকট গিয়া সস্নেহে

বৎস, আজ করিয়াছি
রুক্ষ আচরণ তোমা-'পরে, চিত্ত বড়ো
ক্ষুব্ধ মোর।

জয়সিংহ। কী হয়েছে প্রভু!

রঘুপতি। কী হয়েছে!
শুধাও অপমানিত ত্রিপুরেশ্বরীরে।
এই মুখে কেমনে বলিব কী হয়েছে!

জয়সিংহ। কে করেছে অপমান?

রঘুপতি। গোবিন্দমাণিক্য।

জয়সিংহ। গোবিন্দমাণিক্য! প্রভু, কারে অপমান?

রঘুপতি। কারে! তুমি, আমি, সর্বশাস্ত্র, সর্বদেশ,
সর্বকাল, সর্বদেশকাল-অধিষ্ঠাত্রী
মহাকালী, সকলেরে করে অপমান
ক্ষুদ্র সিংহাসনে বসি। মা'র পূজা-বলি
নিষেধিল স্পর্ধাভরে।

জয়সিংহ। গোবিন্দমাণিক্য!

রঘুপতি। হাঁ গো, হাঁ, তোমার রাজা গোবিন্দমাণিক্য!
তোমার সকল-শ্রেষ্ঠ— তোমার প্রাণের
অধীশ্বর! অকৃতজ্ঞ! পালন করিনু
এত যত্নে স্নেহে তোরে শিশুকাল হতে,
আমা-চেয়ে প্রিয়তর আজ তোর কাছে
গোবিন্দমাণিক্য!

জয়সিংহ। প্রভু, পিতৃকোলে বসি
আকাশে বাড়ায় হাত ক্ষুদ্র মুগ্ধ শিশু
পূর্ণচন্দ্র-পানে— দেব, তুমি পিতা মোর,
পূর্ণশশী মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য।
কিন্তু একি বকিতেছি! কী কথা শুনিনু!

মায়ের পূজার বলি নিষেধ করেছে
রাজা ? এ আদেশ কে মানিবে ?

রঘুপতি। না মানিলে
নির্বাসন।

জয়সিংহ। মাতৃপূজাহীন রাজ্য হতে
নির্বাসন দণ্ড নহে। এ প্রাণ থাকিতে
অসম্পূর্ণ নাহি রবে জননীর পূজা।

চতুর্থ দৃশ্য

অন্তঃপুর

গুণবতী ও পরিচারিকা

গুণবতী। কী বলিস ! মন্দিরের দুয়ার হইতে
রানীর পূজার বলি ফিরায়ে দিয়াছে !
এক দেহে কত মুণ্ড আছে তার ! কে সে
দুরদৃষ্ট ?

পরিচারিকা। বলিতে সাহস নাহি মানি—

গুণবতী। বলিতে সাহস নাহি ? এ কথা বলিলি
কী সাহসে ? আমা-চেয়ে কারে তোর ভয় ?

পরিচারিকা। ক্ষমা করো।

গুণবতী। কাল সন্ধেবেলা ছিনু রানী ;
কাল সন্ধেবেলা বন্দীগণ করে গেছে
স্তব, বিপ্রগণ করে গেছে আশীর্বাদ,
ভৃত্যগণ করজোড়ে আজ্ঞা লয়ে গেছে–
একরাত্রে উলটিল সকল নিয়ম !
দেবী পাইল না পূজা, রানীর মহিমা
অবনত ! ত্রিপুরা কি স্বপ্নরাজ্য ছিল !
ত্বরা করে ডেকে আন্ ব্রাহ্মণ-ঠাকুরে।

[পরিচারিকার প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

গুণবতী। মহারাজ, শুনিতেছ ? মার দ্বার হতে
আমার পূজার বলি ফিরায়ে দিয়েছে।

গোবিন্দমাণিক্য। জানি তাহা।

গুণবতী। জান তুমি ? নিষেধ কর নি
তবু ? জ্ঞাতসারে মহিষীর অপমান ?

গোবিন্দমাণিক্য। তারে ক্ষমা করো প্রিয়ে !

গুণবতী। দয়ার শরীর
তব, কিন্তু মহারাজ, এ তো দয়া নয়—
এ শুধু কাপুরুষতা ! দয়ায় দুর্বল
তুমি, নিজ হাতে দণ্ড দিতে নাহি পারো
যদি, আমি দণ্ড দিব। বলো মোরে কে সে
অপরাধী।

গোবিন্দমাণিক্য। দেবী, আমি। অপরাধ আর
কিছু নহে, তোমারে দিয়েছি ব্যথা এই
অপরাধ।

গুণবতী। কী বলিছ মহারাজ !

গোবিন্দমাণিক্য। আজ
হতে, দেবতার নামে জীবরক্তপাত
আমার ত্রিপুররাজ্যে হয়েছে নিষেধ।

গুণবতী। কাহার নিষেধ ?

গোবিন্দমাণিক্য। জননীর।

গুণবতী। কে শুনেছে ?

গোবিন্দমাণিক্য। আমি।

গুণবতী। তুমি ! মহারাজ, শুনে হাসি আসে।
রাজদ্বারে এসেছেন ভুবন-ঈশ্বরী
জানাইতে আবেদন !

গোবিন্দমাণিক্য। হেসো না মহিষী !
জননী আপনি এসে সন্তানের প্রাণে
বেদনা জানায়েছেন, আবেদন নহে।

গুণবতী। কথা রেখে দাও মহারাজ! মন্দিরের
বাহিরে তোমার রাজ্য। যেথা তব আজ্ঞা
নাহি চলে, সেথা আজ্ঞা নাহি দিয়ো।

গোবিন্দমাণিক্য। মা'র
আজ্ঞা, মোর আজ্ঞা নহে।

গুণবতী। কেমনে জানিলে?

গোবিন্দমাণিক্য। ক্ষীণ দীপালোকে গৃহকোণে থেকে যায়
অন্ধকার; সব পারে, আপনার ছায়া
কিছুতে ঘুচাতে নারে দীপ। মানবের
বুদ্ধি দীপসম, যত আলো করে দান
তত রেখে দেয় সংশয়ের ছায়া। স্বর্গ
হতে নামে যবে জ্ঞান, নিমেষে সংশয়
টুটে। আমার হৃদয়ে সংশয় কিছুই
নাই।

গুণবতী। শুনিয়াছি, আপনার পাপপুণ্য
আপনার কাছে। তুমি থাকো আপনার
অসংশয় নিয়ে— আমারে দুয়ার ছাড়ো,
আমার পূজার বলি আমি নিয়ে যাই
আমার মায়ের কাছে।

গোবিন্দমাণিক্য। দেবী, জননীর
আজ্ঞা পারি না লঙ্ঘিতে।

গুণবতী। আমিও পারি না।
মা'র কাছে আছি প্রতিশ্রুত। সেইমত
যথাশাস্ত্র যথাবিধি পূজিব তাঁহারে।
যাও, তুমি যাও!

গোবিন্দমাণিক্য। যে আদেশ মহারানী! [প্রস্থান

রঘুপতির প্রবেশ

গুণবতী। ঠাকুর, আমার পূজা ফিরায়ে দিয়েছে
মাতৃদ্বার হতে!

*

রঘুপতি। মহারানী, মা'র পূজা
ফিরে গেছে, নহে সে তোমার। উঞ্ছবৃত্ত
দরিদ্রের ভিক্ষালব্ধ পূজা, রাজেন্দ্রাণী,
তোমার পূজার চেয়ে ন্যূন নহে। কিন্তু,
এই বড়ো সর্বনাশ, মা'র পূজা ফিরে
গেছে। এই বড়ো সর্বনাশ, রাজদর্প
ক্রমে স্ফীত হয়ে, করিতেছে অতিক্রম
পৃথিবীর রাজত্বের সীমা— বসিয়াছে
দেবতার দ্বার রোধ করি, জননীর
ভক্তদের প্রতি দুই আঁখি রাঙাইয়া।

গুণবতী। কী হবে ঠাকুর!

রঘুপতি। জানেন তা মহামায়া।
এই শুধু জানি— যে সিংহাসনের ছায়া
পড়েছে মায়ের দ্বারে, ফুৎকারে ফাটিবে
সেই দম্ভমঞ্চখানি জলবিম্বসম।
যুগে যুগে রাজপিতাপিতামহ মিলে
ঊর্ধ্ব-পানে তুলিয়াছে যে রাজমহিমা
অভ্রভেদী ক'রে, মুহূর্তে হইয়া যাবে
ধূলিসাৎ, বজ্রদীর্ণ, দগ্ধ, ঝঞ্ঝাহত।

গুণবতী। রক্ষা করো, রক্ষা করো প্রভু!

রঘুপতি। হা হা! আমি
রক্ষা করিব তোমারে! যে প্রবল রাজা
স্বর্গে মর্তে প্রচারিছে আপন শাসন
তুমি তাঁরি রানী! দেব-ব্রাহ্মণেরে যিনি—
ধিক্, ধিক্ শতবার! ধিক্ লক্ষবার!
কলির ব্রাহ্মণে ধিক্। ব্রহ্মশাপ কোথা!
ব্যর্থ ব্রহ্মতেজ শুধু বক্ষে আপনার
আহত বৃশ্চিক-সম আপনি দংশিছে!
মিথ্যা ব্রহ্ম-আড়ম্বর!

পৈতা ছিঁড়িতে উদ্যত

গুণবতী। কী কর! কী কর
দেব! রাখো, রাখো, দয়া করো নির্দোষীরে!

রঘুপতি। ফিরায়ে দে ব্রাহ্মণের অধিকার।

গুণবতী। দিব।
যাও প্রভু, পূজা করো মন্দিরেতে গিয়ে,
হবে নাকো পূজার ব্যাঘাত।

রঘুপতি। যে আদেশ
রাজ-অধীশ্বরী! দেবতা কৃতার্থ হল
তোমারি আদেশ-বলে, ফিরে পেল পুন
ব্রাহ্মণ আপন তেজ! ধন্য তোমরাই,
যতদিন নাহি জাগে কল্কি-অবতার। [প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্যের পুনঃপ্রবেশ

গোবিন্দমাণিক্য। অপ্রসন্ন প্রেয়সীর মুখ, বিশ্বমাঝে
সব আলো সব সুখ লুপ্ত করে রাখে।
উন্মনা-উৎসুক-চিত্তে ফিরে ফিরে আসি।

গুণবতী। যাও, যাও, এসো না এ গৃহে। অভিশাপ
আনিয়ো না হেথা।

গোবিন্দমাণিক্য। প্রিয়তমে, প্রেমে করে
অভিশাপ নাশ, দয়া করে অকল্যাণ
দূর। সতীর হৃদয় হতে প্রেম গেলে
পতিগৃহে লাগে অভিশাপ।— যাই তবে
দেবী!

গুণবতী। যাও! ফিরে আর দেখায়ো না মুখ।

গোবিন্দমাণিক্য। স্মরণ করিবে যবে, আবার আসিব। [প্রস্থানোন্মুখ

পায়ে পড়িয়া

গুণবতী। ক্ষমা করো, ক্ষমা করো নাথ! এতই কি
হয়েছ নিষ্ঠুর, রমণীর অভিমান
ঠেলে চলে যাবে? জান না কি প্রিয়তম,
ব্যর্থ প্রেম দেখা দেয় রোষের ধরিয়া

ছদ্মবেশ ! ভালো, আপনার অভিমানে
আপনি করিনু অপমান। ক্ষমা করো !

গোবিন্দমাণিক্য। প্রিয়তমে, তোমা-'পরে টুটিলে বিশ্বাস
সেই দণ্ডে টুটিত জীবনবন্ধ। জানি
প্রিয়ে, মেঘ ক্ষণিকের, চিরদিবসের
সূর্য।

গুণবতী। মেঘ ক্ষণিকের। এ মেঘ কাটিয়া
যাবে, বিধির উদ্যত বজ্র ফিরে যাবে,
চিরদিবসের সূর্য উঠিবে আবার
চিরদিবসের প্রথা জাগায়ে জগতে,
অভয় পাইবে সর্বলোক— ভুলে যাবে
দু দণ্ডের দুঃস্বপন। সেই আজ্ঞা করো।
ব্রাহ্মণ ফিরিয়া পাক নিজ অধিকার,
দেবী নিজ পূজা, রাজদণ্ড ফিরে যাক
নিজ অপ্রমত্ত মর্ত-অধিকার-মাঝে।

গোবিন্দমাণিক্য। ধর্মহানি ব্রাহ্মণের নহে অধিকার।
অসহায় জীবরক্ত নহে জননীর
পূজা। দেবতার আজ্ঞা পালন করিতে
রাজা বিপ্র সকলেরই আছে অধিকার।

গুণবতী। ভিক্ষা, ভিক্ষা চাই ! একান্ত মিনতি করি
চরণে তোমার প্রভু ! চিরাগত প্রথা
চিরপ্রবাহিত মুক্ত সমীরণ-সম,
নহে তা রাজার ধন— তাও জোড়করে
সমস্ত প্রজার নামে ভিক্ষা মাগিতেছে
মহিষী তোমার। প্রেমের দোহাই মানো
প্রিয়তম ! বিধাতাও করিবেন ক্ষমা
প্রেম-আকর্ষণ-বশে কর্তব্যের ত্রুটি।

গোবিন্দমাণিক্য। এই কি উচিত মহারানী ! নীচ স্বার্থ,
নিষ্ঠুর ক্ষমতাদর্প, অন্ধ অজ্ঞানতা,
চিররক্তপানে স্ফীত হিংস্র বৃদ্ধ প্রথা—

সহস্র শত্রুর সাথে একা যুদ্ধ করি ;
শ্রান্তদেহে আসি গৃহে নারীচিত্ত হতে
অমৃত করিতে পান ; সেথাও কি নাই
দয়াসুধা ! গৃহমাঝে পুণ্যপ্রেম বহে,
তারো সাথে মিশিয়াছে রক্তধারা ! এত
রক্তস্রোত কোন্ দৈত্য দিয়েছে খুলিয়া—
ভক্তিতে প্রেমেতে রক্ত মাখামাখি হয়,
ক্রূর হিংসা দয়াময়ী রমণীর প্রাণে
দিয়ে যায় শোণিতের ছাপ ! এ শোণিতে
তবু করিব না রোধ !

মুখ ঢাকিয়া

গুণবতী। যাও, যাও তুমি !

গোবিন্দমাণিক্য। হায় মহারানী, কর্তব্য কঠিন হয়
তোমরা ফিরালে মুখ। [প্রস্থান

কাঁদিয়া উঠিয়া

গুণবতী। ওরে অভাগিনী,
এতদিন এ কী ভ্রান্তি পুষেছিলি মনে !
ছিল না সংশয়মাত্র ব্যর্থ হবে আজ
এত অনুরোধ, এত অনুনয়, এত
অভিমান। ধিক্, কী সোহাগে পুত্রহীনা
পতিরে জানায় অভিমান ! ছাই হোক
অভিমান তোর ! ছাই এ কপাল ! ছাই
মহিষীগরব ! আর নহে প্রেমখেলা,
সোহাগক্রন্দন। বুঝিয়াছি আপনার
স্থান— হয় ধূলিতলে নতশির, নয়
ঊর্ধ্বফণা ভুজঙ্গিনী আপনার তেজে।

পঞ্চম দৃশ্য

মন্দির

একদল লোকের প্রবেশ

নেপাল। কোথায় হে, তোমাদের তিন-শো পাঁঠা, এক-শো-এক মোষ! একটা টিকটিকির ছেঁড়া নেজটুকু পর্যন্ত দেখবার জো নেই। বাজনাবাদ্যি গেল কোথায়, সব যে হাঁ-হাঁ করছে। খরচপত্র করে পুজো দেখতে এলুম, আচ্ছা শাস্তি হয়েছে!

গণেশ। দেখ্, মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে অমন করে বলিস নে। মা পাঁঠা পায় নি, এবার জেগে উঠে তোদের এক-একটাকে ধরে ধরে মুখে পুরবে।

হারু। কেন! গেল বছরে বাছারা সব ছিলে কোথায়? আর, সেই ও বছর, যখন ব্রত সাঙ্গ করে রানীমা পুজো দিয়েছিল, তখন কি তোদের পায়ে কাঁটা ফুটেছিল? তখন একবার দেখে যেতে পারো নি? রক্তে যে গোমতী রাঙা হয়ে গিয়েছিল। আর অলুক্ষুনে বেটারা এসেছিস, আর মায়ের খোরাক পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল! তোদের এক-একটাকে ধরে মা'র কাছে নিবেদন করে দিলে মনের খেদ মেটে।

কানু। আর ভাই, মিছে রাগ করিস। আমাদের কি আর বলবার মুখ আছে! তা হলে কি আর দাঁড়িয়ে ওর কথা শুনি!

হারু। তা যা বলিস ভাই, অল্পেতেই আমার রাগ হয় সে কথা সত্যি। সেদিন ও ব্যক্তি শালা পর্যন্ত উঠেছিল, তার বেশি যদি একটা কথা বলত, কিম্বা আমার গায়ে হাত দিত, মাইরি বলছি, তা হলে আমি—

নেপাল। তা, চল্-না দেখি, কার হাড়ে কত শক্তি আছে।

হারু। তা, আয়-না। জানিস? এখানকার দফাদার আমার মামাতো ভাই হয়।

নেপাল। তা, নিয়ে আয় তোর মামাকে সুদ্ধ নিয়ে আয়, তোর দফাদারের দফা নিকেশ করে দিই।

হারু। তোমরা সকলেই শুনলে!

গণেশ ও কানু। আর দূর কর্ ভাই, ঘরে চল্। আজ আর কিছুতে গা লাগছে না। এখন তোদের তামাশা তুলে রাখ্।

হারু। এ কি তামাশা হল! আমার মামাকে নিয়ে তামাশা! আমাদের দফাদারের আপনার বাবাকে নিয়ে—

গণেশ ও কানু। আর রেখে দে! তোর আপনার বাবা নিয়ে তুই আপনি মর্।

[সকলের প্রস্থান

রঘুপতি নয়নরায় ও জয়সিংহের প্রবেশ

রঘুপতি। মা'র 'পরে ভক্তি নাই তব ?

নয়নরায়। হেন কথা
কার সাধ্য বলে! ভক্তবংশে জন্ম মোর।

রঘুপতি। সাধু, সাধু! তবে তুমি মায়ের সেবক,
আমাদেরই লোক।

নয়নরায়। প্রভু, মাতৃভক্ত যাঁরা
আমি তাঁহাদেরই দাস।

রঘুপতি। সাধু! ভক্তি তব
হউক অক্ষয়। ভক্তি তব বাহুমাঝে
করুক সঞ্চার অতি দুর্জয় শকতি।
ভক্তি তব তরবারি করুক শাণিত,
বজ্রসম দিক তাহে তেজ। ভক্তি তব
হৃদয়েতে করুক বসতি, পদমান
সকলের উচ্চে।

নয়নরায়। ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ
ব্যর্থ হইবে না।

রঘুপতি। শুন তবে সেনাপতি,
তোমার সকল বল করো একত্রিত
মা'র কাজে। নাশ করো মাতৃবিদ্রোহীরে।

নয়নরায়। যে আদেশ প্রভু! কে আছে মায়ের শত্রু ?

রঘুপতি। গোবিন্দমাণিক্য।

নয়নরায়। আমাদের মহারাজ!

রঘুপতি। লয়ে তব সৈন্যদল, আক্রমণ করো
তারে।

নয়নরায়। ধিক্ পাপ-পরামর্শ! প্রভু, এ কি
পরীক্ষা আমারে ?

রঘুপতি। পরীক্ষাই বটে। কার
ভৃত্য তুমি, এবার পরীক্ষা হবে তার।
ছাড়ো চিন্তা, ছাড়ো দ্বিধা, কাল নাহি আর—
ত্রিপুরেশ্বরীর আজ্ঞা হতেছে ধ্বনিত
প্রলয়ের শৃঙ্গ-সম— ছিন্ন হয়ে গেছে
আজি সকল বন্ধন।

নয়নরায়। নাই চিন্তা, নাই
কোনো দ্বিধা। যে পদে রেখেছে দেবী, আমি
তাহে রয়েছি অটল।

রঘুপতি। সাধু!

নয়নরায়। এত আমি
নরাধম জননীর সেবকের মাঝে!
মোর 'পরে হেন আজ্ঞা! আমি হব
বিশ্বাসঘাতক! আপনি দাঁড়ায়ে আছে
বিশ্বমাতা হৃদয়ের বিশ্বাসের 'পরে,
সেই তাঁর অটল আসন— আপনি তা
ভাঙিতে বলিবে দেবী আপনার মুখে?
তাহা হলে আজ যাবে রাজা, কাল দেবী—
মনুষ্যত্ব ভেঙে পড়ে যাবে জীর্ণভিত্তি
অট্টালিকা-সম।

জয়সিংহ। ধন্য, সেনাপতি, ধন্য!

রঘুপতি। ধন্য বটে তুমি। কিন্তু একি ভ্রান্তি তব!
যে রাজা বিশ্বাসঘাতী জননীর কাছে,
তার সাথে বিশ্বাসের বন্ধন কোথায়?

নয়নরায়। কী হইবে মিছে তর্কে? বুদ্ধির বিপাকে
চাহি না পড়িতে। আমি জানি এক পথ
আছে— সেই পথ বিশ্বাসের পথ। সেই
সিধে পথ বেয়ে চিরদিন চলে যাবে
অবোধ অধম ভৃত্য এ নয়নরায়। [প্রস্থান

জয়সিংহ। চিন্তা কেন দেব? এমনি বিশ্বাসবলে

মোরাও করিব কাজ। কারে ভয় প্রভু!
সৈন্যবলে কোন্ কাজ! অস্ত্র কোন্ ছার!
যার 'পরে রয়েছে যে ভার, বল তার
আছে সে কাজের। করিবই মা'র পূজা
যদি সত্য মায়ের সেবক হই মোরা।
চলো প্রভু, বাজাই মায়ের ডঙ্কা, ডেকে
আনি পুরবাসীগণে, মন্দিরের দ্বার
খুলে দিই!— ওরে, আয় তোরা, আয়, আয়,
অভয়ার পূজা হবে— নির্ভয়ে আয় রে
তোরা মায়ের সন্তান! আয় পুরবাসী!

[জয়সিংহ ও রঘুপতির প্রস্থান

পুরবাসীগণের প্রবেশ

অক্রূর। ওরে, আয় রে আয়!

সকলে। জয় মা!

হারু। আয় রে, মায়ের সামনে বাহু তুলে নৃত্য করি।

গান

উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে।
আমরা নৃত্য করি সঙ্গে।
দশ দিক আঁধার ক'রে মাতিল দিক্‌বসনা,
জ্বলে বহ্নিশিখা রাঙা-রসনা,
দেখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে।
কালো কেশ উড়িল আকাশে,
রবি সোম লুকালো তরাসে।
রাঙা রক্তধারা ঝরে কালো অঙ্গে,
ত্রিভুবন কাঁপে ভুরুভঙ্গে।

সকলে। জয় মা!

গণেশ। আর ভয় নেই।

কানু। ওরে, সেই দক্ষিণদ'র মানুষগুলো এখন গেল কোথায়?

গণেশ। মায়ের ঐশ্বর্য বেটাদের সইল না। তারা ভেগেছে।

হারু। কেবল মায়ের ঐশ্বর্য নয়, আমি তাদের এমনি শাসিয়ে দিয়েছি, তারা আর এমুখো হবে না। বুঝলে অক্রূরদা, আমার মামাতো ভাই দফাদারের নাম করবা-মাত্র তাদের মুখ চুন হয়ে গেল।

অক্রূর। আমাদের নিতাই সেদিন তাদের খুব কড়া কড়া ছুটো কথা শুনিয়ে দিয়েছিল। ওই যার সেই ছুঁচোপারা মুখ সেই বেটা তেড়ে উত্তর দিতে এসেছিল; আমাদের নিতাই বললে, 'ওরে, তোরা দক্ষিণদেশে থাকিস, তোরা উত্তরের কী জানিস? উত্তর দিতে এসেছিস, উত্তরের জানিস কী?' শুনে আমরা হেসে কে কার গায়ে পড়ি।

গণেশ। ইদিকে ঐ ভালোমানুষটি, কিন্তু নিতাইয়ের সঙ্গে কথায় আঁটবার জো নেই।

হারু। নিতাই আমার পিসে হয়।

কানু। শোনো একবার কথা শোনো। নিতাই আবার তোর পিসে হল কবে?

হারু। তোমরা আমার সকল কথাই ধরতে আরম্ভ করেছ! আচ্ছা, পিসে নয় তো পিসে নয়। তাতে তোমার সুখটা কী হল? আমার হল না বলে কি তোমারই পিসে হল?

রঘুপতি ও জয়সিংহের প্রবেশ

রঘুপতি। শুনলুম সৈন্য আসছে। জয়সিংহ অস্ত্র নিয়ে তুমি এইখানে দাঁড়াও। তোরা আয়, তোরা এইখানে দাঁড়া! মন্দিরের দ্বার আগলাতে হবে। আমি তোদের অস্ত্র এনে দিচ্ছি।

গণেশ। অস্ত্র কেন ঠাকুর?

রঘুপতি। মায়ের পুজো বন্ধ করবার জন্যে রাজার সৈন্য আসছে।

হারু। সৈন্য আসছে! প্রভু, তবে আমরা প্রণাম হই।

কানু। আমরা ক'জনা, সৈন্য এলে কী করতে পারব?

হারু। করতে সবই পারি— কিন্তু সৈন্য এলে এখেনে জায়গা হবে কোথায়! লড়াই তো পরের কথা, এখানে দাঁড়াব কোন্‌খানে!

অক্রূর। তোর কথা রেখে দে। দেখছিস নে প্রভু রাগে কাঁপছেন?— তা ঠাকুর, অনুমতি করেন তো আমাদের দলবল সমস্ত ডেকে নিয়ে আসি।

হারু। সেই ভালো। অমনি আমার মামাতো ভাইকে ডেকে আনি। কিন্তু, আর একটুও বিলম্ব করা উচিত নয়। [সকলের প্রস্থানোদ্যম

সরোষে

রঘুপতি। দাঁড়া তোরা!

করজোড়ে

জয়সিংহ। যেতে দাও প্রভু— প্রাণভয়ে ভীত এরা
বুদ্ধিহীন, আগে হতে রয়েছে মরিয়া।
আমি আছি মায়ের সৈনিক। এক দেহে
সহস্র সৈন্যের বল। অস্ত্র থাক্ পড়ে।
ভীরুদের যেতে দাও।

স্বগত

রঘুপতি। সে কাল গিয়েছে।
অস্ত্র চাই, অস্ত্র চাই— শুধু ভক্তি নয়।

প্রকাশ্যে

জয়সিংহ, তবে বলি আনো, করি পূজা।

বাহিরে বাদ্যোদ্যম

জয়সিংহ। সৈন্য নহে প্রভু, আসিছে রানীর পূজা।

রানীর অনুচর ও পুরবাসীগণের প্রবেশ

সকলে। ওরে, ভয় নেই— সৈন্য কোথায়! মা'র পূজা আসছে।
হারু। আমরা আছি খবর পেয়েছে, সৈন্যেরা শীঘ্র এ দিকে আসছে না।
কানু। ঠাকুর, রানীমা পুজো পাঠিয়েছেন।
রঘুপতি। জয়সিংহ, শীঘ্র পূজার আয়োজন করো। [জয়সিংহের প্রস্থান

পুরবাসীগণের নৃত্যগীত। গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

গোবিন্দমাণিক্য। চলে যাও হেথা হতে— নিয়ে যাও বলি।
রঘুপতি, শোনো নাই আদেশ আমার?
রঘুপতি। শুনি নাই।
গোবিন্দমাণিক্য। তবে তুমি এ রাজ্যের নহ।
রঘুপতি। নহি আমি। আমি আছি যেথা, সেথা এলে
রাজদণ্ড খসে যায় রাজহস্ত হতে,
মুকুট ধুলায় পড়ে লুটে। কে আছিস,
আন্ মার পূজা।

বাদ্যোদ্যম

গোবিন্দমাণিক্য। চুপ কর্‌!

অনুচরের প্রতি

কোথা আছে
সেনাপতি, ডেকে আন্‌! হায় রঘুপতি,
অবশেষে সৈন্য দিয়ে ঘিরিতে হইল
ধর্ম! লজ্জা হয় ডাকিতে সৈনিকদল,
বাহুবল দুর্বলতা করায় স্মরণ।

রঘুপতি। অবিশ্বাসী, সত্যই কি হয়েছে ধারণা
কলিযুগে ব্রহ্মতেজ গেছে— তাই এত
দুঃসাহস? যায় নাই। যে দীপ্ত অনল
জলিছে অন্তরে, সে তোমার সিংহাসনে
নিশ্চয় লাগিবে। নতুবা এ মনানলে
ছাই করে পুড়াইব সব শাস্ত্র, সব
ব্রহ্মগর্ব, সমস্ত তেত্রিশ কোটি মিথ্যা।
আজ নহে মহারাজ, রাজ-অধিরাজ,
এই দিন মনে কোরো আর-এক দিন।

নয়নরায় ও চাঁদপালের প্রবেশ

নয়নের প্রতি

গোবিন্দমাণিক্য। সৈন্য লয়ে থাকো হেথা নিষেধ করিতে
জীববলি।

নয়নরায়। ক্ষমা করো অধম কিংকরে।
অক্ষম রাজার ভৃত্য দেবতামন্দিরে।
যতদূর যেতে পারে রাজার প্রতাপ,
মোরা ছায়া সঙ্গে যাই।

চাঁদপাল। থামো সেনাপতি,
দীপশিখা থাকে এক ঠাঁই, দীপালোক
যায় বহুদূরে। রাজ-ইচ্ছা যেথা যাবে
সেথা যাব মোরা।

গোবিন্দমাণিক্য। সেনাপতি, মোর আজ্ঞা
তোমার বিচারাধীন নহে। ধর্মাধর্ম

লাভক্ষতি রহিল আমার, কার্য শুধু
তব হাতে।

নয়নরায়। এ কথা হৃদয় নাহি মানে।
মহারাজ, ভৃত্য বটে, তবুও মানুষ
আমি। আছে বুদ্ধি, আছে ধর্ম, আছ প্রভু,
আছেন দেবতা।

গোবিন্দমাণিক্য। তবে ফেলো অস্ত্র তব।
চাঁদপাল, তুমি হলে সেনাপতি, দুই
পদ রহিল তোমার। সাবধানে সৈন্য
লয়ে মন্দির করিবে রক্ষা।

চাঁদপাল। যে আদেশ
মহারাজ!

গোবিন্দমাণিক্য। নয়ন, তোমার অস্ত্র দাও
চাঁদপালে।

নয়নরায়। চাঁদপালে! কেন মহারাজ!
এ অস্ত্র তোমার পূর্ব রাজপিতামহ
দিয়েছেন আমাদের পিতামহে। ফিরে
নিতে চাও যদি, তুমি লও। স্বর্গে আছ
তোমরা হে পিতৃপিতামহ, সাক্ষী থাকো
এতদিন যে রাজবিশ্বাস পালিয়াছ
বহু যত্নে, সাগ্নিকের পুণ্য অগ্নি-সম,
যার ধন তারি হাতে ফিরে দিনু আজ
কলঙ্কবিহীন।

চাঁদপাল। কথা আছে ভাই!

নয়নরায়। ধিক্!
চুপ করো! মহারাজ, বিদায় হলেম।

[প্রণামপূর্বক প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্য। ক্ষুদ্র স্নেহ নাই রাজকাজে। দেবতার
কার্যভার তুচ্ছ মানবের 'পরে, হায়,
কী কঠিন!

রঘুপতি। এমনি করিয়া ব্রহ্মশাপ
ফলে, বিশ্বাসী হৃদয় ক্রমে দূরে যায়,
ভেঙে যায় দাঁড়াবার স্থান।

জয়সিংহের প্রবেশ

জয়সিংহ। আয়োজন
হয়েছে পূজার। প্রস্তুত রয়েছে বলি।

গোবিন্দমাণিক্য। বলি কার তরে?

জয়সিংহ। মহারাজ, তুমি হেথা!
তবে শোনো নিবেদন— একান্ত মিনতি
যুগল চরণতলে, প্রভু, ফিরে লও
তব গর্বিত আদেশ। মানব হইয়া
দাঁড়ায়ো না দেবীরে আচ্ছন্ন করি—

রঘুপতি। ধিক্!
জয়সিংহ, ওঠো, ওঠো! চরণে পতিত
কার কাছে? আমি যার গুরু, এ সংসারে
এই পদতলে তার একমাত্র স্থান।
মূঢ়, ফিরে দেখ্— গুরুর চরণ ধরে
ক্ষমা ভিক্ষা কর্। রাজার আদেশ নিয়ে
করিব দেবীর পূজা, করালকালিকা,
এত কি হয়েছে তোর অধঃপাত! থাক্
পূজা, থাক্ বলি— দেখিব রাজার দর্প
কতদিন থাকে। চলে এসো জয়সিংহ!

[রঘুপতি ও জয়সিংহের প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্য। এ সংসারে বিনয় কোথায়! মহাদেবী,
যারা করে বিচরণ তব পদতলে
তারাও শেখে নি হায় কত ক্ষুদ্র তারা!
হরণ করিয়া লয়ে তোমার মহিমা
আপনার দেহে বহে, এত অহংকার!

[প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দির

রঘুপতি জয়সিংহ ও নক্ষত্ররায়

নক্ষত্ররায়। কী জন্য ডেকেছ গুরুদেব ?

রঘুপতি। কাল রাত্রে
স্বপন দিয়েছে দেবী, তুমি হবে রাজা।

নক্ষত্ররায়। আমি হব রাজা ! হা হা ! বল কী ঠাকুর !
রাজা হব ? এ কথা নূতন শোনা গেল !

রঘুপতি। তুমি রাজা হবে।

নক্ষত্ররায়। বিশ্বাস না হয় মোর।

রঘুপতি। দেবীর স্বপন সত্য। রাজটিকা পাবে
তুমি, নাহিকো সন্দেহ।

নক্ষত্ররায়। নাহিকো সন্দেহ !
কিন্তু, যদি নাই পাই ?

রঘুপতি। আমার কথায়
অবিশ্বাস ?

নক্ষত্ররায়। অবিশ্বাস কিছুমাত্র নেই,
কিন্তু দৈবাতের কথা— যদি নাই হয় !

রঘুপতি। অন্যথা হবে না কভু।

নক্ষত্ররায়। অন্যথা হবে না ?
দেখো প্রভু, কথা যেন ঠিক থাকে শেষে।
রাজা হয়ে মন্ত্রীটারে দেব দূর করে,
সর্বদাই দৃষ্টি তার রয়েছে পড়িয়া
আমা-'পরে, যেন সে বাপের পিতামহ।
বড়ো ভয় করি তারে— বুঝেছ ঠাকুর ?
তোমারে করিব মন্ত্রী।

রঘুপতি। মন্ত্রিত্বের পদে
পদাঘাত করি আমি।

নক্ষত্ররায়। আচ্ছা, জয়সিংহ
মন্ত্রী হবে। কিন্তু, হে ঠাকুর, সবই যদি
জানো তুমি, বলো দেখি কবে রাজা হব।

রঘুপতি। রাজরক্ত চান দেবী।

নক্ষত্ররায়। রাজরক্ত চান!

রঘুপতি। রাজরক্ত আগে আনো, পরে রাজা হবে।

নক্ষত্ররায়। পাব কোথা!

রঘুপতি। ঘরে আছে গোবিন্দমাণিক্য।
তাঁরি রক্ত চাই।

নক্ষত্ররায়। তাঁরি রক্ত চাই!

রঘুপতি। স্থির
হয়ে থাকো জয়সিংহ, হোয়ো না চঞ্চল!—
বুঝেছ কি? শোনো তবে— গোপনে তাঁহারে
বধ ক'রে, আনিবে সে তপ্ত রাজরক্ত
দেবীর চরণে।—
জয়সিংহ, স্থির যদি
না থাকিতে পারো, চলে যাও অন্য ঠাঁই।—
বুঝেছ নক্ষত্ররায়? দেবীর আদেশ,
রাজরক্ত চাই— শ্রাবণের শেষ রাত্রে।
তোমরা রয়েছ দুই রাজভ্রাতা— জ্যেষ্ঠ
যদি অব্যাহতি পায়, তোমার শোণিত
আছে। তৃষিত হয়েছে যবে মহাকালী,
তখন সময় আর নাই বিচারের।

নক্ষত্ররায়। সর্বনাশ! হে ঠাকুর, কাজ কী রাজত্বে!
রাজরক্ত থাক্ রাজদেহে, আমি যাহা
আছি সেই ভালো।

রঘুপতি। মুক্তি নাই, মুক্তি নাই
কিছুতেই! রাজরক্ত আনিতেই হবে!

নক্ষত্ররায়। বলে দাও, হে ঠাকুর, কী করিতে হবে।
রঘুপতি। প্রস্তুত হইয়া থাকো। যখন যা বলি
অবিলম্বে করিবে সাধন ; কার্যসিদ্ধি
যতদিন নাহি হয়, বন্ধ রেখো মুখ।
এখন বিদায় হও।
নক্ষত্ররায়। হে মা কাত্যায়নী!

[প্রস্থান

জয়সিংহ। একি শুনিলাম! দয়াময়ী মাতঃ, একি
কথা! তোর আজ্ঞা! ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা!
বিশ্বের জননী!— গুরুদেব! হেন আজ্ঞা
মাতৃ-আজ্ঞা ব'লে করিলে প্রচার!
রঘুপতি। আর
কী উপায় আছে বলো।
জয়সিংহ। উপায়! কিসের
উপায় প্রভু! হা ধিক্! জননী, তোমার
হস্তে খড়্গ নাই? রোষে তব বজ্রানল
নাহি চণ্ডী? তব ইচ্ছা উপায় খুঁজিছে,
খুঁড়িছে সুরঙ্গপথ চোরের মতন
রসাতলগামী? একি পাপ!
রঘুপতি। পাপপুণ্য
তুমি কিবা জানো!
জয়সিংহ। শিখেছি তোমারি কাছে।
রঘুপতি। তবে এসো বৎস, আর-এক শিক্ষা দিই।
পাপপুণ্য কিছু নাই। কে বা ভ্রাতা, কে বা
আত্মপর! কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ!
এ জগৎ মহা হত্যাশালা। জানো না কি
প্রত্যেক পলকপাতে লক্ষকোটি প্রাণী
চির আঁখি মুদিতেছে! সে কাহার খেলা?
হত্যায় খচিত এই ধরণীর ধূলি।
প্রতিপদে চরণে দলিত শত কীট—

*

তাহারা কী জীব নহে ? রক্তের অক্ষরে
অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল
বিশ্বপত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস।
হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে,
হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে, কীটের গহ্বরে,
অগাধ সাগর-জলে, নির্মল আকাশে,
হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে,
হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে—
চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে
ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রাণপণে, ব্যাঘ্রের আক্রমে
মৃগসম, মুহূর্ত দাঁড়াতে নাহি পারে।
মহাকালী কালস্বরূপিণী, রয়েছেন
দাঁড়াইয়া তৃষাতীক্ষ্ণ লোলজিহ্বা মেলি—
বিশ্বের চৌদিক বেয়ে চির রক্তধারা
ফেটে পড়িতেছে, নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা হতে
রসের মতন, অনন্ত খর্পরে তাঁর—

জয়সিংহ। থামো, থামো, থামো !—

মায়াবিনী, পিশাচিনী,
মাতৃহীন এ সংসারে এসেছিস তুই
মা'র ছদ্মবেশ ধরে রক্তপানলোভে ?
ক্ষুধিত বিহঙ্গশিশু অরক্ষিত নীড়ে
চেয়ে থাকে মা'র প্রত্যাশায়, কাছে আসে
লুব্ধ কাক, ব্যগ্রকণ্ঠে অন্ধ শাবকেরা
মা মনে করিয়া তারে করে ডাকাডাকি,
হারায় কোমল প্রাণ হিংস্রচঞ্চুঘাতে—
তেমনি কি তোর ব্যবসায় ? প্রেম মিথ্যা,
স্নেহ মিথ্যা, দয়া মিথ্যা, মিথ্যা আর-সব,
সত্য শুধু অনাদি অনন্ত হিংসা ! তবে
কেন মেঘ হতে, ঝরে আশীর্বাদসম
বৃষ্টিধারা দগ্ধ ধরণীর বক্ষ-'পরে—

গ'লে আসে পাষাণ হইতে দয়াময়ী
স্রোতস্বিনী মরুমাঝে— কোটি কণ্টকের
শিরোভাগে, কেন ফুল ওঠে বিকশিয়া ?
ছলনা করেছ মোরে প্রভু ! দেখিতেছ
মাতৃভক্তি রক্তসম হৃদয় টুটিয়া
ফেটে পড়ে কিনা আমারি হৃদয় বলি
দিলে মাতৃপদে। ওই দেখো হাসিতেছে
মা আমার স্নেহপরিহাসবশে। বটে,
তুই রাক্ষসী পাষাণী বটে, মা আমার
রক্ত-পিয়াসিনী ! নিবি মা আমার রক্ত,
ঘুচাবি সন্তানজন্ম এ জন্মের তরে—
দিব ছুরী বুকে ? এই শিরা-ছেঁড়া রক্ত
বড়ো কি লাগিবে ভালো ? ওরে, মা আমার
রাক্ষসী পাষাণী বটে ! ডাকিছ কি মোরে
গুরুদেব ? ছলনা বুঝেছি আমি তব।
ভক্তহিয়া-বিদারিত এই রক্ত চাও !
দিয়েছিলে এই-যে বেদনা, তারি পরে
জননীর স্নেহহস্ত পড়িয়াছে। দুঃখ
চেয়ে সুখ শত গুণ। কিন্তু, রাজরক্ত !
ছিছি ! ভক্তিপিপাসিতা মাতা, তাঁরে বলো
রক্তপিপাসিনী !

রঘুপতি। বন্ধ হোক বলিদান
তবে !

জয়সিংহ। হোক বন্ধ।— না না, গুরুদেব, তুমি
জানো ভালোমন্দ। সরল ভক্তির বিধি
শাস্ত্রবিধি নহে। আপন আলোকে আঁখি
দেখিতে না পায়, আলোক আকাশ হতে
আসে। প্রভু, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো দাসে।
ক্ষমা করো স্পর্ধা মূঢ়তার। ক্ষমা করো
নিতান্ত বেদনাবশে উদ্‌ভ্রান্ত প্রলাপ।

বলো প্রভু, সত্যই কি রাজরক্ত চান
মহাদেবী ?

রঘুপতি। হায় বৎস, হায়! অবশেষে
অবিশ্বাস মোর প্রতি ?

জয়সিংহ। অবিশ্বাস ? কভু
নহে। তোমারে ছাড়িলে, বিশ্বাস আমার
দাঁড়াবে কোথায় ? বাসুকির শিরশ্চ্যুত
বসুধার মতো, শূন্য হতে শূন্যে পাবে
লোপ। রাজরক্ত চায় তবে মহামায়া,
সে রক্ত আনিব আমি। দিব না ঘটিতে
ভ্রাতৃহত্যা।

রঘুপতি। দেবতার আজ্ঞা পাপ নহে।

জয়সিংহ। পুণ্য তবে, আমিই সে করিব অর্জন।

রঘুপতি। সত্য করে বলি, বৎস, তবে। তোরে আমি
ভালোবাসি প্রাণের অধিক— পালিয়াছি
শিশুকাল হতে তোরে, মায়ের অধিক
স্নেহে— তোরে আমি নারিব হারাতে।

জয়সিংহ। মোর
স্নেহে ঘটিতে দিব না পাপ, অভিশাপ
আনিব না এ স্নেহের 'পরে।

রঘুপতি। ভালো ভালো,
সে কথা হইবে পরে— কল্য হবে স্থির।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দির

অপর্ণা

গান

ওগো পুরবাসী,
আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী।

জয়সিংহ, কোথা জয়সিংহ! কেহ নাই
এ মন্দিরে। তুমি কে দাঁড়ায়ে আছ হোথা
অচল মুরতি— কোনো কথা না বলিয়া
হরিতেছ জগতের সার-ধন যত!
আমরা যাহার লাগি কাতর কাঙাল
ফিরে মরি পথে পথে, সে আপনি এসে
তব পদতলে করে আত্মসমর্পণ!
তাহে তোর কোন্ প্রয়োজন! কেন তারে
কৃপণের ধন-সম রেখে দিস পুঁতে
মন্দিরের তলে— দরিদ্র এ সংসারের
সর্ব ব্যবহার হতে করিয়া গোপন!
জয়সিংহ, এ পাষাণী কোন্ সুখ দেয়,
কোন্ কথা বলে তোমা-কাছে, কোন্ চিন্তা
করে তোমা-তরে— প্রাণের গোপন পাত্রে
কোন্ সান্ত্বনাব সুধা চিররাত্রিদিন
রেখে দেয় করিয়া সঞ্চিত!— ওরে চিত্ত
উপবাসী, কার রুদ্ধ দ্বারে আছ বসে?

গান

ওগো পুরবাসী,
আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী।

হেরিতেছি সুখমেলা, ঘরে ঘরে কত খেলা,
শুনিতেছি সারাবেলা সুমধুর বাঁশি।

রঘুপতির প্রবেশ

রঘুপতি। কে রে তুই এ মন্দিরে!
অপর্ণা। আমি ভিখারিনী।
জয়সিংহ কোথা?
রঘুপতি। দূর হ এখান হতে
মায়াবিনী! জয়সিংহে চাহিস কাড়িতে
দেবীর নিকট হতে ওরে উপদেবী!
অপর্ণা। আমা হতে দেবীর কী ভয়? আমি ভয়
করি তারে, পাছে মোর সব করে গ্রাস!

গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

চাহি না অনেক ধন, রব না অধিক ক্ষণ,
যেথা হতে আসিয়াছি সেথা যাব ভাসি—
তোমরা আনন্দে রবে নব নব উৎসবে,
কিছু ম্লান নাহি হবে গৃহভরা হাসি।

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দির-সম্মুখে পথ

জয়সিংহ

জয়সিংহ। দূর হোক চিন্তাজাল! দ্বিধা দূর হোক!
চিন্তার নরক চেয়ে কার্য ভালো, যত
ক্রূর, যতই কঠোর হোক। কার্যের তো
শেষ আছে, চিন্তার সীমানা নাই কোথা—
ধরে সে সহস্র মূর্তি পলকে পলকে

বাষ্পের মতন ; চারি দিকে যতই সে
পথ খুঁজে মরে, পথ তত লুপ্ত হয়ে
যায়। এক ভালো অনেকের চেয়ে। তুমি
সত্য, গুরুদেব, তোমারি আদেশ সত্য—
সত্যপথ তোমারি ইঙ্গিতমুখে। হত্যা
পাপ নহে, ভ্রাতৃহত্যা পাপ নহে, নহে
পাপ রাজহত্যা !— সেই সত্য, সেই সত্য !
পাপপুণ্য নাই, সেই সত্য ! থাক্ চিন্তা,
থাক্ আত্মদাহ, থাক্ বিচার বিবেক !—
কোথা যাও ভাই-সব, মেলা আছে বুঝি
নিশিপুরে ? কুকী রমণীর নৃত্য হবে ?
আমিও যেতেছি।— এ ধরায় কত সুখ
আছে— নিশ্চিন্ত আনন্দসুখে নৃত্য করে
নারীদল, মধুর অঙ্গের রঙ্গভঙ্গ
উচ্ছ্বসিয়া উঠে চারি দিকে, তটপ্লাবী
তরঙ্গিণী-সম। নিশ্চিন্ত আনন্দে সবে
ধায় চারি দিক হতে— উঠে গীতগান,
বহে হাস্যপরিহাস, ধরণীর শোভা
উজ্জ্বল মুরতি ধরে। আমিও চলিনু।

গান

আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে।
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে সঙ্গে তোদের নিয়ে যা রে।
তোরা কোন্ রূপের হাটে, চলেছিস ভবের বাটে
পিছিয়ে আছি আমি আপন ভারে।
তোদের ঐ হাসিখুশি দিবানিশি দেখে মন কেমন করে।
আমার এই বাধা টুটে নিয়ে যা লুটেপুটে,
পড়ে থাক্ মনের বোঝা ঘরের দ্বারে।
যেমন ঐ এক নিমেষে বন্যা এসে
ভাসিয়ে নে যায় পারাবারে।

এত যে আনাগোনা, কে আছে জানাশোনা—
কে আছে নাম ধরে মোর ডাকতে পারে।
যদি সে বারেক এসে দাঁড়ায় হেসে
চিনতে পারি দেখে তারে॥

দূরে অপর্ণার প্রবেশ

ওকিও অপর্ণা, দূরে দাঁড়াইয়া কেন!
শুনিতেছ অবাক হইয়া জয়সিংহ
গান গাহে? সব মিথ্যা, বৃহৎ বঞ্চনা,
তাই হাসিতেছি— তাই গাহিতেছি গান।
ওই দেখো পথ দিয়ে তাই চলিতেছে
লোক নির্ভাবনা, তাই ছোটো কথা নিয়ে
এতই কৌতুকহাসি, এত কুতূহল,
তাই এত যত্নভরে সেজেছে যুবতী।
সত্য যদি হ'ত, তবে হ'ত কি এমন?
সহজে আনন্দ এত বহিত কি হেথা?
তাহা হলে বেদনায় বিদীর্ণ ধরায়,
বিশ্বব্যাপী ব্যাকুল ক্রন্দন থেমে গিয়ে
মূক হয়ে রহিত অনন্তকাল ধরি।
বাঁশি যদি সত্যই কাঁদিত বেদনায়,
ফেটে গিয়ে সংগীত নীরব হত তার!
মিথ্যা বলে তাই এত হাসি— শ্মশানের
কোলে বসে খেলা, বেদনার পাশে শুয়ে
গান, হিংসা-ব্যাঘ্রিণীর খরনখতলে
চলিতেছে প্রতিদিবসের কর্মকাজ!
সত্য হলে এমন কি হত? হা অপর্ণা,
তুমি আমি কিছু সত্য নই, তাই জেনে
সুখী হও— বিষণ্ণ বিস্ময়ে, মুগ্ধ আঁখি
তুলে কেন রয়েছিস চেয়ে! আয় সখী,
চিরদিন চলে যাই দুই জনে মিলে

সংসারের 'পর দিয়ে, শূন্য নভস্তলে
তুই লঘু মেঘখণ্ড-সম।

রঘুপতির প্রবেশ

রঘুপতি। জয়সিংহ!

জয়সিংহ। তোমারে চিনি নে আমি। আমি চলিয়াছি
আমার অদৃষ্টভরে ভেসে নিজ পথে,
পথের সহস্র লোক যেমন চলেছে।
তুমি কে বলিছ মোরে দাঁড়াইতে? তুমি
চলে যাও— আমি চলে যাই।

রঘুপতি। জয়সিংহ!

জয়সিংহ। ওই তো সম্মুখে পথ চলেছে সরল—
চলে যাব ভিক্ষাপাত্র হাতে, সঙ্গে লয়ে
ভিখারিনী সখী মোর। কে বলিল, এই
সংসারের রাজপথ দুরূহ জটিল!
যেমন ক'রেই যাই, দিবা-অবসানে
পঁহুছিব জীবনের অন্তিম পলকে,
আচার বিচার তর্ক বিতর্কের জাল
কোথা মিশে যাবে। ক্ষুদ্র এই পরিশ্রান্ত
নরজন্ম সমর্পিব ধরণীর কোলে—
দু-চারি দিনের এই সমষ্টি আমার,
দু-চারিটা ভুলভ্রান্তি ভয় দুঃখসুখ,
ক্ষীণ হৃদয়ের আশা, দুর্বলতাবশে
ভ্রষ্ট ভগ্ন এ জীবনভার, ফিরে দিয়ে
অনন্তকালের হাতে, গভীর বিশ্রাম।
এই তো সংসার! কী কাজ শাস্ত্রের বিধি,
কী কাজ গুরুতে!

প্রভু! পিতা! গুরুদেব!
কী বলিতেছিনু! স্বপ্নে ছিনু এতক্ষণ।
এই সে মন্দির— ওই সেই মহাবট

দাঁড়ায়ে রয়েছে, অটল কঠিন দৃঢ়
নিষ্ঠুর সত্যের মতো। কী আদেশ দেব!
ভুলি নাই কী করিতে হবে। এই দেখো—

ছুরী দেখাইয়া

তোমার আদেশ-স্মৃতি অন্তরে বাহিরে
হতেছে শাণিত। আরো কী আদেশ আছে
প্রভু!

রঘুপতি। দূর করে দাও ওই বালিকারে
মন্দির হইতে।— মায়াবিনী, জানি আমি
তোদের কুহক।— দূর করে দাও ওরে!

জয়সিংহ। দূর করে দিব? দরিদ্র আমারি মতো
মন্দির-আশ্রিত, আমারি মতন হায়
সঙ্গীহীন, অকণ্টক পুষ্পের মতন
নির্দোষ নিষ্পাপ শুভ্র সুন্দর সরল
সুকোমল বেদনাকাতর, দূর করে
দিতে হবে ওরে? তাই দিব গুরুদেব!
চলে যা অপর্ণা! দয়ামায়া স্নেহপ্রেম
সব মিছে! মরে যা অপর্ণা! সংসারের
বাহিরেতে কিছুই না থাকে যদি, আছে
তবু দয়াময় মৃত্যু। চলে যা অপর্ণা!

অপর্ণা। তুমি চলে এসো জয়সিংহ, এ মন্দির
ছেড়ে, দুইজনে চলে যাই।

জয়সিংহ। দুইজনে
চলে যাই! এ তো স্বপ্ন নয়। একবার
স্বপ্নে মনে করেছিনু স্বপ্ন এ জগৎ।
তাই হেসেছিনু সুখে, গান গেয়েছিনু।
কিন্তু সত্য এ যে। বোলো না সুখের কথা
আর, দেখায়ো না স্বাধীনতা-প্রলোভন—
বন্দী আমি সত্য-কারাগারে।

রঘুপতি। জয়সিংহ,

কাল নাই মিষ্ট আলাপের। দূর করে
দাও ওই বালিকারে।

জয়সিংহ। চলে যা অপর্ণা!

অপর্ণা। কেন যাব!

জয়সিংহ। এই নারী-অভিমান তোর?

অপর্ণা। অভিমান কিছু নাই আর। জয়সিংহ,
তোমার বেদনা, আমার সকল ব্যথা
সব গর্ব চেয়ে বেশি। কিছু মোর নাই
অভিমান।

জয়সিংহ। তবে আমি যাই। মুখ তোর
দেখিব না, যতক্ষণ রহিবি হেথায়।—
চলে যা অপর্ণা!

অপর্ণা। নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ, ধিক্
থাক্ ব্রাহ্মণত্বে তব। আমি ক্ষুদ্র নারী
অভিশাপ দিয়ে গেনু তোরে, এ বন্ধনে
জয়সিংহে পারিবি না বাঁধিয়া রাখিতে। [প্রস্থান

রঘুপতি। বৎস, তোলো মুখ, কথা কও একবার!
প্রাণপ্রিয় প্রাণাধিক, আমার কি প্রাণে
অগাধ সমুদ্রসম স্নেহ নাই! আরো
চাস? আমি আজন্মের বন্ধু, দু দণ্ডের
মায়াপাশ ছিন্ন হয়ে যায় যদি, তাহে
এত ক্লেশ!

জয়সিংহ। থাক্ প্রভু, বোলো না স্নেহের
কথা আর। কর্তব্য রহিল শুধু মনে।
স্নেহপ্রেম তরুলতাপত্রপুষ্পসম
ধরণীর উপরেতে শুধু, আসে যায়
শুকায় মিলায় নব নব স্বপ্নবৎ।
নিম্নে থাকে শুষ্ক রূঢ় পাষাণের স্তূপ
রাত্রিদিন, অনন্ত হৃদয়ভার-সম। [প্রস্থান

রঘুপতি। জয়সিংহ, কিছুতে পাই নে তোর মন,
এত যে সাধনা করি নানা ছলে-বলে। [প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দিরপ্রাঙ্গণ

জনতা

গণেশ। এবারে মেলায় তেমন লোক হল না!

অক্রূর। এবারে আর লোক হবে কী করে? এ তো আর হিঁদুর রাজত্ব রইল না। এ যেন নবাবের রাজত্ব হয়ে উঠল। ঠাকরুনের বলিই বন্ধ হয়ে গেল, তো মেলায় লোক আসবে কী!

কানু। ভাই, রাজার তো এ বুদ্ধি ছিল না, বোধ হয় কিসে তাকে পেয়েছে।

অক্রূর। যদি পেয়ে থাকে তো কোন্ মুসলমানের ভূতে পেয়েছে, নইলে বলি উঠিয়ে দেবে কেন?

গণেশ। কিন্তু যাই বলো, এ রাজ্যের মঙ্গল হবে না।

কানু। পুরুত-ঠাকুর তো স্বয়ং বলে দিয়েছেন, তিন মাসের মধ্যে মড়কে দেশ উচ্ছন্ন যাবে।

হারু। তিন মাস কেন, যেরকম দেখছি তাতে তিন দিনের ভর সইবে না। এই দেখো-না কেন, আমাদের মোধো এই আড়াই বছর ধরে ব্যামোয় ভুগে ভুগে বরাবরই তো বেঁচে এসেছে, ঐ, যেমন বলি বন্ধ হল অমনি মারা গেল।

অক্রূর। না রে, সে তো আজ তিন মাস হল মরেছে।

হারু। নাহয় তিন মাসই হল, কিন্তু এই বছরেই তো মরেছে বটে।

ক্ষান্তমণি। ওগো, তা কেন, আমার ভাসুরপো, সে যে মরবে কে জানত। তিন দিনের জর— ঐ, যেমনি কবিরাজের বড়িটি খাওয়া অমনি চোখ উল্‌টে গেল।

গণেশ। সেদিন মথুরহাটির গঞ্জে আগুন লাগল, একখানি চালা বাকি রইল না!

চিন্তামণি। অত কথায় কাজ কী! দেখো-না কেন, এ বছর ধান যেমন সস্তা হয়েছে এমন আর কোনোবার হয় নি। এ বছর চাষার কপালে কী আছে কে জানে!

হারু। ঐ রে, রাজা আসছে। সকালবেলাতেই আমাদের এমন রাজার মুখ দেখলুম, দিন কেমন যাবে কে জানে। চল্, এখান থেকে সরে পড়ি।

[সকলের প্রস্থান

চাঁদপাল ও গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

চাঁদপাল। মহারাজ, সাবধানে থেকো। চারি দিকে
চক্ষুকর্ণ পেতে আছি, রাজ-ইষ্টানিষ্ট
কিছু না এড়ায় মোর কাছে। মহারাজ,
তব প্রাণহত্যা-তরে গুপ্ত আলোচনা
স্বকর্ণে শুনেছি।

গোবিন্দমাণিক্য। প্রাণহত্যা! কে করিবে?

চাঁদপাল। বলিতে সংকোচ মানি। ভয় হয়, পাছে
সত্যকার ছুরী চেয়ে নিষ্ঠুর সংবাদ
অধিক আঘাত করে রাজার হৃদয়ে।

গোবিন্দমাণিক্য। অসংকোচে বলে যাও। রাজার হৃদয়
সতত প্রস্তুত থাকে আঘাত সহিতে।
কে করেছে হেন পরামর্শ?

চাঁদপাল। যুবরাজ
নক্ষত্ররায়।

গোবিন্দমাণিক্য। নক্ষত্র!

চাঁদপাল। স্বকর্ণে শুনেছি
মহারাজ, রঘুপতি যুবরাজে মিলে
গোপনে মন্দিরে বসে স্থির হয়ে গেছে
সব কথা।

গোবিন্দমাণিক্য। দুই দণ্ডে স্থির হয়ে গেল
আজন্মের বন্ধন টুটিতে! হায় বিধি!

চাঁদপাল। দেবতার কাছে তব রক্ত এনে দেবে—

গোবিন্দমাণিক্য। দেবতার কাছে! তবে আর নক্ষত্রের
নাই দোষ। জানিয়াছি, দেবতার নামে
মনুষ্যত্ব হারায় মানুষ। ভয় নাই,
যাও তুমি কাজে। সাবধানে রব আমি।

[চাঁদপালের প্রস্থান

রক্ত নহে, ফুল আনিয়াছি মহাদেবী!

ভক্তি শুধু— হিংসা নহে, বিভীষিকা নহে।
এ জগতে দুর্বলেরা বড়ো অসহায়
মা জননী, বাহুবল বড়োই নিষ্ঠুর,
স্বার্থ বড়ো ক্রূর, লোভ বড়ো নিদারুণ,
অজ্ঞান একান্ত অন্ধ— গর্ব চলে যায়
অকাতরে ক্ষুদ্রেরে দলিয়া পদতলে।
হেথা স্নেহ-প্রেম অতি ক্ষীণ বৃন্তে থাকে,
পলকে খসিয়া পড়ে স্বার্থের পরশে।
তুমিও, জননী, যদি খড়্গ উঠাইলে,
মেলিলে রসনা, তবে সব অন্ধকার!
ভাই তাই ভাই নহে আর, পতি-প্রতি
সতী বাম, বন্ধু শত্রু, শোণিতে পঙ্কিল
মানবের বাসগৃহ, হিংসা পুণ্য দয়া
নির্বাসিত। আর নহে, আর নহে, ছাড়ো
ছদ্মবেশ। এখনো কি হয় নি সময়?
এখনো কি রহিবে প্রলয়রূপ তব?
এই-যে উঠিছে খড়্গ চারি দিক হতে
মোর শির লক্ষ্য করি, মাতঃ, একি তোরি
চারি ভুজ হতে? তাই হবে! তবে তাই
হোক। বুঝি মোর রক্তপাতে হিংসানল
নিবে যাবে। ধরণীর সহিবে না এত
হিংসা। রাজহত্যা! ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা!
সমস্ত প্রজার বুকে লাগিবে বেদনা,
সমস্ত ভায়ের প্রাণ উঠিবে কাঁদিয়া।
মোর রক্তে হিংসার ঘুচিবে মাতৃবেশ,
প্রকাশিবে রাক্ষসী-আকার। এই যদি
দয়ার বিধান তোর, তবে তাই হোক!

জয়সিংহের প্রবেশ

জয়সিংহ। বল্ চণ্ডী, সত্যই কি রাজরক্ত চাই?
এই বেলা বল্, বল্ নিজ মুখে, বল্

মানবভাষায়, বল্ শীঘ্র— সত্যই কি
রাজরক্ত চাই ?

নেপথ্যে। চাই।

জয়সিংহ। তবে মহারাজ,
নাম লহ ইষ্টদেবতার। কাল তব
নিকটে এসেছে।

গোবিন্দমাণিক্য। কী হয়েছে জয়সিংহ ?

জয়সিংহ। শুনিলে না নিজকর্ণে ? দেবীরে শুধানু
সত্যই কি রাজরক্ত চাই— দেবী নিজে
কহিলেন 'চাই'।

গোবিন্দমাণিক্য। দেবী নহে জয়সিংহ,
কহিলেন রঘুপতি অন্তরাল হতে,
পরিচিত স্বর।

জয়সিংহ। কহিলেন রঘুপতি ?
অন্তরাল হতে ?— নহে নহে, আর নহে !
কেবলি সংশয় হতে সংশয়ের মাঝে
নামিতে পারি নে আর ! যখনি কূলের
কাছে আসি, কে মোরে ঠেলিয়া দেয় যেন
অতলের মাঝে ! সে যে অবিশ্বাস-দৈত্য !
আর নহে ! গুরু হোক কিম্বা দেবী হোক,
একই কথা !—

ছুরিকা-উন্মোচন।··· ছুরী ফেলিয়া

ফুল নে মা ! নে মা ! ফুল নে মা !
পায়ে ধরি, শুধু ফুল নিয়ে হোক তোর
পরিতোষ ! আর রক্ত না মা, আর রক্ত
নয় ! এও যে রক্তের মতো রাঙা, দুটি
জবাফুল ! পৃথিবীর মাতৃবক্ষ ফেটে
উঠিয়াছে ফুটে, সন্তানের রক্তপাতে
ব্যথিত ধরার স্নেহ-বেদনার মতো।
নিতে হবে ! এই নিতে হবে ! আমি

নাহি ডরি তোর রোষ। রক্ত নাহি দিব!
রাঙা' তোর আঁখি! তোল্ তোর খড়্গ! আন্
তোর শ্মশানের দল! আমি নাহি ডরি।

[গোবিন্দমাণিক্যের প্রস্থান

এ কী হল হায়! দেবী গুরু যাহা ছিল
এক দণ্ডে বিসর্জন দিনু— বিশ্বমাঝে
কিছু রহিল না আর!

রঘুপতির প্রবেশ

রঘুপতি। সকল শুনেছি
আমি। সব পণ্ড হল। কী করিলি ওরে
অকৃতজ্ঞ!

জয়সিংহ। দণ্ড দাও প্রভু!

রঘুপতি। সব ভেঙে
দিলি! ব্রহ্মশাপ ফিরাইলি অর্ধপথ
হতে! লঙ্ঘিলি গুরুর বাক্য! ব্যর্থ করে
দিলি দেবীর আদেশ! আপন বুদ্ধিরে
করিলি সকল হতে বড়ো! আজন্মের
স্নেহঋণ শুধিলি এমনি করে!

জয়সিংহ। দণ্ড
দাও পিতা!

রঘুপতি। কোন্ দণ্ড দিব?

জয়সিংহ। প্রাণদণ্ড।

রঘুপতি। নহে। তার চেয়ে গুরুদণ্ড চাই। স্পর্শ
কর্ দেবীর চরণ।

জয়সিংহ। করিনু পরশ।

রঘুপতি। বল্ তবে, 'আমি এনে দিব রাজরক্ত
শ্রাবণের শেষ রাত্রে দেবীর চরণে।'

জয়সিংহ। আমি এনে দিব রাজরক্ত, শ্রাবণের
শেষ রাত্রে দেবীর চরণে।

রঘুপতি। চলে যাও।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দির

জনতা। রঘুপতি ও জয়সিংহ

রঘুপতি। তোরা এখানে সব কী করতে এলি?

সকলে। আমরা ঠাকরুন দর্শন করতে এসেছি।

রঘুপতি। বটে! দর্শন করতে এসেছ? এখনো তোমাদের চোখ দুটো যে আছে সে কেবল বাপের পুণ্যে। ঠাকরুন কোথায়! ঠাকরুন এ রাজ্য ছেড়ে চলে গেছেন। তোরা ঠাকরুনকে রাখতে পারলি কই? তিনি চলে গেছেন।

সকলে। কী সর্বনাশ! সে কী কথা ঠাকুর! আমরা কী অপরাধ করেছি?

নিস্তারিণী। আমার বোনপো'র ব্যামো ছিল বলেই যা আমি ক'দিন পুজো দিতে আসতে পারি নি।

গোবর্ধন। আমার পাঁঠা দুটো ঠাকরুনকেই দেব বলে অনেক দিন থেকে মনে করে রেখেছিলুম, এরই মধ্যে রাজা বলি বন্ধ করে দিলে তো আমি কী করব!

হারু। এই আমাদের গন্ধমাদন যা মানত করেছিল তা মাকে দেয় নি বটে, কিন্তু মাও তো তেমনি তাকে শাস্তি দিয়েছেন। তার পিলে বেড়ে ঢাক হয়ে উঠেছে— আজ ছ'টি মাস বিছানায় প'ড়ে। তা বেশ হয়েছে, আমাদেরই যেন সে মহাজন, তাই বলে কি মাকে ফাঁকি দিতে পারবে!

অক্রূর। চুপ কর্ তোরা। মিছে গোল করিস নে। আচ্ছা ঠাকুর, মা কেন চলে গেলেন, আমাদের কী অপরাধ হয়েছিল?

রঘুপতি। মার জন্যে এক ফোঁটা রক্ত দিতে পারিস নে, এই তো তোদের ভক্তি?

অনেকে। রাজার আজ্ঞা, তা আমরা কী করব?

রঘুপতি। রাজা কে? মার সিংহাসন তবে কি রাজার সিংহাসনের নীচে? তবে এই মাতৃহীন দেশে তোদের রাজাকে নিয়েই থাক্, দেখি তোদের রাজা কী করে রক্ষা করে।

সকলের সভয়ে গুন্‌গুন্ স্বরে কথা

অক্রূর। চুপ কর্।— সন্তান যদি অপরাধ করে থাকে মা তাকে দণ্ড দিক, কিন্তু

*

একেবারে ছেড়ে চলে যাবে এ কি মা'র মতো কাজ ? বলে দাও কী করলে মা ফিরবে।

রঘুপতি। তোদের রাজা যখন রাজ্য ছেড়ে যাবে, মাও তখন রাজ্যে ফিরে পদার্পণ করবে।

নিস্তব্ধভাবে পরস্পরের মুখাবলোকন

রঘুপতি। তবে তোরা দেখবি ? এইখানে আয়। অনেক দূর থেকে অনেক আশা করে ঠাকরুনকে দেখতে এসেছিস, তবে একবার চেয়ে দেখ্।

মন্দিরের দ্বার-উদ্‌ঘাটন। প্রতিমার পশ্চাদ্ভাগ দৃশ্যমান

সকলে। ও কী ! মার মুখ কোন্ দিকে ?

অক্রূর। ওরে, মা বিমুখ হয়েছেন !

সকলে। ও মা, ফিরে দাঁড়া মা ! ফিরে দাঁড়া মা ! ফিরে দাঁড়া মা ! একবার ফিরে দাঁড়া ! মা কোথায় ! মা কোথায় ! আমরা তোকে ফিরিয়ে আনব মা ! আমরা তোকে ছাড়ব না। চাই নে আমাদের রাজা। যাক রাজা ! মরুক রাজা !

রঘুপতির নিকট আসিয়া

জয়সিংহ। প্রভু, আমি কি একটি কথাও কব না ?

রঘুপতি। না।

জয়সিংহ। সন্দেহের কি কোনো কারণ নেই ?

রঘুপতি। না।

জয়সিংহ। সমস্তই কি বিশ্বাস করব ?

রঘুপতি। হাঁ।

অপর্ণার প্রবেশ

পার্শ্বে আসিয়া

অপর্ণা। জয়সিংহ ! এসো জয়সিংহ, শীঘ্র এসো
এ মন্দির ছেড়ে।

জয়সিংহ। বিদীর্ণ হইল বক্ষ।

[রঘুপতি অপর্ণা ও জয়সিংহের প্রস্থান

রাজার প্রবেশ

প্রজাগণ। রক্ষা করো মহারাজ, আমাদের রক্ষা
করো— মাকে ফিরে দাও!

গোবিন্দমাণিক্য। বৎসগণ, করো
অবধান। সেই মোর প্রাণপণ সাধ
জননীরে ফিরে এনে দেব!

প্রজাগণ। জয় হোক
মহারাজ, জয় হোক তব।

গোবিন্দমাণিক্য। একবার
শুধাই তোদের, তোরা কি মায়ের গর্ভে
নিস নি জনম? মাতৃগণ, তোমরা তো
অনুভব করিয়াছ কোমল হৃদয়ে
মাতৃস্নেহসুধা— বলো দেখি মা কি নেই?
মাতৃস্নেহ সব হতে পবিত্র প্রাচীন;
সৃষ্টির প্রথম দণ্ডে মাতৃস্নেহ শুধু
একেলা জাগিয়া বসে ছিল, নতনেত্রে
তরুণ বিশ্বেরে কোলে লয়ে। আজিও সে
পুরাতন মাতৃস্নেহ রয়েছে বসিয়া
ধৈর্যের প্রতিমা হয়ে। সহিয়াছে কত
উপদ্রব, কত শোক, কত ব্যথা, কত
অনাদর— চোখের সম্মুখে ভায়ে ভায়ে
কত রক্তপাত, কত নিষ্ঠুরতা, কত
অবিশ্বাস— বাক্যহীন বেদনা বহিয়া
তবু সে জননী আছে বসে, দুর্বলের
তরে কোল পাতি, একান্ত যে নিরুপায়
তারি তরে সমস্ত হৃদয় দিয়ে। আজ
কী এমন অপরাধ করিয়াছি মোরা
যার লাগি সে অসীম স্নেহ চলে গেল
চিরমাতৃহীন করে অনাথ সংসার!

বৎসগণ, মাতৃগণ, বলো, খুলে বলো—
কী এমন করিয়াছি অপরাধ ?

কেহ কেহ। মা'র
বলি নিষেধ করেছ ! বন্ধ মা'র পূজা !

গোবিন্দমাণিক্য। নিষেধ করেছি বলি, সেই অভিমানে
বিমুখ হয়েছে মাতা ! আসিছে মড়ক,
উপবাস, অনাবৃষ্টি, অগ্নি, রক্তপাত—
মা তোদের এমনি মা বটে ! দণ্ডে দণ্ডে
ক্ষীণ শিশুটিরে স্তন্য দিয়ে বাঁচাইয়ে
তোলে মাতা, সে কি তার রক্তপানলোভে ?
হেন মাতৃ-অপমান মনে স্থান দিলি
যবে, আজন্মের মাতৃস্নেহস্মৃতিমাঝে
ব্যথা বাজিল না ? মনে পড়িল না মা'র
মুখ ?— 'রক্ত চাই' 'রক্ত চাই' গরজন
করিছে জননী, অবোলা দুর্বল জীব
প্রাণভয়ে কাঁপে থরথর— নৃত্য করে
দয়াহীন নরনারী রক্তমত্ততায়—
এই কি মায়ের পরিবার ? পুত্রগণ,
এই কি মায়ের স্নেহছবি ?

প্রজাগণ। মূর্খ মোরা
বুঝিতে পারি নে।

গোবিন্দমাণিক্য। বুঝিতে পার না ! শিশু
দু দিনের, কিছু যে বোঝে না আর, সেও
তার জননীরে বোঝে। সেও বোঝে, ভয়
পেলে নির্ভয় মায়ের কাছে ; সেও বোঝে
ক্ষুধা পেলে দুগ্ধ আছে মাতৃস্তনে ; সেও
ব্যথা পেলে কাঁদে মার মুখ চেয়ে।— তোরা
এমনি কি ভুলে ভ্রান্ত হলি, মাকে গেলি
ভুলে ? বুঝিতে পারো না মাতা দয়াময়ী !
বুঝিতে পারো না জীবজননীর পূজা

জীবরক্ত দিয়ে নহে, ভালোবাসা দিয়ে !
বুঝিতে পারো না— ভয় যেথা মা সেখানে
নয়, হিংসা যেথা মা সেখানে নাই, রক্ত
যেথা মা'র সেথা অশ্রুজল ! ওরে বৎস,
কী করিয়া দেখাব তোদের, কী বেদনা
দেখেছি মায়ের মুখে কী কাতর দয়া,
কী ভর্ৎসনা অভিমান-ভরা ছলছল
নেত্রে তাঁর। দেখাইতে পারিতাম যদি,
সেই দণ্ডে চিনিতিস আপনার মাকে।
দয়া এল দীনবেশে মন্দিরের দ্বারে,
অশ্রুজলে মুছে দিতে কলঙ্কের দাগ
মা'র সিংহাসন হতে— সেই অপরাধে
মাতা চলে গেল রোষভরে, এই তোরা
করিলি বিচার ?

অপর্ণার প্রবেশ

প্রজাগণ। আপনি চাহিয়া দেখো,
বিমুখ হয়েছে মাতা সন্তানের 'পরে।

মন্দিরের দ্বারে উঠিয়া

অপর্ণা। বিমুখ হয়েছে মাতা ! আয় তো মা, দেখি,
আয় তো সমুখে একবার !

প্রতিমা ফিরাইয়া

এই দেখো
মুখ ফিরায়েছে মাতা।

সকলে। ফিরেছে জননী !
জয় হোক। জয় হোক ! মাতঃ, জয় হোক।

সকলে মিলিয়া গান

থাকতে আর তো পারলি নে মা, পারলি কই ?
কোলের সন্তানেরে ছাড়লি কই ?

দোষী আছি অনেক দোষে, ছিলি বসে ক্ষণিক রোষে,
মুখ তো ফিরালি শেষে, অভয় চরণ কাড়লি কই ?

[সকলের প্রস্থান

জয়সিংহ ও রঘুপতির প্রবেশ

জয়সিংহ। সত্য বলো, প্রভু, তোমারি এ কাজ ?
রঘুপতি। সত্য
কেন না বলিব ? আমি কি ডরাই সত্য
বলিবারে ? আমারি এ কাজ। প্রতিমার
মুখ ফিরায়ে দিয়েছি আমি। কী বলিতে
চাও বলো। হয়েছ গুরুর গুরু তুমি,
কী ভর্ৎসনা করিবে আমারে ? দিবে কোন্
উপদেশ ?
জয়সিংহ। বলিবার কিছু নাই মোর।
রঘুপতি। কিছু নাই ? কোনো প্রশ্ন নাই মোর কাছে ?
সন্দেহ জন্মিলে মনে মীমাংসার তরে
চাহিবে না গুরু-উপদেশ ? এত দূরে
গেছ ? মনে এতই কি ঘটেছে বিচ্ছেদ ?
মূঢ়, শোনো। সত্যই তো বিমুখ হয়েছে
দেবী, কিন্তু তাই ব'লে প্রতিমার মুখ
নাহি ফিরে। মন্দিরে যে রক্তপাত করি
দেবী তাহা করে পান, প্রতিমার মুখে
সে রক্ত উঠে না। দেবতার অসন্তোষ
প্রতিমার মুখে প্রকাশ না পায়। কিন্তু
মূর্খদের কেমনে বুঝাব ! চোখে চাহে
দেখিবারে, চোখে যাহা দেখিবার নয়।
মিথ্যা দিয়ে সত্যেরে বুঝাতে হয় তাই।
মূর্খ, তোমার আমার হাতে সত্য নাই।
সত্যের প্রতিমা সত্য নহে, কথা সত্য
নহে, লিপি সত্য নহে, মূর্তি সত্য নহে—

চিন্তা সত্য নহে। সত্য কোথা আছে— কেহ
নাহি জানে তারে, কেহ নাহি পায় তারে।
সেই সত্য কোটি মিথ্যারূপে চারি দিকে
ফাটিয়া পড়েছে। সত্য তাই নাম ধরে
মহামায়া, অর্থ তার 'মহামিথ্যা'। সত্য
মহারাজ বসে থাকে রাজ-অন্তঃপুরে—
শত মিথ্যা প্রতিনিধি তার, চতুর্দিকে
মরে খেটে খেটে।—
শিরে হাত দিয়ে, ব'সে
ব'সে ভাবো— আমার অনেক কাজ আছে!
আবার গিয়েছে ফিরে প্রজাদের মন।

জয়সিংহ। যে তরঙ্গ তীরে নিয়ে আসে, সেই ফিরে
অকূলের মাঝখানে টেনে নিয়ে যায়।
সত্য নহে, সত্য নহে, সত্য নহে— সবই
মিথ্যা! মিথ্যা! মিথ্যা! দেবী নাই প্রতিমার
মাঝে, তবে কোথা আছে? কোথাও সে নাই!
দেবী নাই! ধন্য ধন্য ধন্য মিথ্যা তুমি!

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদকক্ষ

গোবিন্দমাণিক্য ও চাঁদপাল

চাঁদপাল। প্রজারা করিছে কুমন্ত্রণা। মোগলের
সেনাপতি চলিয়াছে আসামের দিকে
যুদ্ধ-লাগি, নিকটেই আছে, দুই-চারি
দিবসের পথে— প্রজারা তাহারি কাছে
পাঠাবে প্রস্তাব তোমারে করিতে দূর
সিংহাসন হতে।

গোবিন্দমাণিক্য। আমারে করিবে দূর?
মোর 'পরে এত অসন্তোষ?

চাঁদপাল। মহারাজ,
সেবকের অনুনয় রাখো— পশুরক্ত
এত যদি ভালো লাগে নিষ্ঠুর প্রজার
দাও তাহাদের পশু, রাক্ষসী প্রবৃত্তি
পশুর উপর দিয়া যাক। সর্বদাই
ভয়ে ভয়ে আছি কখন কী হয়ে পড়ে।

গোবিন্দমাণিক্য। আছে ভয় জানি চাঁদপাল, রাজকার্য
সেও আছে। পাথার ভীষণ, তবু তরী
তীরে নিয়ে যেতে হবে। গেছে কি প্রজার
দূত মোগলের কাছে?

চাঁদপাল। এতক্ষণে গেছে।

গোবিন্দমাণিক্য। চাঁদপাল, তুমি তবে যাও এই বেলা,
মোগলের শিবিরের কাছাকাছি থেকো—
যখন যা ঘটে সেথা পাঠায়ো সংবাদ।

চাঁদপাল। মহারাজ, সাবধানে থেকো হেথা প্রভু,
অন্তরে বাহিরে শত্রু। [প্রস্থান

গুণবতীর প্রবেশ

গোবিন্দমাণিক্য। প্রিয়ে, বড়ো শুষ্ক,
বড়ো শূন্য এ সংসার। অন্তরে বাহিরে
শত্রু। তুমি এসে ক্ষণেক দাঁড়াও হেসে,
ভালোবেসে চাও মুখপানে। প্রেমহীন
অন্ধকার ষড়যন্ত্র বিপদ বিদ্বেষ
সবার উপরে, হোক তব সুধাময়
আবির্ভাব, ঘোর নিশীথের শিরোদেশে
নির্নিমেষ চন্দ্রের মতন। প্রিয়তমে,
নিরুত্তর কেন? অপরাধ-বিচারের
এই কি সময়? তৃষার্ত হৃদয় যবে

মুমূর্ষুর মতো চাহে মরুভূমি-মাঝে
সুধাপাত্র হাতে নিয়ে ফিরে চলে যাবে ?

[গুণবতীর প্রস্থান

চলে গেলে ! হায়, দুর্বহজীবন !

নক্ষত্ররায়ের প্রবেশ

স্বগত

নক্ষত্ররায়। যেথা যাই সকলেই বলে, 'রাজা হবে ?'—
'রাজা হবে ?'— এ বড়ো আশ্চর্য কাণ্ড। একা
বসে থাকি, তবু শুনি কে যেন বলিছে—
রাজা হবে ? রাজা হবে ? দুই কানে যেন
বাসা করিয়াছে দুই টিয়ে পাখি, এক
বুলি জানে শুধু— রাজা হবে ? রাজা হবে ?
ভালো বাপু, তাই হব, কিন্তু রাজরক্ত
সে কি তোরা এনে দিবি ?

গোবিন্দমাণিক্য। নক্ষত্র !

নক্ষত্র সচকিত

নক্ষত্র !
আমারে মারিবে তুমি ? বলো, সত্য বলো,
আমারে মারিবে ? এই কথা জাগিতেছে
হৃদয়ে তোমার নিশিদিন ? এই কথা
মনে নিয়ে মোর সাথে হাসিয়া বলেছ
কথা, প্রণাম করেছ পায়ে, আশীর্বাদ
করেছ গ্রহণ, মধ্যাহ্নে আহারকালে
এক অন্ন ভাগ করে করেছ ভোজন
এই কথা নিয়ে ? বুকে ছুরী দেবে ? ওরে
ভাই, এই বুকে টেনে নিয়েছিনু তোরে
এ কঠিন মর্তভূমি প্রথম চরণে
তোর বেজেছিল যবে— এই বুকে টেনে
নিয়েছিনু তোরে, যেদিন জননী, তোর

শিরে শেষ স্নেহহস্ত রেখে, চলে গেল
ধরাধাম শূন্য করি— আজ সেই তুই
সেই বুকে ছুরী দিবি ? এক রক্তধারা
বহিতেছে দোঁহার শরীরে, যেই রক্ত
পিতৃপিতামহ হতে বহিয়া এসেছে
চিরদিন ভাইদের শিরায় শিরায়—
সেই শিরা ছিন্ন করে দিয়ে সেই রক্ত
ফেলিবি ভূতলে ? এই বন্ধ করে দিনু
দ্বার, এই নে আমার তরবারি, মার্‌
অবারিত বক্ষে, পূর্ণ হোক মনস্কাম !

নক্ষত্ররায়। ক্ষমা করো ! ক্ষমা করো ভাই ! ক্ষমা করো !

গোবিন্দমাণিক্য। এসো বৎস, ফিরে এসো ! সেই বক্ষে ফিরে
এসো ! ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছ ? এ সংবাদ
শুনেছি যখন, তখনি করেছি ক্ষমা।
তোরে ক্ষমা না করিতে অক্ষম যে আমি।

নক্ষত্ররায়। রঘুপতি দেয় কুমন্ত্রণা। রক্ষ মোরে
তার কাছ হতে।

গোবিন্দমাণিক্য। কোনো ভয় নেই ভাই !

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুরকক্ষ

গুণবতী

গুণবতী। তবু তো হল না। আশা ছিল মনে মনে
কঠিন হইয়া থাকি কিছুদিন যদি
তাহা হলে আপনি আসিবে ধরা দিতে
প্রেমের তৃষায়। এত অহংকার ছিল
মনে। মুখ ফিরে থাকি, কথা নাহি কই,
অশ্রুও ফেলি নে, শুধু শুষ্ক রোষ, শুধু

অবহেলা— এমন তো কতদিন গেল !
শুনেছি নারীর রোষ পুরুষের কাছে
শুধু শোভা আভাময়, তাপ নাহি তাহে—
হীরকের দীপ্তিসম ! ধিক্ থাক্ শোভা !
এ রোষ বজ্রের মতো হত যদি, তবে
পড়িত প্রাসাদ-'পরে, ভাঙিত রাজার
নিদ্রা, চূর্ণ হত রাজ-অহংকার, পূর্ণ
হত রানীর মহিমা ! আমি রানী, কেন
জন্মাইলে এ মিথ্যা বিশ্বাস ! হৃদয়ের
অধীশ্বরী তব, এই মন্ত্র প্রতিদিন
কেন দিলে কানে ? কেন না জানালে মোরে
আমি ক্রীতদাসী, রাজার কিংকরী শুধু,
রানী নহি— তাহা হলে আজিকে সহসা
এ আঘাত, এ পতন সহিতে হত না !

ধ্রুবের প্রবেশ

কোথা যাস তুই ?

ধ্রুব। আমারে ডেকেছে রাজা। [প্রস্থান

গুণবতী। রাজার হৃদয়রত্ন এই সে বালক !
ওরে শিশু, চুরি করে নিয়েছিস তুই
আমার সন্তানতরে যে আসন ছিল।
না আসিতে আমার বাছারা, তাহাদের
পিতৃস্নেহ-'পরে তুই বসাইলি ভাগ !
রাজহৃদয়ের সুধাপাত্র হতে, তুই
নিলি প্রথম অঞ্জলি— রাজপুত্র এসে
তোরি কি প্রসাদ পাবে ওরে রাজদ্রোহী !—
মা গো মহামায়া, একি তোর অবিচার !
এত সৃষ্টি, এত খেলা তোর— খেলাচ্ছলে
দে আমারে একটি সন্তান— দে জননী,
শুধু এইটুকু শিশু, কোলটুকু ভ'রে

যায় যাহে। তুই যা বাসিস ভালো, তাই
দিব তোরে।

নক্ষত্ররায়ের প্রবেশ

নক্ষত্র, কোথায় যাও ? ফিরে
যাও কেন ? এত ভয় কারে তব ? আমি
নারী, অস্ত্রহীন, বলহীন, নিরুপায়,
অসহায়— আমি কি ভীষণ এত ?

নক্ষত্ররায়। না, না,
মোরে ডাকিয়ো না।

গুণবতী। কেন, কী হয়েছে ?

নক্ষত্ররায়। আমি
রাজা নাহি হব।

গুণবতী। নাই হলে। তাই বলে
এত আস্ফালন কেন ?

নক্ষত্ররায়। চিরকাল বেঁচে
থাক্ রাজা, আমি যেন যুবরাজ থেকে
মরি।

গুণবতী। তাই মরো। শীঘ্র মরো। পূর্ণ হোক
মনোরথ। আমি কি তোমার পায়ে ধ'রে
রেখেছি বাঁচিয়ে ?

নক্ষত্ররায়। তবে কী বলিবে বলো।

গুণবতী। যে চোর করিছে চুরি তোমারি মুকুট
তাহারে সরায়ে দাও। বুঝেছ কি ?

নক্ষত্ররায়। সব
বুঝিয়াছি, শুধু কে সে চোর বুঝি নাই।

গুণবতী। ওই-যে বালক ধ্রুব। বাড়িছে রাজার
কোলে, দিনে দিনে উঁচু হয়ে উঠিতেছে
মুকুটের পানে।

নক্ষত্ররায়। তাই বটে! এতক্ষণে

বুঝিলাম সব। মুকুট দেখেছি বটে
ধ্রুবের মাথায়। আমি বলি শুধু খেলা।

গুণবতী। মুকুট লইয়া খেলা? বড়ো কাল-খেলা!
এই বেলা ভেঙে দাও খেলা— নহে তুমি
সে খেলার হইবে খেলেনা।

নক্ষত্ররায়। তাই বটে!
এ তো ভালো খেলা নয়।

গুণবতী। অর্ধরাত্রে আজি
গোপনে লইয়া তারে দেবীর চরণে
মোর নামে কোরো নিবেদন। তার রক্তে
নিবে যাবে দেবরোষানল, স্থায়ী হবে
সিংহাসন এই রাজবংশে— পিতৃলোক
গাহিবেন কল্যাণ তোমার। বুঝেছ কি?

নক্ষত্ররায়। বুঝিয়াছি।

গুণবতী। তবে যাও। যা বলিনু করো।
মনে রেখো, মোর নামে কোরো নিবেদন।

নক্ষত্ররায়। তাই হবে। মুকুট লইয়া খেলা! এ কী
সর্বনাশ! দেবীর সন্তোষ, রাজ্যরক্ষা,
পিতৃলোক— বুঝিতে কিছুই বাকি নেই।

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দিরসোপান

জয়সিংহ

জয়সিংহ। দেবী, আছ, আছ তুমি। দেবী, থাকো তুমি।
এ অসীম রজনীর সর্বপ্রান্তশেষে
যদি থাকো কণামাত্র হয়ে, সেথা হতে

ক্ষীণতম স্বরে সাড়া দাও, বলো মোরে
'বৎস, আছি'— নাই, নাই নাই, দেবী নাই!
নাই? দয়া করে থাকো! অয়ি মায়াময়ী
মিথ্যা, দয়া কর্, দয়া কর্ জয়সিংহে,
সত্য হয়ে ওঠ্। আশৈশব ভক্তি মোর,
আজন্মের প্রেম তোরে প্রাণ দিতে নারে?
এত মিথ্যা তুই?— এ জীবন কারে দিলি
জয়সিংহ! সব ফেলে দিলি সত্যশূন্য,
দয়াশূন্য, মাতৃশূন্য সর্বশূন্য-মাঝে!

অপর্ণার প্রবেশ

অপর্ণা, আবার এসেছিস? তাড়ালেম
মন্দিরবাহিরে, তবু তুই অনুক্ষণ
আশে-পাশে চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াস
সুখের দুরাশা-সম দরিদ্রের মনে?
সত্য আর মিথ্যায় প্রভেদ শুধু এই!—
মিথ্যারে রাখিয়া দিই মন্দিরের মাঝে
বহুযত্নে, তবুও সে থেকেও থাকে না।
সত্যেরে তাড়ায়ে দিই মন্দিরবাহিরে
অনাদরে, তবুও সে ফিরে ফিরে আসে।
অপর্ণা, যাস নে তুই— তোরে আমি, আর
ফিরাব না। আয়, এইখানে বসি দোঁহে।
অনেক হয়েছে রাত। কৃষ্ণপক্ষশশী
উঠিতেছে তরু-অন্তরালে। চরাচর
সুপ্তিমগ্ন, শুধু মোরা দোঁহে নিদ্রাহীন।
অপর্ণা, বিষাদময়ী, তোরেও কি গেছে
ফাঁকি দিয়ে মায়ার দেবতা? দেবতায়
কোন্ আবশ্যক? কেন তারে ডেকে আনি
আমাদের ছোটোখাটো সুখের সংসারে?
তারা কি মোদের ব্যথা বুঝে? পাষাণের

মতো, শুধু চেয়ে থাকে! আপন ভায়েরে
প্রেম হতে বঞ্চিত করিয়া, সেই প্রেম
দিই তারে— সে কি তার কোনো কাজে লাগে?
এ সুন্দরী সুখময়ী ধরণী হইতে
মুখ ফিরাইয়া, তার দিকে চেয়ে থাকি—
সে কোথায় চায়? তার কাছে ক্ষুদ্র বটে,
তুচ্ছ বটে, তবু তো আমার মাতৃধরা;
তার কাছে কীটবৎ, তবু তো আমার
ভাই; অবহেলে অন্ধরথচক্রতলে
দলিয়া চলিয়া যায়, তবু সে দলিত,
উপেক্ষিত, তারা তো আমার আপনার।
আয় ভাই, নির্ভয়ে দেবতাহীন হয়ে
আরো কাছাকাছি সবে বেঁধে বেঁধে থাকি।
রক্ত চাই? স্বরগের ঐশ্বর্য ত্যজিয়া
এ দরিদ্র ধরাতলে তাই কি এসেছ?
সেথায় মানব নেই, জীব নেই কেহ,
রক্ত নেই, ব্যথা পাবে হেন কিছু নেই—
তাই স্বর্গে হয়েছে অরুচি? আসিয়াছ
মৃগয়া করিতে, নির্ভয়বিশ্বাসসুখে
যেথা বাসা বেঁধে আছে মানবের ক্ষুদ্র
পরিবার?— অপর্ণা, বালিকা, দেবী নাই!

অপর্ণা। জয়সিংহ, তবে চলে এসো, এ মন্দির
ছেড়ে।

জয়সিংহ। যাব, যাব, তাই যাব, ছেড়ে চলে
যাব। হায় রে অপর্ণা, তাই যেতে হবে।
তবু, যে রাজত্বে আজন্ম করেছি বাস
পরিশোধ ক'রে দিয়ে তার রাজকর
তবে যেতে পাব। থাক্ ও-সকল কথা।
দেখ্ চেয়ে গোমতীর শীর্ণ জলরেখা
জ্যোৎস্নালোকে পুলকিত— কলধ্বনি তার

এক কথা শতবার করিছে প্রকাশ।
আকাশেতে অর্ধচন্দ্র পাণ্ডুমুখচ্ছবি
শ্রান্তিক্ষীণ— বহু রাত্রিজাগরণে যেন
পড়েছে চাঁদের চোখে আধেক পল্লব
ঘুমভারে। সুন্দর জগৎ! হা অপর্ণা,
এমন রাত্রির মাঝে দেবী নাই। থাক্‌
দেবী। অপর্ণা, জানিস কিছু সুখভরা
সুধাভরা কোনো কথা? শুধু তাই বল্‌।
যা শুনিলে মুহূর্তে অতলে মগ্ন হয়ে
ভুলে যাব জীবনের তাপ, মরণ যে
কত মধুরতাময় আগে হতে পাব
তার স্বাদ। অপর্ণা, এমন কিছু বল্‌
ওই মধুকণ্ঠে তোর, ওই মধু-আঁখি
রেখে মোর মুখপানে, এই জনহীন
স্তব্ধ রজনীতে, এই বিশ্বজগতের
নিদ্রামাঝে, বল্‌ রে অপর্ণা, যা শুনিলে
মনে হবে চারি দিকে আর কিছু নাই,
শুধু ভালোবাসা ভাসিতেছে, পূর্ণিমার
সুপ্তরাত্রে রজনীগন্ধার গন্ধসম।

অপর্ণা। হায় জয়সিংহ, বলিতে পারি নে কিছু—
বুঝি মনে আছে কত কথা।

জয়সিংহ। তবে আরো
কাছে আয়, মন হতে মনে যাক কথা।—
এ কী করিতেছি আমি! অপর্ণা, অপর্ণা,
চলে যা মন্দির ছেড়ে! গুরুর আদেশ!

অপর্ণা। জয়সিংহ, হোয়ো না নিষ্ঠুর! বার বার
ফিরায়ো না! কী সহেছি অন্তর্যামী জানে!

জয়সিংহ। তবে আমি যাই। এক দণ্ড হেথা নহে।

কিয়দ্দুর গিয়া ফিরিয়া

অপর্ণা, নিষ্ঠুর আমি? এই কি রহিবে

তোর মনে, জয়সিংহ নিষ্ঠুর, কঠিন !
কখনো কি হাসিমুখে কহি নাই কথা ?
কখনো কি ডাকি নাই কাছে ? কখনো কি
ফেলি নাই অশ্রুজল তোর অশ্রু দেখে ?
অপর্ণা, সে সব কথা পড়িবে না মনে,
শুধু মনে রহিবে জাগিয়া জয়সিংহ
নিষ্ঠুর পাষাণ ? যেমন পাষাণ ওই
পাষাণের ছবি, দেবী বলিতাম যারে ?—
হায় দেবী, তুই যদি দেবী হইতিস,
তুই যদি বুঝিতিস এই অন্তর্দাহ !

অপর্ণা। বুদ্ধিহীন ব্যথিত এ ক্ষুদ্র নারী-হিয়া,
ক্ষমা করো এরে। এই বেলা চলে এসো,
জয়সিংহ, এসো মোরা এ মন্দির ছেড়ে
যাই।

জয়সিংহ। রক্ষা করো ! অপর্ণা, করুণা করো !
দয়া ক'রে, মোরে ফেলে চলে যাও। এক
কাজ বাকি আছে এ জীবনে, সেই হোক
প্রাণেশ্বর— তার স্থান তুমি কাড়িয়ো না।

[দ্রুত প্রস্থান

অপর্ণা। শতবার সহিয়াছি, আজ কেন আর
নাহি সহে ! আজ কেন ভেঙে পড়ে প্রাণ !

পঞ্চম দৃশ্য

মন্দির

নক্ষত্ররায় রঘুপতি ও নিদ্রিত ধ্রুব

রঘুপতি। কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। জয়সিংহ
এসেছিল মোর কোলে অমনি শৈশবে
পিতৃমাতৃহীন। সেদিন অমনি করে
কেঁদেছিল নূতন দেখিয়া চারি দিক,
হতাশ্বাস শ্রান্ত শোকে অমনি করিয়া
ঘুমায়ে পড়িয়াছিল সন্ধ্যা হয়ে গেলে
ওইখানে দেবীর চরণে! ওরে দেখে
তার সেই শিশুমুখ শিশুর ক্রন্দন
মনে পড়ে।

নক্ষত্ররায়। ঠাকুর, কোরো না দেরি আর—
ভয় হয় কখন সংবাদ পাবে রাজা।

রঘুপতি। সংবাদ কেমন করে পাবে? চারি দিক
নিশীথের নিদ্রা দিয়ে ঘেরা।

নক্ষত্ররায়। একবার
মনে হল যেন দেখিলাম কার ছায়া!

রঘুপতি। আপন ভয়ের।

নক্ষত্ররায়। শুনিলাম যেন কার
ক্রন্দনের স্বর!

রঘুপতি। আপনার হৃদয়ের।
দূর হোক নিরানন্দ। এসো পান করি
কারণসলিল।

মদ্যপান

মনোভাব যতক্ষণ
মনে থাকে, ততক্ষণ দেখায় বৃহৎ—
কার্যকালে ছোটো হয়ে আসে, বহু বাষ্প
গলে গিয়ে একবিন্দু জল। কিছুই না,

শুধু মুহূর্তের কাজ। শুধু শীর্ণশিখা
প্রদীপ নিবাতে যতক্ষণ। ঘুম হতে
চকিতে মিলায়ে যাবে গাঢ়তর ঘুমে
ওই প্রাণরেখাটুকু— শ্রাবণনিশীথে
বিজুলিঝলক-সম, শুধু বজ্র তার
চিরদিন বিঁধে রবে রাজদণ্ড-মাঝে।
এসো এসো যুবরাজ, ম্লান হয়ে কেন
বসে আছ এক পাশে— মুখে কথা নেই,
হাসি নেই, নির্বাপিতপ্রায়! এসো, পান
করি আনন্দসলিল।

নক্ষত্ররায়। অনেক বিলম্ব
হয়ে গেছে। আমি বলি, আজ থাক্‌। কাল
পূজা হবে।

রঘুপতি। বিলম্ব হয়েছে বটে। রাত্রি
শেষ হয়ে আসে।

নক্ষত্ররায়। ওই শোনো পদধ্বনি।

রঘুপতি। কই? নাহি শুনি।

নক্ষত্ররায়। ওই শোনো, ওই দেখো
আলো।

রঘুপতি। সংবাদ পেয়েছে রাজা! আর তবে
এক পল দেরি নয়। জয় মহাকালী!

খড়্গ-উত্তোলন

গোবিন্দমাণিক্য ও প্রহরাগণের প্রবেশ

রাজার নির্দেশক্রমে প্রহরীর দ্বারা রঘুপতি ও নক্ষত্ররায় ধৃত হইল

গোবিন্দমাণিক্য। নিয়ে যাও কারাগারে, বিচার হইবে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিচারসভা

গোবিন্দমাণিক্য রঘুপতি নক্ষত্ররায়
সভাসদ্‌গণ ও প্রহরীগণ

রঘুপতিকে

গোবিন্দমাণিক্য। আর কিছু বলিবার আছে?

রঘুপতি। কিছু নাই।

গোবিন্দমাণিক্য। অপরাধ করিছ স্বীকার?

রঘুপতি। অপরাধ?
অপরাধ করিয়াছি বটে। দেবীপূজা
করিতে পারি নি শেষ— মোহে মূঢ় হয়ে
বিলম্ব করেছি অকারণে। তার শাস্তি
দিতেছেন দেবী, তুমি উপলক্ষ শুধু।

গোবিন্দমাণিক্য। শুন সর্বলোক, আমার নিয়ম এই—
পবিত্র পূজার ছলে দেবতার কাছে
যে মোহান্ধ দিবে জীববলি, কিম্বা তারি
করিবে উদ্যোগ রাজ-আজ্ঞা তুচ্ছ করি,
নির্বাসনদণ্ড তার প্রতি। রঘুপতি,
অষ্ট বর্ষ নির্বাসনে করিবে যাপন;
তোমারে আসিবে রেখে সৈন্য চারিজন
রাজ্যের বাহিরে।

রঘুপতি। দেবী ছাড়া এ জগতে
এ জানু হয় নি নত আর কারো কাছে।
আমি বিপ্র, তুমি শূদ্র, তবু জোড়করে
নতজানু আজ আমি প্রার্থনা করিব
তোমা কাছে— দুই দিন দাও অবসর
শ্রাবণের শেষ দুই দিন। তার পরে
শরতের প্রথম প্রত্যূষে— চলে যাব

তোমার এ অভিশপ্ত দগ্ধ রাজ্য ছেড়ে,
আর ফিরাব না মুখ।

গোবিন্দমাণিক্য। দুই দিন দিনু
অবসর।

রঘুপতি। মহারাজ রাজ-অধিরাজ!
মহিমাসাগর তুমি কৃপা-অবতার!
ধূলির অধম আমি, দীন, অভাজন! [প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্য। নক্ষত্র, স্বীকার করো অপরাধ তব।

নক্ষত্ররায়। মহারাজ, দোষী আমি। সাহস না হয়
মার্জনা করিতে ভিক্ষা। [পদতলে পতন

গোবিন্দমাণিক্য। বলো তুমি কার
মন্ত্রণায় ভুলে এ কাজে দিয়েছ হাত?
স্বভাবকোমল তুমি, নিদারুণ বুদ্ধি
এ তোমার নহে।

নক্ষত্ররায়। আর কারে দিব দোষ!
লব না এ পাপমুখে আর কারো নাম।
আমি শুধু একা অপরাধী। আপনার
পাপমন্ত্রণায় আপনি ভুলেছি। শত
দোষ ক্ষমা করিয়াছ নির্বোধ ভ্রাতার,
আরবার ক্ষমা করো!

গোবিন্দমাণিক্য। নক্ষত্র, চরণ
ছেড়ে ওঠো, শোনো কথা। ক্ষমা কি আমার
কাজ? বিচারক আপন শাসনে বদ্ধ,
বন্দী হতে বেশি বন্দী। এক অপরাধে
দণ্ড পাবে এক জনে, মুক্তি পাবে আর,
এমন ক্ষমতা নাই বিধাতার— আমি
কোথা আছি!

সকলে। ক্ষমা করো, ক্ষমা করো প্রভু!
নক্ষত্র তোমার ভাই।

গোবিন্দমাণিক্য। স্থির হও সবে।

ভাই বন্ধু কেহ নাহি মোর, এ আসনে
যতক্ষণ আছি। প্রমাণ হইয়া গেছে
অপরাধ। ছাড়ায়ে ত্রিপুররাজ্যসীমা
ব্রহ্মপুত্র নদীতীরে আছে রাজগৃহ
তীর্থস্নানতরে, সেথায় নক্ষত্ররায়
অষ্ট বর্ষ নির্বাসন করিবে যাপন।

প্রহরীগণ নক্ষত্রকে লইয়া যাইতে উদ্যত। রাজার
সিংহাসন হইতে অবরোহণ

দিয়ে যাও বিদায়ের আলিঙ্গন। ভাই,
এ দণ্ড তোমার শুধু একেলার নহে,
এ দণ্ড আমার। আজ হতে রাজগৃহ
সূচিকণ্টকিত হয়ে বিঁধিবে আমায়।
রহিল তোমার সাথে আশীর্বাদ মোর ;
যত দিন দূরে র'বি রাখিবেন তোরে
দেবগণ। [নক্ষত্রের প্রস্থান

সভাসদ্‌গণের প্রতি

সভাগৃহ ছেড়ে যাও সবে,
ক্ষণেক একেলা রব আমি। [সকলের প্রস্থান

দ্রুত নয়নরায়ের প্রবেশ

নয়নরায়। মহারাজ,
সমূহ বিপদ!

গোবিন্দমাণিক্য। রাজা কি মানুষ নহে?
হায় বিধি, হৃদয় তাহার গড় নি কি
অতি দীনদরিদ্রের সমান করিয়া?
দুঃখ দিবে সবার মতন, অশ্রুজল
ফেলিবারে অবসর দিবে না কি শুধু?—
কিসের বিপদ, ব'লে যাও শীঘ্র করি।

নয়নরায়। মোগলের সৈন্য সাথে আসে চাঁদপাল,
নাশিতে ত্রিপুরা।

গোবিন্দমাণিক্য। এ নহে, নয়নরায়,

তোমার উচিত। শত্রু বটে চাঁদপাল,
তাই বলে তার নামে হেন অপবাদ!

নয়নরায়। অনেক দিয়েছ দণ্ড হীন অধীনেরে,
আজ এই অবিশ্বাস সব চেয়ে বেশি।
শ্রীচরণচ্যুত হয়ে আছি, তাই বলে
গিয়েছি কি এত অধঃপাতে!

গোবিন্দমাণিক্য। ভালো করে
বলো আরবার, বুঝে দেখি সব।

নয়নরায়। যোগ
দিয়ে মোগলের সাথে চাহে চাঁদপাল
তোমারে করিতে রাজ্যচ্যুত।

গোবিন্দমাণিক্য। তুমি কোথা
পেলে এ সংবাদ?

নয়নরায়। যেদিন আমারে প্রভু
নিরস্ত্র করিলে, অস্ত্রহীন লাজে চলে
গেনু দেশান্তরে; শুনিলাম আসামের
সাথে মোগলের বাধিছে বিবাদ; তাই
চলেছিনু সেথাকার রাজসন্নিধানে
মাগিতে সৈনিকপদ। পথে দেখিলাম
আসিছে মোগল সৈন্য ত্রিপুরার পানে,
সঙ্গে চাঁদপাল। সন্ধানে জেনেছি তার
অভিসন্ধি। ছুটিয়া এসেছি রাজপদে।

গোবিন্দমাণিক্য। সহসা এ কী হল সংসারে হে বিধাতঃ!
শুধু দুই-চারিদিন হল, ধরণীর
কোন্‌খানে ছিদ্রপথ হয়েছে বাহির,
সমুদয় নাগবংশ রসাতল হতে
উঠিতেছে চারি দিকে পৃথিবীর 'পরে—
পদে পদে তুলিতেছে ফণা। এসেছে কি
প্রলয়ের কাল!— এখন সময় নহে
বিস্ময়ের। সেনাপতি, লহো সৈন্যভার।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দিরপ্রাঙ্গণ

জয়সিংহ ও রঘুপতি

রঘুপতি। গেছে গর্ব, গেছে তেজ, গেছে ব্রাহ্মণত্ব।
ওরে বৎস, আমি তোর গুরু নহি আর।
কাল আমি অসংশয়ে করেছি আদেশ
গুরুর গৌরবে, আজ শুধু সানুনয়ে
ভিক্ষা মাগিবার মোর আছে অধিকার।
অন্তরেতে সে দীপ্তি নিবেছে, যার বলে
তুচ্ছ করিতাম আমি ঐশ্বর্যের জ্যোতি,
রাজার প্রতাপ। নক্ষত্র পড়িলে খসি
তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর মাটির প্রদীপ।
তাহারে খুঁজিয়া ফিরে পরিহাসভরে
খদ্যোত ধূলির মাঝে, খুঁজিয়া না পায়।
দীপ প্রতিদিন নেভে, প্রতিদিন জ্বলে,
বারেক নিভিলে তারা চির-অন্ধকার!
আমি সেই চিরদীপ্তিহীন ; সামান্য এ
পরমায়ু, দেবতার অতি ক্ষুদ্র দান,
ভিক্ষা মেগে লইয়াছি তারি দুটো দিন
রাজদ্বারে নতজানু হয়ে। জয়সিংহ,
সেই দুই দিন যেন ব্যর্থ নাহি হয়।
সেই দুই দিন যেন আপন কলঙ্ক
ঘুচায়ে মরিয়া যায়। কালামুখ তার
রাজরক্তে রাঙা করে তবে যায় যেন।
বৎস, কেন নিরুত্তর? গুরুর আদেশ
নাহি আর ; তবু তোরে করেছি পালন
আশৈশব, কিছু নহে তার অনুরোধ?

নহি কি রে আমি তোর পিতার অধিক
পিতৃবিহীনের পিতা বলে ? এই দুঃখ,
এত করে স্মরণ করাতে হল ! কৃপা
ভিক্ষা সহ্য হয়, ভালোবাসা ভিক্ষা করে
যে অভাগ্য, ভিক্ষুকের অধম ভিক্ষুক
সে যে। বৎস, তবু নিরুত্তর ? জানু তবে
আরবার নত হোক। কোলে এসেছিল
যবে, ছিল এতটুকু, এ জানুর চেয়ে
ছোটো— তার কাছে নত হোক জানু। পুত্র,
ভিক্ষা চাই আমি।

জয়সিংহ। পিতা, এ বিদীর্ণ বুকে
আর হানিয়ো না বজ্র। রাজরক্ত চাহে
দেবী, তাই তারে এনে দিব। যাহা চাহে
সব দিব। সব ঋণ শোধ করে দিয়ে
যাব। তাই হবে। তাই হবে। [প্রস্থান

রঘুপতি। তবে তাই
হোক। দেবী চাহে, তাই বলে দিস। আমি
কেহ নই। হায় অকৃতজ্ঞ, দেবী তোর
কী করেছে ? শিশুকাল হতে দেবী তোরে
প্রতিদিন করেছে পালন ? রোগ হলে
করিয়াছে সেবা ? ক্ষুধায় দিয়েছে অন্ন ?
মিটায়েছে জ্ঞানের পিপাসা ? অবশেষে
এই অকৃতজ্ঞতার ব্যথা নিয়েছে কি
দেবী বুক পেতে ? হায়, কলিকাল ! থাক্ !

তৃতীয় দৃশ্য

প্রাসাদকক্ষ

গোবিন্দমাণিক্য

নয়নরায়ের প্রবেশ

নয়নরায়। বিদ্রোহী সৈনিকদের এনেছি ফিরায়ে,
যুদ্ধসজ্জা হয়েছে প্রস্তুত। আজ্ঞা দাও
মহারাজ, অগ্রসর হই— আশীর্বাদ
করো—

গোবিন্দমাণিক্য। চলো সেনাপতি, নিজে আমি যাব
রণক্ষেত্রে।

নয়নরায়। যতক্ষণ এ দাসের দেহে
প্রাণ আছে, ততক্ষণ মহারাজ, ক্ষান্ত
থাকো, বিপদের মুখে গিয়ে—

গোবিন্দমাণিক্য। সেনাপতি,
সবার বিপদ-অংশ হতে, মোর অংশ
নিতে চাই আমি। মোর রাজ-অংশ, সব
চেয়ে বেশি। এসো সৈন্যগণ, লহো মোরে
তোমাদের মাঝে। তোমাদের নৃপতিরে
দূর সিংহাসনচূড়ে নির্বাসিত করে
সমরগৌরব হতে বঞ্চিত কোরো না।

চরের প্রবেশ

চর। নির্বাসনপথ হতে লয়েছে কাড়িয়া
কুমার নক্ষত্ররায়ে মোগলের সেনা ;
রাজপদে বরিয়াছে তাঁরে। আসিছেন
সৈন্য লয়ে রাজধানী পানে।

গোবিন্দমাণিক্য। চুকে গেল।
আর ভয় নাই। যুদ্ধ তবে গেল মিটে।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। বিপক্ষশিবির হতে পত্র আসিয়াছে।
গোবিন্দমাণিক্য। নক্ষত্রের হস্তলিপি। শান্তির সংবাদ
হবে বুঝি।— এই কি স্নেহের সম্ভাষণ!
এ তো নহে নক্ষত্রের ভাষা! চাহে মোর
নির্বাসন, নতুবা ভাসাবে রক্তস্রোতে
সোনার ত্রিপুরা— দগ্ধ করে দিবে দেশ,
বন্দী হবে মোগলের অন্তঃপুরতরে
ত্রিপুররমণী?— দেখি, দেখি, এই বটে
তারি লিপি। 'মহারাজ নক্ষত্রমাণিক্য!'
মহারাজ! দেখো সেনাপতি— এই দেখো
রাজদণ্ডে-নির্বাসিত দিয়েছে রাজারে
নির্বাসনদণ্ড। এমনি বিধির খেলা!
নয়নরায়। নির্বাসন! এ কী স্পর্ধা! এখনো তো যুদ্ধ
শেষ হয় নাই।
গোবিন্দমাণিক্য। এ তো নহে মোগলের
দল। ত্রিপুরার রাজপুত্র রাজা হতে
করিয়াছে সাধ, তার তরে যুদ্ধ কেন?
নয়নরায়। রাজ্যের মঙ্গল—
গোবিন্দমাণিক্য। রাজ্যের মঙ্গল হবে?
দাঁড়াইয়া মুখোমুখি দুই ভাই হানে
ভ্রাতৃবক্ষ লক্ষ্য করে মৃত্যুমুখী ছুরী,
রাজ্যের মঙ্গল হবে তাহে? রাজ্যে শুধু
সিংহাসন আছে— গৃহস্থের ঘর নেই,
ভাই নেই, ভ্রাতৃত্ববন্ধন নেই হেথা?
দেখি দেখি আরবার— এ কি তার লিপি?
নক্ষত্রের নিজের রচনা নহে। আমি
দস্যু, আমি দেবদ্বেষী, আমি অবিচারী,
এ রাজ্যের অকল্যাণ আমি! নহে, নহে,

এ তার রচনা নহে।— রচনা যাহারই
হোক, অক্ষর তো তারি বটে। নিজ হস্তে
লিখেছে তো সেই— যে সর্পেরই বিষ হোক,
নিজের অক্ষরমুখে মাথায়ে দিয়েছে,
হেনেছে আমার বুকে।— বিধি, এ তোমার
শাস্তি, তার নহে। নির্বাসন! তাই হোক।
তার নির্বাসনদণ্ড তার হয়ে আমি
নীরবে বিনম্র শিরে করিব বহন।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দির। বাহিরে ঝড়

রঘুপতি

পূজোপকরণ লইয়া

রঘুপতি। এতদিনে আজ বুঝি জাগিয়াছ দেবী!
ওই রোষহুহুংকার! অভিশাপ হাঁকি
নগরের 'পর দিয়া ধেয়ে চলিয়াছ
তিমিররূপিণী! ওই বুঝি তোর
প্রলয়সঙ্গিনীগণ দারুণ ক্ষুধায়
প্রাণপণে নাড়া দেয় বিশ্বমহাতরু!
আজ মিটাইব তোর দীর্ঘ উপবাস।
ভক্তেরে সংশয়ে ফেলি এতদিন ছিলি
কোথা দেবী? তোর খড়্গ তুই না তুলিলে
আমরা কি পারি? আজ কী আনন্দ, তোর
চণ্ডীমূর্তি দেখে! সাহসে ভরেছে চিত্ত,
সংশয় গিয়েছে; হতমান নতশির
উঠেছে নূতন তেজে। ওই পদধ্বনি

শুনা যায়, ওই আসে তোর পূজা। জয়
মহাদেবী!

অপর্ণার প্রবেশ

দূর হ, দূর হ মায়াবিনী,—
জয়সিংহে চাস তুই? আরে সর্বনাশী!
মহাপাতকিনী! [অপর্ণার প্রস্থান

এ কী অকাল-ব্যাঘাত!
জয়সিংহ যদি নাই আসে! কভু নহে।
সত্যভঙ্গ কভু নাহি হবে তার।— জয়
মহাকালী, সিদ্ধিদাত্রী, জয় ভয়ংকরী!—
যদি বাধা পায়— যদি ধরা পড়ে শেষে—
যদি প্রাণ যায় তার প্রহরীর হাতে!—
জয় মা অভয়া, জয় ভক্তের সহায়।
জয় মা জাগ্রত দেবী, জয় সর্বজয়া!
ভক্তবৎসলার যেন দুর্নাম না রটে
এ সংসারে, শত্রুপক্ষ নাহি হাসে যেন
নিঃশঙ্ক কৌতুকে। মাতৃ-অহংকার যদি
চূর্ণ হয় সন্তানের, মা বলিয়া তবে
কেহ ডাকিবে না তোরে। ওই পদধ্বনি!
জয়সিংহ বটে! জয় নৃমুণ্ডমালিনী,
পাষণ্ডদলনী মহাশক্তি!

জয়সিংহের দ্রুত প্রবেশ

জয়সিংহ,
রাজরক্ত কই?

জয়সিংহ। আছে আছে! ছাড়ো মোরে।
নিজে আমি করি নিবেদন।—

রাজরক্ত
চাই তোর, দয়াময়ী, জগৎপালিনী
মাতা? নহিলে কিছুতে তোর মিটিবে না

তৃষা ? আমি রাজপুত, পূর্ব পিতামহ
ছিল রাজা, এখনো রাজত্ব করে মোর
মাতামহবংশ— রাজরক্ত আছে দেহে।
এই রক্ত দিব। এই যেন শেষ রক্ত
হয় মাতা, এই রক্তে শেষ মিটে যেন
অনন্ত পিপাসা তোর, রক্ততৃষাতুরা। [বক্ষে ছুরী-বিদ্ধন

রঘুপতি। জয়সিংহ ! জয়সিংহ ! নির্দয় ! নিষ্ঠুর !
এ কী সর্বনাশ করিলি রে ? জয়সিংহ,
অকৃতজ্ঞ, গুরুদ্রোহী, পিতৃমর্মঘাতী,
স্বেচ্ছাচারী ! জয়সিংহ, কুলিশকঠিন !
ওরে জয়সিংহ, মোর একমাত্র প্রাণ,
প্রাণাধিক, জীবন-মন্থন-করা ধন !
জয়সিংহ, বৎস মোর, হে গুরুবৎসল !
ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর
কিছু নাহি চাহি ! অহংকার অভিমান
দেবতা ব্রাহ্মণ সব যাক ! তুই আয় !

অপর্ণার প্রবেশ

অপর্ণা। পাগল করিবে মোরে। জয়সিংহ, কোথা
জয়সিংহ !

রঘুপতি। আয় মা অমৃতময়ী ! ডাক্
তোর সুধাকণ্ঠে, ডাক্ ব্যগ্রস্বরে, ডাক্
প্রাণপণে ! ডাক্ জয়সিংহে ! তুই তারে
নিয়ে যা মা আপনার কাছে, আমি নাহি
চাহি।

[অপর্ণার মূর্ছা

প্রতিমার পদতলে মাথা রাখিয়া

ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে !

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ

গোবিন্দমাণিক্য ও নয়নরায়

গোবিন্দমাণিক্য। এখনি আনন্দধ্বনি ! এখনি পরেছে
দীপমালা নির্লজ্জ প্রাসাদ ! উঠিয়াছে
রাজধানী-বহির্দ্বারে বিজয়তোরণ
পুলকিত নগরের আনন্দ-উৎক্ষিপ্ত
দুই বাহু-সম ! এখনো প্রাসাদ হতে
বাহিরে আসি নি— ছাড়ি নাই সিংহাসন।
এতদিন রাজা ছিনু— কারো কি করি নি
উপকার ? কোনো অবিচার করি নাই
দূর ? কোনো অত্যাচার করি নি শাসন ?
ধিক্ ধিক্ নির্বাসিত রাজা ! আপনারে
আপনি বিচার করি আপনার শোকে
আপনি ফেলিস অশ্রু !
মর্তরাজ্য গেল,
আপনার রাজা তবু আমি। মহোৎসব
হোক আজি অন্তরের সিংহাসনতলে।

গুণবতীর প্রবেশ

গুণবতী। প্রিয়তম, প্রাণেশ্বর, আর কেন নাথ ?
এইবার শুনেছ তো দেবীর নিষেধ !
এসো প্রভু, আজ রাত্রে শেষ পূজা করে
রামজানকীর মতো যাই নির্বাসনে ?
গোবিন্দমাণিক্য। অয়ি প্রিয়তমে, আজি শুভদিন মোর।
রাজ্য গেল, তোমারে পেলেম ফিরে। এসো
প্রিয়ে, যাই দোঁহে দেবীর মন্দিরে, শুধু
প্রেম নিয়ে, শুধু পুষ্প নিয়ে, মিলনের

অশ্রু নিয়ে, বিদায়ের বিশুদ্ধ বিষাদ
নিয়ে, আজ রক্ত নয়, হিংসা নয়।

গুণবতী। ভিক্ষা
রাখো নাথ!

গোবিন্দমাণিক্য। বলো দেবী!

গুণবতী। হোয়ো না পাষাণ।
রাজগর্ব ছেড়ে দাও। দেবতার কাছে
পরাভব না মানিতে চাও যদি, তবু
আমার যন্ত্রণা দেখে গলুক হৃদয়।
তুমি তো নিষ্ঠুর কভু ছিলে নাকো প্রভু,
কে তোমারে করিল পাষাণ! কে তোমারে
আমার সৌভাগ্য হতে লইল কাড়িয়া!
করিল আমারে রাজাহীন রানী!

গোবিন্দমাণিক্য। প্রিয়ে,
আমারে বিশ্বাস করো একবার শুধু,
না বুঝিয়া বোঝো মোর পানে চেয়ে। অশ্রু
দেখে বোঝো, আমারে যে ভালোবাস সেই
ভালোবাসা দিয়ে বোঝো— আর রক্তপাত
নহে। মুখ ফিরায়ো না দেবী, আর মোরে
ছাড়িয়ো না, নিরাশ কোরো না আশা দিয়ে।
যাবে যদি মার্জনা করিয়া যাও তবে।

[গুণবতীর প্রস্থান

গেলে চলি! কী কঠিন নিষ্ঠুর সংসার!—
ওরে কে আছিস?— কেহ নাই? চলিলাম।
বিদায় হে সিংহাসন! হে পুণ্য প্রাসাদ,
আমার পৈতৃক ক্রোড়, নির্বাসিত পুত্র
তোমারে প্রণাম ক'রে লইল বিদায়।

গুরুদেব, এনে দাও তাঁরে, রোষশান্তি
করিব তাঁহার। আনিয়াছি মার পূজা।
রাজ্য পতি সব ছেড়ে পালিয়াছি শুধু
প্রতিজ্ঞা আমার। দয়া করো, দয়া করে
দেবীরে ফিরায়ে আনো শুধু, আজি এই
এক রাত্রি তরে। কোথা দেবী ?

রঘুপতি। কোথাও সে
নাই। ঊর্ধ্বে নাই, নিম্নে নাই, কোথাও সে
নাই, কোথাও সে ছিল না কখনো।

গুণবতী। প্রভু,
এইখানে ছিল না কি দেবী ?

রঘুপতি। দেবী বল
তারে! এ সংসারে কোথাও থাকিত দেবী,
তবে সেই পিশাচীরে দেবী বলা কভু
সহ্য কি করিত দেবী ? মহত্ত্ব কি তবে
ফেলিত নিষ্ফল রক্ত হৃদয় বিদারি
মূঢ় পাষাণের পদে ? দেবী বল তারে ?
পুণ্যরক্ত পান ক'রে সে মহারাক্ষসী
ফেটে মরে গেছে।

গুণবতী। গুরুদেব, বধিয়ো না
মোরে। সত্য করে বলো আরবার। দেবী
নাই ?

রঘুপতি। নাই।

গুণবতী। দেবী নাই ?

রঘুপতি। নাই।

গুণবতী। দেবী নাই ?
তবে কে রয়েছে ?

রঘুপতি। কেহ নাই। কিছু নাই।

গুণবতী। নিয়ে যা, নিয়ে যা পূজা! ফিরে যা, ফিরে যা!
বল্ শীঘ্র কোন্ পথে গেছে মহারাজ।

অপর্ণার প্রবেশ

অপর্ণা। পিতা !

রঘুপতি। জননী, জননী, জননী আমার !
পিতা ! এ তো নহে ভর্ৎসনার নাম। পিতা !
মা জননী, এ পুত্রঘাতীরে পিতা ব'লে
যে জন ডাকিত, সেই রেখে গেছে ওই
সুধামাখা নাম তোর কণ্ঠে, এইটুকু
দয়া করে গেছে। আহা, ডাক্ আরবার !

অপর্ণা। পিতা, এস এ মন্দির ছেড়ে যাই মোরা।

পুষ্প-অর্ঘ্য লইয়া

গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

গোবিন্দমাণিক্য। দেবী কই ?

রঘুপতি। দেবী নাই।

গোবিন্দমাণিক্য। একি রক্তধারা !

রঘুপতি। এই শেষ পুণ্যরক্ত এ পাপ-মন্দিরে।
জয়সিংহ নিবায়েছে নিজ রক্ত দিয়ে
হিংসারক্তশিখা।

গোবিন্দমাণিক্য। ধন্য ধন্য জয়সিংহ,
এ পূজার পুষ্পাঞ্জলি সঁপিনু তোমারে।

গুণবতী। মহারাজ !

গোবিন্দমাণিক্য। প্রিয়তমে !

গুণবতী। আজ দেবী নাই—
তুমি মোর একমাত্র রয়েছ দেবতা। [প্রণাম

গোবিন্দমাণিক্য। গেছে পাপ। দেবী আজ এসেছে ফিরিয়া
আমার দেবীর মাঝে।

অপর্ণা। পিতা, চলে এস!

রঘুপতি। পাষাণ ভাঙিয়া গেল— জননী আমার
এবার দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা!
জননী অমৃতময়ী!

অপর্ণা। পিতা, চলে এস!

উপন্যাস ও গল্প

চীত্রাঃ

সূচনা

রাজর্ষি সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্যে অনুরোধ পেয়েছি। বলবার বিশেষ কিছু নেই। এর প্রধান বক্তব্য এই যে, এ আমার স্বপ্নলব্ধ উপন্যাস।

বালক পত্রের সম্পাদিকা আমাকে ঐ মাসিকের পাতে নিয়মিত পরিবেশনের কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তার ফল হল এই যে, প্রায় একমাত্র আমিই হলুম তার ভোজের জোগানদার। একটু সময় পেলেই মনটা 'কী লিখি' 'কী লিখি' করতে থাকে।

রাজনারায়ণ বাবু ছিলেন দেওঘরে। তাঁকে দেখতে যাব বলে বেরনো গেল। রাত্রে গাড়ির আলোটা বিশ্রামের ব্যাঘাত করবে বলে তার নিচেকার আবরণটা টেনে দিলুম। অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সহযাত্রীর মন তাতে প্রসন্ন হল না, ঢাকা খুলে দিলেন। জাগা অনিবার্য ভেবে একটা গল্পের প্লট মনে আনতে চেষ্টা করলুম। ঘুম এসে গেল। স্বপ্নে দেখলুম— একটা পাথরের মন্দির। ছোটো মেয়েকে নিয়ে বাপ এসেছেন পুজো দিতে। সাদাপাথরের সিঁড়ির উপর দিয়ে বলির রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। দেখে মেয়েটির মুখে কী ভয়! কী বেদনা! বাপকে সে বার বার করুণস্বরে বলতে লাগল, বাবা, এত রক্ত কেন! বাপ কোনোমতে মেয়ের মুখ চাপা দিতে চায়, মেয়ে তখন নিজের আঁচল দিয়ে রক্ত মুছতে লাগল। জেগে উঠেই বললুম, গল্প পাওয়া গেল। এই স্বপ্নের বিবরণ 'জীবনস্মৃতি'তে পূর্বেই লিখেছি, পুনরুক্তি করতে হল। আসল গল্পটা ছিল প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে হিংস্র শক্তিপূজার বিরোধ। কিন্তু মাসিক পত্রের পেটুক দাবি সাহিত্যের বৈধ ক্ষুধার মাপে পরিমিত হতে চায় না। ব্যঞ্জনের পদসংখ্যা বাড়িয়ে চলতে হল।

বস্তুত উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়েছে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে। ফসল-খেতের যেখানে কিনারা সেদিকটাতে চাষ পড়ে নি, আগাছায় জঙ্গল হয়ে উঠেছে। সাময়িক পত্রের অবিবেচনায় প্রায়ই লেখনীর জাত নষ্ট হয়। বিশেষ যেখানে শিশু পাঠকই লক্ষ্য সেখানে বাজে বাচালতার সংকোচ থাকে না। অল্পবয়সের ছেলেদেরও সম্মান রাখার দরকার আছে, এ কথা শিশুসাহিত্য-লেখকেরা প্রায় ভোলেন। সাহিত্যরচনায় গুণী-লেখনীর সতর্কতা যদি না থাকে, যদি সে রচনা বিনা লজ্জায় অকিঞ্চিৎকর হয়ে ওঠে, তবে সেটা

অস্বাস্থ্যকর হবেই, বিশেষত ছেলেদের পাকযন্ত্রের পক্ষে। দুধের বদলে পিঠুলি-গোলা যদি ব্যাবসার খাতিরে চালাতেই হয়, তবে সে ফাঁকি বরঞ্চ চালানো যেতে পারে বয়স্কদের পাত্রে, তাতে তাঁদের রুচির পরীক্ষা হবে; কিন্তু ছেলেদের ভোগে নৈব নৈব চ।

রাজর্ষি

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভুবনেশ্বরী মন্দিরের পাথরের ঘাট গোমতী নদীতে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ত্রিপুরার মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য একদিন গ্রীষ্মকালের প্রভাতে স্নান করিতে আসিয়াছেন, সঙ্গে তাঁহার ভাই নক্ষত্ররায়ও আসিয়াছেন। এমন সময়ে একটি ছোটো মেয়ে তাহার ছোটো ভাইকে সঙ্গে করিয়া সেই ঘাটে আসিল। রাজার কাপড় টানিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

রাজা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "মা, আমি তোমার সন্তান।"

মেয়েটি বলিল, "আমাকে পূজার ফুল পাড়িয়া দাও-না।"

রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, চলো।"

অনুচরগণ অস্থির হইয়া উঠিল। তাহারা কহিল, "মহারাজ, আপনি কেন যাইবেন, আমরা পাড়িয়া দিতেছি।"

রাজা বলিলেন, "না, আমাকে যখন বলিয়াছে আমিই পাড়িয়া দিব।"

রাজা সেই মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সেদিনকার বিমল উষার সঙ্গে তাহার মুখের সাদৃশ্য ছিল। রাজার হাত ধরিয়া যখন সে মন্দিরসংলগ্ন ফুলবাগানে বেড়াইতেছিল, তখন চারি দিকের শুভ্র বেলফুলগুলির মতো তাহার ফুটফুটে মুখখানি হইতে যেন একটি বিমল সৌরভের ভাব উত্থিত হইয়া প্রভাতের কাননে ব্যাপ্ত হইতেছিল। ছোটো ভাইটি দিদির কাপড় ধরিয়া দিদির সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছিল। সে কেবল একমাত্র দিদিকেই জানে, রাজার সঙ্গে তাহার বড়ো-একটা ভাব হইল না।

রাজা মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী মা?"

মেয়ে বলিল, "হাসি।"

রাজা ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী?"

ছেলেটি বড়ো বড়ো চোখ মেলিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিছু উত্তর করিল না।

হাসি তাহার গায়ে হাত দিয়া কহিল, "বল্‌-না ভাই, আমার নাম তাতা।"

ছেলেটি তাহার অতি ছোটো দুইখানি ঠোঁট একটুখানি খুলিয়া গম্ভীরভাবে দিদির কথার প্রতিধ্বনির মতো বলিল, "আমার নাম তাতা।"

বলিয়া দিদির কাপড় আরও শক্ত করিয়া ধরিল।

হাসি রাজাকে বুঝাইয়া বলিল, "ও কিনা ছেলেমানুষ, তাই ওকে সকলে তাতা বলে।"

ছোটো ভাইটির দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "আচ্ছা, বল্ দেখি মন্দির।"

ছেলেটি দিদির মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "লদন্দ।"

হাসি হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "তাতা মন্দির বলিতে পারে না, বলে লদন্দ।—আচ্ছা, বল্ দেখি কড়াই।"

ছেলেটি গম্ভীর হইয়া বলিল, "বলাই।"

হাসি আবার হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "তাতা আমাদের কড়াই বলিতে পারে না, বলে বলাই।"

বলিয়া তাতাকে ধরিয়া চুমো খাইয়া খাইয়া অস্থির করিয়া দিল।

তাতা সহসা দিদির এত হাসি ও এত আদরের কোনোই কারণ খুঁজিয়া পাইল না, সে কেবল মস্ত চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল। বাস্তবিকই মন্দির এবং কড়াই শব্দ উচ্চারণ সম্বন্ধে তাতার সম্পূর্ণ ত্রুটি ছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না; তাতার বয়সে হাসি মন্দিরকে কখনোই লদন্দ বলিত না, সে মন্দিরকে বলিত পালু, আর সে কড়াইকে বলাই বলিত কি না জানি না কিন্তু কড়িকে বলিত ঘয়ি, সুতরাং তাতার এরূপ বিচিত্র উচ্চারণ শুনিয়া তাহার যে অত্যন্ত হাসি পাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কী। তাতা সম্বন্ধে নানা ঘটনা সে রাজাকে বলিতে লাগিল। একবার একজন বুড়োমানুষ কম্বল জড়াইয়া আসিয়াছিল, তাতা তাহাকে ভাল্লুক বলিয়াছিল, এমনি তাতার মন্দবুদ্ধি। আর একবার তাতা গাছের আতাফলগুলিকে পাখি মনে করিয়া মোটা মোটা ছোটো দুটি হাতে তালি দিয়া তাহাদিগকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাতা যে হাসির চেয়ে অনেক ছেলেমানুষ, ইহা তাতার দিদি বিস্তর উদাহরণ-দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করিয়া দিল। তাতা নিজের বুদ্ধির পরিচয়ের কথা সম্পূর্ণ অবিচলিতচিত্তে শুনিতেছিল, যতটুকু বুঝিতে পারিল তাহাতে ক্ষোভের কারণ কিছুই দেখিতে পাইল না। এইরূপে সেদিনকার সকালে ফুল তোলা শেষ হইল। ছোটো মেয়েটির আঁচল ভরিয়া যখন ফুল দিলেন তখন রাজার মনে হইল, যেন তাঁহার পূজা শেষ হইল; এই দুইটি সরল প্রাণের স্নেহের দৃশ্য দেখিয়া, এই পবিত্র হৃদয়ের আশ মিটাইয়া ফুল তুলিয়া দিয়া, তাঁহার যেন দেবপূজার কাজ হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাহার পরদিন হইতে ঘুম ভাঙিলে সূর্য উঠিলেও রাজার প্রভাত হইত না, ছোটো দুটি ভাইবোনের মুখ দেখিলে তবে তাঁহার প্রভাত হইত। প্রতিদিন তাহাদিগকে ফুল তুলিয়া দিয়া তবে তিনি স্নান করিতেন; দুই ভাইবোনে ঘাটে বসিয়া তাঁহার স্নান দেখিত। যেদিন সকালে এই দুটি ছেলেমেয়ে না আসিত, সেদিন তাঁহার সন্ধ্যা-আহ্নিক যেন সম্পূর্ণ হইত না।

হাসি ও তাতার বাপ মা কেহ নাই। কেবল একটি কাকা আছে। কাকার নাম কেদারেশ্বর। এই দুটি ছেলেমেয়েই তাহার জীবনের একমাত্র সুখ ও সম্বল।

এক বৎসর কাটিয়া গেল। তাতা এখন মন্দির বলিতে পারে, কিন্তু এখনও কড়াই বলিতে বলাই বলে। অধিক কথা সে কয় না। গোমতী নদীর ধারে নাগকেশর গাছের তলায় পা ছড়াইয়া তাহার দিদি তাহাকে যে-কোনো গল্পই করিত, সে তাহাই ড্যাবাড্যাবা চোখে আবাক হইয়া শুনিত। সে গল্পের কোনো মাথামুণ্ড ছিল না; কিন্তু সে যে কী বুঝিত সেই জানে; গল্প শুনিয়া সেই গাছের তলায়, সেই সূর্যের আলোতে, সেই মুক্ত সমীরণে, একটি ছোটো ছেলের ছোটো হৃদয়টুকুতে যে কত কথা কত ছবি উঠিত তাহা আমরা কী জানি। তাতা আর-কোনো ছেলের সঙ্গে খেলা করিত না, কেবল তাহার দিদির সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো বেড়াইত।

আষাঢ় মাস। সকাল হইতে ঘন মেঘ করিয়া রহিয়াছে। এখনও বৃষ্টি পড়ে নাই, কিন্তু বাদলা হইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে। দূরদেশের বৃষ্টির কণা বহিয়া শীতল বাতাস বহিতেছে। গোমতী নদীর জলে এবং গোমতী নদীর উভয় পারের অরণ্যে অন্ধকার আকাশের ছায়া পড়িয়াছে। কাল রাত্রে অমাবস্যা ছিল, কাল ভুবনেশ্বরীর পূজা হইয়া গিয়াছে।

যথাসময়ে হাসি ও তাতার হাত ধরিয়া রাজা স্নান করিতে আসিয়াছেন। একটি রক্তস্রোতের রেখা শ্বেত প্রস্তরের ঘাটের সোপান বাহিয়া জলে গিয়া শেষ হইয়াছে। কাল রাত্রে যে এক-শো-এক মহিষ বলি হইয়াছে তাহারই রক্ত।

হাসি সেই রক্তের রেখা দেখিয়া সহসা একপ্রকার সংকোচে সরিয়া গিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কিসের দাগ বাবা!"

রাজা বলিলেন, "রক্তের দাগ মা!"

সে কহিল, "এত রক্ত কেন!" এমন একপ্রকার কাতর স্বরে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল 'এত রক্ত কেন', যে, রাজারও হৃদয়ের মধ্যে ক্রমাগত এই প্রশ্ন উঠিতে লাগিল, 'এত রক্ত কেন!' তিনি সহসা শিহরিয়া উঠিলেন। বহুদিন ধরিয়া প্রতিবৎসর রক্তের স্রোত দেখিয়া আসিতেছেন, একটি ছোটো মেয়ের প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল, 'এত রক্ত কেন!' তিনি উত্তর দিতে ভুলিয়া গেলেন। অন্যমনে স্নান করিতে করিতে ঐ প্রশ্নই ভাবিতে লাগিলেন।

হাসি জলে আঁচল ভিজাইয়া সিঁড়িতে বসিয়া ধীরে ধীরে রক্তের রেখা মুছিতে লাগিল, তাহার দেখাদেখি ছোটো হাত দুটি দিয়া তাতাও তাহাই করিতে লাগিল। হাসির আঁচলখানি রক্তে লাল হইয়া গেল। রাজার যখন স্নান হইয়া গেল, তখন দুই ভাইবোনে মিলিয়া রক্তের দাগ মুছিয়া ফেলিয়াছে।

সেইদিন বাড়ি ফিরিয়া গিয়া হাসির জ্বর হইল। তাতা কাছে বসিয়া দুটি ছোটো আঙুলে দিদির মুদ্রিত চোখের পাতা খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া মাঝে মাঝে ডাকিতেছে, "দিদি!" দিদি অমনি সচকিতে একটুখানি জাগিয়া উঠিতেছে। "কী তাতা" বলিয়া তাতাকে কাছে টানিয়া লইতেছে; আবার তাহার চোখ ঢুলিয়া পড়িতেছে। তাতা অনেক ক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, কোনো কথাই বলে না। অবশেষে অনেক ক্ষণ পরে ধীরে ধীরে দিদির গলা জড়াইয়া ধরিয়া দিদির মুখের কাছে মুখ দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "দিদি, তুই উঠবি নে?" হাসি চমকিয়া জাগিয়া তাতাকে বুকে চাপিয়া কহিল, "কেন উঠব না ধন!" কিন্তু দিদির উঠিবার আর সাধ্য নাই। তাতার ক্ষুদ্র হৃদয় যেন অত্যন্ত অন্ধকার হইয়া গেল। তাতার সমস্ত দিনের খেলাধুলা আনন্দের আশাএকেবারে ম্লান হইয়া গেল। আকাশ অত্যন্ত অন্ধকার, ঘরের চালের উপর ক্রমাগতই বৃষ্টির শব্দ শুনা যাইতেছে, প্রাঙ্গণের তেঁতুল গাছ জলে ভিজিতেছে, পথে পথিক নাই। কেদারেশ্বর একজন বৈদ্যকে সঙ্গে করিয়া আনিল। বৈদ্য নাড়ি টিপিয়া অবস্থা দেখিয়া ভালো বোধ করিল না।

তাহার পরদিন স্নান করিতে আসিয়া রাজা দেখিলেন, মন্দিরে দুইটি ভাইবোন তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া নাই। মনে করিলেন, এই ঘোরতর বর্ষায় তাহারা আসিতে পারে নাই। স্নান-তর্পণ শেষ করিয়া শিবিকায় চড়িয়া বাহকদিগকে কেদারেশ্বরের কুটিরে যাইতে আজ্ঞা দিলেন। অনুচরেরা সকলে আশ্চর্য হইয়া গেল, কিন্তু রাজাজ্ঞার উপরে আর কথা কহিতে পারিল না।

রাজার শিবিকা প্রাঙ্গণে গিয়া পৌছিলে কুটিরে অত্যন্ত গোলযোগ পড়িয়া গেল।

সে গোলমালে রোগীর রোগের কথা সকলেই ভুলিয়া গেল। কেবল তাতা নড়িল না, সে অচেতন দিদির কোলের কাছে বসিয়া দিদির কাপড়ের এক প্রান্ত মুখের ভিতর পুরিয়া চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল।

রাজাকে ঘরে আসিতে দেখিয়া তাতা জিজ্ঞাসা করিল, "কী হয়েছে?"

উদ্বিগ্নহৃদয় রাজা কিছুই উত্তর দিলেন না। তাতা ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "দিদির নেগেছে?"

খুড়ো কেদারেশ্বর কিছু বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল, "হাঁ, লেগেছে।"

অমনি তাতা দিদির কাছে গিয়া দিদির মুখ তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়া গলা জড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, তোমার কোথায় নেগেছে?"

মনের অভিপ্রায় এই যে, সেই জায়গাটাতে ফুঁ দিয়া, হাত বুলাইয়া, দিদির সমস্ত বেদনা দূর করিয়া দিবে। কিন্তু যখন দিদি কোনো উত্তর দিল না তখন তাহার আর সহ্য হইল না— ছোটো দুইটি ঠোঁট উত্তরোত্তর ফুলিতে লাগিল, অভিমানে কাঁদিয়া উঠিল। কাল হইতে বসিয়া আছে, একটি কথা নাই কেন! তাতা কী করিয়াছে যে তাহার উপর এত অনাদর! রাজার সম্মুখে তাতার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া কেদারেশ্বর অত্যন্ত শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে বিরক্ত হইয়া তাতার হাত ধরিয়া অন্য ঘরে টানিয়া লইয়া গেল। তবুও দিদি কিছু বলিল না।

রাজবৈদ্য আসিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়া গেল। রাজা সন্ধ্যাবেলায় আবার হাসিকে দেখিতে আসিলেন। তখন বালিকা প্রলাপ বকিতেছে। বলিতেছে, "মাগো, এত রক্ত কেন!"

রাজা কহিলেন, "মা, এ রক্তস্রোত আমি নিবারণ করিব।"

বালিকা বলিল, "আয় ভাই তাতা, আমরা দুজনে এ রক্ত মুছে ফেলি।"

রাজা কহিলেন, "আয় মা, আমিও মুছি।"

সন্ধ্যার কিছু পরেই হাসি একবার চোখ খুলিয়াছিল। একবার চারি দিকে চাহিয়া কাহাকে যেন খুঁজিল। তখন তাতা অন্য ঘরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কাহাকে যেন না দেখিতে পাইয়া হাসি চোখ বুজিল। চক্ষু আর খুলিল না। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় রাজার কোলে হাসির মৃত্যু হইল।

হাসিকে যখন চিরদিনের জন্য কুটির হইতে লইয়া গেল, তখন তাতা অজ্ঞান হইয়া ঘুমাইতেছিল। সে যদি জানিতে পাইত, তবে সেও বুঝি দিদির সঙ্গে সঙ্গে ছোটো ছায়াটির মতো চলিয়া যাইত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাজার সভা বসিয়াছে। ভুবনেশ্বরী-দেবী-মন্দিরের পুরোহিত কার্যবশত রাজদর্শনে আসিয়াছেন।

পুরোহিতের নাম রঘুপতি। এ দেশে পুরোহিতকে চোন্তাই বলিয়া থাকে। ভুবনেশ্বরী দেবীর পূজার চৌদ্দ দিন পরে গভীর রাত্রে চতুর্দশ দেবতার এক পূজা হয়। এই পূজার সময় এক দিন দুই রাত্রি কেহ ঘরের বাহির হইতে পারে না, রাজাও না। রাজা যদি বাহির হন, তবে চোন্তাইয়ের নিকটে তাঁহাকে অর্থদণ্ড দিতে হয়। প্রবাদ আছে, এই পূজার রাত্রে মন্দিরে নরবলি হয়। এই পূজা উপলক্ষে সর্বপ্রথমে যে-সকল পশুবলি হয়, তাহা রাজবাড়ির দান বলিয়া গৃহীত হয়। এই বলির পশু গ্রহণ করিবার জন্য চোন্তাই রাজসমীপে আসিয়াছেন। পূজার আর বারো দিন বাকি আছে।

রাজা বলিলেন, "এ বৎসর হইতে মন্দিরে জীববলি আর হইবে না।"

সভাসুদ্ধ লোক অবাক হইয়া গেল। রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়ের মাথার চুল পর্যন্ত দাঁড়াইয়া উঠিল।

চোন্তাই রঘুপতি বলিলেন, "আমি এ কি স্বপ্ন দেখিতেছি!"

রাজা বলিলেন, "না ঠাকুর, এতদিন আমরা স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, আজ আমাদের চেতনা হইয়াছে। একটি বালিকার মূর্তি ধরিয়া মা আমাকে দেখা দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গেছেন, করুণাময়ী জননী হইয়া মা তাঁহার জীবের রক্ত আর দেখিতে পারেন না।"

রঘুপতি কহিলেন, "মা তবে এতদিন ধরিয়া জীবের রক্ত পান করিয়া আসিতেছেন কী করিয়া?"

রাজা কহিলেন, "না, পান করেন নাই। তোমরা যখন রক্তপাত করিতে তখন তিনি মুখ ফিরাইয়া থাকিতেন।"

রঘুপতি বলিলেন, "মহারাজ, রাজকার্য আপনি ভালো বুঝেন সন্দেহ নাই, কিন্তু পূজা সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না। দেবীর যদি কিছুতে অসন্তোষ হইত, আমিই আগে জানিতে পারিতাম।"

নক্ষত্ররায় অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "হাঁ, এ ঠিক কথা। দেবীর যদি কিছুতে অসন্তোষ হইত, ঠাকুরমহাশয়ই আগে জানিতে পাইতেন।"

*

রাজা বলিলেন, "হৃদয় যার কঠিন হইয়া গিয়াছে, দেবীর কথা সে শুনিতে পায় না।"

নক্ষত্ররায় পুরোহিতের মুখের দিকে চাহিলেন— ভাবটা এই যে, এ কথার একটা উত্তর দেওয়া আবশ্যক। রঘুপতি আগুন হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি পাষণ্ড নাস্তিকের মতো কথা কহিতেছেন।"

নক্ষত্ররায় মৃদু প্রতিধ্বনির মতো বলিলেন, "হাঁ, নাস্তিকের মতো কথা কহিতেছেন।"

গোবিন্দমাণিক্য উদ্দীপ্তমূর্তি পুরোহিতের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, রাজসভায় বসিয়া আপনি মিথ্যা সময় নষ্ট করিতেছেন। মন্দিরের কাজ বহিয়া যাইতেছে, আপনি মন্দিরে যান। যাইবার সময় পথে প্রচার করিয়া দিবেন যে, আমার রাজ্যে যে ব্যক্তি দেবতার নিকট জীববলি দিবে তাহার নির্বাসনদণ্ড হইবে।"

তখন রঘুপতি কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পইতা স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "তবে তুমি উচ্ছন্ন যাও!"

চারি দিক হইতে হাঁ-হাঁ করিয়া সভাসদ্‌গণ পুরোহিতের উপর গিয়া পড়িলেন। রাজা ইঙ্গিতে সকলকে নিষেধ করিলেন, সকলে সরিয়া দাঁড়াইলেন। রঘুপতি বলিতে লাগিলেন, "তুমি রাজা, তুমি ইচ্ছা করিলে প্রজার সর্বস্ব হরণ করিতে পারো, তাই বলিয়া তুমি মায়ের বলি হরণ করিবে! বটে! কী তোমার সাধ্য! আমি রঘুপতি মায়ের সেবক থাকিতে কেমন তুমি পূজার ব্যাঘাত কর দেখিব।"

মন্ত্রী রাজার স্বভাব বিলক্ষণ অবগত আছেন। তিনি জানেন সংকল্প হইতে রাজাকে শীঘ্র বিচলিত করা যায় না। তিনি ধীরে ধীরে সভয়ে কহিলেন, "মহারাজ, আপনার স্বর্গীয় পিতৃপুরুষগণ বরাবর দেবীর নিকটে নিয়মিত বলি দিয়া আসিতেছেন। কখনো এক দিনের জন্য ইহার অন্যথা হয় নাই।"

মন্ত্রী থামিলেন।

রাজা চুপ করিয়া রহিলেন। মন্ত্রী বলিলেন, "আজ এতদিন পরে আপনার পিতৃপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত সেই প্রাচীন পূজার ব্যাঘাত সাধন করিলে স্বর্গে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইবেন।"

মহারাজ ভাবিতে লাগিলেন। নক্ষত্ররায় বিজ্ঞতাসহকারে বলিলেন, "হাঁ, স্বর্গে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইবেন।"

মন্ত্রী আবার বলিলেন, "মহারাজ, এক কাজ করুন, যেখানে সহস্র বলি হইয়া থাকে সেখানে একশত বলির আদেশ করুন।"

সভাসদেরা বজ্রাহতের মতো অবাক হইয়া রহিল, গোবিন্দমাণিক্যও বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ক্রুদ্ধ পুরোহিত অধীর হইয়া সভা হইতে উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

এমন সময়ে কেমন করিয়া প্রহরীদের হাত এড়াইয়া খালি-গায়ে খালি-পায়ে একটি ছোটো ছেলে সভায় প্রবেশ করিল। রাজসভার মাঝখানে দাঁড়াইয়া রাজার মুখের দিকে বড়ো বড়ো চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি কোথায় ?"

বৃহৎ রাজসভার সমস্ত যেন সহসা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। দীর্ঘ গৃহে কেবল একটি ছেলের কণ্ঠধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল "দিদি কোথায়"।

রাজা তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে নামিয়া ছেলেকে কোলে করিয়া দৃঢ়স্বরে মন্ত্রীকে বলিলেন, "আজ হইতে আমার রাজ্যে বলিদান হইতে পারিবে না। ইহার উপর আর কথা কহিয়ো না।"

মন্ত্রী কহিলেন, "যে আজ্ঞা।"

তাতা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি কোথায় ?"

রাজা বলিলেন, "মায়ের কাছে।"

তাতা অনেক ক্ষণ মুখে আঙুল দিয়া চুপ করিয়া রহিল, একটা যেন ঠিকানা পাইল এমনি তাহার মনে হইল। আজ হইতে রাজা তাতাকে নিজের কাছে রাখিলেন। খুড়ো কেদারেশ্বর রাজবাড়িতে স্থান পাইল।

সভাসদেরা আপনা-আপনি বলাবলি করিতে লাগিল, "এ যে মগের মুল্লুক হইয়া দাঁড়াইল। আমরা তো জানি বৌদ্ধ মগেরাই রক্তপাত করে না, অবশেষে আমাদের হিন্দুদের দেশেও কি সেই নিয়ম চলিবে নাকি !"

নক্ষত্ররায়ও তাহাদের মতে সম্পূর্ণ মত দিয়া কহিলেন, "হাঁ, শেষে হিন্দুদের দেশেও কি সেই নিয়ম চলিবে নাকি ?"

সকলেই ভাবিল, অবনতির লক্ষণ ইহা হইতে আর কী হইতে পারে! মগে হিন্দুতে তফাত রহিল কী !

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভুবনেশ্বরী-দেবী-মন্দিরের ভৃত্য জয়সিংহ জাতিতে রাজপুত, ক্ষত্রিয়। তাঁহার বাপ সুচেতসিংহ ত্রিপুরার রাজবাটীর একজন পুরাতন ভৃত্য ছিলেন। সুচেতসিংহের মৃত্যুকালে জয়সিংহ নিতান্ত বালক ছিলেন। এই অনাথ বালককে রাজা মন্দিরের কাজে নিযুক্ত করেন। জয়সিংহ মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতির দ্বারাই পালিত ও শিক্ষিত হইয়াছেন। ছেলেবেলা হইতে মন্দিরে পালিত হইয়া জয়সিংহ মন্দিরকে গৃহের মতো ভালোবাসিতেন, মন্দিরের প্রত্যেক সোপান প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ডের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তাঁহার মা ছিলেন না, ভুবনেশ্বরী প্রতিমাকেই তিনি মায়ের মতো দেখিতেন, প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া তিনি কথা কহিতেন, তাঁহার একলা বোধ হইত না। তাঁহার আরও সঙ্গী ছিল। মন্দিরের বাগানের অনেকগুলি গাছকে তিনি নিজের হাতে মানুষ করিয়াছেন। তাঁহার চারি দিকে প্রতিদিন তাঁহার গাছগুলি বাড়িতেছে, লতাগুলি জড়াইতেছে, শাখা পুষ্পিত হইতেছে, ছায়া বিস্তৃত হইতেছে, শ্যামল বল্লরীর পল্লবস্তবকে যৌবনগর্বে নিকুঞ্জ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু জয়সিংহের এ-সকল প্রাণের কথা, ভালোবাসার কথা, বড়ো কেহ একটা জানিত না; তাঁহার বিপুল বল ও সাহসের জন্যই তিনি বিখ্যাত ছিলেন।

মন্দিরের কাজকর্ম শেষ করিয়া জয়সিংহ তাঁহার কুটিরের দ্বারে বসিয়া আছেন। সম্মুখে মন্দিরের কানন। বিকাল হইয়া আসিয়াছে। অত্যন্ত ঘন মেঘ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। নববর্ষার জলে জয়সিংহের গাছগুলি স্নান করিতেছে, বৃষ্টিবিন্দুর নৃত্যে পাতায় পাতায় উৎসব পড়িয়া গিয়াছে, বর্ষাজলের ছোটো ছোটো শত শত প্রবাহ ঘোলা হইয়া, কলকল করিয়া গোমতী নদীতে গিয়া পড়িতেছে— জয়সিংহ পরমানন্দে তাঁহার কাননের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। চারি দিকে মেঘের স্নিগ্ধ অন্ধকার, বনের ছায়া, ঘনপল্লবের শ্যামশ্রী, ভেকের কোলাহল, বৃষ্টির অবিশ্রাম ঝর্‌ঝর্‌ শব্দ— কাননের মধ্যে এইরূপ নববর্ষার ঘোরঘটা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ জুড়াইয়া যাইতেছে।

ভিজিতে ভিজিতে রঘুপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জয়সিংহ তাড়াতাড়ি উঠিয়া পা ধুইবার জল ও শুকনো কাপড় আনিয়া দিলেন।

রঘুপতি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “তোমাকে কাপড় আনিতে কে কহিল?”

বলিয়া কাপড়গুলা লইয়া ঘরের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন।

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "আপনি বলিতেছেন আমি রাজা হইব?"

বলিয়া রঘুপতির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "আমি কি মিথ্যা কথা বলিতেছি?"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "আপনি কি মিথ্যা কথা বলিতেছেন? সে কেমন করিয়া হইবে? দেখুন ঠাকুরমশায়, আমি কাল ব্যাঙের স্বপ্ন দেখিয়াছি। আচ্ছা, ব্যাঙের স্বপ্ন দেখিলে কী হয় বলুন দেখি।"

রঘুপতি হাস্য সম্বরণ করিয়া কহিলেন, "কেমনতরো ব্যাঙ বলো দেখি। তাহার মাথায় দাগ আছে তো?"

নক্ষত্ররায় সগর্বে কহিলেন, "তাহার মাথায় দাগ আছে বৈকি। দাগ না থাকিলে চলিবে কেন!"

রঘুপতি কহিলেন, "বটে! তবে তো তোমার রাজটিকা লাভ হইবে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "তবে আমার রাজটিকা লাভ হইবে! আপনি বলিতেছেন আমার রাজটিকা লাভ হইবে? আর যদি না হয়?"

রঘুপতি কহিলেন, "আমার কথা ব্যর্থ হইবে? বল কী!"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "না না, সে কথা হইতেছে না। আপনি কিনা বলিতেছেন আমার রাজটিকা লাভ হইবে, মনে করুন যদিই না হয়। দৈবাৎ কি এমন হয় না যে—"

রঘুপতি কহিলেন, "না না, ইহার অন্যথা হইবে না।"

নক্ষত্ররায়। ইহার অন্যথা হইবে না। আপনি বলিতেছেন, ইহার অন্যথা হইবে না। দেখুন ঠাকুরমশায়, আমি রাজা হইলে আপনাকে মন্ত্রী করিব।

রঘুপতি। মন্ত্রিত্বের পদে আমি পদাঘাত করি।

নক্ষত্ররায় অত্যন্ত উদারভাবে কহিলেন, "আচ্ছা, জয়সিংহকে মন্ত্রী করিব।"

রঘুপতি কহিলেন, "সে কথা পরে হইবে। রাজা হইবার আগে কী করিতে হইবে সেটা শোনো আগে। মা রাজরক্ত দেখিতে চান, স্বপ্নে আমার প্রতি এই আদেশ হইয়াছে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "মা রাজরক্ত দেখিতে চান, স্বপ্নে আপনার প্রতি এই আদেশ হইয়াছে। এ তো বেশ কথা।"

রঘুপতি কহিলেন, "তোমাকে গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত আনিতে হইবে।"

নক্ষত্ররায় খানিকটা হাঁ করিয়া রহিলেন। এ কথাটা তত 'বেশ' বলিয়া মনে হইল না।

রঘুপতি তীব্রস্বরে কহিলেন, "সহসা ভ্রাতৃস্নেহের উদয় হইল নাকি ?"

নক্ষত্ররায় কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, "হাঃ হাঃ, ভ্রাতৃস্নেহ! ঠাকুরমশায় বেশ বলিলেন যা হোক, ভ্রাতৃস্নেহ!"

এমন মজার কথা, এমন হাসিবার কথা যেন আর হয় না। ভ্রাতৃস্নেহ! কী লজ্জার বিষয়! কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, নক্ষত্ররায়ের প্রাণের ভিতরে ভ্রাতৃস্নেহ জাগিতেছে, তাহা হাসিয়া উড়াইবার জো নাই।

রঘুপতি কহিলেন, "তা হইলে কী করিবে বলো।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "কী করিব বলুন!"

রঘুপতি। কথাটা ভালো করিয়া শোনো। তোমাকে গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত মায়ের দর্শনার্থ আনিতে হইবে।

নক্ষত্ররায় মন্ত্রের মতো বলিয়া গেলেন, "গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত মায়ের দর্শনার্থ আনিতে হইবে।"

রঘুপতি নিতান্ত ঘৃণার সহিত বলিয়া উঠিলেন, "নাঃ, তোমার দ্বারা কিছু হইবে না।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "কেন হইবে না? যাহা বলিবেন তাহাই হইবে। আপনি তো আদেশ করিতেছেন?"

রঘুপতি। হাঁ, আমি আদেশ করিতেছি।

নক্ষত্ররায়। কী আদেশ করিতেছেন?

রঘুপতি বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "মায়ের ইচ্ছা, তিনি রাজরক্ত দর্শন করিবেন। তুমি গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত দেখাইয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবে, এই আমার আদেশ।"

নক্ষত্ররায়। আমি আজই গিয়া ফতে খাঁকে এই কাজে নিযুক্ত করিব।

রঘুপতি। না না, আর কোনো লোককে ইহার বিন্দুবিসর্গ জানাইয়ো না। কেবল জয়সিংহকে তোমার সাহায্যে নিযুক্ত করিব। কাল প্রাতে আসিয়ো, কী উপায়ে এ কার্য সাধন করিতে হইবে কাল বলিব।

নক্ষত্ররায় রঘুপতির হাত এড়াইয়া বাঁচিলেন। যত শীঘ্র পারিলেন বাহির হইয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নক্ষত্ররায় চলিয়া গেলে জয়সিংহ কহিলেন, "গুরুদেব, এমন ভয়ানক কথা কখনো শুনি নাই। আপনি মায়ের সম্মুখে মায়ের নাম করিয়া ভাইকে দিয়া ভ্রাতৃহত্যার প্রস্তাব করিলেন, আর আমাকে তাই দাঁড়াইয়া শুনিতে হইল!"

রঘুপতি বলিলেন, "আর কী উপায় আছে বলো।"

জয়সিংহ কহিলেন, "উপায়! কিসের উপায়!"

রঘুপতি। তুমিও যে নক্ষত্ররায়ের মতো হইলে দেখিতেছি। এতক্ষণ তবে কী শুনিলে?

জয়সিংহ। যাহা শুনিলাম তাহা শুনিবার যোগ্য নহে, তাহা শুনিলে পাপ আছে।

রঘুপতি। পাপপুণ্যের তুমি কী বুঝ?

জয়সিংহ। এতকাল আপনার কাছে শিক্ষা পাইলাম, পাপপুণ্যের কিছুই বুঝি না কি?

রঘুপতি। শোনো বৎস, তোমাকে তবে আর-এক শিক্ষা দিই। পাপপুণ্য কিছুই নাই। কেই বা পিতা, কেই বা ভ্রাতা, কেই বা কে? হত্যা যদি পাপ হয় তো সকল হত্যাই সমান। কিন্তু কে বলে হত্যা পাপ? হত্যা তো প্রতিদিনই হইতেছে। কেহ বা মাথায় একখণ্ড পাথর পড়িয়া হত হইতেছে, কেহ বা বন্যায় ভাসিয়া গিয়া হত হইতেছে, কেহ বা মড়কের মুখে পড়িয়া হত হইতেছে, কেহ বা মনুষ্যের ছুরিকাঘাতে হত হইতেছে। কত পিপীলিকা আমরা প্রত্যহ পদতলে দলন করিয়া যাইতেছি, আমরা তাহাদের অপেক্ষা এমনই কি বড়ো? এই-সকল ক্ষুদ্র প্রাণীদের জীবন-মৃত্যু খেলা বৈ তো নয়, মহাশক্তির মায়া বৈ তো নয়। কালরূপিণী মহামায়ার নিকটে প্রতিদিন এমন কত লক্ষকোটি প্রাণীর বলিদান হইতেছে— জগতের চতুর্দিক হইতে জীবশোণিতের স্রোত তাঁহার মহাখর্পরে আসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। আমিই নাহয় সেই স্রোতে আর-একটি কণা যোগ করিয়া দিলাম। তাঁহার বলি তিনিই এক কালে গ্রহণ করিতেন, আমি নাহয় মাঝখানে থাকিয়া উপলক্ষ হইলাম।

তখন জয়সিংহ প্রতিমার দিকে ফিরিয়া কহিতে লাগিলেন, "এইজন্যই কি তোকে সকলে মা বলে মা! তুই এমন পাষাণী! রাক্ষসী, সমস্ত জগৎ হইতে রক্ত নিষ্পেষণ

করিয়া লইয়া উদরে পুরিবার জন্য তুই ওই লোল জিহ্বা বাহির করিয়াছিস! স্নেহ প্রেম মমতা সৌন্দর্য ধর্ম সমস্তই মিথ্যা, সত্য কেবল তোর ওই অনন্ত রক্ততৃষা! তোরই উদর-পূরণের জন্য মানুষ মানুষের গলায় ছুরি বসাইবে, ভাই ভাইকে খুন করিবে, পিতাপুত্রে কাটাকাটি করিবে! নিষ্ঠুর, সত্যসত্যই এই যদি তোর ইচ্ছা তবে মেঘ রক্তবর্ষণ করে না কেন, করুণাস্বরূপিণী নদী রক্তস্রোত লইয়া রক্তসমুদ্রে গিয়া পড়ে না কেন? না না, মা, তুই প্রকাশ করিয়া বল্— এ শিক্ষা মিথ্যা, এ শাস্ত্র মিথ্যা— আমার মাকে মা বলে না, সন্তানরক্তপিপাসু রাক্ষসী বলে, এ কথা আমি সহিতে পারিব না।"

জয়সিংহের চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল— তিনি নিজের কথা লইয়া নিজেই ভাবিতে লাগিলেন। এত কথা ইতিপূর্বে কখনো তাঁহার মনে হয় নাই, রঘুপতি যদি তাঁহাকে নূতন শাস্ত্র শিক্ষা দিতে না আসিতেন, তবে কখনোই তাঁহার এত কথা মনেই আসিত না।

রঘুপতি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তবে তো বলিদানের পালা একেবারে উঠাইয়া দিতে হয়।"

জয়সিংহ অতি শৈশবকাল হইতে প্রতিদিন বলিদান দেখিয়া আসিতেছেন। এই জন্য, মন্দিরে যে বলিদান কোনোকালে বন্ধ হইতে পারে কিম্বা বন্ধ হওয়া উচিত এ কথা কিছুতেই তাঁহার মনে লাগে না। এমন-কি এ কথা মনে করিতে তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগে। এইজন্য রঘুপতির কথার উত্তরে জয়সিংহ বলিলেন, "সে স্বতন্ত্র কথা। তাহার অন্য কোনো অর্থ আছে। তাহাতে তো কোনো পাপ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ভাইকে ভাই হত্যা করিবে! তাই বলিয়া মহারাজ গোবিন্দ-মাণিক্যকে— প্রভু, আপনার পায়ে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করি, আমাকে প্রবঞ্চনা করিবেন না, সত্যই কি মা স্বপ্নে কহিয়াছেন— রাজরক্ত নহিলে তাঁর তৃপ্তি হইবে না?"

রঘুপতি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "সত্য নহিলে কি মিথ্যা কহিতেছি? তুমি কি আমাকে অবিশ্বাস কর?"

জয়সিংহ রঘুপতির পদধূলি লইয়া কহিলেন, "গুরুদেবের প্রতি আমার বিশ্বাস শিথিল না হয় যেন। কিন্তু নক্ষত্ররায়েরও তো রাজকুলে জন্ম।"

রঘুপতি কহিলেন, "দেবতাদের স্বপ্ন ইঙ্গিতমাত্র; সকল কথা শুনা যায় না, অনেকটা বুঝিয়া লইতে হয়। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি দেবীর অসন্তোষ হইয়াছে, অসন্তোষের সম্পূর্ণ কারণও জন্মিয়াছে। অতএব দেবী যখন রাজরক্ত চাহিয়াছেন তখন বুঝিতে হইবে, তাহা গোবিন্দমাণিক্যেরই রক্ত।"

দানবের রাজত্ব স্থাপন করাই কি তোর অভিপ্রায়। রাজরক্ত কি নিতান্তই চাই? তোর মুখের উত্তর না শুনিলে আমি কখনোই রাজহত্যা ঘটিতে দিব না, আমি ব্যাঘাত করিব। বল্, হাঁ কি না।"

সহসা বিজন মন্দিরে শব্দ উঠিল, "হাঁ।"

জয়সিংহ চমকিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, মনে হইল যেন ছায়ার মতো কী একটা কাঁপিয়া গেল। স্বর শুনিয়া প্রথমেই তাঁহার মনে হইয়াছিল, যেন তাঁর গুরুর কণ্ঠস্বর। পরে মনে করিলেন, মা তাঁহাকে তাঁহার গুরুর কণ্ঠস্বরেই আদেশ করিলেন ইহাই সম্ভব। তাঁহার গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রতিমাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া সশস্ত্রে বাহির হইয়া পড়িলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গোমতী নদীর দক্ষিণ দিকের এক স্থানের পাড় অতিশয় উচ্চ। বর্ষার ধারা ও ছোটো ছোটো স্রোত এই উন্নত ভূমিকে নানা গুহাগহ্বরে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার কিছু দূরে প্রায় অর্ধচন্দ্রাকারে বড়ো বড়ো শাল ও গাম্ভারি গাছে এই শতধা-বিদীর্ণ ভূমিখণ্ডকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু মাঝখানের এই জমিটুকুর মধ্যে বড়ো গাছ একটিও নাই। কেবল স্থানে স্থানে টিপির উপর ছোটো ছোটো শাল গাছ বাড়িতে পারিতেছে না, বাঁকিয়া কালো হইয়া পড়িয়াছে। বিস্তর পাথর ছড়ানো। এক-হাত দুই-হাত -প্রশস্ত ছোটো ছোটো জলস্রোত কত শত আঁকাবাঁকা পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, মিলিয়া, বিভক্ত হইয়া, নদীতে গিয়া পড়িতেছে। এই স্থান অতি নির্জন— এখানকার আকাশ গাছের দ্বারা অবরুদ্ধ নহে। এখান হইতে গোমতী নদী এবং তাহার পরপারের বিচিত্রবর্ণ শস্যক্ষেত্রসকল অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। প্রতিদিন প্রাতে রাজা গোবিন্দমাণিক্য এইখানে বেড়াইতে আসিতেন, সঙ্গে একটি সঙ্গী বা একটি অনুচরও আসিত না। জেলেরা কখনো কখনো গোমতীতে মাছ ধরিতে আসিয়া দূর হইতে দেখিতে পাইত, তাহাদের সৌম্যমূর্তি রাজা যোগীর ন্যায় স্থিরভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার মুখে প্রভাতের জ্যোতি কি তাঁহার আত্মার জ্যোতি বুঝা যাইত না। আজকাল বর্ষার দিনে প্রতিদিন এখানে আসিতে পারিতেন না, কিন্তু বর্ষা-উপশমে যেদিন আসিতেন সেদিন ছোটো তাতাকে সঙ্গে করিয়া আনিতেন।

তাতাকে আর তাতা বলিতে ইচ্ছা করে না। একমাত্র যাহার মুখে তাতা সম্বোধন মানাইত সে তো আর নাই। পাঠকের কাছে তাতা শব্দের কোনো অর্থই নাই। কিন্তু হাসি যখন সকালবেলায় শালবনে, দুষ্টুমি করিয়া শালগাছের আড়ালে লুকাইয়া, তাহার সুমিষ্ট তীক্ষ্ণ স্বরে তাতা বলিয়া ডাকিত এবং তাহার উত্তরে গাছে গাছে দোয়েল ডাকিয়া উঠিত, দূর কানন হইতে প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিত, তখন সেই তাতা শব্দ অর্থে পরিপূর্ণ হইয়া কানন ব্যাপ্ত করিত— তখন সেই তাতা সম্বোধন একটি বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ের অতি কোমল স্নেহনীড় পরিত্যাগ করিয়া পাখির মতো স্বর্গের দিকে উড়িয়া যাইত— তখন সেই একটি স্নেহসিক্ত মধুর সম্বোধন প্রভাতের সমুদয় পাখির গান লুটিয়া লইত— প্রভাত-প্রকৃতির আনন্দময় সৌন্দর্যের সহিত একটি ক্ষুদ্র বালিকার আনন্দময় স্নেহের ঐক্য দেখাইয়া দিত। এখন সে বালিকা নাই— বালকটি আছে, কিন্তু তাতা নাই। বালকটি এ সংসারের সহস্র লোকের, সহস্র বিষয়ের, কিন্তু তাতা কেবলমাত্র সেই বালিকারই। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য এই বালককে ধ্রুব বলিয়া ডাকিতেন, আমরাও তাহাই বলিয়া ডাকিব।

মহারাজ পূর্বে একা গোমতীতীরে আসিতেন, এখন ধ্রুবকে সঙ্গে করিয়া আনেন। তাহার পবিত্র সরল মুখচ্ছবিতে তিনি দেবলোকের ছায়া দেখিতে পান। মধ্যাহ্নে সংসারের আবর্তের মধ্যে রাজা যখন প্রবেশ করেন তখন বৃদ্ধ বিজ্ঞ মন্ত্রীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়, তাঁহাকে পরামর্শ দেয়। আর প্রভাত হইলে একটি শিশু তাঁহাকে সংসারের বাহিরে লইয়া আসে— তাহার বড়ো বড়ো দুটি নীরব চক্ষুর সম্মুখে বিষয়ের সহস্র কুটিলতা সংকুচিত হইয়া যায়— শিশুর হাত ধরিয়া মহারাজ বিশ্বজগতের মধ্যবর্তী অনন্তের দিকে প্রসারিত একটি উদার সরল বিস্তৃত রাজপথে গিয়া দাঁড়ান; সেখানে অনন্ত সুনীল আকাশচন্দ্রাতপের নিম্ন-স্থিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহাসভা দেখিতে পাওয়া যায়; সেখানে ভূলোক ভুবর্লোক স্বর্লোক সপ্তলোকের সংগীতের আভাস শুনা যায়; সেখানে সরল পথে সকলই সরল সহজ শোভন বলিয়া বোধ হয়, কেবলই অগ্রসর হইতে উৎসাহ হয়, উৎকট ভাবনা-চিন্তা অসুখ-অশান্তি দূর হইয়া যায়। মহারাজ সেই প্রভাতে, নির্জনে বনের মধ্যে, নদীর তীরে, মুক্ত আকাশে, একটি শিশুর প্রেমে নিমগ্ন হইয়া অসীম প্রেমসমুদ্রের পথ দেখিতে পান।

গোবিন্দমাণিক্য ধ্রুবকে কোলে করিয়া লইয়া তাহাকে ধ্রুবোপাখ্যান শুনাইতেছেন; সে যে বড়ো-একটা-কিছু বুঝিতেছে তাহা নহে, কিন্তু রাজার ইচ্ছা ধ্রুবের মুখে আধো-আধো স্বরে এই ধ্রুবোপাখ্যান আবার ফিরিয়া শুনেন।

গল্প শুনিতে শুনিতে ধ্রুব বলিল, “আমি বনে যাব।”

রাজা বলিলেন, "কী করতে বনে যাবে ?"

ধ্রুব বলিল, "হয়িকে দেখতে যাব।"

রাজা বলিলেন, "আমরা তো বনে এসেছি, হরিকে দেখতে এসেছি।"

ধ্রুব। হয়ি কোথায় ?

রাজা। এইখানেই আছেন।

ধ্রুব কহিল, "দিদি কোথায় ?"

বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া পিছনে চাহিয়া দেখিল— তাহার মনে হইল, দিদি যেন আগেকার মতো পিছন হইতে সহসা তাহার চোখ টিপিবার জন্য আসিতেছে। কাহাকেও না পাইয়া ঘাড় নামাইয়া চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি কোথায় ?"

রাজা কহিলেন, "হরি তোমার দিদিকে ডেকে নিয়েছেন।"

ধ্রুব কহিল, "হয়ি কোথায় ?"

রাজা কহিলেন, "তাঁকে ডাকো বৎস। তোমাকে সেই যে শ্লোক শিখিয়ে দিয়েছিলেম সেইটে বলো।"

ধ্রুব দুলিয়া দুলিয়া বলিতে লাগিল—

হরি তোমায় ডাকি— বালক একাকী,
আঁধার অরণ্যে ধাই হে।
গহন তিমিরে নয়নের নীরে
পথ খুঁজে নাহি পাই হে।
সদা মনে হয় কী করি কী করি,
কখন আসিবে কাল-বিভাবরী,
তাই ভয়ে মরি ডাকি 'হরি হরি'—
হরি বিনা কেহ নাই হে।
নয়নের জল হবে না বিফল,
তোমায় সবে বলে ভকতবৎসল,
সেই আশা মনে করেছি সম্বল—
বেঁচে আছি আমি তাই হে।
আঁধারেতে জাগে তোমার আঁখিতারা,
তোমার ভক্ত কভু হয় না পথহারা,
ধ্রুব তোমায় চাহে তুমি ধ্রুবতারা—
আর কার পানে চাই হে।

'র'য়ে-'ল'য়ে 'ড'য়ে-'দ'য়ে উলটপালট করিয়া, অর্ধেক কথা মুখের মধ্যে রাখিয়া, অর্ধেক কথা উচ্চারণ করিয়া, ধ্রুব দুলিয়া দুলিয়া সুধাময় কণ্ঠে এই শ্লোক পাঠ করিল। শুনিয়া রাজার প্রাণ আনন্দে নিমগ্ন হইয়া গেল, প্রভাত দ্বিগুণ মধুর হইয়া উঠিল, চারি দিকে নদী কানন তরুলতা হাসিতে লাগিল। কনকসুধাসিক্ত নীলাকাশে তিনি কাহার অনুপম সুন্দর সহাস্য মুখচ্ছবি দেখিতে পাইলেন। ধ্রুব যেমন তাঁহার কোলে বসিয়া আছে— তাঁহাকেও তেমনি কে যেন বাহুপাশের মধ্যে, কোলের মধ্যে তুলিয়া লইল। তিনি আপনাকে, আপনার চারি দিকের সকলকে, বিশ্বচরাচরকে কাহার কোলের উপর দেখিতে পাইলেন। তাঁহার আনন্দ ও প্রেম সূর্যকিরণের ন্যায় দশ দিকে বিকিরিত হইয়া আকাশ পূর্ণ করিল।

এমন সময় সশস্ত্র জয়সিংহ গুহাপথ দিয়া সহসা রাজার সম্মুখে আসিয়া উত্থিত হইলেন।

রাজা তাঁহাকে দুই হাত বাড়াইয়া দিলেন ; কহিলেন, "এসো জয়সিংহ, এসো।"

রাজা তখন শিশুর সহিত মিশিয়া শিশু হইয়াছেন, তাঁহার রাজমর্যাদা কোথায় ?

জয়সিংহ রাজাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। কহিলেন, "মহারাজ, এক নিবেদন আছে।"

রাজা কহিলেন, "কী বলো।"

জয়সিংহ। মা, আপনার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন।

রাজা। কেন, আমি তাঁর অসন্তোষের কাজ কী করিয়াছি ?

জয়সিংহ। মহারাজ বলি বন্ধ করিয়া দেবীর পূজার ব্যাঘাত করিয়াছেন।

রাজা বলিয়া উঠিলেন, "কেন জয়সিংহ, কেন এ হিংসার লালসা! মাতৃক্রোড়ে সন্তানের রক্তপাত করিয়া তুমি মাকে প্রসন্ন করিতে চাও!"

জয়সিংহ ধীরে ধীরে রাজার পায়ের কাছে বসিলেন। ধ্রুব তাঁহার তলোয়ার লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

জয়সিংহ কহিলেন, "কেন মহারাজ, শাস্ত্রে তো বলিদানের ব্যবস্থা আছে।"

রাজা কহিলেন, "শাস্ত্রের যথার্থ বিধি কেই-বা পালন করে। আপনার প্রবৃত্তি অনুসারে সকলেই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। যখন দেবীর সম্মুখে বলির সকর্দম রক্ত সর্বাঙ্গে মাখিয়া সকলে উৎকট চীৎকারে ভীষণ উল্লাসে প্রাঙ্গণে নৃত্য করিতে থাকে, তখন কি তাহারা মায়ের পূজা করে, না নিজের হৃদয়ের মধ্যে যে হিংসারাক্ষসী আছে সেই রাক্ষসীটার পূজা করে! হিংসার নিকটে বলিদান দেওয়া শাস্ত্রের বিধি নহে, হিংসাকে বলি দেওয়াই শাস্ত্রের বিধি।"

জয়সিংহ অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। কল্য রাত্রি হইতে তাঁহার মনেও এমন অনেক কথা তোলপাড় হইয়াছে।

অবশেষে বলিলেন, "আমি মায়ের স্বমুখে শুনিয়াছি— এ বিষয়ে আর কোনো সংশয় থাকিতে পারে না। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, তিনি মহারাজের রক্ত চান।"

বলিয়া জয়সিংহ প্রভাতের মন্দিরের ঘটনা রাজাকে বলিলেন।

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "এ তো মায়ের আদেশ নয়, এ রঘুপতির আদেশ। রঘুপতিই অন্তরাল হইতে তোমার কথার উত্তর দিয়াছিলেন।"

রাজার মুখে এই কথা শুনিয়া জয়সিংহ একেবারে চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনেও এইরূপ সংশয় একবার চকিতের মতো উঠিয়াছিল, কিন্তু আবার বিদ্যুতের মতো অন্তর্হিত হইয়াছিল। রাজার কথায় সেই সন্দেহে আবার আঘাত লাগিল।

জয়সিংহ অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "না মহারাজ, আমাকে ক্রমাগত সংশয় হইতে সংশয়ান্তরে লইয়া যাইবেন না— আমাকে তীর হইতে ঠেলিয়া সমুদ্রে ফেলিবেন না— আপনার কথায় আমার চারি দিকের অন্ধকার কেবল বাড়িতেছে। আমার যে বিশ্বাস, যে ভক্তি ছিল, তাই থাক্— তাহার পরিবর্তে এ কুয়াশা আমি চাই না। মায়ের আদেশই হউক আর গুরুর আদেশই হউক, সে একই কথা— আমি পালন করিব।" বলিয়া বেগে উঠিয়া তাঁহার তলোয়ার খুলিলেন— তলোয়ার রৌদ্রকিরণে বিদ্যুতের মতো চক্‌মক্ করিয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া ধ্রুব ঊর্ধ্বস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, তাহার ছোটো দুইটি হাতে রাজাকে জড়াইয়া রাজাকে প্রাণপণে আচ্ছাদন করিয়া ধরিল— রাজা জয়সিংহের প্রতি লক্ষ না করিয়া ধ্রুবকেই বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

জয়সিংহ তলোয়ার দূরে ফেলিয়া দিলেন। ধ্রুবের পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "কোনো ভয় নেই বৎস, কোনো ভয় নেই। আমি এই চলিলাম, তুমি ওই মহৎ আশ্রয়ে থাকো, ওই বিশাল বক্ষে বিরাজ করো— তোমাকে কেহ বিচ্ছিন্ন করিবে না।"

বলিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন।

সহসা আবার কী ভাবিয়া ফিরিয়া কহিলেন, "মহারাজকে সাবধান করিয়া দিই, আপনার ভ্রাতা নক্ষত্ররায় আপনার বিনাশের পরামর্শ করিয়াছেন। ২৯শে আষাঢ় চতুর্দশ দেবতার পূজার রাত্রে আপনি সতর্ক থাকিবেন।"

রাজা হাসিয়া কহিলেন, "নক্ষত্র কোনোমতেই আমাকে বধ করিতে পারিবে না, সে আমাকে ভালোবাসে।"

জয়সিংহ বিদায় হইয়া গেলেন।

*

রাজা ধ্রুবের দিকে চাহিয়া ভক্তিভাবে কহিলেন, "তুমিই আজ রক্তপাত হইতে ধরণীকে রক্ষা করিলে, সেই উদ্দেশেই তোমার দিদি তোমাকে রাখিয়া গিয়াছেন।"

বলিয়া ধ্রুবের অশ্রুসিক্ত দুইটি কপোল মুছাইয়া দিলেন।

ধ্রুব গম্ভীর মুখে কহিল, "দিদি কোথায়?"

এমন সময়ে মেঘ আসিয়া সূর্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, নদীর উপর কালো ছায়া পড়িল। দূরের বনান্ত মেঘের মতোই কালো হইয়া উঠিল। বৃষ্টিপাতের লক্ষণ দেখিয়া রাজা প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

মন্দির অনেক দূরে নয়। কিন্তু জয়সিংহ বিজন নদীর ধার দিয়া অনেক ঘুরিয়া ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে চলিলেন। বিস্তর ভাবনা তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল। এক জায়গায় নদীর তীরে গাছের তলায় বসিয়া পড়িলেন। দুই হস্তে মুখ আচ্ছাদন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছি, অথচ সংশয় যাইতেছে না। আজ হইতে কেই-বা আমার সংশয় ঘুচাইবে! কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ আজ হইতে কে তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিবে! সংসারের সহস্র কোটি পথের মোহানায় দাঁড়াইয়া কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব কোন্‌টা যথার্থ পথ। প্রান্তরের মধ্যে আমি অন্ধ একাকী দাঁড়াইয়া আছি, আজ আমার যষ্টি ভাঙিয়া গেছে।'

জয়সিংহ যখন উঠিলেন তখন বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে মন্দিরের দিকে চলিলেন। দেখিলেন বিস্তর লোক কোলাহল করিতে করিতে মন্দিরের দিক হইতে দল বাঁধিয়া চলিয়া আসিতেছে।

বুড়া বলিতেছে, "বাপ-পিতামহর কাল থেকে এই তো চলে আসছে জানি, আজ রাজার বুদ্ধি কি তাঁদের সকলকেই ছাড়িয়ে উঠল!"

যুবা বলিতেছে, "এখন আর মন্দিরে আসতে ইচ্ছে করে না, পুজার সে ধুম নেই।"

কেহ বলিল, "এ যেন নবাবের রাজত্ব হয়ে দাঁড়ালো।"

তাহার মনের ভাব এই যে, বলিদান সম্বন্ধে দ্বিধা একজন মুসলমানের মনেই জন্মাইতে পারে, কিন্তু একজন হিন্দুর মনে জন্মানো অত্যন্ত আশ্চর্য।

মেয়েরা বলিতে লাগিল, "এ রাজ্যের মঙ্গল হবে না।"

একজন কহিল, "পুরুত-ঠাকুর তো স্বয়ং বললেন যে, মা স্বপ্নে বলেছেন তিন মাসের মধ্যে এ দেশ মড়কে উচ্ছন্ন যাবে।"

হারু বলিল, "এই দেখো-না কেন, মোধো আজ দেড় বছর ধরে ব্যামো ভুগে বরাবর বেঁচে এসেছে, যেই বলি বন্ধ হল অমনি সে মারা গেল।"

ক্ষান্ত বলিল, "তা কেন, আমার ভাশুরপো, সে যে মরবে এ কে জানত! তিন দিনের জ্বর। যেমনি কবিরাজের বড়িটি খাওয়া অমনি চোখ উলটে গেল।"

ভাশুরপোর শোকে এবং রাজ্যের অমঙ্গল-আশঙ্কায় ক্ষান্ত কাতর হইয়া পড়িল।

তিনকড়ি কহিল, "সেদিন মথুরহাটির গঞ্জে আগুন লাগল, একখানা চালাও বাকি রইল না।"

চিন্তামণি চাষা তাহার একজন সঙ্গী চাষাকে কহিল, "অত কথায় কাজ কী, দেখো-না-কেন এ বছর যেমন ধান সস্তা হয়েছে এমন অন্য কোনো বছর হয় নি। এ বছর চাষার কপালে কী আছে কে জানে!"

বলিদান বন্ধ হইবার পরে এবং পূর্বেও যাহার যাহা-কিছু ক্ষতি হইয়াছে, সর্বসম্মতিক্রমে ওই বলি বন্ধ হওয়াই তাহার একমাত্র কারণ নির্দিষ্ট হইল। এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই ভালো, এইরূপ সকলের মত হইল। এ মত কিছুতেই পরিবর্তিত হইল না বটে, কিন্তু দেশেই সকলে বাস করিতে লাগিল।

জয়সিংহ অন্যমনস্ক ছিলেন। ইহাদের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া তিনি মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন ; দেখিলেন, পূজা শেষ করিয়া রঘুপতি মন্দিরের বাহিরে বসিয়া আছেন।

দ্রুতগতি রঘুপতির নিকটে গিয়াই জয়সিংহ কাতর অথচ দৃঢ় স্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব, মায়ের আদেশ গ্রহণ করিবার জন্য আজ প্রভাতে আমি যখন মাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কেন তাহার উত্তর দিলেন?"

রঘুপতি একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, "মা তো আমার দ্বারাই তাঁহার আদেশ প্রচার করিয়া থাকেন, তিনি নিজমুখে কিছু বলেন না।"

জয়সিংহ কহিলেন, "আপনি সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন না কেন? অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া আমাকে ছলনা করিলেন কেন?"

রঘুপতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "চুপ করো। আমি কী ভাবিয়া কী করি তুমি তাহার কী বুঝিবে? বাচালের মতো যাহা মুখে আসে তাহাই বলিয়ো না। আমি যাহা আদেশ করিব তুমি কেবল তাহাই পালন করিবে, কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়ো না।"

জয়সিংহ চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার সংশয় বাড়িল বৈ কমিল না। কিছু ক্ষণ পরে বলিলেন, "আজ প্রাতে আমি মায়ের কাছে বলিয়াছিলাম যে, তিনি যদি স্বমুখে আমাকে আদেশ না করেন তবে আমি কখনোই রাজহত্যা ঘটিতে দিব না, তাহার ব্যাঘাত করিব। যখন স্থির বুঝিলাম মা আদেশ করেন নাই, তখন মহারাজের নিকট নক্ষত্ররায়ের সংকল্প প্রকাশ করিয়া দিতে হইল, তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিলাম।"

রঘুপতি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। উদ্‌বেল ক্রোধ দমন করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "মন্দিরে প্রবেশ করো।"

উভয়ে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

রঘুপতি কহিলেন "মায়ের চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করো— বলো যে, ২৯শে আষাঢ়ের মধ্যে আমি রাজরক্ত আনিয়া এই চরণে উপহার দিব।"

জয়সিংহ ঘাড় হেঁট করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে একবার গুরুর মুখের দিকে একবার প্রতিমার মুখের দিকে চাহিলেন। প্রতিমা স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "২৯শে আষাঢ়ের মধ্যে আমি রাজরক্ত আনিয়া এই চরণে উপহার দিব।"

দশম পরিচ্ছেদ

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া মহারাজ নিয়মিত রাজকার্য সমাপন করিলেন। প্রাতঃকালের সূর্যালোক আচ্ছন্ন হইয়া গেছে। মেঘের ছায়ায় দিন আবার অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। মহারাজ অত্যন্ত বিমনা আছেন। অন্যদিন রাজসভায় নক্ষত্ররায় উপস্থিত থাকিতেন, আজ তিনি উপস্থিত ছিলেন না। রাজা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, তিনি ওজর করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন তাঁহার শরীর অসুস্থ। রাজা স্বয়ং নক্ষত্ররায়ের কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নক্ষত্র মুখ তুলিয়া রাজার মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না। একখানা লিখিত কাগজ লইয়া কাজে ব্যস্ত আছেন এমনি ভাণ করিলেন। রাজা বলিলেন, "নক্ষত্র, তোমার কি অসুখ করিয়াছে?"

নক্ষত্র কাগজের এপিঠ ওপিঠ উল্‌টাইয়া হাতের অঙ্গুরি নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "অসুখ? না, অসুখ ঠিক নয়— এই একটুখানি কাজ ছিল— হাঁ হাঁ, অসুখ হয়েছিল— কতকটা অসুখের মতন বটে।"

নক্ষত্ররায় নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন, গোবিন্দমাণিক্য অতিশয় বিষণ্ণমুখে

নক্ষত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন— 'হায় হায়, স্নেহের নীড়ের মধ্যেও হিংসা ঢুকিয়াছে, সে সাপের মতো লুকাইতে চায়, মুখ দেখাইতে চায় না। আমাদের অরণ্যে কি হিংস্র পশু যথেষ্ট নাই, শেষে কি মানুষও মানুষকে ভয় করিবে, ভাইও ভাইয়ের পাশে গিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বসিতে পাইবে না! এ সংসারে হিংসা-লোভই এত বড়ো হইয়া উঠিল, আর স্নেহ-প্রেম কোথাও ঠাঁই পাইল না! এই আমার ভাই, ইহার সহিত প্রতিদিন এক গৃহে বাস করি, একাসনে বসিয়া থাকি, হাসিমুখে কথা কই— এও আমার পাশে বসিয়া মনের মধ্যে ছুরী শানাইতেছে!' গোবিন্দমাণিক্যের নিকট তখন সংসার হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যের মতো বোধ হইতে লাগিল। ঘন অন্ধকারের মধ্যে কেবল চারি দিকে দন্ত ও নখরের ছটা দেখিতে পাইলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মহারাজ মনে করিলেন, 'এই স্নেহপ্রেমহীন হানাহানির রাজ্যে বাঁচিয়া থাকিয়া আমি আমার স্বজাতির, আমার ভাইদের মনে কেবলই হিংসা লোভ ও দ্বেষের অনল জ্বালাইতেছি— আমার সিংহাসনের চারি দিকে আমার প্রাণাধিক আত্মীয়েরা আমার দিকে চাহিয়া মনে মনে মুখ বক্র করিতেছে, দন্ত ঘর্ষণ করিতেছে, শৃঙ্খলবদ্ধ ভীষণ কুক্কুরের মতো চারি দিক হইতে আমার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িবার অবসর খুঁজিতেছে। ইহা অপেক্ষা ইহাদের খরনখরাঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া, ইহাদের রক্তের তৃষা মিটাইয়া এখান হইতে অপসৃত হওয়াই ভালো।'

প্রভাত-আকাশে গোবিন্দমাণিক্য যে প্রেমমুখচ্ছবি দেখিয়াছিলেন তাহা কোথায় মিলাইয়া গেল।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া মহারাজ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "নক্ষত্র, আজ অপরাহ্ণে গোমতী-তীরের নির্জন অরণ্যে আমরা দুইজনে বেড়াইতে যাইব।"

রাজার এই গম্ভীর আদেশবাণীর বিরুদ্ধে নক্ষত্রের মুখে কথা সরিল না, কিন্তু সংশয়ে ও আশঙ্কায় তাঁহার মন আকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, মহারাজ এতক্ষণ নীরবে দুই চক্ষু তাঁহারই মনের দিকে নিবিষ্ট করিয়া বসিয়াছিলেন— সেখানে অন্ধকার গর্তের মধ্যে যে ভাবনাগুলো কীটের মতো কিল্‌বিল্ করিতেছিল, সেগুলো যেন সহসা আলো দেখিয়া অস্থির হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ভয়ে ভয়ে নক্ষত্ররায় রাজার মুখের দিকে একবার চাহিলেন— দেখিলেন তাঁহার মুখে কেবল সুগভীর বিষণ্ণ শান্তির ভাব, সেখানে রোষের রেখামাত্র নাই। মানবহৃদয়ের কঠিন নিষ্ঠুরতা দেখিয়া কেবল সুগভীর শোক তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছিল।

বেলা পড়িয়া আসিল। তখনো মেঘ করিয়া আছে। নক্ষত্ররায়কে সঙ্গে লইয়া

মহারাজ পদব্রজে অরণ্যের দিকে চলিলেন। এখনো সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব আছে, কিন্তু মেঘের অন্ধকারে সন্ধ্যা বলিয়া ভ্রম হইতেছে— কাকেরা অরণ্যের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া অবিশ্রাম চীৎকার করিতেছে, কিন্তু দুই-একটা চিল এখনো আকাশে সাঁতার দিতেছে। দুই ভাই যখন নির্জন বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন নক্ষত্ররায়ের গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। বড়ো বড়ো প্রাচীন গাছ জটলা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে— তাহারা একটি কথা কহে না, কিন্তু স্থির হইয়া যেন কীটের পদশব্দটুকু পর্যন্তও শোনে; তাহারা কেবল নিজের ছায়ার দিকে, তলস্থিত অন্ধকারের দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকে। অরণ্যের সেই জটিল রহস্যের ভিতরে পদক্ষেপ করিতে নক্ষত্র-রায়ের পা যেন আর উঠে না— চারি দিকে সুগভীর নিস্তব্ধতার ভ্রূকুটি দেখিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হইতে লাগিল; নক্ষত্ররায়ের অত্যন্ত সন্দেহ ও ভয় জন্মিল; ভীষণ অদৃষ্টের মতো নীরব রাজা এই সন্ধ্যাকালে এই পৃথিবীর অন্তরাল দিয়া তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন কিছুই ঠাহর পাইলেন না। নিশ্চয় মনে করিলেন, রাজার কাছে ধরা পড়িয়াছেন, এবং গুরুতর শাস্তি দিবার জন্যই রাজা তাঁহাকে এই অরণ্যের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। নক্ষত্ররায় ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাইতে পারিলে বাঁচেন, কিন্তু মনে হইল কে যেন তাঁহার হাত-পা বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কিছুতেই আর পরিত্রাণ নাই।

অরণ্যের মধ্যস্থলে কতকটা ফাঁকা। একটি স্বাভাবিক জলাশয়ের মতো আছে, বর্ষাকালে তাহা জলে পরিপূর্ণ। সেই জলাশয়ের ধারে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রাজা বলিলেন, "দাঁড়াও!"

নক্ষত্ররায় চমকিয়া দাঁড়াইলেন। মনে হইল, রাজার আদেশ শুনিয়া সেই মুহূর্তে কালের স্রোত যেন বন্ধ হইল— সেই মুহূর্তেই যেন অরণ্যের বৃক্ষগুলি যে যেখানে ছিল ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল— নীচে হইতে ধরণী এবং উপর হইতে আকাশ যেন নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। কাকের কোলাহল থামিয়া গেছে, বনের মধ্যে একটি শব্দ নাই। কেবল সেই 'দাঁড়াও' শব্দ অনেক ক্ষণ ধরিয়া যেন গম্‌ গম্‌ করিতে লাগিল— সেই 'দাঁড়াও' শব্দ যেন তড়িৎপ্রবাহের মতো বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে, শাখা হইতে প্রশাখায় প্রবাহিত হইতে লাগিল; অরণ্যের প্রত্যেক পাতাটা যেন সেই শব্দের কম্পনে রী রী করিতে লাগিল। নক্ষত্ররায়ও যেন গাছের মতোই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা তখন নক্ষত্ররায়ের মুখের দিকে মর্মভেদী স্থির বিষণ্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "নক্ষত্র, তুমি আমাকে মারিতে চাও?"

নক্ষত্র বজ্রাহতের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন, উত্তর দিবার চেষ্টাও করিতে পারিলেন না।

রাজা কহিলেন, "কেন মারিবে ভাই? রাজ্যের লোভে? তুমি কি মনে কর রাজ্য কেবল সোনার সিংহাসন, হীরার মুকুট ও রাজছত্র? এই মুকুট, এই রাজছত্র, এই রাজদণ্ডের ভার কত তাহা জান? শতসহস্র লোকের চিন্তা এই হীরার মুকুট দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছি। রাজ্য পাইতে চাও তো সহস্র লোকের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহণ করো, সহস্র লোকের বিপদকে আপনার বিপদ বলিয়া বরণ করো, সহস্র লোকের দারিদ্র্যকে আপনার দারিদ্র্য বলিয়া স্কন্ধে বহন করো— এ যে করে সে-ই রাজা, সে পর্ণকুটিরেই থাক্ আর প্রাসাদেই থাক্। যে ব্যক্তি সকল লোককে আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে, সকল লোক তো তাহারই। পৃথিবীর দুঃখহরণ যে করে সেই পৃথিবীর রাজা। পৃথিবীর রক্ত ও অর্থ শোষণ যে করে সে তো দস্যু— সহস্র অভাগার অশ্রুজল তাহার মস্তকে অহর্নিশি বর্ষিত হইতেছে, সেই অভিশাপধারা হইতে কোনো রাজচ্ছত্র তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। তাহার প্রচুর রাজভোগের মধ্যে শত শত উপবাসীর ক্ষুধা লুকাইয়া আছে, অনাথের দারিদ্র্য গলাইয়া সে সোনার অলংকার করিয়া পরে, তাহার ভূমিবিস্তৃত রাজবস্ত্রের মধ্যে শত শত শীতাতুরের মলিন ছিন্ন কন্থা। রাজাকে বধ করিয়া রাজত্ব মেলে না ভাই, পৃথিবীকে বশ করিয়া রাজা হইতে হয়।"

গোবিন্দমাণিক্য থামিলেন। চারি দিকে গভীর স্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। নক্ষত্ররায় মাথা নত করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

মহারাজ খাপ হইতে তরবারি খুলিলেন। নক্ষত্ররায়ের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "ভাই, এখানে লোক নাই, সাক্ষ্য নাই, কেহ নাই— ভাইয়ের বক্ষে ভাই যদি ছুরী মারিতে চায় তবে তাহার স্থান এই, সময় এই। এখানে কেহ তোমাকে নিবারণ করিবে না, কেহ তোমাকে নিন্দা করিবে না। তোমার শিরায় আর আমার শিরায় একই রক্ত বহিতেছে, একই পিতা একই পিতামহের রক্ত— তুমি সেই রক্তপাত করিতে চাও করো, কিন্তু মনুষ্যের আবাসস্থলে করিয়ো না। কারণ, যেখানে এই রক্তের বিন্দু পড়িবে, সেইখানেই অলক্ষ্যে ভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে। পাপের শেষ কোথায় গিয়া হয় কে জানে। পাপের একটি বীজ যেখানে পড়ে সেখানে দেখিতে দেখিতে গোপনে কেমন করিয়া সহস্র বৃক্ষ জন্মায়, কেমন করিয়া অল্পে অল্পে সুশোভন মানবসমাজ অরণ্যে পরিণত হইয়া যায় তাহা কেহ জানিতে পারে না। অতএব নগরে গ্রামে যেখানে নিশ্চিন্তচিত্তে পরমস্নেহে ভাইয়ে ভাইয়ে গলাগলি করিয়া

আছে, সেই ভাইদের নীড়ের মধ্যে ভাইয়ের রক্তপাত করিয়ো না। এইজন্য তোমাকে আজ অরণ্যে ডাকিয়া আনিয়াছি।"

এই বলিয়া রাজা নক্ষত্ররায়ের হাতে তরবারি দিলেন। নক্ষত্ররায়ের হাত হইতে তরবারি মাটিতে পড়িয়া গেল। নক্ষত্ররায় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "দাদা, আমি দোষী নই— এ কথা আমার মনে কখনো উদয় হয় নাই—"

রাজা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আমি তাহা জানি। তুমি কি কখনো আমাকে আঘাত করিতে পারো— তোমাকে পাঁচজনে মন্দ পরামর্শ দিয়াছে।"

নক্ষত্ররায় বলিলেন, "আমাকে রঘুপতি কেবল এই উপদেশ দিতেছে।"

রাজা বলিলেন, "রঘুপতির কাছ হইতে দূরে থাকিয়ো।"

নক্ষত্ররায় বলিলেন, "কোথায় যাইব বলিয়া দিন। আমি এখানে থাকিতে চাই না। আমি এখান হইতে— রঘুপতির কাছ হইতে পালাইতে চাই।"

রাজা বলিলেন, "তুমি আমারই কাছে থাকো— আর কোথাও যাইতে হইবে না— রঘুপতি তোমার কী করিবে!"

নক্ষত্ররায় রাজার হাত দৃঢ় করিয়া ধরিলেন, যেন রঘুপতি তাঁহাকে টানিয়া লইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নক্ষত্ররায় রাজার হাত ধরিয়া অরণ্যের মধ্য দিয়া যখন গৃহে ফিরিয়া আসিতেছেন তখনো আকাশ হইতে অল্প অল্প আলো আসিতেছিল— কিন্তু অরণ্যের নীচে অত্যন্ত অন্ধকার হইয়াছে। যেন অন্ধকারের বন্যা আসিয়াছে, কেবল গাছগুলোর মাথা উপরে জাগিয়া আছে। ক্রমে তাহাও ডুবিয়া যাইবে; তখন অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া আকাশে পৃথিবীতে এক হইয়া যাইবে।

প্রাসাদের পথে না গিয়া রাজা মন্দিরের দিকে গেলেন। মন্দিরের সন্ধ্যা-আরতি সমাপন করিয়া একটি দীপ জ্বালিয়া রঘুপতি ও জয়সিংহ কুটিরে বসিয়া আছেন। উভয়েই নীরবে আপন আপন ভাবনা লইয়া আছেন। দীপের ক্ষীণ আলোকে কেবল তাঁহাদের দুইজনের মুখের অন্ধকার দেখা যাইতেছে। নক্ষত্ররায় রঘুপতিকে দেখিয়া মুখ তুলিতে পারিলেন না; রাজার ছায়ায় দাঁড়াইয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিলেন—

রাজা তাঁহাকে পাশে টানিয়া লইয়া দৃঢ়রূপে তাঁহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইলেন ও স্থির-নেত্রে রঘুপতির মুখের দিকে একবার চাহিলেন। রঘুপতি তীব্রদৃষ্টিতে নক্ষত্ররায়ের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। অবশেষে রাজা রঘুপতিকে প্রণাম করিলেন, নক্ষত্র-রায়ও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। রঘুপতি প্রণাম গ্রহণ করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "জয়োস্তু— রাজ্যের কুশল ?"

রাজা একটুখানি থামিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, আশীর্বাদ করুন, রাজ্যের অকুশল না ঘটুক। এ রাজ্যে মায়ের সকল সন্তান যেন সদ্ভাবে প্রেমে মিলিয়া থাকে, এ রাজ্যে ভাইয়ের কাছ হইতে ভাইকে কেহ যেন কাড়িয়া না লয়, যেখানে প্রেম আছে সেখানে কেহ যেন হিংসার প্রতিষ্ঠা না করে। রাজ্যের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়াই আসিয়াছি। পাপসংকল্পের সংঘর্ষণে দাবানল জ্বলিয়া উঠিতে পারে— নির্বাণ করুন, শান্তির বারি বর্ষণ করুন, পৃথিবী শীতল করুন।"

রঘুপতি কহিলেন, "দেবতার রোষানল জ্বলিয়া উঠিলে কে তাহা নির্বাণ করিবে ? এক অপরাধীর জন্য সহস্র নিরপরাধ সে অনলে দগ্ধ হয়।"

রাজা বলিলেন, "সেই তো ভয়, সেইজন্যই কাঁপিতেছি। সে কথা কেহ বুঝিয়াও বোঝে না কেন! আপনি কি জানেন না, এ রাজ্যে দেবতার নাম করিয়া দেবতার নিয়ম লঙ্ঘন করা হইতেছে ? সেইজন্যই অমঙ্গল-আশঙ্কায় আজ সন্ধ্যাবেলায় এখানে আসিয়াছি— এখানে পাপের বৃক্ষ রোপণ করিয়া আমার এই ধনধান্যময় সুখের রাজ্যে দেবতার বজ্র আহ্বান করিয়া আনিবেন না। আপনাকে এই কথা বলিয়া গেলাম, এই কথা বলিবার জন্যই আজ আমি আসিয়াছিলাম।"

বলিয়া মহারাজ রঘুপতির মুখের উপর তাঁহার মর্মভেদী দৃষ্টি স্থাপন করিলেন। রাজার সুগম্ভীর দৃঢ় স্বর রুদ্ধ ঝটিকার মতো কুটিরের মধ্যে কাঁপিতে লাগিল। রঘুপতি একটি উত্তর দিলেন না, পইতা লইয়া নাড়িতে লাগিলেন। রাজা প্রণাম করিয়া নক্ষত্ররায়ের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে জয়সিংহও বাহির হইলেন। ঘরের মধ্যে কেবল একটি দীপ, রঘুপতি এবং রঘুপতির বৃহৎ ছায়া রহিল।

তখন আকাশের আলো নিবিয়া গেছে। মেঘের মধ্যে তারা নিমগ্ন। আকাশের কানায় কানায় অন্ধকার। পুবে বাতাসে সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে কোথা হইতে কদম ফুলের গন্ধ পাওয়া যাইতেছে এবং অরণ্যে মর্মরশব্দ শুনা যাইতেছে। ভাবনায় নিমগ্ন হইয়া পরিচিত পথ দিয়া রাজা চলিতেছেন, সহসা পশ্চাৎ হইতে শুনিলেন কে ডাকিল— "মহারাজ!"

রাজা ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি ?"

পরিচিত স্বর কহিল, "আমি আপনার অধম সেবক, আমি জয়সিংহ। মহারাজ আপনি আমার গুরু, আমার প্রভু। আপনি ছাড়া আমার আর কেহ নাই। যেমন আপনি আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতার হাত ধরিয়া অন্ধকারের মধ্যে দিয়া লইয়া যাইতেছেন, তেমনি আমারও হাত ধরুন, আমাকেও সঙ্গে লইয়া যান ; আমি গুরুতর অন্ধকারের মধ্যে পড়িয়াছি। আমার কিসে ভালো হইবে, কিসে মন্দ হইবে, আমি কিছুই জানি না। আমি একবার বামে যাইতেছি, একবার দক্ষিণে যাইতেছি, আমার কর্ণধার কেহ নাই।"

সেই অন্ধকারে অশ্রু পড়িতে লাগিল, কেহ দেখিতে পাইল না, কেবল আবেগভরে জয়সিংহের আর্দ্র স্বর কাঁপিতে কাঁপিতে রাজার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। স্তব্ধ স্থির অন্ধকার, বায়ুচঞ্চল সমুদ্রের মতো কাঁপিতে লাগিল। রাজা জয়সিংহের হাত ধরিয়া বলিলেন, "চলো, আমার সঙ্গে প্রাসাদে চলো।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

তাহার পরদিন যখন জয়সিংহ মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন, তখন পূজার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। রঘুপতি বিমর্ষ মুখে একাকী বসিয়া আছেন। ইহার পূর্বে কখনো এরূপ অনিয়ম হয় নাই।

জয়সিংহ আসিয়া গুরুর কাছে না গিয়া তাঁহার বাগানের মধ্যে গেলেন। তাঁহার গাছপালাগুলির মধ্যে গিয়া বসিলেন। তাহারা তাঁহার চারি দিকে কাঁপিতে লাগিল, নড়িতে লাগিল, ছায়া নাচাইতে লাগিল। তাঁহার চারি দিকে পুষ্পখচিত পল্লবের স্তর, শ্যামল স্তরের উপর স্তর, ছায়াপূর্ণ সুকোমল স্নেহের আচ্ছাদন, সুমধুর আহ্বান, প্রকৃতির প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন। এখানে সকলে অপেক্ষা করিয়া থাকে, কথা জিজ্ঞাসা করে না, ভাবনার ব্যাঘাত করে না, চাহিলে তবে চায়, কথা কহিলে তবে কথা কয়। এই নীরব শুশ্রূষার মধ্যে, প্রকৃতির এই অন্তঃপুরের মধ্যে বসিয়া জয়সিংহ ভাবিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাকে যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে ধীরে ধীরে রঘুপতি আসিয়া তাঁহার পিঠে হাত দিলেন। জয়সিংহ সচকিত হইয়া উঠিলেন। রঘুপতি তাঁহার পাশে বসিলেন। জয়সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া কম্পিতস্বরে কহিলেন, "বৎস, তোমার এমন ভাব দেখিতেছি কেন? আমি

তোমার কী করিয়াছি যে, তুমি অল্পে অল্পে আমার কাছ হইতে সরিয়া যাইতেছ ?”

জয়সিংহ কী বলিতে চেষ্টা করিলেন, রঘুপতি তাহাতে বাধা দিয়া বলিতে লাগিলেন, “এক মুহূর্তের জন্য কি আমার স্নেহের অভাব দেখিয়াছ ? আমি কি তোমার কাছে কোনো অপরাধ করিয়াছি জয়সিংহ ? যদি করিয়া থাকি তবে আমি তোমার গুরু, তোমার পিতৃতুল্য, আমি তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছি—আমাকে মার্জনা করো।”

জয়সিংহ বজ্রাহতের ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন ; গুরুর চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন ; বলিলেন, “পিতা, আমি কিছুই জানি না, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না, আমি কোথায় যাইতেছি দেখিতে পাইতেছি না।”

রঘুপতি জয়সিংহের হাত ধরিয়া বলিলেন, “বৎস, আমি তোমাকে তোমার শৈশব হইতে মাতার ন্যায় স্নেহে পালন করিয়াছি, পিতার ন্যায় যত্নে শাস্ত্রশিক্ষা দিয়াছি—তোমার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সখার ন্যায় তোমাকে আমার সমুদয় মন্ত্রণার সহযোগী করিয়াছি। আজ তোমাকে কে আমার পাশ হইতে টানিয়া লইতেছে ? এতদিনকার স্নেহমমতার বন্ধন কে বিচ্ছিন্ন করিতেছে ? তোমার উপর আমার যে দেবদত্ত অধিকার জন্মিয়াছে সে পবিত্র অধিকারে কে হস্তক্ষেপ করিয়াছে ? বলো, বৎস, সেই মহাপাতকীর নাম বলো।”

জয়সিংহ বলিলেন, “প্রভু, আপনার কাছ হইতে আমাকে কেহ বিচ্ছিন্ন করে নাই—আপনিই আমাকে দূর করিয়া দিয়াছেন। আমি ছিলাম গৃহের মধ্যে, আপনি সহসা পথের মধ্যে আমাকে বাহির করিয়া দিয়াছেন। আপনি বলিয়াছেন, কেই-বা পিতা, কেই-বা মাতা, কেই-বা ভ্রাতা ! আপনি বলিয়াছেন, পৃথিবীতে কোনো বন্ধন নাই, স্নেহপ্রেমের পবিত্র অধিকার নাই। যাঁহাকে মা বলিয়া জানিতাম আপনি তাঁহাকে বলিয়াছেন শক্তি—যে যেখানে হিংসা করিতেছে, যে যেখানে রক্তপাত করিতেছে, যেখানেই ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ, যেখানেই দুই জন মানুষে যুদ্ধ, সেইখানেই এই তৃষিত শক্তি রক্তলালসায় তাঁহার খর্পর লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আপনি মায়ের কোল হইতে আমাকে এ কী রাক্ষসীর দেশে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছেন !”

রঘুপতি অনেক ক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “তবে তুমি স্বাধীন হইলে, বন্ধনমুক্ত হইলে, তোমার উপর হইতে আমার সমস্ত অধিকার আমি প্রত্যাহরণ করিলাম। তাহাতেই যদি তুমি সুখী হও, তবে তাই হউক।”

বলিয়া উঠিবার উদ্‌যোগ করিলেন।

জয়সিংহ তাঁহার পা ধরিয়া বলিলেন, "না না না প্রভু— আপনি আমাকে ত্যাগ করিলেও আমি আপনাকে ত্যাগ করিতে পারি না। আমি রহিলাম— আপনার পদতলেই রহিলাম, আপনি যাহা ইচ্ছা করিবেন। আপনার পথ ছাড়া আমার অন্য পথ নাই।"

রঘুপতি তখন জয়সিংহকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন— তাঁহার অশ্রু প্রবাহিত হইয়া জয়সিংহের স্কন্ধে পড়িতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মন্দিরে অনেক লোক জমা হইয়াছে। খুব কোলাহল উঠিয়াছে। রঘুপতি রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কী করিতে আসিয়াছ?"

তাহারা নানা কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমরা ঠাকরুন-দর্শন করিতে আসিয়াছি।"

রঘুপতি বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকরুন কোথায়! ঠাকরুন এ রাজ্য থেকে চলে গেছেন। তোরা ঠাকরুনকে রাখতে পারলি কৈ! তিনি চলে গেছেন।"

ভারী গোলমাল উঠিল, নানা দিক হইতে নানা কথা শুনা যাইতে লাগিল।

"সে কী কথা ঠাকুর!"

"আমরা কী অপরাধ করেছি ঠাকুর?"

"মা কি কিছুতেই প্রসন্ন হবেন না?"

"আমার ভাইপোর ব্যামো ছিল ব'লে আমি ক'দিন পূজা দিতে আসি নি।" (তার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহারই উপেক্ষা সহিতে না পারিয়া দেবী দেশ ছাড়িতেছেন।)

"আমার পাঁঠা-দুটি ঠাকরুনকে দেব মনে করেছিলুম, বিস্তর দূর বলে আসতে পারি নি।" (দুটো পাঁঠা দিতে দেরি করিয়া রাজ্যের যে এরূপ অমঙ্গল ঘটিল, ইহাই মনে করিয়া সে কাতর হইতেছিল।)

"গোবর্ধন যা মানত করেছিল তা মাকে দেয় নি বটে, কিন্তু মাও তো তেমনি তাকে শাস্তি দিয়েছেন। তার পিলে বেড়ে ঢাক হয়েছে, সে আজ ছ মাস বিছানায় পড়ে।" (গোবর্ধন তাহার প্লীহার আতিশয্য লইয়া চুলায় যাক্‌, মা দেশে থাকুন— এইরূপ সে মনে মনে প্রার্থনা করিল। সকলেই অভাগা গোবর্ধনের প্লীহার প্রচুর উন্নতি কামনা করিতে লাগিল।)

ভিড়ের মধ্যে একটি দীর্ঘপ্রস্থ লোক ছিল, সে সকলকে ধমক দিয়া থামাইল

এবং রঘুপতিকে জোড়হস্তে কহিল, "ঠাকুর, মা কেন চলিয়া গেলেন, আমাদের কী অপরাধ হইয়াছিল?"

রঘুপতি কহিলেন, "তোরা মায়ের জন্য এক ফোঁটা রক্ত দিতে পারিস নে, এই তো তোদের ভক্তি!"

সকলে চুপ করিয়া রহিল। অবশেষে কথা উঠিতে লাগিল। অস্পষ্ট স্বরে কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "রাজার নিষেধ, আমরা কী করিব!"

জয়সিংহ প্রস্তরের পুত্তলিকার মতো স্থির হইয়া বসিয়া ছিলেন। 'মায়ের নিষেধ' এই কথা তড়িদ্‌বেগে তাঁহার রসনাগ্রে উঠিয়াছিল; কিন্তু তিনি আপনাকে দমন করিলেন, একটি কথা কহিলেন না!

রঘুপতি তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "রাজা কে! মায়ের সিংহাসন কি রাজার সিংহাসনের নীচে? তবে এই মাতৃহীন দেশে তোদের রাজাকে লইয়াই তোরা থাক্‌। দেখি তোদের কে রক্ষা করে।"

জনতার মধ্যে গুন্‌ গুন্‌ শব্দ উঠিল। সকলেই সাবধানে কথা কহিতে লাগিল।

রঘুপতি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "রাজাকেই বড়ো করিয়া লইয়া তোদের মাকে তোরা রাজ্য হইতে অপমান করিয়া বিদায় করিলি। সুখে থাকিবি মনে করিস নে। আর তিন বৎসর পরে এতবড়ো রাজ্যে তোদের ভিটের চিহ্ন থাকিবে না— তোদের বংশে বাতি দিবার কেহ থাকিবে না।"

জনতার মধ্যে সাগরের গুন্‌ গুন্‌ শব্দ ক্রমশ স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল। জনতাও ক্রমে বাড়িতেছে। সেই দীর্ঘ লোকটি জোড়হাত করিয়া রঘুপতিকে কহিল, "সন্তান যদি অপরাধ ক'রে থাকে তবে মা তাকে শাস্তি দিন, কিন্তু মা সন্তানকে একেবারে পরিত্যাগ করে যাবেন এ কি কখনো হয়! প্রভু, বলে দিন কী করলে মা ফিরে আসবেন।"

রঘুপতি কহিলেন, "তোদের এই রাজা যখন এ রাজ্য হইতে বাহির হইয়া যাইবেন, মাও তখন এই রাজ্যে পুনর্বার পদার্পণ করিবেন।"

এই কথা শুনিয়া জনতার গুন্‌ গুন্‌ শব্দ হঠাৎ থামিয়া গেল। হঠাৎ চতুর্দিক সুগভীর নিস্তব্ধ হইয়া গেল, অবশেষে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল; কেহ সাহস করিয়া কথা কহিতে পারিল না।

রঘুপতি মেঘগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "তবে তোরা দেখিবি! আয়, আমার সঙ্গে আয়। অনেক দূর হতে অনেক আশা করিয়া তোরা ঠাকরুনকে দর্শন করিতে আসিয়াছিস— চল্‌, একবার মন্দিরে চল্‌।"

সকলে সভয়ে মন্দিরের প্রাঙ্গণে আসিয়া সমবেত হইল। মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ ছিল, রঘুপতি ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া দিলেন।

কিয়ৎক্ষণ কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্তি হইল না। প্রতিমার মুখ দেখা যাইতেছে না, প্রতিমার পশ্চাদ্ভাগ দর্শকের দিকে স্থাপিত। মা বিমুখ হইয়াছেন। সহসা জনতার মধ্য হইতে ক্রন্দনধ্বনি উঠিল, "একবার ফিরে দাঁড়া মা! আমরা কী অপরাধ করেছি!" চারি দিকে "মা কোথায়, মা কোথায়" রব উঠিল। প্রতিমা পাষাণ বলিয়াই ফিরিল না। অনেকে মূর্ছা গেল। ছেলেরা কিছু না বুঝিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বৃদ্ধেরা মাতৃহারা শিশুসন্তানের মতো কাঁদিতে লাগিল, "মা, ওমা!" স্ত্রীলোকদের ঘোমটা খুলিয়া গেল, অঞ্চল খসিয়া পড়িল, তাহারা বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল। যুবকেরা কম্পিত ঊর্ধ্বস্বরে বলিতে লাগিল "মা, তোকে আমরা ফিরিয়ে আনব— তোকে আমরা ছাড়ব না।"

একজন পাগল গাহিয়া উঠিল—

"মা আমার পাষাণের মেয়ে,
সন্তানে দেখলি নে চেয়ে।"

মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া সমস্ত রাজ্য যেন "মা" "মা" করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল— কিন্তু প্রতিমা ফিরিল না। মধ্যাহ্নের সূর্য প্রখর হইয়া উঠিল, প্রাঙ্গণে উপবাসী জনতার বিলাপ থামিল না।

তখন জয়সিংহ কম্পিত পদে আসিয়া রঘুপতিকে কহিলেন, "প্রভু, আমি কি একটি কথাও কহিতে পাইব না?"

রঘুপতি কহিলেন, "না, একটি কথাও না।"

জয়সিংহ কহিলেন, "সন্দেহের কি কোনো কারণ নাই?"

রঘুপতি দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "না।"

জয়সিংহ দৃঢ়রূপে মুষ্টি বদ্ধ করিয়া কহিলেন, "সমস্তই কি বিশ্বাস করিব?"

রঘুপতি জয়সিংহকে সুতীব্র দৃষ্টিদ্বারা দগ্ধ করিয়া কহিলেন, "হাঁ।"

জয়সিংহ বক্ষে হাত দিয়া কহিলেন, "আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।"

তিনি জনতার মধ্য হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

তাহার পরদিন ২৯শে আষাঢ়। আজ রাত্রে চতুর্দশ দেবতার পূজা। আজ প্রভাতে তালবনের আড়ালে সূর্য যখন উঠিতেছেন, তখন পূর্ব দিকে মেঘ নাই। কনককিরণপ্লাবিত আনন্দময় কাননের মধ্যে গিয়া জয়সিংহ যখন বসিলেন তখন তাঁহার পুরাতন স্মৃতিসকল মনে উঠিতে লাগিল। এই বনের মধ্যে এই পাষাণ-মন্দিরের পাষাণসোপানাবলীর মধ্যে, এই গোমতীতীরে সেই বৃহৎ বটের ছায়ায়, সেই ছায়া-দিয়া-ঘেরা পুকুরের ধারে তাঁহার বাল্যকাল সুমধুর স্বপ্নের মতো মনে পড়িতে লাগিল। যে-সকল মধুর দৃশ্য তাঁহার বাল্যকালকে সস্নেহে ঘিরিয়া থাকিত তাহারা আজ হাসিতেছে, তাঁহাকে আবার আহ্বান করিতেছে, কিন্তু তাঁহার মন বলিতেছে, 'আমি যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছি, আমি বিদায় লইয়াছি, আমি আর ফিরিব না।' শ্বেত পাষাণের মন্দিরের উপরে সূর্যকিরণ পড়িয়াছে এবং তাহার বাম দিকের ভিত্তিতে বকুলশাখার কম্পিত ছায়া পড়িয়াছে। ছেলেবেলায় এই পাষাণমন্দিরকে যেমন সচেতন বোধ হইত, এই সোপানের মধ্যে একলা বসিয়া যখন খেলা করিতেন তখন এই সোপানগুলির মধ্যে যেমন সঙ্গ পাইতেন, আজ প্রভাতের সূর্যকিরণে মন্দিরকে তেমনি সচেতন, তাহার সোপানগুলিকে তেমনি শৈশবের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। মন্দিরের ভিতরে মাকে আজ আবার মা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিন্তু অভিমানে তাঁহার হৃদয় পুরিয়া গেল, তাঁহার দুই চক্ষু ভাসিয়া জল পড়িতে লাগিল।

রঘুপতিকে আসিতে দেখিয়া জয়সিংহ চোখের জল মুছিয়া ফেলিলেন। গুরুকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। রঘুপতি কহিলেন, "আজ পূজার দিন। মায়ের চরণ স্পর্শ করিয়া কী শপথ করিয়াছিলে মনে আছে?"

জয়সিংহ কহিলেন, "আছে।"

রঘুপতি। শপথ পালন করিবে তো?

জয়সিংহ। হাঁ।

রঘুপতি। দেখিয়ো বৎস, সাবধানে কাজ করিয়ো। বিপদের আশঙ্কা আছে। আমি তোমাকে রক্ষা করিবার জন্যই প্রজাদিগকে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছি।

জয়সিংহ চুপ করিয়া রঘুপতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিছুই উত্তর

করিলেন না ; রঘুপতি তাঁহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "আমার আশীর্বাদে নির্বিঘ্নে তুমি তোমার কার্য সাধন করিতে পারিবে, মায়ের আদেশ পালন করিতে পারিবে।"

এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

অপরাহ্নে একটি ঘরে বসিয়া রাজা ধ্রুবের সহিত খেলা করিতেছেন। ধ্রুবের আদেশমতে একবার মাথার মুকুট খুলিতেছেন একবার পরিতেছেন ; ধ্রুব মহারাজের এই দুর্দশা দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইতেছে। রাজা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমি অভ্যাস করিতেছি। তাঁহার আদেশে এ মুকুট যেমন সহজে পরিতে পারিয়াছি, তাঁহার আদেশে এ মুকুট যেন তেমনি সহজে খুলিতে পারি। মুকুট পরা শক্ত, কিন্তু মুকুট ত্যাগ করা আরও কঠিন।"

ধ্রুবের মনে সহসা একটা ভাবোদয় হইল— কিয়ৎক্ষণ রাজার মুখের দিকে চাহিয়া মুখে আঙুল দিয়া বলিল, "তুমি আজা।" রাজা শব্দ হইতে 'র' অক্ষর একেবারে সমূলে লোপ করিয়া দিয়াও ধ্রুবের মনে কিছুমাত্র অনুতাপের উদয় হইল না। রাজার মুখের সামনে রাজাকে আজা বলিয়া সে সম্পূর্ণ আত্মপ্রসাদ লাভ করিল।

রাজা ধ্রুবের এই ধৃষ্টতা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন, "তুমি আজা।"

ধ্রুব বলিল, "তুমি আজা।"

এ বিষয়ে তর্কের শেষ হইল না। কোনো পক্ষে কোনো প্রমাণ নাই, তর্ক কেবলই গায়ের জোরে। অবশেষে রাজা নিজের মুকুট লইয়া ধ্রুবের মাথায় চড়াইয়া দিলেন। তখন ধ্রুবের আর কথাটি কহিবার জো রহিল না, সম্পূর্ণ হার হইল। ধ্রুবের মুখের আধখানা সেই মুকুটের নীচে ডুবিয়া গেল। মুকুট-সমেত মস্ত মাথা দুলাইয়া ধ্রুব মুকুট-হীন রাজার প্রতি আদেশ করিল, "একটা গল্প বলো।"

রাজা বলিলেন, "কী গল্প বলিব ?"

ধ্রুব কহিল, "দিদির গল্প বলো।"

গল্পমাত্রকেই ধ্রুব দিদির গল্প বলিয়া জানিত। সে জানিত, দিদি যে-সকল গল্প বলিত তাহা ছাড়া পৃথিবীতে আর গল্প নাই। রাজা তখন মস্ত এক পৌরাণিক গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "হিরণ্যকশিপু নামে এক রাজা ছিল।"

রাজা শুনিয়া ধ্রুব বলিয়া উঠিল, "আমি আজা।" মস্ত ঢিলে মুকুটের জোরে হিরণ্য-কশিপুর রাজপদ সে একেবারে অগ্রাহ্য করিল।

চাটুভাষী সভাসদের ন্যায় গোবিন্দমাণিক্য সেই কিরীটী শিশুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলিলেন, তুমিও আজা, সেও আজা।"

মহারাজ! আপনি নিষেধ করিলে আমার যাত্রা শুভ হইবে না ; আশীর্বাদ করুন, এখানে আমার যে-সকল সংশয় ছিল, সেখানে যেন সে-সকল সংশয় দূর হইয়া যায়। এখানকার মেঘ সেখানে যেন কাটিয়া যায়। যেন আপনার মতো রাজার রাজত্বে যাই, যেন শান্তি পাই।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে যাইবে?"

জয়সিংহ কহিলেন, "আজ সন্ধ্যাকালে। অধিক সময় নাই মহারাজ, আজ আমি তবে বিদায় হই।"

বলিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া রাজার পদধূলি লইলেন, রাজার চরণে দুই ফোঁটা অশ্রু পড়িল।

জয়সিংহ উঠিয়া যখন যাইতে উদ্যত হইলেন তখন ধ্রুব ধীরে ধীরে গিয়া তাঁহার কাপড় টানিয়া কহিল, "তুমি যেয়ো না।"

জয়সিংহ হাসিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া কহিলেন, "কার কাছে থাকিব বৎস? আমার কে আছে?"

ধ্রুব কহিল, "আমি আজা।"

জয়সিংহ কহিলেন, "তোমরা রাজার রাজা, তোমরাই সকলকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছ।"

ধ্রুবকে কোল হইতে নামাইয়া জয়সিংহ গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মহারাজ গম্ভীরমুখে অনেক ক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

চতুর্দশী তিথি। মেঘও করিয়াছে, চাঁদও উঠিয়াছে। আকাশের কোথাও আলো কোথাও অন্ধকার। কখনো চাঁদ বাহির হইতেছে, কখনো চাঁদ লুকাইতেছে। গোমতী-তীরের অরণ্যগুলি চাঁদের দিকে চাহিয়া তাহাদের গভীর অন্ধকাররাশির মর্মভেদ করিয়া মাঝে মাঝে নিশ্বাস ফেলিতেছে।

আজ রাত্রে পথে লোক বাহির হওয়া নিষেধ। রাত্রে পথে লোক কেই বা বাহির হয়। কিন্তু নিষেধ আছে বলিয়া পথের বিজনতা আজ আরও গভীর বোধ হইতেছে। নগরবাসীরা সকলেই আপনার ঘরের দীপ নিবাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। পথে একটি প্রহরী নাই। চোরও আজ পথে বাহির হয় না। যাহারা শ্মশানে শবদাহ করিতে যাইবে তাহারা মৃতদেহ ঘরে লইয়া প্রভাতের জন্য প্রতীক্ষা

ধ্রুব তাহাতেও সুস্পষ্ট অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিল, "না, আমি আজা।"

অবশেষে মহারাজ যখন বলিলেন "হিরণ্যকশিপু আজা নয়, সে আক্কস", তখন ধ্রুব তাহাতে আপত্তি করিবার কিছুই দেখিল না।

এমন সময় নক্ষত্ররায় গৃহে প্রবেশ করিলেন— কহিলেন, "শুনিলাম রাজকার্যোপলক্ষে মহারাজ আমাকে ডাকিয়াছেন। আদেশের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি।"

রাজা কহিলেন, "আর-একটু অপেক্ষা করো, গল্পটা শেষ করিয়া লই।" বলিয়া গল্পটা সমস্ত শেষ করিলেন। "আক্কস দুষ্টু"— গল্প শুনিয়া সংক্ষেপে ধ্রুব এইরূপ মত প্রকাশ করিল।

ধ্রুবের মাথায় মুকুট দেখিয়া নক্ষত্ররায়ের ভালো লাগে নাই। ধ্রুব যখন দেখিল নক্ষত্ররায়ের দৃষ্টি তাহার দিকে স্থাপিত রহিয়াছে, তখন সে নক্ষত্ররায়কে গম্ভীরভাবে জানাইয়া দিল, "আমি আজা।"

নক্ষত্র বলিলেন, "ছি, ও কথা বলিতে নাই।" বলিয়া ধ্রুবের মাথা হইতে মুকুট তুলিয়া লইয়া রাজার হাতে দিতে উদ্যত হইলেন। ধ্রুব মুকুটহরণের সম্ভাবনা দেখিয়া সত্যকার রাজাদের মতো চীৎকার করিয়া উঠিল। গোবিন্দমাণিক্য তাহাকে এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন, নক্ষত্রকে নিবারণ করিলেন।

অবশেষে গোবিন্দমাণিক্য নক্ষত্ররায়কে কহিলেন, "শুনিয়াছি রঘুপতি ঠাকুর অসৎ উপায়ে প্রজাদের অসন্তোষ উদ্রেক করিয়া দিতেছেন। তুমি স্বয়ং নগরের মধ্যে গিয়া এ বিষয়ে তদারক করিয়া আসিবে এবং সত্যমিথ্যা অবধারণ করিয়া আমাকে জানাইবে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "যে আজ্ঞে।" বলিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু ধ্রুবের মাথায় মুকুট তাঁহার কিছুতেই ভালো লাগিল না!

প্রহরী আসিয়া কহিল, "পুরোহিত ঠাকুরের সেবক জয়সিংহ সাক্ষাৎ-প্রার্থনায় দ্বারে দাঁড়াইয়া।"

রাজা তাহাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন।

জয়সিংহ মহারাজকে প্রণাম করিয়া করজোড়ে কহিলেন, "মহারাজ, আমি বহুদূরদেশে চলিয়া যাইতেছি। আপনি আমার রাজা, আমার গুরু, আপনার আশীর্বাদ লইতে আসিয়াছি।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইবে জয়সিংহ?"

জয়সিংহ কহিলেন, "জানি না মহারাজ, কোথায় তাহা কেহ বলিতে পারে না।"

রাজাকে কথা কহিতে উদ্যত দেখিয়া জয়সিংহ কহিলেন, "নিষেধ করিবেন না

*

করিয়া আছে। ঘরে যাহাদের সন্তান মুমূর্ষু তাহারা বৈদ্য ডাকিতে বাহির হয় না। যে ভিক্ষুক পথপ্রান্তে বৃক্ষতলে শয়ন করিত সে আজ গৃহস্থের গোশালায় আশ্রয় লইয়াছে।

সে রাত্রে শৃগাল-কুকুর নগরের পথে পথে বিচরণ করিতেছে, দুই একটা চিতাবাঘ গৃহস্থের দ্বারের কাছে আসিয়া উঁকি মারিতেছে। মানুষের মধ্যে কেবল একজন মাত্র আজ গৃহের বাহিরে আছে— আর মানুষ নাই। সে একখানা ছুরী লইয়া নদীতীরে পাথরের উপর শান দিতেছে, এবং অন্যমনস্ক হইয়া কী ভাবিতেছে। ছুরীর ধার যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সে বোধ করি ছুরীর সঙ্গে সঙ্গে ভাবনাতেও শান দিতেছিল, তাই তার শান দেওয়া আর শেষ হইতেছে না। প্রস্তরের ঘর্ষণে তীক্ষ্ণ ছুরী হিস হিস শব্দ করিয়া হিংসার লালসায় তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার নদী বহিয়া যাইতেছিল। জগতের উপর দিয়া অন্ধকার রজনীর প্রহর বহিয়া যাইতেছিল। আকাশের উপর দিয়া অন্ধকার ঘনমেঘের স্রোত ভাসিয়া যাইতেছিল।

অবশেষে যখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল তখন জয়সিংহের চেতনা হইল! তপ্ত ছুরী খাপের মধ্যে পুরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পূজার সময় নিকটবর্তী হইয়াছে। তাঁহার শপথের কথা মনে পড়িয়াছে। আর এক দণ্ডও বিলম্ব করিলে চলিবে না।

মন্দির আজ সহস্র দীপে আলোকিত। ত্রয়োদশ দেবতার মাঝখানে কালী দাঁড়াইয়া নররক্তের জন্য জিহ্বা মেলিয়াছেন। মন্দিরের সেবকদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া চতুর্দশ দেবপ্রতিমা সম্মুখে করিয়া রঘুপতি একাকী বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে এক দীর্ঘ খাঁড়া। উলঙ্গ উজ্জ্বল খড়্গ দীপালোকে বিভাসিত হইয়া স্থির বজ্রের ন্যায় দেবীর আদেশের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

অর্ধরাত্রে পূজা। সময় নিকটবর্তী। রঘুপতি অত্যন্ত অস্থিরচিত্তে জয়সিংহের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। সহসা ঝড়ের মতো বাতাস উঠিয়া মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। বাতাসে মন্দিরের সহস্র দীপশিখা কাঁপিতে লাগিল, উলঙ্গ খড়্গের উপর বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। চতুর্দশ দেবতা এবং রঘুপতির ছায়া যেন জীবন পাইয়া দীপ-শিখার নৃত্যের তালে তালে মন্দিরের ভিত্তিময় নাচিতে লাগিল। একটা নরকপাল ঝড়ের বাতাসে ঘরময় গড়াইতে লাগিল। মন্দিরের মধ্যে দুইটা চামচিকা আসিয়া শুষ্ক পত্রের মতো ক্রমাগত উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল— দেয়ালে তাহাদের ছায়া উড়িতে লাগিল।

দ্বিপ্রহর হইল। প্রথমে নিকটে, পরে দূর-দূরান্তরে শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। ঝড়ের বাতাসও তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পূজার সময় হইয়াছে। রঘুপতি অমঙ্গল-আশঙ্কায় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন।

এমন সময় জীবন্ত ঝড়বৃষ্টিবিদ্যুতের মতো জয়সিংহ নিশীথের অন্ধকারের মধ্য হইতে সহসা মন্দিরের আলোকের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দীর্ঘ চাদরে দেহ আচ্ছাদিত, সর্বাঙ্গ বাহিয়া বৃষ্টিধারা পড়িতেছে, নিশ্বাস বেগে বহিতেছে, চক্ষুতারকায় অগ্নিকণা জলিতেছে।

রঘুপতি তাঁহাকে ধরিয়া কানের কাছে মুখ দিয়া কহিলেন, "রাজরক্ত আনিয়াছ?"

জয়সিংহ তাঁহার হাত ছাড়াইয়া উচ্চস্বরে কহিলেন, "আনিয়াছি। রাজরক্ত আনিয়াছি। আপনি সরিয়া দাঁড়ান, আমি দেবীকে নিবেদন করি।"

শব্দে মন্দির কাঁপিয়া উঠিল।

কালীর প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "সত্যই কি তবে তুই সন্তানের রক্ত চাস মা! রাজরক্ত নহিলে তোর তৃষা মিটিবে না? জন্মাবধি আমি তোকেই মা বলিয়া আসিয়াছি, আমি তোরই সেবা করিয়াছি, আমি আর-কাহারও দিকে চাই নাই, আমার জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। আমি রাজপুত, আমি ক্ষত্রিয়, আমার প্রপিতামহ রাজা ছিলেন, আমার মাতামহবংশীয়েরা আজও রাজত্ব করিতেছেন। এই নে তবে তোর সন্তানের রক্ত, তোর রাজরক্ত এই নে।" গাত্র হইতে চাদর পড়িয়া গেল। কটিবন্ধ হইতে ছুরী বাহির করিলেন— বিদ্যুৎ নাচিয়া উঠিল— চকিতের মধ্যে সেই ছুরী আমূল তাঁহার হৃদয়ে নিহিত করিলেন, মরণের তীক্ষ্ণ জিহ্বা তাঁহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। প্রতিমার পদতলে পড়িয়া গেলেন; পাষাণপ্রতিমা বিচলিত হইল না।

রঘুপতি চীৎকার করিয়া উঠিলেন— জয়সিংহকে তুলিবার চেষ্টা করিলেন, তুলিতে পারিলেন না। তাঁহার মৃতদেহের উপর পড়িয়া রহিলেন। রক্ত গড়াইয়া মন্দিরের শ্বেত প্রস্তরের উপর প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে দীপগুলি একে একে নিবিয়া গেল। অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত রাত্রি একটি প্রাণীর নিশ্বাসের শব্দ শুনা গেল; রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় ঝড় থামিয়া চারি দিক নিস্তব্ধ হইয়া গেল। রাত্রি চতুর্থ প্রহরের সময় মেঘের ছিদ্র দিয়া চন্দ্রালোক মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। চন্দ্রালোক জয়সিংহের পাণ্ডুবর্ণ মুখের উপর পড়িল, চতুর্দশ দেবতা শিয়রে দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতে লাগিল। প্রভাতে বন হইতে যখন পাখি ডাকিয়া উঠিল, তখন রঘুপতি মৃতদেহ ছাড়িয়া উঠিয়া গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

রাজার আদেশমত প্রজাদের অসন্তোষের কারণ অনুসন্ধানের জন্য নক্ষত্ররায় স্বয়ং প্রাতঃকালে বাহির হইয়াছেন। তাঁহার ভাবনা হইতে লাগিল, মন্দিরে কী করিয়া যাই। রঘুপতির সম্মুখে পড়িলে তিনি কেমন অস্থির হইয়া পড়েন, আত্মসম্বরণ করিতে পারেন না। রঘুপতির সম্মুখে পড়িতে তাঁহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা। এই জন্য তিনি স্থির করিয়াছেন, রঘুপতির দৃষ্টি এড়াইয়া গোপনে জয়সিংহের কক্ষে গিয়া তাঁহার নিকট হইতে সবিশেষ বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন।

নক্ষত্ররায় ধীরে ধীরে জয়সিংহের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই মনে করিলেন, ফিরিতে পারিলে বাঁচি। দেখিলেন জয়সিংহের পুঁথি, তাঁহার বসন, তাঁহার গৃহসজ্জা চারি দিকে ছড়ানো রহিয়াছে, মাঝখানে রঘুপতি বসিয়া। জয়সিংহ নাই। রঘুপতির লোহিত চক্ষু অঙ্গারের ন্যায় জলিতেছে, তাঁহার কেশপাশ বিশৃঙ্খল। তিনি নক্ষত্ররায়কে দেখিয়াই দৃঢ় মুষ্টিতে তাঁহার হাত ধরিলেন। বলপূর্বক তাঁহাকে মাটিতে বসাইলেন। নক্ষত্ররায়ের প্রাণ উড়িয়া গেল। রঘুপতি তাঁহার অঙ্গারনয়নে নক্ষত্ররায়ের মর্মস্থান পর্যন্ত দগ্ধ করিয়া পাগলের মতো বলিলেন, "রক্ত কোথায় ?"

নক্ষত্ররায়ের হৃৎপিণ্ডে রক্তের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, মুখ দিয়া কথা সরিল না।

রঘুপতি উচ্চস্বরে বলিলেন, "তোমার প্রতিজ্ঞা কোথায় ? রক্ত কোথায় ?"

নক্ষত্ররায় হাত নাড়িলেন, পা নাড়িলেন, বামে সরিয়া বসিলেন, কাপড়ের প্রান্ত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন— তাঁহার ঘর্ম বহিতে লাগিল, তিনি শুষ্কমুখে বলিলেন, "ঠাকুর—"

রঘুপতি কহিলেন, "এবার মা যে স্বয়ং খড়্গ তুলিয়াছেন, এবার চারি দিকে যে রক্তের স্রোত বহিতে থাকিবে— এবার তোমাদের বংশে এক ফোঁটা রক্ত যে বাকি থাকিবে না। তখন দেখিব নক্ষত্ররায়ের ভ্রাতৃস্নেহ !"

"ভ্রাতৃস্নেহ ! হাঃ হাঃ হাঃ ! ঠাকুর"—

নক্ষত্ররায়ের হাসি আর বাহির হইল না, গলা শুকাইয়া গেল।

রঘুপতি কহিলেন, "আমি গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত চাই না। পৃথিবীতে গোবিন্দমাণিক্যের যে প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়, আমি তাহাকেই চাই। তাহার রক্ত লইয়া আমি গোবিন্দমাণিক্যের গায়ে মাখাইতে চাই— তাহার বক্ষস্থল রক্তবর্ণ হইয়া যাইবে— সে রক্তের চিহ্ন কিছুতেই মুছিবে না। এই দেখো— চাহিয়া দেখো।"

বলিয়া উত্তরীয় মোচন করিলেন, তাঁহার দেহ রক্তে লিপ্ত, তাঁহার বক্ষোদেশে স্থানে স্থানে রক্ত জমিয়া আছে।

নক্ষত্ররায় শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার হাত-পা কাঁপিতে লাগিল। রঘুপতি বজ্রমুষ্টিতে নক্ষত্ররায়ের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "সে কে? কে গোবিন্দ-মাণিক্যের প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়? কে চলিয়া গেলে গোবিন্দমাণিক্যর চক্ষে পৃথিবী শ্মশান হইয়া যাইবে, তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য চলিয়া যাইবে? সকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই কাহার মুখ তাঁহার মনে পড়ে, কাহার স্মৃতি সঙ্গে করিয়া তিনি রাত্রে শয়ন করিতে যান, তাঁহার হৃদয়ের নীড় সমস্তটা পরিপূর্ণ করিয়া কে বিরাজ করিতেছে? সে কে? সে কি তুমি?"

বলিয়া, ব্যাঘ্র লম্ফ দিবার পূর্বে কম্পিত হরিণশিশুর দিকে যেমন একদৃষ্টিতে চায়, রঘুপতি তেমনি নক্ষত্রের দিকে চাহিলেন। নক্ষত্ররায় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "না, আমি না।" কিন্তু কিছুতেই রঘুপতির মুষ্টি ছাড়াইতে পারিলেন না।

রঘুপতি বলিলেন, "তবে বলো সে কে!

নক্ষত্ররায় বলিয়া ফেলিলেন, "সে ধ্রুব।"

রঘুপতি বলিলেন, "ধ্রুব কে?"

নক্ষত্ররায়, "সে একটি শিশু—"

রঘুপতি বলিলেন, "আমি জানি, তাহাকে জানি। রাজার নিজের সন্তান নাই, তাহাকেই সন্তানের মতো পালন করিতেছেন। নিজের সন্তানকে লোকে কেমন ভালোবাসে জানি না, কিন্তু পালিত সন্তানকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসে তাহা জানি। আপনার সমুদয় সম্পদের চেয়ে তাহার সুখ রাজার বেশি মনে হয়। আপনার মাথায় মুকুটের চেয়ে তাহার মাথায় মুকুট দেখিতে রাজার বেশি আনন্দ হয়।"

নক্ষত্ররায় আশ্চর্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক কথা।"

রঘুপতি কহিলেন, "ঠিক কথা নয় তো কী! রাজা তাহাকে কতখানি ভালোবাসেন তাহা কি আমি জানি না! আমি কি বুঝিতে পারি না! আমিও তাহাকেই চাই।"

নক্ষত্ররায় হাঁ করিয়া রঘুপতির দিকে চাহিয়া রহিলেন। আপন-মনে বলিলেন, "তাহাকেই চাই।"

রঘুপতি কহিলেন, "তাহাকে আনিতেই হইবে— আজই আনিতে হইবে— আজ রাত্রেই চাই।" নক্ষত্ররায় প্রতিধ্বনির মতো কহিলেন, "আজ রাত্রেই চাই।"

নক্ষত্ররায়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া গলার স্বর নামাইয়া রঘুপতি বলিলেন,

"এই শিশুই তোমার শত্রু, তাহা জান? তুমি রাজবংশে জন্মিয়াছ— কোথাকার এক অজ্ঞাতকুলশীল শিশু তোমার মাথা হইতে মুকুট কাড়িয়া লইতে আসিয়াছে তাহা কি জান? যে সিংহাসন তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, সেই সিংহাসনে তাহার জন্য স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা কি দুটো চক্ষু থাকিতে দেখিতে পাইতেছ না!"

নক্ষত্ররায়ের কাছে এ-সকল কথা নূতন নহে। তিনিও পূর্বে এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। সগর্বে বলিলেন, "তা কি আর বলিতে হইবে ঠাকুর! আমি কি আর এইটে দেখিতে পাই না!"

রঘুপতি কহিলেন, "তবে আর কী! তবে তাহাকে আনিয়া দাও। তোমার সিংহাসনের বাধা দূর করি। এই কটা প্রহর কোনোমতে কাটিবে, তার পর— তুমি কখন আনিবে?"

নক্ষত্ররায়, "আজ সন্ধ্যাবেলায়— অন্ধকার হইলে।"

পইতা স্পর্শ করিয়া রঘুপতি বলিলেন, "যদি না আনিতে পার তো ব্রাহ্মণের অভিশাপ লাগিবে। তা হইলে, যে মুখে তুমি প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করিয়া পালন না কর, ত্রিরাত্রি না পোহাইতে সেই মুখের মাংস শকুনি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইবে।"

শুনিয়া নক্ষত্ররায় চমকিয়া মুখে হাত বুলাইলেন— কোমল মাংসের উপরে শকুনির চঞ্চুপাত -কল্পনা তাঁহার নিতান্ত দুঃসহ বোধ হইল। রঘুপতিকে প্রণাম করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বিদায় হইলেন। সে ঘর হইতে আলোক বাতাস ও জনকোলাহলের মধ্যে গিয়া নক্ষত্ররায় পুনর্জীবন লাভ করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় নক্ষত্ররায়কে দেখিয়া ধ্রুব "কাকা" বলিয়া ছুটিয়া আসিল, দুটি ছোটো হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া তাঁহার কপোলে কপোল দিয়া মুখের কাছে মুখ রাখিল। চুপি চুপি বলিল, "কাকা।"

নক্ষত্র কহিলেন, "ছি, ও কথা বোলো না, আমি তোমার কাকা না।"

ধ্রুব তাঁহাকে এতকাল বরাবর কাকা বলিয়া আসিতেছিল, আজ সহসা বারণ শুনিয়া সে ভারী আশ্চর্য হইয়া গেল। গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; তার পরে নক্ষত্রের মুখের দিকে বড়ো বড়ো চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "আমি তোমার কাকা নই।"

শুনিয়া সহসা ধ্রুবের অত্যন্ত হাসি পাইল— এতবড়ো অসম্ভব কথা সে ইতিপূর্বে

আর কখনোই শুনে নাই; সে হাসিয়া বলিল, "তুমি কাকা।" নক্ষত্র যত নিষেধ করিতে লাগিলেন সে ততই বলিতে লাগিল, "তুমি কাকা।" তাহার হাসিও ততই বাড়িতে লাগিল। সে নক্ষত্ররায়কে কাকা বলিয়া খেপাইতে লাগিল। নক্ষত্র বলিলেন, "ধ্রুব, তোমার দিদিকে দেখিতে যাইবে?"

ধ্রুব তাড়াতাড়ি নক্ষত্রের গলা ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "দিদি কোথায়?"

নক্ষত্র বলিলেন, "মায়ের কাছে।"

ধ্রুব কহিল, "মা কোথায়?"

নক্ষত্র, "মা আছেন এক জায়গায়। আমি সেখানে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি।"

ধ্রুব হাততালি দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কখন নিয়ে যাবে কাকা?"

নক্ষত্র, "এখনি।"

ধ্রুব আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিয়া সজোরে নক্ষত্রের গলা জড়াইয়া ধরিল; নক্ষত্র তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া চাদরে আচ্ছাদন করিয়া গুপ্ত দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

আজ রাত্রেও পথে লোক বাহির হওয়া নিষেধ। এইজন্য পথে প্রহরী নাই, পথিক নাই। আকাশে পূর্ণচন্দ্র।

মন্দিরে গিয়া নক্ষত্ররায় ধ্রুবকে রঘুপতির হাতে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন। রঘুপতিকে দেখিয়া ধ্রুব সবলে নক্ষত্ররায়কে জড়াইয়া ধরিল, কোনোমতে ছাড়িতে চাহিল না। রঘুপতি তাহাকে বলপূর্বক কাড়িয়া লইলেন। ধ্রুব "কাকা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্ররায়ের চোখে জল আসিল, কিন্তু রঘুপতির কাছে এই হৃদয়ের দুর্বলতা দেখাইতে তাঁহার নিতান্ত লজ্জা করিতে লাগিল। তিনি ভাণ করিলেন যেন তিনি পাষাণে গঠিত। তখন ধ্রুব কাঁদিয়া কাঁদিয়া "দিদি" "দিদি" বলিয়া ডাকিতে লাগিল, দিদি আসিল না। রঘুপতি বজ্রস্বরে এক ধমক দিয়া উঠিলেন। ভয়ে ধ্রুবের কান্না থামিয়া গেল। কেবল তাহার কান্না ফাটিয়া ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল। চতুর্দশ দেবমূর্তি চাহিয়া রহিল।

গোবিন্দমাণিক্য নিশীথে স্বপ্নে ক্রন্দন শুনিয়া জাগিয়া উঠিলেন। সহসা শুনিতে পাইলেন, তাঁহার বাতায়নের নীচে হইতে কে কাতরস্বরে ডাকিতেছে, "মহারাজ! মহারাজ!"

রাজা সত্বর উঠিয়া গিয়া চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলেন, ধ্রুবের পিতৃব্য কেদারেশ্বর। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইয়াছে?"

কেদারেশ্বর কহিলেন, "মহারাজ, আমার ধ্রুব কোথায়?"

রাজা কহিলেন, "কেন, তাহার শয্যাতে নাই ?"

"না।"

কেদারেশ্বর বলিতে লাগিলেন, "অপরাহ্ণ হইতে ধ্রুবকে না দেখিতে পাওয়ায় জিজ্ঞাসা করাতে যুবরাজ নক্ষত্ররায়ের ভৃত্য কহিল, ধ্রুব অন্তঃপুরে যুবরাজের কাছে আছে। শুনিয়া আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। অনেক রাত হইতে দেখিয়া আমার আশঙ্কা জন্মিল ; অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, যুবরাজ নক্ষত্ররায় প্রাসাদে নাই। আমি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ-প্রার্থনার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রহরীরা কিছুতেই আমার কথা গ্রাহ্য করিল না— এইজন্য বাতায়নের নীচে হইতে মহারাজকে ডাকিয়াছি, আপনার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছি, আমার এই অপরাধ মার্জনা করিবেন।'

রাজার মনে একটা ভাব বিদ্যুতের মতো চমকিয়া উঠিল। তিনি চারিজন প্রহরীকে ডাকিলেন, কহিলেন, "সশস্ত্রে আমার অনুসরণ করো।"

একজন কহিল, "মহারাজ, আজ রাত্রে পথে বাহির হওয়া নিষেধ।"

রাজা কহিলেন, "আমি আদেশ করিতেছি।"

কেদারেশ্বর সঙ্গে যাইতে উদ্যত হইলেন, রাজা তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে কহিলেন। বিজন পথে চন্দ্রালোকে রাজা মন্দিরাভিমুখে চলিলেন।

মন্দিরের দ্বার যখন সহসা খুলিয়া গেল, দেখা গেল খড়্গ সম্মুখে করিয়া নক্ষত্র এবং রঘুপতি মদ্যপান করিতেছেন। আলোক অধিক নাই, একটি দীপ জ্বলিতেছে। ধ্রুব কোথায় ? ধ্রুব কালীপ্রতিমার পায়ের কাছে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে— তাহার কপোলের অশ্রুরেখা শুকাইয়া গেছে, ঠোঁট দুটি একটু খুলিয়া গেছে, মুখে ভয় নাই, ভাবনা নাই— এ যেন পাষাণ-শয্যা নয়, যেন সে দিদির কোলের উপরে শুইয়া আছে। দিদি যেন চুমো খাইয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়াছে।

মদ খাইয়া নক্ষত্রের প্রাণ খুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু রঘুপতি স্থির হইয়া বসিয়া পূজার লগ্নের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন— নক্ষত্রের প্রলাপে কিছুমাত্র কান দিতেছিলেন না। নক্ষত্র বলিতেছিলেন, "ঠাকুর, তোমার মনে মনে ভয় হচ্ছে। তুমি মনে করছ আমিও ভয় করছি। কিছু ভয় নেই ঠাকুর! ভয় কিসের! ভয় কাকে! আমি তোমাকে রক্ষা করব। তুমি কি মনে কর আমি রাজাকে ভয় করি! আমি শাসুজাকে ভয় করি নে, আমি শাজাহানকে ভয় করি নে। ঠাকুর, তুমি বললে না কেন— আমি রাজাকে ধরে আনতুম, দেবীকে সন্তুষ্ট করে দেওয়া যেত। ওইটুকু ছেলের কতটুকুই বা রক্ত!"

এমন সময় সহসা মন্দিরের ভিত্তির উপরে ছায়া পড়িল। নক্ষত্ররায় পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন— রাজা। চকিতের মধ্যে নেশা সম্পূর্ণ ছুটিয়া গেল। নিজের ছায়ার চেয়ে নিজে মলিন হইয়া গেলেন। দ্রুতবেগে নিদ্রিত ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইয়া গোবিন্দমাণিক্য প্রহরীদিগকে কহিলেন, "ইহাদের দুজনকে বন্দী করো।"

চারিজন প্রহরী রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়ের দুই হাত ধরিল। ধ্রুবকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বিজন পথে জ্যোৎস্নালোকে রাজা প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। রঘুপতি ও নক্ষত্ররায় সে রাত্রে কারাগারে রহিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

তাহার পরদিন বিচার। বিচারশালা লোকে লোকারণ্য। বিচারাসনে রাজা বসিয়াছেন, সভাসদেরা চারি দিকে বসিয়াছেন। সম্মুখে দুইজন বন্দী। কাহারও হাতে শৃঙ্খল নাই। কেবল সশস্ত্র প্রহরী তাঁহাদিগকে ঘেরিয়া আছে— রঘুপতি পাষাণ-মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া আছেন, নক্ষত্ররায়ের মাথা নত।

রঘুপতির দোষ সপ্রমাণ করিয়া রাজা তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার কী বলিবার আছে?"

রঘুপতি কহিলেন, "আমার বিচার করিবার অধিকার আপনার নাই।"

রাজা কহিলেন, "তবে তোমার বিচার কে করিবে?"

রঘুপতি। আমি ব্রাহ্মণ, আমি দেবসেবক, দেবতা আমার বিচার করিবেন।

রাজা। পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার দিবার জন্য জগতে দেবতার সহস্র অনুচর আছে। আমরাও তাহার একজন। সে কথা লইয়া আমি তোমার সহিত বিচার করিতে চাই না— আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, কাল সন্ধ্যাকালে বলির মানসে তুমি একটি শিশুকে হরণ করিয়াছিলে কি না।

রঘুপতি কহিলেন, "হাঁ।"

রাজা কহিলেন, "তুমি অপরাধ স্বীকার করিতেছ?"

রঘুপতি। অপরাধ! অপরাধ কিসের! আমি মায়ের আদেশ পালন করিতেছিলাম, মায়ের কার্য করিতেছিলাম, তুমি তাহার ব্যাঘাত করিয়াছ— অপরাধ তুমি করিয়াছ— আমি মায়ের সমক্ষে তোমাকে অপরাধী করিতেছি, তিনি তোমার বিচার করিবেন।

রাজা তাঁহার কথার কোনো উত্তর না দিয়া কহিলেন, "আমার রাজ্যের নিয়ম এই, যে ব্যক্তি দেবতার উদ্দেশে জীববলি দিবে বা দিতে উদ্যত হইবে তাহার নির্বাসনদণ্ড। সেই দণ্ড আমি তোমার প্রতি প্রয়োগ করিলাম। আট বৎসরের জন্য তুমি নির্বাসিত হইলে। প্রহরীরা তোমাকে আমার রাজ্যের বাহিরে রাখিয়া আসিবে।"

প্রহরীরা রঘুপতিকে সভাগৃহ হইতে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল। রঘুপতি তাহাদিগকে কহিলেন, "স্থির হও।" রাজার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তোমার বিচার শেষ হইল, এখন আমি তোমার বিচার করিব, তুমি অবধান করো। চতুর্দশ দেবতা -পূজার দুই রাত্রে যে কেহ পথে বাহির হইবে, পুরোহিতের কাছে সে দণ্ডিত হইবে এই আমাদের মন্দিরের নিয়ম। সেই প্রাচীন নিয়ম -অনুসারে তুমি আমার নিকটে দণ্ডার্হ।"

রাজা কহিলেন, "আমি তোমার দণ্ড গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।"

সভাসদেরা কহিলেন, "এ অপরাধের কেবল অর্থদণ্ড হইতে পারে।"

পুরোহিত কহিলেন, "আমি তোমার দুই লক্ষ মুদ্রা দণ্ড করিতেছি। এখনি দিতে হইবে।"

রাজা কিয়ৎক্ষণ ভাবিলেন, পরে বলিলেন, "তথাস্তু।" কোষাধ্যক্ষকে ডাকিয়া দুই লক্ষ মুদ্রা আদেশ করিয়া দিলেন। প্রহরীরা রঘুপতিকে বাহিরে লইয়া গেল।

রঘুপতি চলিয়া গেলে নক্ষত্ররায়ের দিকে চাহিয়া রাজা দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "নক্ষত্র-রায়, তোমার অপরাধ তুমি স্বীকার কর কি না।"

নক্ষত্ররায় বলিলেন, "মহারাজ, আমি অপরাধী, আমাকে মার্জনা করুন।"

বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া রাজার পা জড়াইয়া ধরিলেন।

মহারাজ বিচলিত হইলেন, কিছুক্ষণ বাক্যস্ফূর্তি হইল না। অবশেষে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, "নক্ষত্ররায়, ওঠো, আমার কথা শোনো। আমি মার্জনা করিবার কে? আমি আপনার শাসনে আপনি রুদ্ধ। বন্দীও যেমন বদ্ধ, বিচারকও তেমনি বদ্ধ। একই অপরাধে আমি একজনকে দণ্ড দিব, একজনকে মার্জনা করিব, এ কী করিয়া হয়? তুমিই বিচার করো।"

সভাসদেরা বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ, নক্ষত্ররায় আপনার ভাই, আপনার ভাইকে মার্জনা করুন।"

রাজা দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "তোমরা সকলে চুপ করো। যতক্ষণ আমি এই আসনে আছি, ততক্ষণ আমি কাহারও ভাই নহি, কাহারও বন্ধু নহি।"

সভাসদেরা চারি দিকে চুপ করিলেন। সভা নিস্তব্ধ হইল। রাজা গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, "তোমরা সকলেই শুনিয়াছ— আমার রাজ্যের নিয়ম এই যে, যে ব্যক্তি দেবতার উদ্দেশে জীব বলি দিবে বা দিতে উদ্যত হইবে তাহার নির্বাসন-দণ্ড। কাল সন্ধ্যাকালে নক্ষত্ররায় পুরোহিতের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বলির মানসে একটি শিশুকে হরণ করিয়াছিলেন। এই অপরাধ সপ্রমাণ হওয়াতে আমি তাঁহার আট বৎসর নির্বাসনদণ্ড বিধান করিলাম।"

প্রহরীরা যখন নক্ষত্ররায়কে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল তখন রাজা আসন হইতে নামিয়া নক্ষত্ররায়কে আলিঙ্গন করিলেন; রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "বৎস, কেবল তোমার দণ্ড হইল না, আমারও দণ্ড হইল। না জানি পূর্বজন্মে কী অপরাধ করিয়াছিলাম! যতদিন তুমি বন্ধুদের কাছ হইতে দূরে থাকিবে দেবতা তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুন, তোমার মঙ্গল করুন।"

সংবাদ দেখিতে দেখিতে রাষ্ট্র হইল। অন্তঃপুরে ক্রন্দনধ্বনি উঠিল। রাজা নিভৃত কক্ষে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। জোড়হাতে কহিতে লাগিলেন, "প্রভু, আমি যদি কখনো অপরাধ করি, আমাকে মার্জনা করিয়ো না, আমাকে কিছুমাত্র দয়া করিয়ো না। আমাকে আমার পাপের শাস্তি দাও। পাপ করিয়া শাস্তি বহন করা যায়, কিন্তু মার্জনাভার বহন করা যায় না প্রভু!"

নক্ষত্ররায়ের প্রেম রাজার মনে দ্বিগুণ জাগিতে লাগিল। নক্ষত্ররায়ের ছেলেবেলাকার মুখ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। সে যে-সকল খেলা করিয়াছে, কথা কহিয়াছে, কাজ করিয়াছে, তাহা একে একে তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল। এক-একটা দিন, এক-একটা রাত্রি তাহার সূর্যালোকের মধ্যে, তাহার তারাখচিত আকাশের মধ্যে শিশু নক্ষত্ররায়কে লইয়া তাঁহার সম্মুখে উদয় হইল। রাজার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

নির্বাসনোদ্যত রঘুপতিকে যখন প্রহরীরা জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুর, কোন্ দিকে যাইবেন" তখন রঘুপতি উত্তর করিলেন, "পশ্চিম দিকে যাইব।"

নয় দিন পশ্চিম মুখে যাত্রার পর বন্দী ও প্রহরীরা ঢাকা শহরের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিল। তখন প্রহরীরা রঘুপতিকে ছাড়িয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিল।

তাহাদের ভারী খেলা পড়িয়া গেল। খেলার সাধ মিটিলে পর ব্রাহ্মণকে সুজার শিবিরে লইয়া গেল।

সুজাকে দেখিয়া রঘুপতি সেলাম করিলেন না। তিনি দেবতা ও স্ববর্ণ ছাড়া আর কাহারও কাছে কখনও মাথা নত করেন নাই। মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; হাত তুলিয়া বলিলেন, "শাহেন শার জয় হউক।"

সুজা মদের পেয়ালা লইয়া সভাসদ্‌-সমেত বসিয়াছিলেন; আলস্যবিজড়িত স্বরে নিতান্ত উপেক্ষাভরে কহিলেন "কী, ব্যাপার কী!"

সৈন্যেরা কহিল, "জনাব, শত্রুপক্ষের চর গোপনে আমাদের বলাবল জানিতে আসিয়াছিল; আমরা তাহাকে প্রভুর কাছে ধরিয়া আনিয়াছি।"

সুজা কহিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা! বেচারা দেখিতে আসিয়াছে, উহাকে ভালো করিয়া সমস্ত দেখাইয়া ছাড়িয়া দাও। দেশে গিয়া গল্প করিবে।"

রঘুপতি বদ হিন্দুস্থানিতে কহিলেন, "সরকারের অধীনে আমি কর্ম প্রার্থনা করি।"

সুজা আলস্যভরে হাত নাড়িয়া তাঁহাকে দ্রুত চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। বলিলেন, "গরম!" যে বাতাস করিতেছিল, সে দ্বিগুণ জোরে বাতাস করিতে লাগিল।

দারা তাঁহার পুত্র সুলেমানকে রাজা জয়সিংহের অধীনে সুজার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদের বৃহৎ সৈন্যদল নিকটবর্তী হইয়াছে, সংবাদ আসিয়াছে। তাই বিজয়গড়ের কেল্লা অধিকার করিয়া সেইখানে সৈন্য সমবেত করিবার জন্য সুজা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সুজার হাতে কেল্লা এবং সরকারী খাজনা সমর্পণ করিবার প্রস্তাব লইয়া বিজয়গড়ের অধিপতি বিক্রমসিংহের নিকট দূত গিয়াছিল। বিক্রমসিংহ সেই দূতমুখে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি কেবল দিল্লীশ্বর শাজাহান এবং জগদীশ্বর ভবানীপতিকে জানি— সুজা কে? আমি তাহাকে জানি না।"

সুজা জড়িত স্বরে কহিলেন, "ভারী বেআদব! নাহক আবার লড়াই করিতে হইবে। ভারী হাঙ্গাম!"

রঘুপতি এই-সমস্ত শুনিতে পাইলেন। সৈন্যদের হাত এড়াইবামাত্র বিজয়গড়ের দিকে চলিয়া গেলেন।

*

একবিংশ পরিচ্ছেদ

পাহাড়ের উপরে বিজয়গড়। বিজয়গড়ের অরণ্য গড়ের কাছাকাছি গিয়া শেষ হইয়াছে। অরণ্য হইতে বাহির হইয়া রঘুপতি সহসা দেখিলেন, দীর্ঘ পাষাণদুর্গ যেন নীল আকাশে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অরণ্য যেমন তাহার সহস্র তরুজালে প্রচ্ছন্ন, দুর্গ তেমনি আপনার পাষাণের মধ্যে আপনি রুদ্ধ। অরণ্য সাবধানী, দুর্গ সতর্ক। অরণ্য ব্যাঘ্রের মতো গুঁড়ি মারিয়া লেজ পাকাইয়া বসিয়া আছে, দুর্গ সিংহের মতো কেশর ফুলাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অরণ্য মাটিতে কান পাতিয়া শুনিতেছে, দুর্গ আকাশে মাথা তুলিয়া দেখিতেছে।

রঘুপতি অরণ্য হইতে বাহির হইবামাত্র দুর্গপ্রাকারের উপরে সৈন্যেরা সচকিত হইয়া উঠিল। শৃঙ্গ বাজিয়া উঠিল। দুর্গ যেন সহসা সিংহনাদ করিয়া দাঁত নখ মেলিয়া ভ্রূকুটি করিয়া দাঁড়াইল। রঘুপতি পইতা দেখাইয়া হাত তুলিয়া ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। সৈন্যেরা সতর্ক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রঘুপতি যখন দুর্গপ্রাচীরের কাছাকাছি গেলেন তখন সৈন্যেরা জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "তুমি কে?"

রঘুপতি বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ, অতিথি।"

দুর্গাধিপতি বিক্রমসিংহ পরম ধর্মনিষ্ঠ। দেবতা ব্রাহ্মণ ও অতিথি -সেবায় নিযুক্ত। পইতা থাকিলে দুর্গপ্রবেশের জন্য আর কোনো পরিচয়ের আবশ্যক ছিল না। কিন্তু আজ যুদ্ধের দিনে কী করা উচিত সৈন্যেরা ভাবিয়া পাইতেছিল না।

রঘুপতি কহিলেন, "তোমরা আশ্রয় না দিলে মুসলমানদের হাতে আমাকে মরিতে হইবে।"

বিক্রমসিংহের কানে যখন এ কথা গেল তখন তিনি ব্রাহ্মণকে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় দিতে অনুমতি করিলেন। প্রাচীরের উপর হইতে একটা মই নামানো হইল, রঘুপতি দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দুর্গের মধ্যে যুদ্ধের প্রতীক্ষায় সকলেই ব্যস্ত। বৃদ্ধ খুড়াসাহেব ব্রাহ্মণ-অভ্যর্থনার ভার স্বয়ং লইলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম খড়্গসিংহ, কিন্তু তাঁহাকে কেহ বলে খুড়াসাহেব, কেহ বলে সুবাদার-সাহেব— কেন যে বলে তাহার কোনো কারণ পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নাই, ভাই নাই, তাঁহার খুড়া হইবার কোনো অধিকার বা সুদূর সম্ভাবনা নাই এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র যতগুলি তাঁহার সুবা তাহার অপেক্ষা অধিক নহে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেহ তাঁহার উপাধি সম্বন্ধে কোনোপ্রকার আপত্তি অথবা সন্দেহ উত্থাপিত করে নাই। যাহারা বিনা ভাইপোয় খুড়া, বিনা সুবায় সুবাদার, সংসারের

অনিত্যতা ও লক্ষ্মীর চপলতা -নিবন্ধন তাহাদের পদচ্যুতির কোনো আশঙ্কা নাই।

খুড়াসাহেব আসিয়া কহিলেন, "বাহবা, এই তো ব্রাহ্মণ বটে!" বলিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। রঘুপতির একপ্রকার তেজীয়ান দীপশিখার মতো আকৃতি ছিল, যাহা দেখিয়া সহসা পতঙ্গেরা মুগ্ধ হইয়া যাইত।

খুড়াসাহেব জগতের বর্তমান শোচনীয় অবস্থায় বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন, "ঠাকুর, তেমন ব্রাহ্মণ আজকাল ক'টা মেলে।"

রঘুপতি কহিলেন, "অতি অল্প।"

খুড়াসাহেব কহিলেন, "আগে ব্রাহ্মণের মুখে অগ্নি ছিল, এখন সমস্ত অগ্নি জঠরে আশ্রয় লইয়াছে।"

রঘুপতি কহিলেন, "তাও কি আগেকার মতো আছে?"

খুড়াসাহেব মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "ঠিক কথা। অগস্ত্য মুনি যে-আন্দাজ পান করিয়াছিলেন সে-আন্দাজ যদি আহার করিতেন তাহা হইলে একবার বুঝিয়া দেখুন।"

রঘুপতি কহিলেন, "আরও দৃষ্টান্ত আছে।"

খুড়াসাহেব। হাঁ আছে বৈকি। জহ্নু মুনির পিপাসার কথা শুনা যায়, তাঁহার ক্ষুধার কথা কোথাও লেখে নাই, কিন্তু একটা অনুমান করা যাইতে পারে। হর্তুকি খাইলেই যে কম খাওয়া হয় তাহা নহে, ক'টা করিয়া হর্তুকি তাঁহারা রোজ খাইতেন তাহার একটা হিসাব থাকিলে তবু বুঝিতে পারিতাম।

রঘুপতি ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "না সাহেব, আহারের প্রতি তাঁহাদের যথেষ্ট মনোযোগ ছিল না।"

খুড়াসাহেব জিভ কাটিয়া কহিলেন, "রাম রাম, বলেন কী ঠাকুর? তাঁহাদের জঠরানল যে অত্যন্ত প্রবল ছিল তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। দেখুন-না-কেন, কালক্রমে আর-সকল অগ্নিই নিবিয়া গেল, হোমের অগ্নিও আর জ্বলে না, কিন্তু— "

রঘুপতি কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, "হোমের অগ্নি আর জ্বলিবে কী করিয়া? দেশে ঘি রহিল কই? পাষণ্ডেরা সমস্ত গোরু পার করিয়া দিতেছে, এখন হব্য পাওয়া যায় কোথায়? হোমাগ্নি না জ্বলিলে ব্রহ্মতেজ আর কতদিন টেঁকে?"

বলিয়া রঘুপতি নিজের প্রচ্ছন্ন দাহিকাশক্তি অত্যন্ত অনুভব করিতে লাগিলেন।

খুড়াসাহেব কহিলেন, "ঠিক বলিয়াছেন ঠাকুর, গোরুগুলো মরিয়া আজকাল মনুষ্য-লোকে জন্মগ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের কাছ হইতে ঘি পাইবার প্রত্যাশা করা যায় না। মগজের সম্পূর্ণ অভাব। ঠাকুরের কোথা হইতে আসা হইতেছে?"

রঘুপতি কহিলেন, "ত্রিপুরার রাজবাটী হইতে।"

বিজয়গড়ের বহিঃস্থিত ভারতবর্ষের ভূগোল অথবা ইতিহাস সম্বন্ধে খুড়াসাহেবের যৎসামান্য জানা ছিল। বিজয়গড় ছাড়া ভারতবর্ষে জানিবার যোগ্য যে আর-কিছু আছে তাহাও তাঁহার বিশ্বাস নহে। সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলিলেন, "আহা, ত্রিপুরার রাজা মস্ত রাজা।"

রঘুপতি তাহা সম্পূণ অনুমোদন করিলেন।

খুড়াসাহেব। ঠাকুরের কী করা হয়?

রঘুপতি। আমি ত্রিপুরার রাজপুরোহিত।

খুড়াসাহেব চোখ বুজিয়া মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "আহা!" রঘুপতির উপরে তাঁহার ভক্তি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল।

"কী করিতে আসা হইয়াছে?"

রঘুপতি কহিলেন, "তীর্থদর্শন করিতে।"

ধুম করিয়া আওয়াজ হইল। শত্রুপক্ষ দুর্গ আক্রমণ করিয়াছে। খুড়াসাহেব হাসিয়া চোখ টিপিয়া কহিলেন, "ও কিছু নয়, ঢেলা ছুঁড়িতেছে।" বিজয়গড়ের উপরে খুড়াসাহেবের বিশ্বাস যত দৃঢ়, বিজয়গড়ের পাষাণ তত দৃঢ় নহে। বিদেশী পথিক দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিলেই খুড়াসাহেব তাহাকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসেন এবং বিজয়গড়ের মাহাত্ম্য তাহার মনে বদ্ধমূল করিয়া দেন। ত্রিপুরার রাজবাটী হইতে রঘুপতি আসিয়াছেন, এমন অতিথি সচরাচর মেলে না, খুড়াসাহেব অত্যন্ত উল্লাসে আছেন। অতিথির সঙ্গে বিজগড়ের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, ব্রহ্মার অণ্ড এবং বিজয়গড়ের দুর্গ যে প্রায় একই সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ঠিক মনুর পর হইতেই মহারাজ বিক্রমসিংহের পূর্বপুরুষেরা যে এই দুর্গ ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন সে বিষয়ে কোনো সংশয় থাকিতে পারে না। এই দুর্গের প্রতি শিবের কী বর আছে এবং এই দুর্গে কার্তবীর্যার্জুন যে কিরূপে বন্দী হইয়াছিলেন তাহাও রঘুপতির অগোচর রহিল না।

সন্ধ্যার সময় সংবাদ পাওয়া গেল শত্রুপক্ষ দুর্গের কোনো ক্ষতি করিতে পারে নাই। তাহারা কামান পাতিয়াছিল, কিন্তু কামানের গোলা দুর্গে আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। খুড়াসাহেব হাসিয়া রঘুপতির দিকে চাহিলেন। মর্ম এই যে, দুর্গের প্রতি শিবের যে অমোঘ বর আছে তাহার এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কী হইতে পারে। বোধ করি, নন্দী স্বয়ং আসিয়া কামানের গোলাগুলি লুফিয়া লইয়া গিয়াছে, কৈলাসে গণপতি ও কার্তিকেয় ভাঁটা খেলিবেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

শাসুজাকে কোনোমতে হস্তগত করাই রঘুপতির উদ্দেশ্য ছিল। তিনি যখন শুনিলেন, সুজা দুর্গ আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখন মনে করিলেন মিত্রভাবে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি কোনোরূপে সুজার দুর্গ-আক্রমণে সাহায্য করিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ যুদ্ধবিগ্রহের কোনো ধার ধারেন না, কী করিলে যে সুজার সাহায্য হইতে পারে কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না।

পরদিন আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বিপক্ষ পক্ষ বারুদ দিয়া দুর্গপ্রাচীরের কিয়দংশ উড়াইয়া দিল কিন্তু ঘন ঘন গুলিবর্ষণের প্রভাবে দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিল না। ভগ্ন অংশ দেখিতে দেখিতে গাঁথিয়া তোলা হইল। আজ মাঝে মাঝে দুর্গের মধ্যে গোলাগুলি আসিয়া পড়িতে লাগিল, দুই-চারিজন করিয়া দুর্গ-সৈন্য হত ও আহত হইতে লাগিল।

"ঠাকুর, কিছু ভয় নাই, এ কেবল খেলা হইতেছে" বলিয়া খুড়াসাহেব রঘুপতিকে লইয়া দুর্গের চারি দিক দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কোথায় অস্ত্রাগার, কোথায় ভাণ্ডার, কোথায় আহতদের চিকিৎসাগৃহ, কোথায় বন্দীশালা, কোথায় দরবার, এই সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইতে লাগিলেন ও বার বার রঘুপতির মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। রঘুপতি কহিলেন, "চমৎকার কারখানা। ত্রিপুরার গড় ইহার কাছে লাগিতে পারে না। কিন্তু সাহেব, গোপনে পলায়নের জন্য ত্রিপুরার গড়ে একটি আশ্চর্য সুরঙ্গ-পথ আছে, এখানে সেরূপ কিছুই দেখিতেছি না।"

খুড়াসাহেব কী একটা বলিতে যাইতেছিলেন, সহসা আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন, "না, এ দুর্গে সেরূপ কিছুই নাই।"

রঘুপতি নিতান্ত আশ্চর্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "এতবড়ো দুর্গে একটা সুরঙ্গ-পথ নাই, এ কেমন কথা হইল!"

খুড়াসাহেব কিছু কাতর হইয়া কহিলেন, "নাই, এ কি হইতে পারে? অবশ্যই আছে, তবে আমরা হয়তো কেহ জানি না।"

রঘুপতি হাসিয়া কহিলেন, "তবে তো না থাকারই মধ্যে। যখন আপনিই জানেন না তখন আর কেই বা জানে।"

খুড়াসাহেব অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তার পরে সহসা "হরি হে রাম রাম" বলিয়া তুড়ি দিয়া হাই তুলিলেন, তার পরে মুখে গোঁফে দাড়িতে দুই-এক-বার হাত বুলাইয়া হঠাৎ বলিলেন, "ঠাকুর, পূজা-অর্চনা লইয়া থাকেন,

আপনাকে বলিতে কোনো দোষ নাই— দুর্গ-প্রবেশের এবং দুর্গ হইতে বাহির হইবার দুইটা গোপন পথ আছে, কিন্তু বাহিরের কোনো লোককে তাহা দেখানো নিষেধ।"

রঘুপতি কিঞ্চিৎ সন্দেহের স্বরে কহিলেন, "বটে! তা হবে।"

খুড়াসাহেব দেখিলেন তাঁহারই দোষ, একবার "নাই" একবার "আছে" বলিলে লোকের স্বভাবতই সন্দেহ হইতে পারে। বিদেশীর চোখে ত্রিপুরার গড়ের কাছে বিজয়গড় কোনো অংশে খাটো হইয়া যাইবে ইহা খুড়াসাহেবের পক্ষে অসহ্য।

তিনি কহিলেন, "ঠাকুর, বোধ করি, আপনার ত্রিপুরা অনেক দূরে এবং আপনি ব্রাহ্মণ, দেবসেবাই আপনার একমাত্র কাজ, আপনার দ্বারা কিছুই প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই।"

রঘুপতি কহিলেন, "কাজ কী সাহেব, সন্দেহ হয় তো ও-সব কথা থাক্-না। আমি ব্রাহ্মণের ছেলে আমার দুর্গের খবরে কাজ কী।"

খুড়াসাহেব জিভ কাটিয়া কহিলেন, "আরে রাম রাম, আপনাকে আবার সন্দেহ কিসের! চলুন, একবার দেখাইয়া লইয়া আসি।"

এ দিকে সহসা দুর্গের বাহিরে সুজার সেনাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। অরণ্যের মধ্যে সুজার শিবির ছিল, সুলেমান এবং জয়সিংহের সৈন্য আসিয়া সহসা তাঁহাকে বন্দী করিয়াছে এবং অলক্ষ্যে দুর্গ-আক্রমণকারীদের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। সুজার সৈন্যেরা লড়াই না করিয়া কুড়িটা কামান পশ্চাতে ফেলিয়া ভঙ্গ দিল।

দুর্গের মধ্যে ধুম পড়িয়া গেল। বিক্রমসিংহের নিকট সুলেমানের দূত পৌঁছিতেই তিনি দুর্গের দ্বার খুলিয়া দিলেন, স্বয়ং অগ্রসর হইয়া সুলেমান ও রাজা জয়সিংহকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। দিল্লীশ্বরের সৈন্য ও অশ্ব-গজে দুর্গ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। নিশান উড়িতে লাগিল, শঙ্খ ও রণবাদ্য বাজিতে লাগিল এবং খুড়াসাহেবের শ্বেত গুম্ফের নীচে শ্বেত হাস্য পরিপূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

খুড়াসাহেবের কী আনন্দের দিন! আজ দিল্লীশ্বরের রাজপুত সৈন্যেরা বিজয়গড়ের অতিথি হইয়াছে। প্রবলপ্রতাপান্বিত শাসুজা আজ বিজয়গড়ের বন্দী। কার্তবীর্যার্জুনের পর হইতে বিজয়গড়ে এমন বন্দী আর মেলে নাই। কার্তবীর্যার্জুনের বন্ধন-দশা স্মরণ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া খুড়াসাহেব রাজপুত সুচেতসিংহকে বলিলেন, "মনে করিয়া

দেখো, হাজারটা হাতে শিকলি পরাইতে কী আয়োজনটাই করিতে হইয়াছিল। কলিযুগ পড়িয়া অবধি ধুমধাম বিলকুল কমিয়া গিয়াছে। এখন রাজার ছেলেই হউক আর বাদশাহের ছেলেই হউক বাজারে দুখানার বেশি হাত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাঁধিয়া সুখ নাই।"

সুচেতসিংহ হাসিয়া নিজের হাতের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এই দুইখানা হাতই যথেষ্ট।"

খুড়াসাহেব কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলেন, "তা বটে, সেকালে কাজ ছিল ঢের বেশি। আজকাল কাজ এত কম পড়িয়াছে যে, এই দুইখানা হাতেরই কোনো কৈফিয়ত দেওয়া যায় না। আরো হাত থাকিলে আরো গোঁফে তা দিতে হইত।"

আজ খুড়াসাহেবের বেশভূষার ত্রুটি ছিল না। চিবুকের নীচে হইতে পাকা দাড়ি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহার দুই কানে লটকাইয়া দিয়াছেন। গোঁফজোড়া পাকাইয়া কর্ণরন্ধ্রের কাছাকাছি লইয়া গিয়াছেন। মাথায় বাঁকা পাগড়ি, কটিদেশে বাঁকা তলোয়ার। জরির জুতার সম্মুখভাগ শিঙের মতো বাঁকিয়া পাকাইয়া উঠিয়াছে। আজ খুড়াসাহেবের চলিবার এমনি ভঙ্গি, যেন বিজয়গড়ের মহিমা তাঁহারই সর্বাঙ্গে তরঙ্গিত হইতেছে। আজ এই-সমস্ত সমজদার লোকের নিকটে বিজগড়ের মাহাত্ম্য প্রমাণ হইয়া যাইবে এই আনন্দে তাঁহার আহারনিদ্রা নাই।

সুচেতসিংহকে লইয়া প্রায় সমস্ত দিন দুর্গ পর্যবেক্ষণ করিলেন। সুচেতসিংহ যেখানে কোনোপ্রকার আশ্চর্য প্রকাশ না করেন সেখানে খুড়াসাহেব স্বয়ং "বাহবা বাহবা" করিয়া নিজের উৎসাহ রাজপুত বীরের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিতে চেষ্টা করেন। বিশেষত দুর্গপ্রাকারের গাঁথুনি সম্বন্ধে তাঁহাকে সবিশেষ পরিশ্রম করিতে হইল। দুর্গপ্রাকার যেরূপ অবিচলিত, সুচেতসিংহও ততোধিক— তাঁহার মুখে কোনোপ্রকারই ভাব প্রকাশ পাইল না। খুড়াসাহেব ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহাকে একবার দুর্গপ্রাকারের বামে একবার দক্ষিণে, একবার উপরে একবার নীচে আনিয়া উপস্থিত করিতে লাগিলেন— বার বার বলিতে লাগিলেন, "কী তারিফ!" কিন্তু কিছুতেই সুচেতসিংহের হৃদয়দুর্গ অধিকার করিতে পারিলেন না। অবশেষে সন্ধ্যাবেলায় শ্রান্ত হইয়া সুচেতসিংহ বলিয়া উঠিলেন "আমি ভরতপুরের গড় দেখিয়াছি, আর-কোনো গড় আমার চক্ষে লাগে না।"

খুড়াসাহেব কাহারও সঙ্গে কখনও বিবাদ করেন না; নিতান্ত ম্লান হইয়া বলিলেন, "অবশ্য অবশ্য। এ কথা বলিতে পারো বটে।"

নিশ্বাস ফেলিয়া দুর্গ সম্বন্ধে আলোচনা পরিত্যাগ করিলেন। বিক্রমসিংহের

পূর্বপুরুষ দুর্গাসিংহের কথা উঠাইলেন। তিনি বলিলেন, "দুর্গাসিংহের তিন পুত্র ছিল। কনিষ্ঠ পুত্র চিত্রসিংহের এক আশ্চর্য অভ্যাস ছিল। তিনি প্রতিদিন প্রাতে আধ সের আন্দাজ ছোলা দুধে সিদ্ধ করিয়া খাইতেন। তাঁহার শরীরও তেমনি ছিল। আচ্ছা জি, তুমি যে ভরতপুরের গড়ের কথা বলিতেছ, সে অবশ্য খুব মস্ত গড়ই হইবে— কিন্তু কই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে তো তাহার কোনো উল্লেখ নাই।"

সুচেতসিংহ হাসিয়া কহিলেন, "তাহার জন্য কাজের কোনো ব্যাঘাত হইতেছে না।"

খুড়াসাহেব কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিলেন, "হা হা হা! তা ঠিক, তা ঠিক! তবে কি জানো, ত্রিপুরার গড়ও বড়ো কম নহে, কিন্তু বিজয়গড়ের—"

সুচেতসিংহ। ত্রিপুরা আবার কোন্ মুল্লুকে?

খুড়াসাহেব। সে ভারী মুল্লুক। অত কথায় কাজ কী, সেখানকার রাজপুরোহিত-ঠাকুর আমাদের গড়ে অতিথি আছেন, তুমি তাঁহার মুখে সমস্ত শুনিবে।

কিন্তু ব্রাহ্মণকে আজ কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। খুড়াসাহেবের প্রাণ সেই ব্রাহ্মণের জন্য কাঁদিতে লাগিল। তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, 'এই রাজপুত গ্রাম্যগুলোর চেয়ে সে ব্রাহ্মণ অনেক ভালো।' সুচেতসিংহের নিকটে শতমুখে রঘুপতির প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং বিজয়গড় সম্বন্ধে রঘুপতির কী মত তাহাও ব্যক্ত করিলেন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

খুড়াসাহেবের হাত এড়াইতে সুচেতসিংহকে আর অধিক প্রয়াস পাইতে হইল না। কাল প্রাতে বন্দী-সমেত সম্রাট-সৈন্যের যাত্রার দিন স্থির হইয়াছে, যাত্রার আয়োজনে সৈন্যেরা নিযুক্ত হইল।

বন্দীশালায় শাসুজা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে কহিতেছেন, 'ইহারা কী বেআদব! শিবির হইতে আমার আলবোলাটা আনিয়া দিবে, তাহাও ইহাদের মনে উদয় হইল না।'

বিজয়গড়ের পাহাড়ের নিম্নভাগে এক গভীর খাল আছে। সেই খালের ধারে এক স্থানে একটি বজ্রদগ্ধ অশথের গুঁড়ি আছে। সেই গুঁড়ির কাছ-বরাবর রঘুপতি গভীর রাত্রে ডুব দিলেন ও অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

গোপনে দুর্গ-প্রবেশের জন্য যে সুরঙ্গ-পথ আছে এই খালের গভীর তলেই তাহার প্রবেশের মুখ। এই পথ বাহিয়া সুরঙ্গ-প্রান্তে পৌঁছিয়া নীচে হইতে সবলে ঠেলিলেই একটি পাথর উঠিয়া পড়ে, উপর হইতে তাহাকে কিছুতেই উঠানো যায় না। সুতরাং যাহারা দুর্গের ভিতরে আছে তাহারা এ পথ দিয়া বাহির হইতে পারে না।

বন্দীশালার পালঙ্কের উপরে সুজা নিদ্রিত। পালঙ্ক ছাড়া গৃহে আর কোনো সজ্জা নাই। একটি প্রদীপ জলিতেছে। সহসা গৃহে ছিদ্র প্রকাশ পাইল। অল্পে অল্পে মাথা তুলিয়া পাতাল হইতে রঘুপতি উঠিয়া পড়িলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ ভিজা। সিক্ত বস্ত্র হইতে জলধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। রঘুপতি ধীরে ধীরে সুজাকে স্পর্শ করিলেন।

সুজা চমকিয়া উঠিয়া চক্ষু রগড়াইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন, তার পরে আলস্য-জড়িত স্বরে কহিলেন, "কী হাঙ্গাম! ইহারা কি আমাকে রাত্রেও ঘুমাইতে দিবে না! তোমাদের ব্যবহারে আমি আশ্চর্য হইয়াছি।"

রঘুপতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "শাহাজাদা, উঠিতে আজ্ঞা হউক। আমি সেই ব্রাহ্মণ। আমাকে স্মরণ করিয়া দেখুন। ভবিষ্যতেও আমাকে স্মরণে রাখিবেন।"

পরদিন প্রাতে সম্রাট্-সৈন্য যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। সুজাকে নিদ্রা হইতে জাগাইবার জন্য রাজা জয়সিংহ স্বয়ং বন্দীশালায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সুজা তখনো শয্যা হইতে উঠেন নাই। কাছে গিয়া স্পর্শ করিলেন। দেখিলেন, সুজা নহে, তাঁহার বস্ত্র পড়িয়া আছে। সুজা নাই। ঘরের মেঝের মধ্যে সুরঙ্গ-গহ্বর, তাহার প্রস্তর-আবরণ উন্মুক্ত পড়িয়া আছে।

বন্দীর পলায়নবার্তা দুর্গে রাষ্ট্র হইল। সন্ধানের জন্য চারি দিকে লোক ছুটিল। রাজা বিক্রমসিংহের শির নত হইল। বন্দী কিরূপে পলাইল তাহার বিচারের জন্য সভা বসিল।

খুড়াসাহেবের সেই গর্বিত সহর্ষ ভাব কোথায় গেল! তিনি পাগলের মতো 'ব্রাহ্মণ কোথায়' 'ব্রাহ্মণ কোথায়' করিয়া রঘুপতিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। ব্রাহ্মণ কোথাও নাই। পাগড়ি খুলিয়া খুড়াসাহেব কিছুকাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন। সুচেতসিংহ পাশে আসিয়া বসিলেন; কহিলেন, "খুড়াসাহেব, কী আশ্চর্য কারখানা! এ কি সমস্ত ভূতের কাণ্ড!"

খুড়াসাহেব বিষণ্ণ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "না, এ ভূতের কাণ্ড নয় সুচেতসিংহ, এ একজন নিতান্ত নির্বোধ বৃদ্ধের কাণ্ড ও আর-একজন বিশ্বাসঘাতক পাষণ্ডের কাজ।"

সুচেতসিংহ আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "তুমি যদি তাহাদের জানোই তবে তাহাদের গ্রেফ্‌তার করিয়া দাও-না কেন?"

খুড়াসাহেব কহিলেন, "তাহাদের মধ্যে একজন পালাইয়াছে। আর-একজনকে গ্রেফ্‌তার করিয়া রাজসভায় লইয়া যাইতেছি।"

বলিয়া পাগড়ি পরিলেন ও রাজসভার বেশ ধারণ করিলেন।

সভায় তখন প্রহরীদের সাক্ষ্য লওয়া হইতেছিল। খুড়াসাহেব নতশিরে সভায় প্রবেশ করিলেন। বিক্রমসিংহের পদতলে তলোয়ার খুলিয়া রাখিয়া কহিলেন, "আমাকে বন্দী করিতে আদেশ করুন, আমি অপরাধী।"

রাজা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "খুড়াসাহেব, ব্যাপার কী!"

খুড়াসাহেব কহিলেন, "সেই ব্রাহ্মণ! এ সমস্ত সেই বাঙালি ব্রাহ্মণের কাজ।"

রাজা জয়সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

খুড়াসাহেব কহিলেন, "আমি বিজয়গড়ের বৃদ্ধ খুড়াসাহেব।"

জয়সিংহ। তুমি কী করিয়াছ?

খুড়াসাহেব। আমি বিজয়গড়ের সন্ধান ভেদ করিয়া বিশ্বাসঘাতকের কাজ করিয়াছি। আমি নিতান্ত নির্বোধের মতো বিশ্বাস করিয়া বাঙালি ব্রাহ্মণকে সুরঙ্গ-পথের কথা বলিয়াছিলাম—

বিক্রমসিংহ সহসা জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "খড়্গসিং!"

খুড়াসাহেব চমকিয়া উঠিলেন— তিনি প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার নাম খড়্গসিংহ।

বিক্রমসিংহ কহিলেন, "খড়্গসিং, এতদিন পরে তুমি কি আবার শিশু হইয়াছ!"

খুড়াসাহেব নতশিরে চুপ করিয়া রহিলেন।

বিক্রমসিংহ। খুড়াসাহেব, তুমি এই কাজ করিলে! তোমার হাতে আজ বিজয়-গড়ের অপমান হইল।

খুড়াসাহেব চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার হাত থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কম্পিত হস্তে কপাল স্পর্শ করিয়া মনে মনে কহিলেন, 'অদৃষ্ট!'

বিক্রমসিংহ কহিলেন, "আমার দুর্গ হইতে দিল্লীশ্বরের শত্রু পলায়ন করিল! জানো তুমি আমাকে দিল্লীশ্বরের নিকটে অপরাধী করিয়াছ!"

খুড়াসাহেব কহিলেন, "আমিই একা অপরাধী। মহারাজ অপরাধী এ কথা দিল্লীশ্বর বিশ্বাস করিবেন না।"

বিক্রমসিংহ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তুমি কে? তোমার খবর দিল্লীশ্বর কী রাখেন?

তুমি তো আমারই লোক। এ যেন আমি নিজের হাতে বন্দীর বন্ধন মোচন করিয়া দিয়াছি।"

খুড়াসাহেব নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। তিনি চোখের জল আর সামলাইতে পারিলেন না।

বিক্রমসিংহ কহিলেন, "তোমাকে কী দণ্ড দিব ?"

খুড়াসাহেব। মহারাজের যেমন ইচ্ছা।

বিক্রমসিংহ। তুমি বুড়ামানুষ, তোমাকে অধিক আর কী দণ্ড দিব। নির্বাসন দণ্ডই তোমার পক্ষে যথেষ্ট।

খুড়াসাহেব বিক্রমসিংহের পা জড়াইয়া ধরিলেন; কহিলেন, "বিজয়গড় হইতে নির্বাসন! না মহারাজ, আমি বৃদ্ধ, আমার মতিভ্রম হইয়াছিল। আমাকে বিজয়গড়েই মরিতে দিন। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ করিয়া দিন। এই বুড়া বয়সে শেয়াল-কুকুরের মতো আমাকে বিজয়গড় হইতে খেদাইয়া দিবেন না।"

রাজা জয়সিংহ কহিলেন, "মহারাজ, আমার অনুরোধে ইহার অপরাধ মার্জনা করুন। আমি সম্রাটকে সমস্ত অবস্থা অবগত করিব।"

খুড়াসাহেবের মার্জনা হইল। সভা হইতে বাহির হইবার সময় খুড়াসাহেব কাঁপিয়া পড়িয়া গেলেন। সেদিন হইতে খুড়াসাহেবকে আর বড়ো একটা দেখা যাইত না। তিনি ঘর হইতে বাহির হইতেন না। তাঁহার মেরুদণ্ড যেন ভাঙিয়া গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

গুজুরপাড়া ব্রহ্মপুত্রের তীরে ক্ষুদ্র গ্রাম। একজন ক্ষুদ্র জমিদার আছেন, নাম পীতাম্বর রায়; বাসিন্দা অধিক নাই। পীতাম্বর আপনার পুরাতন চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আপনাকে রাজা বলিয়া থাকেন। তাঁহার প্রজারাও তাঁহাকে রাজা বলিয়া থাকে। তাঁহার রাজমহিমা এই আম্রপিয়ালবনবেষ্টিত ক্ষুদ্র গ্রামটুকুর মধ্যেই বিরাজমান। তাঁহার যশ এই গ্রামের নিকুঞ্জগুলির মধ্যে ধ্বনিত হইয়া এই গ্রামের সীমানার মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়। জগতের বড়ো বড়ো রাজাধিরাজের প্রখর প্রতাপ এই ছায়াময় নীড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পায় না। কেবল তীর্থস্নানের উদ্দেশে নদীতীরে ত্রিপুরার রাজাদের এক বৃহৎ প্রাসাদ আছে, কিন্তু অনেক কাল হইতে রাজারা কেহ স্নানে আসেন নাই, সুতরাং ত্রিপুরার রাজার সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা অস্পষ্ট জনশ্রুতি প্রচলিত আছে মাত্র।

একদিন ভাদ্রমাসের দিনে গ্রামে সংবাদ আসিল, ত্রিপুরার এক রাজকুমার নদী-তীরের পুরাতন প্রাসাদে বাস করিতে আসিতেছেন। কিছুদিন পরে বিস্তর পাগড়ি-বাঁধা লোক আসিয়া প্রাসাদে ভারী ধুম লাগাইয়া দিল। তাহার প্রায় এক সপ্তাহ পরে হাতিঘোড়া লোকলস্কর লইয়া স্বয়ং নক্ষত্ররায় গুজুরপাড়া গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমারোহ দেখিয়া গ্রামবাসীদের মুখে যেন রা সরিল না। পীতাম্বরকে এতদিন ভারী রাজা বলিয়া মনে হইত, কিন্তু আজ আর তাহা কাহারও মনে হইল না; নক্ষত্ররায়কে দেখিয়া সকলেই একবাক্যে বলিল, "হাঁ, রাজপুত্র এইরকমই হয় বটে।"

এইরূপে পীতাম্বর তাঁহার পাকা দালান ও চণ্ডীমণ্ডপসুদ্ধ একেবারে লুপ্ত হইয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। নক্ষত্ররায়কে তিনি এমনি রাজা বলিয়া অনুভব করিলেন যে নিজের ক্ষুদ্র রাজমহিমা নক্ষত্ররায়ের চরণে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া তিনি পরম সুখী হইলেন। নক্ষত্ররায় কদাচিৎ হাতি চড়িয়া বাহির হইলে পীতাম্বর আপনার প্রজাদের ডাকিয়া বলিতেন, "রাজা দেখেছিস? ওই দেখ্— রাজা দেখ্।" মাছ তরকারি আহার্যদ্রব্য উপহার লইয়া পীতাম্বর প্রতিদিন নক্ষত্ররায়কে দেখিতে আসিতেন— নক্ষত্ররায়ের তরুণ সুন্দর মুখ দেখিয়া পীতাম্বরের স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। নক্ষত্ররায়ই গ্রামের রাজা হইয়া উঠিলেন। পীতাম্বর প্রজাদের মধ্যে গিয়া ভর্তি হইলেন।

প্রতিদিন তিন বেলা নহবত বাজিতে লাগিল, গ্রামের পথে হাতি-ঘোড়া চলিতে লাগিল, রাজদ্বারে মুক্ত তরবারির বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল, হাট বাজার বসিয়া গেল। পীতাম্বর এবং তাঁহার প্রজারা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। নক্ষত্ররায় এই নির্বাসনের রাজা হইয়া উঠিয়া সমস্ত দুঃখ ভুলিলেন। এখানে রাজত্বের ভার কিছুমাত্র নাই, অথচ রাজত্বের সুখ সম্পূর্ণ আছে। এখানে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বদেশে তাঁহার এত প্রবল প্রতাপ ছিল না। তাহা ছাড়া, এখানে রঘুপতির ছায়া নাই। মনের উল্লাসে নক্ষত্ররায় বিলাসে মগ্ন হইলেন। ঢাকা নগরী হইতে নটনটী আসিল, নৃত্যগীতবাদ্যে নক্ষত্ররায়ের তিলেক অরুচি নাই।

নক্ষত্ররায় ত্রিপুরার রাজ-অনুষ্ঠান সমস্তই অবলম্বন করিলেন। ভৃত্যদের মধ্যে কাহারও নাম রাখিলেন মন্ত্রী, কাহারও নাম রাখিলেন সেনাপতি, পীতাম্বর দেওয়ানজি নামে চলিত হইলেন। রীতিমত রাজ-দরবার বসিত। নক্ষত্ররায় পরম আড়ম্বরে বিচার করিতেন। নকুড় আসিয়া নালিশ করিল, "মথুর আমায় 'কুত্তো' কয়েছে।" তাহার বিধিমত বিচার বসিল। বিবিধ প্রমাণ সংগ্রহের পর মথুর দোষী সাব্যস্ত

হইলে নক্ষত্ররায় পরম গম্ভীরভাবে বিচারাসন হইতে আদেশ করিলেন; নকুড় মথুরকে দুই কানমলা দেয়। এইরূপে সুখে সময় কাটিতে লাগিল। এক-একদিন হাতে নিতান্ত কাজ না থাকিলে সৃষ্টিছাড়া একটা কোনো নূতন আমোদ উদ্ভাবনের জন্য মন্ত্রীকে তলব পড়িত। মন্ত্রী রাজসভাসদ্দিগকে সমবেত করিয়া নিতান্ত উদ্‌বিগ্ন ব্যাকুলভাবে নূতন খেলা বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, গভীর চিন্তা এবং পরামর্শের অবধি থাকিত না। একদিন সৈন্যসামন্ত লইয়া পীতাম্বরের চণ্ডীমণ্ডপ আক্রমণ করা হইয়াছিল, এবং তাঁহার পুকুর হইতে মাছ ও তাঁহার বাগান হইতে ডাব ও পালংশাক লুঠের দ্রব্যের স্বরূপ অত্যন্ত ধুম করিয়া বাদ্য বাজাইয়া প্রাসাদে আনা হইয়াছিল। এইরূপ খেলাতে নক্ষত্ররায়ের প্রতি পীতাম্বরের স্নেহ আরো গাঢ় হইত।

আজ প্রাসাদে বিড়াল-শাবকের বিবাহ। নক্ষত্ররায়ের একটি শিশু বিড়ালী ছিল, তাহার সহিত মণ্ডলদের বিড়ালের বিবাহ হইবে। চুড়োমণি ঘটক ঘটকালির স্বরূপ তিন শত টাকা ও একটা শাল পাইয়াছে। গায়ে-হলুদ প্রভৃতি সমস্ত উপক্রমণিকা হইয়া গিয়াছে। আজ শুভলগ্নে সন্ধ্যার সময়ে বিবাহ হইবে। এ কয় দিন রাজবাটীতে কাহারও তিলার্ধ অবসর নাই।

সন্ধ্যার সময় পথঘাট আলোকিত হইল, নহবত বসিল। মণ্ডলদের বাড়ি হইতে চতুর্দোলায় চড়িয়া কিংখাবের বেশ পরিয়া পাত্র অতি কাতর স্বরে মিউ মিউ করিতে করিতে যাত্রা করিয়াছে। মণ্ডলদের বাড়ির ছোটো ছেলেটি মিত-বরের মতো তাহার গলার দড়িটি ধরিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। উলু-শঙ্খধ্বনির মধ্যে পাত্র সভাস্থ হইল।

পুরোহিতের নাম কেনারাম, কিন্তু নক্ষত্ররায় তাহার নাম রাখিয়াছিলেন রঘুপতি। নক্ষত্ররায় আসল রঘুপতিকে ভয় করিতেন, এইজন্য নকল রঘুপতিকে লইয়া খেলা করিয়া সুখী হইতেন। এমন-কি, কথায় কথায় তাহাকে উৎপীড়ন করিতেন; গরিব কেনারাম সমস্ত নীরবে সহ্য করিত। আজ দৈবদুর্বিপাকে কেনারাম সভায় অনুপস্থিত— তাহার ছেলেটি জ্বরবিকারে মরিতেছে!

নক্ষত্ররায় অধীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রঘুপতি কোথায়?"

ভৃত্য বলিল, "তাঁহার বাড়িতে ব্যামো।"

নক্ষত্ররায় দ্বিগুণ হাঁকিয়া বলিলেন, "বোলাও উস্‌কো।"

লোক ছুটিল। ততক্ষণ রোরুদ্যমান বিড়ালের সমক্ষে নাচগান চলিতে লাগিল।

নক্ষত্ররায় বলিলেন, "সাহানা গাও।" সাহানা গান আরম্ভ হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভৃত্য আসিয়া নিবেদন করিল, "রঘুপতি আসিয়াছেন।"

নক্ষত্ররায় সরোষে বলিলেন, "বোলাও।"

তৎক্ষণাৎ পুরোহিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। পুরোহিতকে দেখিয়াই নক্ষত্ররায়ের ভ্রূকুটি কোথায় মিলাইয়া গেল, তাঁহার সম্পূর্ণ ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, কপালে ঘর্ম দেখা দিল। সাহানা-গান সারঙ্গ ও মৃদঙ্গ সহসা বন্ধ হইল; কেবল বিড়ালের মিউ মিউ ধ্বনি নিস্তব্ধ ঘরে দ্বিগুণ জাগিয়া উঠিল!

এ রঘুপতিই বটে। তাহার আর সন্দেহ নাই। দীর্ঘ, শীর্ণ, তেজস্বী, বহুদিনের ক্ষুধিত কুকুরের মতো চক্ষু দুটো জ্বলিতেছে। ধুলায় পরিপূর্ণ দুই পা তিনি কিংখাব মছলন্দের উপর স্থাপন করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "নক্ষত্ররায়!"

নক্ষত্ররায় চুপ করিয়া রহিলেন।

রঘুপতি বলিলেন, "তুমি রঘুপতিকে ডাকিয়াছ। আমি আসিয়াছি।"

নক্ষত্ররায় অস্পষ্টস্বরে কহিলেন, "ঠাকুর— ঠাকুর!"

রঘুপতি কহিলেন, "উঠিয়া এসো।"

নক্ষত্ররায় ধীরে ধীরে সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। বিড়ালের বিয়ে, সাহানা এবং সারঙ্গ, একেবারে বন্ধ হইল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

রঘুপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ-সব কী হইতেছিল?"

নক্ষত্ররায় মাথা চুলকাইয়া কহিলেন, "নাচ হইতেছিল।"

রঘুপতি ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া কহিলেন, "ছী ছি!"

নক্ষত্র অপরাধীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "কাল এখান হইতে যাত্রা করিতে হইবে। তাহার উদ্‌যোগ করো।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "কোথায় যাইতে হইবে?"

রঘুপতি। সে কথা পরে হইবে। আপাতত আমার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়ো।

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "আমি এখানে বেশ আছি।"

রঘুপতি। বেশ আছি! তুমি রাজবংশে জন্মিয়াছ, তোমার পূর্বপুরুষেরা সকলে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন। তুমি কিনা আজ এই বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা হইয়া বসিয়াছ আর বলিতেছ 'বেশ আছি'!

রঘুপতি তীব্র বাক্যে ও তীক্ষ্ণ কটাক্ষে প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, নক্ষত্ররায় ভালো নাই। নক্ষত্ররায়ও রঘুপতির মুখের তেজে কতকটা সেইরকমই বুঝিলেন। তিনি বলিলেন, "বেশ আর কী এমনি আছি! কিন্তু আর কী করিব ? উপায় কী আছে ?"

রঘুপতি। উপায় ঢের আছে— উপায়ের অভাব নাই। আমি তোমাকে উপায় দেখাইয়া দিব, তুমি আমার সঙ্গে চলো।

নক্ষত্ররায়। একবার দেওয়ানজিকে জিজ্ঞাসা করি।

রঘুপতি। না।

নক্ষত্ররায়। আমার এই-সব জিনিসপত্র—

রঘুপতি। কিছু আবশ্যক নাই।

নক্ষত্ররায়। লোকজন—

রঘুপতি। দরকার নাই।

নক্ষত্ররায়। আমার হাতে এখন যথেষ্ট নগদ টাকা নাই।

রঘুপতি। আমার আছে। আর অধিক ওজর আপত্তি করিয়ো না। আজ শয়ন করিতে যাও, কাল প্রাতঃকালেই যাত্রা করিতে হইবে।

বলিয়া রঘুপতি কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন।

তাহার পরদিন ভোরে নক্ষত্ররায় উঠিয়াছেন। তখন বন্দীরা ললিত রাগিণীতে মধুর গান গাহিতেছে। নক্ষত্ররায় বহির্ভবনে আসিয়া জানলা হইতে বাহিরে চাহিয়া দেখিলেন। পূর্বতীরে সূর্যোদয় হইতেছে, অরুণরেখা দেখা দিয়াছে। উভয় তীরের ঘন তরুস্রোতের মধ্য দিয়া, ছোটো ছোটো নিদ্রিত গ্রামগুলির দ্বারের কাছ দিয়া ব্রহ্মপুত্র তাহার বিপুল জলরাশি লইয়া অবাধে বহিয়া যাইতেছে। প্রাসাদের জানলা হইতে নদীতীরের একটি ছোটো কুটির দেখা যাইতেছে। একটি মেয়ে প্রাঙ্গণ ঝাঁট দিতেছে— একজন পুরুষ তাহার সঙ্গে দুই-একটা কথা কহিয়া মাথায় চাদর বাঁধিয়া, একটা বড়ো বাঁশের লাঠির অগ্রভাগে পুঁটুলি বাঁধিয়া, নিশ্চিন্তমনে কোথায় বাহির হইল। শ্যামা ও দোয়েল শিস দিতেছে, বেনে-বউ বড়ো কাঁঠাল গাছের ঘন পল্লবের মধ্যে বসিয়া গান গাহিতেছে। বাতায়নে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া নক্ষত্ররায়ের হৃদয় হইতে এক গভীর দীর্ঘনিশ্বাস উঠিল, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে রঘুপতি আসিয়া নক্ষত্ররায়কে স্পর্শ করিলেন। নক্ষত্ররায় চমকিয়া উঠিলেন। রঘুপতি মৃদুগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "যাত্রার সমস্ত প্রস্তুত।"

নক্ষত্ররায় জোড়হাতে অত্যন্ত কাতর স্বরে কহিলেন, "ঠাকুর, আমাকে মাপ করো ঠাকুর— আমি কোথাও যাইতে চাহি না। আমি এখানে বেশ আছি।"

রঘুপতি একটি কথা না বলিয়া নক্ষত্ররায়ের মুখের দিকে তাঁহার অগ্নিদৃষ্টি স্থির রাখিলেন। নক্ষত্ররায় চোখ নামাইয়া কহিলেন, "কোথায় যাইতে হইবে?"

রঘুপতি। সে কথা এখন হইতে পারে না।

নক্ষত্র। দাদার বিরুদ্ধে আমি কোনো চক্রান্ত করিতে পারিব না।

রঘুপতি জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন, "দাদা তোমার কী মহৎ উপকারটা করিয়াছেন শুনি।"

নক্ষত্র মুখ ফিরাইয়া জানালার উপর আঁচড় কাটিয়া বলিলেন, "আমি জানি, তিনি আমাকে ভালোবাসেন।"

রঘুপতি তীব্র শুষ্ক হাস্যের সহিত কহিলেন, "হরি হরি, কী প্রেম! তাই বুঝি নির্বিঘ্নে ধ্রুবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য মিছা ছুতা করিয়া দাদা তোমাকে রাজ্য হইতে তাড়াইলেন— পাছে রাজ্যের গুরুভারে ননির পুতলি স্নেহের ভাই কখনো ব্যথিত হইয়া পড়ে। সে রাজ্যে আর কি কখনো সহজে প্রবেশ করিতে পারিবে নির্বোধ!"

নক্ষত্ররায় তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আমি কি এই সামান্য কথাটা আর বুঝি না! আমি সমস্তই বুঝি— কিন্তু আমি কী করিব বলো ঠাকুর, উপায় কী?"

রঘুপতি। সেই উপায়ের কথাই তো হইতেছে। সেইজন্যই তো আসিয়াছি। ইচ্ছা হয় তো আমার সঙ্গে চলিয়া আইস, নয় তো এই বাঁশবনের মধ্যে বসিয়া বসিয়া তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী দাদার ধ্যান করো। আমি চলিলাম।"

বলিয়া রঘুপতি প্রস্থানের উদ্‌যোগ করিলেন। নক্ষত্ররায় তাড়াতাড়ি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া কহিলেন, "আমিও যাইব ঠাকুর, কিন্তু দেওয়ানজি যদি যাইতে চান তাঁহাকে আমাদের সঙ্গে লইয়া যাইতে কি আপত্তি আছে?"

রঘুপতি কহিলেন, "আমি ছাড়া আর কেহ সঙ্গে যাইবে না।"

বাড়ি ছাড়িয়া নক্ষত্ররায়ের পা সরিতে চায় না। এই-সমস্ত সুখের খেলা ছাড়িয়া, দেওয়ানজিকে ছাড়িয়া, রঘুপতির সঙ্গে একলা কোথায় যাইতে হইবে! কিন্তু রঘুপতি যেন তাঁহার কেশ ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। তাহা ছাড়া নক্ষত্ররায়ের মনে এক-প্রকার ভয়মিশ্রিত কৌতূহলও জন্মিতে লাগিল। তাহারও একটা ভীষণ আকর্ষণ আছে।

নৌকা প্রস্তুত আছে। নদীতীরে উপস্থিত হইয়া নক্ষত্ররায় দেখিলেন, কাঁধে গামছা ফেলিয়া পীতাম্বর স্নান করিতে আসিয়াছেন। নক্ষত্রকে দেখিয়াই পীতাম্বর হাস্যবিকশিত মুখে কহিলেন, "জয়োস্তু মহারাজ! শুনিলাম নাকি কাল কোথা হইতে এক অলক্ষণমন্ত বিটল ব্রাহ্মণ আসিয়া শুভবিবাহের ব্যাঘাত করিয়াছে।"

নক্ষত্ররায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। রঘুপতি গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "আমিই সেই বিটল ব্রাহ্মণ।"

পীতাম্বর হাসিয়া উঠিলেন ; কহিলেন, "তবে তো আপনার সাক্ষাতে আপনার বর্ণনা করাটা ভালো হয় নাই। জানিলে কোন্ পিতার পুত্র এমন কাজ করিত! কিছু মনে করিবেন না ঠাকুর, অসাক্ষাতে লোকে কী না বলে! আমাকে যাহারা সম্মুখে বলে রাজা, তাহারা আড়ালে বলে পিতু। মুখের সামনে কিছু না বলিলেই হইল, আমি তো এই বুঝি। আসল কথা কী জানেন, আপনার মুখটা কেমন ভারী অপ্রসন্ন দেখাইতেছে, কাহারও এমন মুখের ভাব দেখিলে লোকে তাহার নামে নিন্দা রটায়। মহারাজ, এত প্রাতে যে নদীতীরে ?"

নক্ষত্ররায় কিছু করুণ স্বরে কহিলেন, "আমি যে চলিলাম দেওয়ানজি !"

পীতাম্বর। চলিলেন ? কোথায় ? ন-পাড়ায়, মণ্ডলদের বাড়ি ?

নক্ষত্র। না দেওয়ানজি, মণ্ডলদের বাড়ি নয়। অনেক দূর।

পীতাম্বর। অনেক দূর ? তবে কি পাইকঘাটায় শিকারে যাইতেছেন ?

নক্ষত্ররায় একবার রঘুপতির মুখের দিকে চাহিয়া কেবল বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়িলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "বেলা বহিয়া যায়, নৌকায় উঠা হউক।"

পীতাম্বর অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ও ক্রুদ্ধ ভাবে ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিলেন ; কহিলেন, "তুমি কে হে ঠাকুর ? আমাদের মহারাজকে হুকুম করিতে আসিয়াছ !"

নক্ষত্র ব্যস্ত হইয়া পীতাম্বরকে এক পাশে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "উনি আমাদের গুরুঠাকুর।"

পীতাম্বর বলিয়া উঠিলেন, "হোক-না গুরুঠাকুর। উনি আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে থাকুন, চাল-কলা বরাদ্দ করিয়া দিব, সমাদরে থাকিবেন— মহারাজকে উঁহার কিসের আবশ্যক ?"

রঘুপতি। বৃথা সময় নষ্ট হইতেছে— আমি তবে চলিলাম।

পীতাম্বর। যে আজ্ঞে, বিলম্বে ফল কী, মশায় চট্‌পট্ সরিয়া পড়ুন। মহারাজকে লইয়া আমি প্রাসাদে যাইতেছি।

নক্ষত্ররায় একবার রঘুপতির মুখের দিকে চাহিয়া একবার পীতাম্বরের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "না দেওয়ানজি, আমি যাই।"

পীতাম্বর। তবে আমিও যাই, লোকজন সঙ্গে লউন। রাজার মতো চলুন। রাজা যাইবেন, সঙ্গে দেওয়ানজি যাইবে না ?

*

নক্ষত্ররায় কেবল রঘুপতির মুখের দিকে চাহিলেন। রঘুপতি কহিলেন, "কেহ সঙ্গে যাইবে না।"

পীতাম্বর উগ্র হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "দেখো ঠাকুর, তুমি—"

নক্ষত্ররায় তাঁহাকে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, "দেওয়ানজি, আমি যাই, দেরি হইতেছে।"

পীতাম্বর ম্লান হইয়া নক্ষত্রের হাত ধরিয়া কহিলেন, "দেখো বাবা, আমি তোমাকে রাজা বলি, কিন্তু আমি তোমাকে সন্তানের মতো ভালোবাসি— আমার সন্তান কেহ নাই। তোমার উপর আমার জোর খাটে না। তুমি চলিয়া যাইতেছ, আমি জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারি না। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ এই আছে, যেখানেই যাও আমি মরিবার আগে ফিরিয়া আসিতে হইবে। আমি স্বহস্তে আমার রাজত্ব সমস্ত তোমার হাতে দিয়া যাইব। আমার এই একটি সাধ আছে।"

নক্ষত্ররায় ও রঘুপতি নৌকায় উঠিলেন। নৌকা দক্ষিণমুখে চলিয়া গেল। পীতাম্বর স্নান ভুলিয়া গামছা-কাঁধে অন্যমনস্কে বাড়ি ফিরিয়া গেলেন! গুজুরপাড়া যেন শূন্য হইয়া গেল— তাহার আমোদ-উৎসব সমস্ত অবসান। কেবল প্রতিদিন প্রকৃতির নিত্য উৎসব, প্রাতে পাখির গান, পল্লবের মর্মরধ্বনি ও নদীতরঙ্গের করতালির বিরাম নাই।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

দীর্ঘ পথ। কোথাও বা নদী, কোথাও বা ঘন অরণ্য, কোথাও বা ছায়াহীন প্রান্তর — কখনো বা নৌকায়, কখনো বা পদব্রজে, কখনো বা টাট্টু ঘোড়ায়— কখনো রৌদ্র, কখনো বৃষ্টি, কখনো কোলাহলময় দিন, কখনো নিশীথিনীর নিস্তব্ধ অন্ধকার— নক্ষত্র-রায় অবিশ্রাম চলিয়াছেন। কত দেশ, কত বিচিত্র দৃশ্য, কত বিচিত্র লোক— কিন্তু নক্ষত্ররায়ের পার্শ্বে ছায়ার ন্যায় ক্ষীণ, রৌদ্রের ন্যায় দীপ্ত সেই একমাত্র রঘুপতি অবিশ্রাম লাগিয়া আছেন। দিনে রঘুপতি, রাত্রে রঘুপতি, স্বপ্নেও রঘুপতি বিরাজ করেন। পথে পথিকেরা যাতায়াত করিতেছে, পথপার্শ্বে ধুলায় ছেলেরা খেলা করিতেছে, হাটে শত শত লোক কেনাবেচা করিতেছে, গ্রামে বৃদ্ধেরা পাশা খেলিতেছে, ঘাটে মেয়েরা জল তুলিতেছে, নৌকায় মাঝিরা গান গাহিয়া চলিয়াছে— কিন্তু নক্ষত্ররায়ের পার্শ্বে এক শীর্ণ রঘুপতি সর্বদা জাগিয়া আছে। জগতে চারি দিকে বিচিত্র খেলা হইতেছে, বিচিত্র ঘটনা ঘটিতেছে— কিন্তু এই রঙ্গভূমির বিচিত্র লীলার

মাঝখান দিয়া নক্ষত্ররায়ের দুরদৃষ্ট তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে— সজন তাঁহার পক্ষে বিজন, লোকালয় কেবল শূন্য মরুভূমি।

নক্ষত্ররায় শ্রান্ত হইয়া তাঁহার পার্শ্ববর্তী ছায়াকে জিজ্ঞাসা করেন, "আর কত দূর যাইতে হইবে ?"

ছায়া উত্তর করে, "অনেক দূর।"

"কোথায় যাইতে হইবে ?"

তাহার উত্তর নাই। নক্ষত্ররায় নিশ্বাস ফেলিয়া চলিতে থাকেন। তরুশ্রেণীর মধ্যে পাতা-দিয়া-ছাওয়া নিভৃত পরিচ্ছন্ন কুটির দেখিলে তাঁহার মনে হয়, 'আমি যদি এই কুটিরের অধিবাসী হইতাম !' গোধূলির সময় যখন রাখাল লাঠি কাঁধে করিয়া মাঠ দিয়া গ্রামপথ দিয়া ধুলা উড়াইয়া গোরু-বাছুর লইয়া চলে, নক্ষত্ররায়ের মনে হয়, 'আমি যদি ইহার সঙ্গে যাইতে পাইতাম, সন্ধ্যাবেলায় গৃহে গিয়া বিশ্রাম করিতে পাইতাম !' মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড রৌদ্রে চাষা চাষ করিতেছে, তাহাকে দেখিয়া নক্ষত্ররায় মনে করেন, 'আহা, এ কী সুখী !'

পথকষ্টে নক্ষত্ররায় বিবর্ণ শীর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছেন ; রঘুপতিকে বলেন, "ঠাকুর, আমি আর বাঁচিব না।"

রঘুপতি বলেন, "এখন তোমাকে মরিতে দিবে কে !"

নক্ষত্ররায়ের মনে হইল, রঘুপতি অবকাশ না দিলে তাঁহার মরিবারও সুযোগ নাই। একজন স্ত্রীলোক নক্ষত্ররায়কে দেখিয়া বলিয়াছিল, 'আহা, কাদের ছেলে গো ! একে পথে কে বাহির করিয়াছে !' শুনিয়া নক্ষত্ররায়ের প্রাণ গলিয়া গেল, তাঁহার চোখে জল আসিল, তাঁহার ইচ্ছা করিল সেই স্ত্রীলোকটিকে মা বলিয়া তাহার সঙ্গে তাহার ঘরে চলিয়া যান।

কিন্তু নক্ষত্ররায় রঘুপতির হাতে যতই কষ্ট পাইতে লাগিলেন রঘুপতির ততই বশ হইতে লাগিলেন, রঘুপতির অঙ্গুলির ইঙ্গিতে তাঁহার সমস্ত অস্তিত্ব পরিচালিত হইতে লাগিল।

চলিতে চলিতে ক্রমে নদীর বাহুল্য কমিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে ভূমি দৃঢ় হইয়া আসিল ; মৃত্তিকা লোহিত বর্ণ, কঙ্করময়, লোকালয় দূরে দূরে স্থাপিত, গাছপালা বিরল ; নারিকেল-বনের দেশ ছাড়িয়া দুই পথিক তাল-বনের দেশে আসিয়া পড়িলেন। মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো বাঁধ, শুষ্ক নদীর পথ, দূরে মেঘের মতো পাহাড় দেখা যাইতেছে। ক্রমে শাসুজার রাজধানী রাজমহল নিকটবর্তী হইতে লাগিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

অবশেষে রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরাজয় ও পলায়নের পরে সুজা নূতন সৈন্য-সংগ্রহের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু রাজকোষে অধিক অর্থ নাই। প্রজাগণ করভারে পীড়িত। ইতিমধ্যে দারাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া ঔরংজেব দিল্লির সিংহাসনে বসিয়াছেন। সুজা এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। কিন্তু সৈন্যসামন্ত কিছুই প্রস্তুত ছিল না, এই জন্য কিছু সময় হাতে পাইবার আশায় তিনি ছল করিয়া ঔরংজেবের নিকট এক দূত পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া পাঠাইলেন যে, নয়নের-জ্যোতি হৃদয়ের-আনন্দ পরমস্নেহাস্পদ প্রিয়তম ভ্রাতা ঔরংজেব সিংহাসন-লাভে কৃতকার্য হইয়াছেন ইহাতে সুজা মৃতদেহে প্রাণ পাইলেন— এক্ষণে সুজার বাংলা-শাসন-ভার নূতন সম্রাট মঞ্জুর করিলেই আনন্দের আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। ঔরংজেব অত্যন্ত সমাদরের সহিত দূতকে আহ্বান করিলেন। সুজার শরীর-মনের স্বাস্থ্য এবং সুজার পরিবারের মঙ্গল-সংবাদ জানিবার জন্য সবিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, 'যখন স্বয়ং সম্রাট শাজাহান সুজাকে বাংলার শাসনকার্যে নিয়োগ করিয়াছেন, তখন আর দ্বিতীয় মঞ্জুরি-পত্রের কোনো আবশ্যক নাই।' এই সময় রঘুপতি সুজার সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুজা কৃতজ্ঞতা ও সমাদরের সহিত তাঁহার উদ্ধারকর্তাকে আহ্বান করিলেন। বলিলেন, "খবর কী ?"

রঘুপতি বলিলেন, "বাদশাহের কাছে কিছু নিবেদন আছে।"

সুজা মনে মনে ভাবিলেন, 'নিবেদন আবার কিসের ? কিছু অর্থ চাহিয়া না বসিলে বাঁচি।'

রঘুপতি কহিলেন, "আমার প্রার্থনা এই যে—"

সুজা কহিলেন, "ব্রাহ্মণ, তোমার প্রার্থনা আমি নিশ্চয় পূরণ করিব। কিন্তু কিছু দিন সবুর করো। এখন রাজকোষে অধিক অর্থ নাই।"

রঘুপতি কহিলেন, "শাহেন শা, রুপা সোনা বা আর কোনো ধাতু চাহি না, আমি এখন শাণিত ইস্পাত চাই। আমার নালিশ শুনুন, আমি বিচার প্রার্থনা করি।"

সুজা কহিলেন, "ভারী মুশকিল! এখন আমার বিচার করিবার সময় নহে। ব্রাহ্মণ, তুমি বড়ো অসময়ে আসিয়াছ।"

রঘুপতি কহিলেন, "শাহজাদা, সময় অসময় সকলেরই আছে। আপনি বাদশাহ, আপনারও আছে; এবং আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমারও আছে। আপনার সময়মত

আপনি বিচার করিতে বসিলে আমার সময় থাকে কোথা ?"

সুজা হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "ভারী হাঙ্গাম! এত কথা শোনার চেয়ে তোমার নালিশ শোনা ভালো। বলিয়া যাও।"

রঘুপতি কহিলেন, "ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নক্ষত্র-রায়কে বিনা অপরাধে নির্বাসিত করিয়াছেন—"

সুজা বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "ব্রাহ্মণ, তুমি পরের নালিশ লইয়া কেন আমার সময় নষ্ট করিতেছ। এখন এ-সমস্ত বিচার করিবার সময় নয়।"

রঘুপতি কহিলেন, "ফরিয়াদী রাজধানীতে হাজির আছেন।"

সুজা কহিলেন, "তিনি আপনি উপস্থিত থাকিয়া আপনার মুখে যখন নালিশ উত্থাপন করিবেন তখন বিবেচনা করা যাইবে।"

রঘুপতি কহিলেন, "তাঁহাকে কবে এখানে হাজির করিব ?"

সুজা কহিলেন, "ব্রাহ্মণ কিছুতেই ছাড়ে না। আচ্ছা এক সপ্তাহ পরে আনিয়ো।"

রঘুপতি কহিলেন, "বাদশাহ যদি হুকুম করেন তো আমি তাঁহাকে কাল আনিব।"

সুজা বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা, কালই আনিয়ো।"

আজিকার মতো নিষ্কৃতি পাইলেন। রঘুপতি বিদায় হইলেন।

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "নবাবের কাছে যাইব, কিন্তু নজরের জন্য কী লইব ?"

রঘুপতি কহিলেন, "সেজন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না।"

নজরের জন্য তিনি দেড়লক্ষ মুদ্রা উপস্থিত করিলেন।

পরদিন প্রভাতে রঘুপতি কম্পিতহৃদয় নক্ষত্ররায়কে লইয়া সুজার সভায় উপস্থিত হইলেন। যখন দেড় লক্ষ টাকা নবাবের পদতলে স্থাপিত হইল তখন তাঁহার মুখশ্রী তেমন অপ্রসন্ন বোধ হইল না। নক্ষত্ররায়ের নালিশ অতি সহজেই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। তিনি কহিলেন, "এক্ষণে তোমাদের কী অভিপ্রায় আমাকে বলো।"

রঘুপতি কহিলেন, "গোবিন্দমাণিক্যকে নির্বাসিত করিয়া তাঁহার স্থলে নক্ষত্র-রায়কে রাজা করিয়া দিতে আজ্ঞা হউক।"

যদিও সুজা নিজে ভ্রাতার সিংহাসনে হস্তক্ষেপ করিতে কিছুমাত্র সংকুচিত হন না, তথাপি এ স্থলে তাঁহার মনে কেমন আপত্তি উপস্থিত হইল। কিন্তু রঘুপতির প্রার্থনা পূরণ করাই তাঁহার আপাতত সকলের চেয়ে সহজ বোধ হইল— নহিলে রঘুপতি বিস্তর বকাবকি করিবে এই তাঁহার ভয়। বিশেষত দেড় লক্ষ টাকা নজরের উপরেও অধিক আপত্তি করা ভালো দেখায় না এইরূপ তাঁহার মনে হইল। তিনি বলিলেন,

"আচ্ছা, গোবিন্দমাণিক্যের নির্বাসন এবং নক্ষত্ররায়ের রাজ্যপ্রাপ্তির পরোয়ানা-পত্র তোমাদের সঙ্গে দিব, তোমরা লইয়া যাও।"

রঘুপতি কহিলেন, "বাদশাহের কতিপয় সৈন্যও সঙ্গে দিতে হইবে।"

সুজা দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "না, না, না— তাহা হইবে না, যুদ্ধবিগ্রহ করিতে পারিব না।"

রঘুপতি কহিলেন, "যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ আরও ছত্রিশ হাজার টাকা আমি রাখিয়া যাইতেছি। এবং ত্রিপুরায় নক্ষত্ররায় রাজা হইবামাত্র এক বৎসরের খাজনা সেনা-পতির হাত দিয়া পাঠাইয়া দিব।"

এ প্রস্তাব সুজার অতিশয় যুক্তিসংগত বোধ হইল, এবং অমাত্যেরাও তাঁহার সহিত একমত হইল। একদল মোগল-সৈন্য সঙ্গে লইয়া রঘুপতি ও নক্ষত্ররায় ত্রিপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এই উপন্যাসের আরম্ভকাল হইতে এখন দুই বৎসর হইয়া গিয়াছে। ধ্রুব তখন দুই বৎসরের বালক ছিল। এখন তাহার বয়স চার বৎসর। এখন সে বিস্তর কথা শিখিয়াছে। এখন তিনি আপনাকে ভারী মস্ত লোক জ্ঞান করেন; সকল কথা যদিও স্পষ্ট বলিতে পারেন না, কিন্তু অত্যন্ত জোরের সহিত বলিয়া থাকেন। রাজাকে প্রায় তিনি 'পুতুল দেব' বলিয়া পরম প্রলোভন ও সান্ত্বনা দিয়া থাকেন, এবং রাজা যদি কোনোপ্রকার দুষ্টুমির লক্ষণ প্রকাশ করেন তবে ধ্রুব তাঁকে 'ঘরে বন্দ করে রাখব' বলিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত করিয়া তুলেন। এইরূপে রাজা এখন বিশেষ শাসনে আছেন— ধ্রুবের অনভিমত কোনো কাজ করিতে তিনি বড়ো একটা ভরসা করেন না।

ইতিমধ্যে হঠাৎ ধ্রুবের একটি সঙ্গী জুটিয়া গেল। একটি প্রতিবেশীর মেয়ে, ধ্রুব অপেক্ষা ছয় মাসের ছোটো। মিনিট দশেকের ভিতরে উভয়ের মধ্যে চিরস্থায়ী ভাব হইয়া গেল। মাঝে একটুখানি মনান্তর হইবারও সম্ভাবনা হইয়াছিল। ধ্রুবের হাতে একটা বড়ো বাতাসা ছিল। প্রথম-প্রণয়ের উচ্ছ্বাসে ধ্রুব তাহার ছোটো দুইটি আঙুল দিয়া অতি সাবধানে ক্ষুদ্র একটু কণা ভাঙিয়া একেবারে তাহার সঙ্গিনীর মুখে পুরিয়া দিল ও পরম অনুগ্রহের সহিত ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "তুমি কাও।"

সঙ্গিনী মিষ্ট পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়া কহিল, "আরও কাব।"

তখন ধ্রুব কিছু কাতর হইয়া পড়িল। বন্ধুত্বের উপরে এত অধিক দাবি ন্যায়সংগত

বোধ হইল না ; ধ্রুব তাহার স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য ও গৌরবের সহিত ঘাড় নাড়িয়া, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "ছি— আর কেতে নেই, অছুখ কোবে, বাবা মা'বে।"

বলিয়াই অধিক বিলম্ব না করিয়া সমস্ত বাতাসাটা নিজের মুখের মধ্যে একেবারে পুরিয়া দিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। সহসা বালিকার মুখের মাংসপেশীর মধ্যে পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল— ওষ্ঠাধর ফুলিতে লাগিল, ভ্রূযুগ উপরে উঠিতে লাগিল— আসন্ন ক্রন্দনের সমস্ত লক্ষণ ব্যক্ত হইল।

ধ্রুব কাহারও ক্রন্দন সহিতে পারিত না ; তাড়াতাড়ি সুগভীর সান্ত্বনার স্বরে কহিল, "কাল দেব।"

রাজা আসিবামাত্র ধ্রুব অত্যন্ত বিজ্ঞ হইয়া নূতন সঙ্গিনীর প্রতি নির্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "একে কিছু বোলো না, এ কাঁদবে! ছি, মারতে নেই, ছি!"

রাজার কোনোপ্রকার দুরভিসন্ধি ছিল না সত্য, তথাপি গায়ে পড়িয়া রাজাকে সাবধান করিয়া দেওয়া ধ্রুব অত্যন্ত আবশ্যক বিবেচনা করিল। রাজা মেয়েটিকে মারিলেন না, ধ্রুব স্পষ্টই দেখিল তাহার উপদেশ নিষ্ফল নহে।

তার পরে ধ্রুব মুরুব্বির ভাব ধারণ করিয়া কোনোপ্রকার বিপদের আশঙ্কা নাই জানাইয়া মেয়েটিকে পরম গাম্ভীর্যের সহিত আশ্বাস দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

তাহারও কিছুমাত্র আবশ্যক ছিল না। কারণ, মেয়েটি আপনা হইতে নির্ভীক ভাবে রাজার কাছে গিয়া অত্যন্ত কৌতূহল ও লোভের সহিত তাঁহার হাতের কঙ্কণ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

এইরূপে ধ্রুব কেবলমাত্র নিজের যত্নে ও পরিশ্রমে পৃথিবীতে শান্তি ও প্রেম স্থাপন করিয়া প্রসন্নচিত্তে রাজার মুখের কাছে আপনার বেলফুলের মতো মোটা গোল কোমল পবিত্র মুখখানি বাড়াইয়া দিল— রাজার সদ্‌ব্যবহারের পুরস্কার— রাজা চুম্বন করিলেন।

তখন ধ্রুব তাহার সঙ্গিনীর মুখ তুলিয়া ধরিয়া রাজাকে অনুমতি ও অনুরোধের মাঝামাঝি স্বরে কহিল, "একে চুমো কাও।"

রাজা ধ্রুবের আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহস করিলেন না। মেয়েটি তখন নিমন্ত্রণের কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া নিতান্ত অভ্যস্ত ভাবে অম্লানবদনে রাজার কোলের উপরে চড়িয়া বসিল।

এতক্ষণ জগতে কোনোপ্রকার অশান্তি বা উচ্ছৃঙ্খলতার লক্ষণ ছিল না, কিন্তু এইবার ধ্রুবের সিংহাসনে টান পড়িতেই তাহার সার্বভৌমিক প্রেম টলমল করিয়া উঠিল। রাজার কোলের 'পরে তাহার নিজের একমাত্র স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা

বলবতী হইয়া উঠিল। মুখ অত্যন্ত ভার হইল, মেয়েটিকে দুই-একবার টানিল, এমন কি নিজের পক্ষে অবস্থাবিশেষে ছোটো মেয়েকে মারাও ততটা অন্যায় বোধ হইল না।

রাজা তখন মিট্‌মাট করিবার উদ্দেশে ধ্রুবকেও তাঁহার আধখানা কোলে টানিয়া লইলেন। কিন্তু তাহাতেও ধ্রুবের আপত্তি দূর হইল না। অপরার্ধ অধিকার করিবার জন্য নূতন আক্রমণের উদ্‌যোগ করিতে লাগিল। এমন সময়ে নূতন রাজপুরোহিত বিল্বন ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন।

রাজা উভয়কেই কোল হইতে নামাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ধ্রুবকে বলিলেন, "ঠাকুরকে প্রণাম করো।"

ধ্রুব তাহা আবশ্যক বোধ করিল না; মুখে আঙুল পুরিয়া বিদ্রোহীভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। মেয়েটি আপনা হইতেই রাজার দেখাদেখি পুরোহিতকে প্রণাম করিল।

বিল্বন ঠাকুর ধ্রুবকে কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এ সঙ্গী জুটিল কোথা হইতে?"

ধ্রুব খানিকক্ষণ ভাবিয়া কহিল, "আমি টক্‌টক্ চ'ব।" টক্‌টক্ অর্থে ঘোড়া।

পুরোহিত কহিলেন, "বাহবা, প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে কী সামঞ্জস্য!"

সহসা মেয়েটির দিকে ধ্রুবের চক্ষু পড়িল, তাহার সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে আপনার মত ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিল, "ও দুষ্টু, ওকে মা'ব।"

বলিয়া আকাশে আপনার ক্ষুদ্র মুষ্টি নিক্ষেপ করিল।

রাজা গম্ভীরভাবে কহিলেন, "ছি ধ্রুব!"

একটি ফুঁয়ে যেমন প্রদীপ নিবিয়া যায় তেমনি তৎক্ষণাৎ ধ্রুবের মুখ ম্লান হইয়া গেল। প্রথমে সে অশ্রুনিবারণের জন্য দুই মুষ্টি দিয়া দুই চক্ষু রগড়াইতে লাগিল; অবশেষে দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র স্ফীত হৃদয় আর ধারণ করিতে পারিল না, কাঁদিয়া উঠিল।

বিল্বন ঠাকুর তাহাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া, কোলে লইয়া, আকাশে তুলিয়া, ভূমিতে নামাইয়া, অস্থির করিয়া তুলিলেন; উচ্চৈঃস্বরে ও দ্রুত উচ্চারণে বলিলেন, "শোনো শোনো ধ্রুব, শোনো, তোমাকে শ্লোক বলি শোনো—

কলহ কটকটাং কাঠ কাঠিন্য কাঠ্যং
কটন কিটন কীটং কুট্টলং খট্টমট্টং।

অর্থাৎ কিনা, যে ছেলে কাঁদে তাকে কলহ কট্‌কটাঙের মধ্যে পুরে খুব করে কাঠ কাঠিন্য কাঠ্যং দিতে হয়, তার পরে এতগুলো কটন কিটন কীটং নিয়ে একেবারে তিন দিন ধরে কুট্টলং খট্টমট্টং।"

পুরোহিত ঠাকুর এইরূপ অনর্গল বকিয়া গেলেন। ধ্রুবের ক্রন্দন অসম্পূর্ণ

অবস্থাতেই একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল। সে প্রথমে গোলমালে বিব্রত ও অবাক হইয়া বিল্বন ঠাকুরের মুখের দিকে সজল চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া রহিল। তার পরে তাঁর হাতমুখ নাড়া দেখিয়া তাহার অত্যন্ত কৌতুক বোধ হইল।

সে ভারী খুশি হইয়া বলিল, "আবার বলো।"

পুরোহিত আবার বকিয়া গেলেন। ধ্রুব অত্যন্ত হাসিতে হাসিতে বলিল, "আবার বলো।"

রাজা ধ্রুবের অশ্রুসিক্ত কপোলে এবং হাসিভরা অধরে বার বার চুম্বন করিলেন। তখন রাজা রাজপুরোহিত ও দুটি ছেলেমেয়ে মিলিয়া খেলা পড়িয়া গেল।

বিল্বন ঠাকুর রাজাকে কহিলেন, "মহারাজ ইহাদের লইয়া বেশ আছেন। দিনরাত প্রখর বুদ্ধিমানদের সঙ্গে থাকিলে বুদ্ধি লোপ পায়। ছুরীতে অবিশ্রাম শান পড়িলে ছুরী ক্রমেই সূক্ষ্ম হইয়া অন্তর্ধান করে। একটা মোটা বাঁট কেবল অবশিষ্ট থাকে।"

রাজা হাসিয়া কহিলেন, "এখনো তবে বোধ করি আমার সূক্ষ্ম বুদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই।"

বিল্বন। না। সূক্ষ্ম বুদ্ধির একটা লক্ষণ এই যে, তাহা সহজ জিনিসকে শক্ত করিয়া তুলে। পৃথিবীতে বিস্তর বুদ্ধিমান না থাকিলে পৃথিবীর কাজ অনেকটা সোজা হইত। নানারূপ সুবিধা করিতে গিয়াই নানারূপ অসুবিধা ঘটে। অধিক বুদ্ধি লইয়া মানুষ কী করিবে ভাবিয়া পায় না।

রাজা কহিলেন, "পাঁচটা আঙুলেই বেশ কাজ চলিয়া যায়, দুর্ভাগ্যক্রমে সাতটা আঙুল পাইলে ইচ্ছা করিয়া কাজ বাড়াইতে হয়।"

রাজা ধ্রুবকে ডাকিলেন। ধ্রুব তাহার সঙ্গিনীর সহিত পুনরায় শান্তি স্থাপন করিয়া খেলা করিতেছিল। রাজার ডাক শুনিয়া তৎক্ষণাৎ খেলা ছাড়িয়া রাজার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে সম্মুখে বসাইয়া কহিলেন, "ধ্রুব, সেই নূতন গানটি ঠাকুরকে শোনাও।"

কিন্তু ধ্রুব নিতান্ত আপত্তির ভাবে ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিল।

রাজা লোভ দেখাইয়া বলিলেন, "তোমাকে টক্‌টক্ চড়তে দেব।"

ধ্রুব তাহার আধো-আধো উচ্চারণে বলিতে লাগিল,—

আমায় ছ-জনায় মিলে পথ দেখায় ব'লে
পদে পদে পথ ভুলি হে।
নানা কথার ছলে নানান মুনি বলে,
সংশয়ে তাই দুলি হে।

তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ,
তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ,
কানের কাছে সবাই করিছে বিবাদ
শত লোকের শত বুলি হে।
কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি
আড়াল করে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি,
ধরণীর ধুলো তাই নিয়ে আছি—
পাই নে চরণধূলি হে।
শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়,
আপনা-আপনি বিবাদ বাধায়,
কারে সামালিব— এ কী হল দায়—
একা যে, অনেকগুলি হে।
আমায় এক করো তোমার প্রেমে বেঁধে,
এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদে,
ধাঁদার মাঝে পড়ে কত মরি কেঁদে—
চরণেতে লহ তুলি হে।

ধ্রুবের মুখে আধো-আধো স্বরে এ কবিতা শুনিয়া বিল্বন ঠাকুর নিতান্ত বিগলিত হইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, "আশীর্বাদ করি তুমি চিরজীবী হইয়া থাকো।"

ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইয়া ঠাকুর অনেক মিনতি করিয়া বলিলেন, "আর-একবার শুনাও।"

ধ্রুব সুদৃঢ় মৌন আপত্তি প্রকাশ করিল। পুরোহিত চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া কহিলেন, "তবে আমি কাঁদি।"

ধ্রুব ঈষৎ বিচলিত হইয়া কহিল, "কাল শোনাব। ছি কাঁদতে নেই। তুমি একন বায়ি (বাড়ি) যাও। বাবা মা'বে।"

বিল্বন হাসিয়া কহিলেন, "মধুর গলাধাক্কা।"

রাজার নিকটে বিদায় লইয়া পুরোহিত ঠাকুর পথে বাহির হইলেন।

পথে দুইজন পথিক যাইতেছিল। একজন আর-একজনকে কহিতেছিল, "তিন দিন তার দরজায় মাথা ভেঙে মলুম, এক পয়সা বের করতে পারলুম না— এইবার সে পথে বেরোলে তার মাথা ভাঙব, দেখি তাতে কী হয়।"

পিছন হইতে বিল্বন কহিলেন, "তাতেও কোনো ফল হবে না। দেখতেই তো

পাচ্ছ বাপু, মাথার মধ্যে কিছুই থাকে না, কেবল দুর্বুদ্ধি আছে। বরঞ্চ নিজের মাথা ভাঙা ভালো, কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না।''

পথিকদ্বয় শশব্যস্ত ও অপ্রতিভ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিল। বিল্বন কহিলেন, "বাপু, তোমরা যে কথা বলছিলে সে কথাগুলো ভালো নয়।"

পথিকদ্বয় কহিল, "যে আজ্ঞে ঠাকুর, আর অমন কথা বলব না।"

পুরোহিত ঠাকুরকে পথে ছেলেরা ঘিরিল। তিনি কহিলেন, "আজ বিকালে আমার ওখানে যাস, আমি আজ গল্প শোনাব।" আনন্দে ছেলেরা লাফালাফি চেঁচামেচি বাধাইয়া দিল। বিল্বন ঠাকুর এক-একদিন অপরাহ্ণে রাজ্যের ছেলে জড়ো করিয়া তাহাদিগকে সহজ ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক গল্প শুনাইতেন। মাঝে মাঝে দুই-একটি নীরস কথাও যথাসাধ্য রসসিক্ত করিয়া বলিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু যখন দেখিতেন ছেলেদের মধ্যে হাই তোলা সংক্রামক হইয়া উঠিতেছে তখন তাহাদের মন্দিরের বাগানের মধ্যে ছাড়িয়া দিতেন। সেখানে ফলের গাছ অসংখ্য আছে। ছেলেগুলো আকাশভেদী চীৎকারশব্দে বানরের মতো ডালে ডালে লুটপাট বাধাইয়া দিত— বিল্বন আমোদ দেখিতেন।

বিল্বন কোন্ দেশী লোক কেহ জানে না। ব্রাহ্মণ, কিন্তু উপবীত ত্যাগ করিয়াছেন। বলিদান প্রভৃতি বন্ধ করিয়া একপ্রকার নূতন অনুষ্ঠানে দেবীর পূজা করিয়া থাকেন— প্রথম প্রথম তাহাতে লোকেরা সন্দেহ ও আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু এখন সমস্ত সহিয়া গিয়াছে। বিশেষত বিল্বনের কথায় সকলে বশ। বিল্বন সকলের বাড়ি বাড়ি গিয়া সকলের সঙ্গে আলাপ করেন, সকলের সংবাদ লন, এবং রোগীকে যাহা ঔষধ দেন তাহা আশ্চর্য খাটিয়া যায়। বিপদে আপদে সকলেই তাঁহার পরামর্শমতে কাজ করে— তিনি মধ্যবর্তী হইয়া কাহারও বিবাদ মিটাইয়া দিলে বা কিছুর মীমাংসা করিয়া দিলে তাহার উপরে আর কেহ কথা কহে না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এই বৎসরে ত্রিপুরায় এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিল। উত্তর হইতে সহসা পালে পালে ইঁদুর ত্রিপুরার শস্যক্ষেত্রে আসিয়া পড়িল। শস্য সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলিল, এমন-কি, কৃষকের ঘরে শস্য যত-কিছু সঞ্চিত ছিল তাহাও অধিকাংশ খাইয়া ফেলিল— রাজ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। বন হইতে ফল-

মূল আহরণ করিয়া লোকে প্রাণধারণ করিতে লাগিল। বনের অভাব নাই, এবং বনে নানাপ্রকার আহার্য উদ্ভিজ্জও আছে। মৃগয়ালব্ধ মাংস বাজারে মহার্ঘ মূল্যে বিক্রয় হইতে লাগিল। লোকে বুনো মহিষ, হরিণ, খরগোশ, সজারু, কাঠবিড়ালি, বরা, বড়ো বড়ো স্থলকচ্ছপ শিকার করিয়া খাইতে লাগিল— হাতি পাইলে হাতিও খায়— অজগর সাপ খাইতে লাগিল— বনে আহার্য পাখির অভাব নাই— গাছের কোটরের মধ্যে মৌচাক ও মধু পাওয়া যায়— স্থানে স্থানে নদীর জল বাঁধিয়া তাহাতে মাদক লতা ফেলিয়া দিলে মাছেরা অবশ হইয়া ভাসিয়া উঠে, সেই-সকল মাছ ধরিয়া লোকেরা খাইতে লাগিল এবং শুকাইয়া সঞ্চয় করিল। আহার এখনো কোনোক্রমে চলিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। স্থানে স্থানে চুরি-ডাকাতি আরম্ভ হইল; প্রজারা বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ করিল।

তাহারা বলিতে লাগিল, "মায়ের বলি বন্ধ করাতে মায়ের অভিশাপে এই-সকল দুর্ঘটনা ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে।" বিল্বন ঠাকুর সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তিনি উপহাসচ্ছলে কহিলেন, "কৈলাসে কার্তিক-গণেশের মধ্যে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, কার্তিকের ময়ূরের নামে গণেশের ইঁদুরগুলো ত্রিপুরার ত্রিপুরেশ্বরীর কাছে নালিশ করিতে আসিয়াছে।" প্রজারা এ কথা নিতান্ত উপহাসের ভাবে গ্রহণ করিল না। তাহারা দেখিল, বিল্বন ঠাকুরের কথামত ইঁদুরের স্রোত যেমন দ্রুতবেগে আসিল তেমনি দ্রুত-বেগে সমস্ত শস্য নষ্ট করিয়া কোথায় অন্তর্ধান করিল— তিন দিনের মধ্যে তাহাদের আর চিহ্নমাত্র রহিল না। বিল্বন ঠাকুরের অগাধ জ্ঞানের সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ রহিল না। কৈলাসে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ সম্বন্ধে গান রচিত হইতে লাগিল, মেয়েরা ছেলেরা ভিক্ষুকেরা সেই গান গাহিতে লাগিল, পথে ঘাটে সেই গান প্রচলিত হইল।

কিন্তু রাজার প্রতি বিদ্বেষভাব ভালো করিয়া ঘুচিল না। বিল্বন ঠাকুরের পরামর্শমতে গোবিন্দমাণিক্য দুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রজাদের এক বৎসরের খাজনা মাপ করিলেন। তাহার কতকটা ফল হইল। কিন্তু তবুও অনেকে মায়ের অভিশাপ এড়াইবার জন্য চট্টগ্রামে পার্বত্য প্রদেশে পলায়ন করিল। এমন-কি রাজার মনে সন্দেহের উদয় হইতে লাগিল।

তিনি বিল্বনকে ডাকিয়া কহিলেন, "ঠাকুর, রাজার পাপেই প্রজা কষ্ট পায়। আমি কি মায়ের বলি বন্ধ করিয়া পাপ করিয়াছি? তাহারই কি এই শাস্তি?"

বিল্বন সমস্ত কথা একেবারে উড়াইয়া দিলেন। তিনি কহিলেন, "মায়ের কাছে যখন হাজার নরবলি হইত, তখন আপনার অধিক প্রজাহানি হইয়াছে, না এই দুর্ভিক্ষে হইয়াছে?"

রাজা নিরুত্তর হইয়া রহিলেন কিন্তু তাঁহার মনের মধ্য হইতে সংশয় সম্পূর্ণ দূর হইল না। প্রজারা তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছে, তাঁহার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিতেছে, ইহাতে তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছে, তাঁহার নিজের প্রতিও নিজের সন্দেহ জন্মিয়াছে। তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "কিছুই বুঝিতে পারি না।"

বিল্বন কহিলেন, "অধিক বুঝিবার আবশ্যক কী। কেন কতকগুলো ইঁদুর আসিয়া শস্য খাইয়া গেল তাহা না'ই বুঝিলাম। আমি অন্যায় করিব না, আমি সকলের হিত করিব, এইটুকু স্পষ্ট বুঝিলেই হইল। তার পরে বিধাতার কাজ বিধাতা করিবেন, তিনি আমাদের হিসাব দিতে আসিবেন না।"

রাজা কহিলেন, "ঠাকুর, তুমি গৃহে গৃহে ফিরিয়া অবিশ্রাম কাজ করিতেছ, পৃথিবীর যতটুকু হিত করিতেছ ততটুকুই তোমার পুরস্কার হইতেছে, এই আনন্দে তোমার সমস্ত সংশয় চলিয়া যায়। আমি কেবল দিনরাত্রি একটা মুকুট মাথায় করিয়া সিংহাসনের উপরে চড়িয়া বসিয়া আছি, কেবল কতকগুলো চিন্তা ঘাড়ে করিয়া আছি— তোমার কাজ দেখিলে আমার লোভ হয়।"

বিল্বন কহিলেন, "মহারাজ, আমি তোমারই তো এক অংশ। তুমি ওই সিংহাসনে বসিয়া না থাকিলে আমি কি কাজ করিতে পারিতাম! তোমাতে আমাতে মিলিয়া আমরা উভয়ে সম্পূর্ণ হইয়াছি।"

এই বলিয়া বিল্বন বিদায় গ্রহণ করিলেন, রাজা মুকুট মাথায় করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। মনে মনে কহিলেন, 'আমার কাজ যথেষ্ট রহিয়াছে, আমি তাহার কিছুই করি না। আমি কেবল আমার চিন্তা লইয়াই নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। সেইজন্যই আমি প্রজাদের বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারি না। রাজ্যশাসনের আমি যোগ্য নই।'

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মোগল-সৈন্যের কর্তা হইয়া নক্ষত্ররায় পথের মধ্যে তেঁতুলে-নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রভাতে রঘুপতি আসিয়া কহিলেন, "যাত্রা করিতে হইবে মহারাজ, প্রস্তুত হোন।"

সহসা রঘুপতির মুখে মহারাজ শব্দ অত্যন্ত মিষ্ট শুনাইল। নক্ষত্ররায় উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। তিনি কল্পনায় পৃথিবীসুদ্ধ লোকের মুখ হইতে মহারাজ সম্ভাষণ শুনিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে ত্রিপুরার উচ্চ সিংহাসনে চড়িয়া সভা উজ্জ্বল করিয়া

বসিলেন। মনের আনন্দে বলিলেন, "ঠাকুর, আপনাকে কখনোই ছাড়া হইবে না। আপনাকে সভায় থাকিতে হইবে। আপনি কী চান সেইটে আমাকে বলুন।"

নক্ষত্ররায় মনে মনে রঘুপতিকে তৎক্ষণাৎ বৃহৎ একখণ্ড জায়গির অবলীলাক্রমে দান করিয়া ফেলিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "আমি কিছু চাহি না।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "সে কী কথা! তা হইবে না ঠাকুর। কিছু লইতেই হইবে। কয়লাসর পরগনা আমি আপনাকে দিলাম— আপনি লেখাপড়া করিয়া লউন।"

রঘুপতি কহিলেন, "সে-সকল পরে দেখা যাইবে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "পরে কেন, আমি এখনি দিব। সমস্ত কয়লাসর পরগনা আপনারই হইল; আমি এক পয়সা খাজনা লইব না।"

বলিয়া নক্ষত্ররায় মাথা তুলিয়া অত্যন্ত সিধা হইয়া বসিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "মরিবার জন্য তিন হাত জমি মিলিলেই সুখী হইব। আমি আর কিছু চাহি না।" বলিয়া রঘুপতি চলিয়া গেলেন। তাঁহার জয়সিংহকে মনে পড়িয়াছে। জয়সিংহ যদি থাকিত তবে পুরস্কারের স্বরূপ কিছু লইতেন— জয়সিংহ যখন নাই তখন সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্য মৃত্তিকার সমষ্টি ছাড়া আর কিছু মনে হইল না।

রঘুপতি এখন নক্ষত্ররায়কে রাজ্যাভিমানে মত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার মনের মধ্যে ভয় আছে পাছে এত আয়োজন করিয়া সমস্ত ব্যর্থ হয়, পাছে দুর্বলস্বভাব নক্ষত্ররায় ত্রিপুরায় গিয়া বিনাযুদ্ধে রাজার নিকট ধরা দেন। কিন্তু দুর্বল হৃদয়ে একবার রাজ্যমদ জন্মিলে আর ভাবনা নাই। রঘুপতি নক্ষত্ররায়ের প্রতি আর অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন না, কথায় কথায় তাঁহার সম্মান দেখাইয়া থাকেন। সকল বিষয়ে তাঁহার মৌখিক আদেশ লইয়া থাকেন। মোগল-সৈন্যেরা তাঁহাকে মহারাজা সাহেব বলে, তাঁহাকে দেখিলে শশব্যস্ত হইয়া উঠে— বায়ু বহিলে যেমন সমস্ত শস্যক্ষেত্র নত হইয়া যায় তেমনি নক্ষত্ররায় আসিয়া দাঁড়াইলে সারি সারি মোগল-সেনা একসঙ্গে মাথা নত করিয়া সেলাম করে। সেনাপতি সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভিবাদন করেন। শত শত মুক্ত তরবারির জ্যোতির মধ্যে বৃহৎ হস্তীর পৃষ্ঠে রাজচিহ্ন-অঙ্কিত স্বর্ণমণ্ডিত হাওদায় চড়িয়া তিনি যাত্রা করেন, সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসজনক বাদ্য বাজিতে থাকে— সঙ্গে সঙ্গে নিশানধারী রাজনিশান ধরিয়া চলে। তিনি যেখান দিয়া যান, সেখানকার গ্রামের লোক সৈন্যের ভয়ে ঘরবাড়ি ছাড়িয়া পালাইয়া যায়। তাহাদের ত্রাস দেখিয়া নক্ষত্ররায়ের মনে গর্বের উদয় হয়। তাঁহার মনে হয়, আমি দিগ্বিজয় করিয়া চলিয়াছি। ছোটো ছোটো জমিদারগণ নানাবিধ উপঢৌকন লইয়া আসিয়া তাঁহাকে সেলাম

করিয়া যায়— তাহাদিগকে পরাজিত নৃপতি বলিয়া বোধ হয় ; মহাভারতের দিগ্বিজয়ী পাণ্ডবদের কথা মনে পড়ে।

একদিন সৈন্যেরা আসিয়া সেলাম করিয়া কহিল, "মহারাজ সাহেব !"

নক্ষত্ররায় খাড়া হইয়া বসিলেন।

"আমরা মহারাজের জন্য জান দিতে আসিয়াছি— আমরা জানের পরোয়া রাখি না। বরাবর আমাদের দস্তুর আছে, লড়াইয়ে যাইবার পথে আমরা গ্রাম লুঠ করিয়া যাই— কোনো শাস্ত্রে ইহাতে দোষ লিখে না।"

নক্ষত্ররায় মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "ঠিক কথা, ঠিক কথা।"

সৈন্যেরা কহিল, "ব্রাহ্মণ-ঠাকুর আমাদের লুঠ করিতে বারণ করিয়াছেন। আমরা জান দিতে যাইতেছি, অথচ একটু লুঠ করিতে পারিব না, এ বড়ো অবিচার।"

নক্ষত্ররায় পুনশ্চ মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "ঠিক কথা, ঠিক কথা।"

"মহারাজার যদি হুকুম মিলে তো আমরা ব্রাহ্মণ-ঠাকুরের কথা না মানিয়া লুঠ করিতে যাই।"

নক্ষত্ররায় অত্যন্ত স্পর্ধার সহিত কহিলেন, "ব্রাহ্মণ-ঠাকুর কে ! ব্রাহ্মণ-ঠাকুর কী জানে ! আমি তোমাদিগকে হুকুম দিতেছি তোমরা লুঠপাট করিতে যাও।"

বলিয়া একবার ইতস্তত চাহিয়া দেখিলেন, কোথাও রঘুপতিকে না দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

কিন্তু রঘুপতিকে এইরূপে অকাতরে লঙ্ঘন করিয়া তিনি মনের মধ্যে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। ক্ষমতামদ মদিরার মতো তাঁহার শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইতে লাগিল। পৃথিবীকে নূতন চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। কাল্পনিক বেলুনের উপরে চড়িয়া পৃথিবীটা যেন অনেক নিম্নে মেঘের মতো মিলাইয়া গেল। এমন-কি, মাঝে মাঝে কদাচ কখনো রঘুপতিকেও নগণ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সহসা বলপূর্বক গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। মনে মনে বার বার করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমাকে নির্বাসন! একটা সামান্য প্রজার মতো আমাকে বিচারসভায় আহ্বান! এবার দেখি কে কাহাকে নির্বাসিত করে। এবার ত্রিপুরাসুদ্ধ লোক নক্ষত্ররায়ের প্রতাপ অবগত হইবে।'

নক্ষত্ররায় ভারী উৎফুল্ল ও স্ফীত হইলেন।

নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর অনর্থক উৎপীড়ন ও লুঠপাটের প্রতি রঘুপতির বিশেষ বিরাগ ছিল। নিবারণ করিবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সৈন্যেরা নক্ষত্ররায়ের আজ্ঞা পাইয়া তাঁহাকে অবহেলা করিল। তিনি নক্ষত্র-

রায়ের কাছে বলিলেন, "অসহায় গ্রামবাসীদের উপরে কেন এ অত্যাচার!"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "ঠাকুর, এ-সব বিষয়ে তুমি ভালো বোঝ না। যুদ্ধবিগ্রহের সময় সৈন্যদের লুঠপাটে নিষেধ করিয়া নিরুৎসাহ করা ভালো না।"

নক্ষত্ররায়ের কথা শুনিয়া রঘুপতি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। সহসা নক্ষত্ররায়ের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান দেখিয়া তিনি মনে মনে হাসিলেন। কহিলেন, "এখন লুঠপাট করিতে দিলে পরে ইহাদিগকে সামলানো দায় হইবে। সমস্ত ত্রিপুরা লুঠিয়া লইবে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "তাহাতে হানি কী? আমি তো তাহাই চাই। ত্রিপুরা একবার বুঝুক, নক্ষত্ররায়কে নির্বাসিত করার ফল কী। ঠাকুর, এ-সব বিষয় তুমি কিছু বোঝ না— তুমি তো কখনো যুদ্ধ কর নাই।"

রঘুপতি মনে মনে অত্যন্ত আমোদ বোধ করিলেন। কিছু উত্তর না করিয়া চলিয়া গেলেন। নক্ষত্ররায় নিতান্ত পুত্তলিকার মতো না হইয়া একটু শক্ত মানুষের মতো হন, এই তাঁহার ইচ্ছা ছিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ত্রিপুরায় ইঁদুরের উৎপাত যখন আরম্ভ হয় তখন শ্রাবণ মাস। তখন ক্ষেত্রে কেবল ভুট্টা ফলিয়াছিল, এবং পাহাড়ে জমিতে ধান্যক্ষেত্রেও পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তিন মাস কোনোমতে কাটিয়া গেল— অগ্রহায়ণ মাসে নিম্নভূমিতে যখন ধান কাটিবার সময় আসিল তখন দেশে আনন্দ পড়িয়া গেল। চাষারা[১] স্ত্রীলোক বালক যুবক বৃদ্ধ সকলে মিলিয়া দা হাতে লইয়া ক্ষেত্রে গিয়া পড়িল। হৈয়া হৈয়া শব্দে পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করিতে লাগিল। জুমিয়া রমণীদের গানে মাঠ-বাট ধ্বনিত হইয়া উঠিল। রাজার প্রতি অসন্তোষ দূর হইয়া গেল— রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। এমন সময় সংবাদ আসিল, নক্ষত্ররায় রাজ্য-আক্রমণের উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন এবং অত্যন্ত লুঠপাট উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন— এই সংবাদে সমস্ত রাজ্য শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

এ সংবাদ রাজার বক্ষে ছুরীর মতো বিদ্ধ হইল। সমস্ত দিনই তাঁহাকে বিঁধিতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া কেবলই প্রত্যেক বার নূতন করিয়া তাঁহার মনে হইতে

১ প্রকৃতপক্ষে ইহাদের চাষা বলা যায় না। কারণ, ইহারা রীতিমত চাষ করে না। জঙ্গল দগ্ধ করিয়া বর্ষারম্ভে বীজ বপন করে মাত্র। এইরূপ ক্ষেত্রকে জুম বলে, কৃষকদিগকে জুমিয়া বলে।

লাগিল নক্ষত্ররায় তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। নক্ষত্ররায়ের সরল সুন্দর মুখ শতবার তাঁহার স্নেহচক্ষের সম্মুখে দেখিতে লাগিলেন এবং সেই সঙ্গেই মনে হইতে লাগিল, সেই নক্ষত্ররায় কতকগুলো সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তলোয়ার হাতে লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। এক-একবার তাঁহার মনে মনে ইচ্ছা করিতে লাগিল একটি সৈন্যও না লইয়া নক্ষত্ররায়ের সম্মুখে বৃহৎ রণক্ষেত্রে একা দাঁড়াইয়া সমস্ত বক্ষস্থল অবারিত করিয়া নক্ষত্ররায়ের সহস্র সৈনিকের তরবারি এক কালে তাঁহার হৃদয়ে গ্রহণ করেন।

তিনি ধ্রুবকে কাছে টানিয়া বলিলেন, "ধ্রুব, তুইও কি এই মুকুটখানার জন্য আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতে পারিস ?" বলিয়া মুকুট ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন, একটি বড়ো মুক্তা ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল।

ধ্রুব আগ্রহের সহিত হাত বাড়াইয়া কহিল, "আমি নেব।"

রাজা ধ্রুবের মাথায় মুকুট পরাইয়া তাহাকে কোলে লইয়া কহিলেন, "এই লও— আমি কাহারও সহিত ঝগড়া করিতে চাই না।" বলিয়া অত্যন্ত আবেগের সহিত ধ্রুবকে চাপিয়া ধরিলেন।

তাহার পরে সমস্ত দিন ধরিয়া 'এ কেবল আমারই পাপের শাস্তি' বলিয়া রাজা নিজের সহিত তর্ক করিতে লাগিলেন। নহিলে ভাই কখনো ভাইকে আক্রমণ করে না। ইহা মনে করিয়া তাঁহার কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা হইল। তিনি মনে করিলেন, ইহা ঈশ্বরের বিধান। জগৎপতির দরবার হইতে আদেশ আসিয়াছে, ক্ষুদ্র নক্ষত্ররায় কেবল তাহার মানবহৃদয়ের প্ররোচনায় তাহা লঙ্ঘন করিতে পারে না। এই মনে করিয়া তাঁহার আহত স্নেহ কিছু শান্তি পাইল। পাপ তিনি নিজের স্কন্ধে লইতে রাজি আছেন— নক্ষত্ররায়ের পাপের ভার যেন তাহাতে কতকটা কমিয়া যায়।

বিল্বন আসিয়া কহিলেন, "মহারাজ, এ সময় কি আকাশের দিকে তাকাইয়া ভাবিবার সময় ?"

রাজা কহিলেন, "ঠাকুর, এ-সকল আমারই পাপের ফল।"

বিল্বন কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ, এই-সকল কথা শুনিলে আমার ধৈর্য থাকে না। দুঃখ যে পাপেরই ফল তাহা কে বলিল, পুণ্যের ফলও হইতে পারে। কত ধর্মাত্মা আজীবন দুঃখে কাটাইয়া গিয়াছেন।"

রাজা নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

বিল্বন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ কী পাপ করিয়াছিলেন যাহার ফলে এই ঘটনা ঘটিল ?"

*

রাজা কহিলেন, "আপন ভাইকে নির্বাসিত করিয়াছিলাম।"

বিল্বন কহিলেন, "আপনি ভাইকে নির্বাসিত করেন নাই। দোষীকে নির্বাসিত করিয়াছেন।"

রাজা কহিলেন, "দোষী হইলেও ভাইকে নির্বাসনের পাপ আছেই। তাহার ফল হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না। কৌরবেরা দুরাচার হইলেও পাণ্ডবেরা তাঁহাদিগকে বধ করিয়া প্রসন্নচিত্তে রাজ্যসুখ ভোগ করিতে পারিলেন না। যজ্ঞ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। পাণ্ডবেরা কৌরবদের নিকট হইতে রাজ্য লইলেন, কৌরবেরা মরিয়া গিয়া পাণ্ডবদের রাজ্য হরণ করিলেন। আমি নক্ষত্রকে নির্বাসিত করিয়াছি, নক্ষত্র আমাকে নির্বাসিত করিতে আসিতেছে।"

বিল্বন কহিলেন, "পাণ্ডবেরা পাপের শাস্তি দিবার জন্য কৌরবদের সহিত যুদ্ধ করেন নাই, তাঁহারা রাজ্যলাভের জন্য করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজ পাপের শাস্তি দিয়া নিজের সুখদুঃখ উপেক্ষা করিয়া ধর্ম পালন করিয়াছিলেন। ইহাতে আমি তো পাপ কিছুই দেখিতেছি না। তবে প্রায়শ্চিত্তের বিধি দিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। আমি ব্রাহ্মণ উপস্থিত আছি, আমাকে সন্তুষ্ট করিলেই প্রায়শ্চিত্ত হইবে।"

রাজা ঈষৎ হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

বিল্বন কহিলেন, "সে যাহাই হউক, এখন যুদ্ধের আয়োজন করুন। আর বিলম্ব করিবেন না।"

রাজা কহিলেন, "আমি যুদ্ধ করিব না।"

বিল্বন কহিলেন, "সে হইতেই পারে না। আপনি বসিয়া বসিয়া ভাবুন। আমি ততক্ষণ সৈন্যসংগ্রহের চেষ্টা করিগে। সকলেই এখন জুমে গিয়াছে, যথেষ্ট সৈন্য পাওয়া কঠিন।"

বলিয়া আর কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বিল্বন চলিয়া গেলেন।

ধ্রুবের সহসা কী মনে হইল; সে রাজার কাছে আসিয়া রাজার মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকা কোথায়?"

নক্ষত্ররায়কে ধ্রুব কাকা বলিত।

রাজা কহিলেন, "কাকা আসিতেছেন ধ্রুব।"

তাঁহার চোখের পাতা ঈষৎ আর্দ্র হইয়া গেল।

বলিয়া আপনাকে ফাঁকি দিয়া সুখী করিতে চাহিতেছ।"

কথাটা গোবিন্দমাণিক্যের মনে লাগিল। তিনি নিরুত্তর হইয়া কিছুক্ষণ ব
রহিলেন। অবশেষে নিতান্ত কাতর হইয়া বলিলেন, "মনে করো-না ঠাকুর, আ
পরাজয় হইয়াছে, নক্ষত্র আমাকে বধ করিয়া রাজা হইয়াছে।"

বিল্বন কহিলেন, "যদি সত্য তাহাই ঘটে তাহা হইলে আমি মহারাজের জন্য শে
করিব না। কিন্তু মহারাজ যদি কর্তব্যে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন, তবেই আমা
শোকের কারণ ঘটিবে।"

রাজা কিঞ্চিৎ অধীর হইয়া কহিলেন, "আপন ভাইয়ের রক্তপাত করিব!"

বিল্বন কহিলেন, "কর্তব্যের কাছে ভাই বন্ধু কেহই নাই। কুরুক্ষেত্রের যু
সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কী উপদেশ দিয়াছিলেন স্মরণ করিয়া দেখুন।"

রাজা কহিলেন, "ঠাকুর, তুমি কি বল আমি স্বহস্তে এই তরবারি লইয়া নক্ষ
রায়কে আঘাত করিব?"

বিল্বন কহিলেন, "হাঁ।"

সহসা ধ্রুব আসিয়া গম্ভীর ভাবে কহিল, "ছি, ও কথা বলতে নেই।"

ধ্রুব খেলা করিতেছিল, দুই পক্ষের কী একটা গোলমাল শুনিয়া সহসা তাহার ম
হইল দুইজনে অবশ্যই একটা দুষ্টামি করিতেছে, অতএব সময় থাকিতে দুইজন
কিঞ্চিৎ শাসন করিয়া আসা আবশ্যক। এই-সকল বিবেচনা করিয়া তিনি হঠাৎ আসি
ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "ছি, ও কথা বলতে নেই।"

পুরোহিত ঠাকুরের অত্যন্ত আমোদ বোধ হইল। তিনি হাসিয়া উঠিলেন, ধ্রুব
কোলে লইয়া চুমো খাইতে লাগিলেন। কিন্তু রাজা হাসিলেন না। তাঁহার মনে হই
যেন বালকের মুখে তিনি দৈববাণী শুনিলেন।

তিনি অসন্দিগ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকুর, আমি স্থির করিয়াছি এ রক্তপা
আমি ঘটিতে দিব না, আমি যুদ্ধ করিব না।"

বিল্বন ঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, "মহারাজের য
যুদ্ধ করিতেই আপত্তি থাকে, তবে আর-এক কাজ করুন। আপনি নক্ষত্ররায়ের সহি
সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে বিরত করুন।"

গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন, "ইহাতে আমি সম্মত আছি।"

বিল্বন কহিলেন, "তবে সেইরূপ প্রস্তাব লিখিয়া নক্ষত্ররায়ের নিকট পাঠানে
হউক।"

অবশেষে তাহাই স্থির হইল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিল্বন ঠাকুরের বিস্তর কাজ পড়িয়া গেল। তিনি চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদে নানা উপহার সমেত দ্রুতগামী দূত পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে কুকি-গ্রামপতি নিকটে কুকি-সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। যুদ্ধের নাম শুনিয়া তাহারা নাি উঠিল। কুকিদের যত লাল (গ্রামপতি) ছিল তাহারা যুদ্ধের সংবাদস্বরূপ ল বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা দা দূতহস্তে গ্রামে গ্রামে পাঠাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে কুি স্রোত চট্টগ্রামের শৈলশৃঙ্গ হইতে ত্রিপুরার শৈলশৃঙ্গে আসিয়া পড়িল। তাহাদিগ কোনো নিয়মের মধ্যে সংযত করিয়া রাখাই দায়। বিল্বন স্বয়ং ত্রিপুরার গ্রামে গ্রা গিয়া জুম হইতে বাছিয়া বাছিয়া সাহসী যুবাপুরুষদিগকে সৈন্যশ্রেণীতে সং করিয়া আনিলেন। অগ্রসর হইয়া মোগলসৈন্যদিগকে আক্রমণ করা বিল্বন ঠা সংগত বিবেচনা করিলেন না। যখন তাহারা সমতলক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া অপেক্ষাকৃ দুর্গম শৈলশৃঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন অরণ্য, পর্বত ও নানা দুর্গম গুপ্ত স্থা হইতে তাহাদিগকে সহসা আক্রমণ করিয়া চকিত করিবেন স্থির করিলেন। বড়ো বড়ে শিলাখণ্ডের দ্বারা গোমতী নদীর জল বাঁধিয়া রাখিলেন— নিতান্ত পরাভবের আশ দেখিলে সেই বাঁধ ভাঙিয়া দিয়া জলপ্লাবনের দ্বারা মোগলসৈন্যদিগকে ভাসাইয়া দেওয় যাইতে পারিবে।

এ দিকে নক্ষত্ররায় দেশ লুণ্ঠন করিতে করিতে ত্রিপুরার পার্বত্য প্রদেশে আসিয় পৌঁছিলেন। তখন জুম কাটা শেষ হইয়া গেছে। জুমিয়ারা সকলেই দা ও তীরধনু হাতে করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। কুকিদলকে উচ্ছ্বাসোন্মুখ জলপ্রপাতের মতো আর বাঁধিয়া রাখা যায় না।

গোবিন্দমাণিক্য বলিলেন, "আমি যুদ্ধ করিব না।"

বিল্বন ঠাকুর কহিলেন, "এ কোনো কাজের কথাই নহে।"

রাজা কহিলেন, "আমি রাজত্ব করিবার যোগ্য নহি, তাহারই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। সেই জন্য আমার প্রতি প্রজাদের বিশ্বাস নাই, সেই জন্যই দুর্ভিক্ষের সূচনা, সেই জন্যই এই যুদ্ধ। রাজ্য-পরিত্যাগের জন্য এ-সকল ভগবানের আদেশ।"

বিল্বন কহিলেন, "এ কখনোই ভগবানের আদেশ নহে। ঈশ্বর তোমার উপরে রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছেন; যতদিন রাজকার্য নিঃসংকট ছিল ততদিন তোমার সহজ কর্তব্য অনায়াসে পালন করিয়াছ, যখনই রাজ্যভার গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে তখনই তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া তুমি স্বাধীন হইতে চাহিতেছ এবং ঈশ্বরের আদেশ

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নক্ষত্ররায় সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কোথাও তিলমাত্র বাধা পাইলেন না। ত্রিপুরায় যে গ্রামেই তিনি পদার্পণ করিলেন সেই গ্রামই তাঁহাকে রাজা বলিয়া বরণ করিতে লাগিল। পদে পদে রাজত্বের আস্বাদ পাইতে লাগিলেন— ক্ষুধা আরও বাড়িতে লাগিল, চারি দিকের বিস্তৃত ক্ষেত্র, গ্রাম, পর্বতশ্রেণী, নদী সমস্তই 'আমার' বলিয়া মনে হইতে লাগিল এবং সেই অধিকারব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নিজেও যেন অনেক দূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া অত্যন্ত প্রশস্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। মোগল-সৈন্যেরা যাহা চায় তিনি তাহাই তাহাদিগকে লইতে আলী হুকুম দিয়া দিলেন। মনে হইল এ-সমস্তই আমার এবং ইহারা আমারই রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহাদিগকে কোনো সুখ হইতে বঞ্চিত করা হইবে না— স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়া মোগলেরা তাঁহার আতিথ্যের ও রাজবৎ উদারতা ও বদান্যতার অনেক প্রশংসা করিবে ; বলিবে, "ত্রিপুরার রাজা বড়ো কম রাজা নহে।" মোগলসৈন্যদের নিকট হইতে খ্যাতি লাভ করিবার জন্য তিনি সততই উৎসুক হইয়া রহিলেন। তাহারা তাঁহাকে কোনো-প্রকার শ্রুতিমধুর সম্ভাষণ করিলে তিনি নিতান্ত জল হইয়া যান। সর্বদাই ভয় হয় পাছে কোনো নিন্দার কারণ ঘটে।

রঘুপতি আসিয়া কহিলেন, "মহারাজ, যুদ্ধের তো কোনো উদ্‌যোগ দেখা যাইতেছে না।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "না ঠাকুর, ভয় পাইয়াছে।"

বলিয়া অত্যন্ত হাসিতে লাগিলেন।

রঘুপতি হাসিবার বিশেষ কোনো কারণ দেখিলেন না, কিন্তু তথাপি হাসিলেন।

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "নক্ষত্ররায় নবাবের সৈন্য লইয়া আসিয়াছে। বড়ো সহজ ব্যাপার নহে।"

রঘুপতি কহিলেন, "দেখি এবার কে কাহাকে নির্বাসনে পাঠায়! কেমন ?"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "আমি ইচ্ছা করিলে নির্বাসনদণ্ড দিতে পারি, কারারুদ্ধ করিতেও পারি— বধের হুকুম দিতেও পারি। এখনো স্থির করি নাই কোন্‌টা করিব।"

বলিয়া অতিশয় বিজ্ঞভাবে অনেক বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "অত ভাবিবেন না মহারাজ। এখনো অনেক সময় আছে। কিন্তু আমার ভয় হইতেছে, গোবিন্দমাণিক্য যুদ্ধ না করিয়াই আপনাকে পরাভূত করিবেন।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "সে কেমন করিয়া হইবে ?"

রঘুপতি কহিলেন, "গোবিন্দমাণিক্য সৈন্যগুলোকে আড়ালে রাখিয়া বিস্তর ভ্রাতৃস্নেহ দেখাইবেন। গলা ধরিয়া বলিবেন— ছোটো ভাই আমার, এসো ঘরে এসো, দুধ-সর খাওসে। মহারাজ কাঁদিয়া বলিবেন— যে আজ্ঞে, আমি এখনি যাইতেছি। অধিক বিলম্ব হইবে না। বলিয়া নাগরা জুতাজোড়াটা পায়ে দিয়া দাদার পিছনে পিছনে মাথা নিচু করিয়া টাট্টু ঘোড়াটির মতো চলিবেন। বাদশাহের মোগল ফৌজ তামাশা দেখিয়া হাসিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইবে।"

নক্ষত্ররায় রঘুপতির মুখে এই তীব্র বিদ্রূপ শুনিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। কিঞ্চিৎ হাসিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "আমাকে কি ছেলেমানুষ পাইয়াছে যে এমনি করিয়া ভুলাইবে! তাহার জো নাই। সে হবে না ঠাকুর। দেখিয়া লইয়ো।"

সেইদিন গোবিন্দমাণিক্যের চিঠি আসিয়া পৌঁছিল। সে চিঠি রঘুপতি খুলিলেন। রাজা অত্যন্ত স্নেহপ্রকাশ করিয়া সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়াছেন। চিঠি নক্ষত্ররায়কে দেখাইলেন না। দূতকে বলিয়া দিলেন, "কষ্ট স্বীকার করিয়া গোবিন্দমাণিক্যের এতদূর আসিবার দরকার নাই। সৈন্য ও তরবারি লইয়া মহারাজ নক্ষত্রমাণিক্য শীঘ্রই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। গোবিন্দমাণিক্য এই অল্প কাল যেন প্রিয়ভ্রাতৃবিরহে অধিক কাতর হইয়া না পড়েন। আট বৎসর নির্বাসনে থাকিলে ইহা অপেক্ষা আরও অধিক কাল বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ছিল।"

রঘুপতি নক্ষত্ররায়কে গিয়া কহিলেন, "গোবিন্দমাণিক্য নির্বাসিত ছোটো ভাইকে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ একখানি চিঠি লিখিয়াছেন।"

নক্ষত্ররায় পরম উপেক্ষার ভাণ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "সত্য না কি! কী চিঠি? কই দেখি।" বলিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "সে চিঠি মহারাজকে দেখানো আমি আবশ্যক বিবেচনা করি নাই। তখনই ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। বলিয়াছি, যুদ্ধ ছাড়া ইহার আর কোনো উত্তর নাই।"

নক্ষত্ররায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বেশ করিয়াছ ঠাকুর! তুমি বলিয়াছ যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো উত্তর নাই? বেশ উত্তর দিয়াছ।"

রঘুপতি কহিলেন, "গোবিন্দমাণিক্য উত্তর শুনিয়া ভাবিবে যে, যখন নির্বাসন দিয়াছিলাম তখন তো ভাই বেশ সহজে গিয়াছিল, কিন্তু সেই ভাই ঘরে ফিরিয়া আসিবার সময় তো কম গোলযোগ করিতেছে না।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "মনে করিবেন ভাইটি বড়ো সহজ লোক নয়। মনে করিলেই যে যখন ইচ্ছা নির্বাসন দিব এবং যখন ইচ্ছা ডাকিয়া লইব সেটি হইবার জো নাই।"

বলিয়া অত্যন্ত আনন্দে দ্বিতীয়বার হাসিতে লাগিলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নক্ষত্ররায়ের উত্তর শুনিয়া গোবিন্দমাণিক্য অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন। বিল্বন মনে করিলেন, এবারে হয়তো মহারাজা আপত্তি প্রকাশ করিবেন না। কিন্তু গোবিন্দমাণিক্য বলিলেন, "এ কথা কখনোই নক্ষত্ররায়ের কথা নহে। এ সেই পুরোহিত বলিয়া পাঠাইয়াছে। নক্ষত্রের মুখ দিয়া এমন কথা কখনোই বাহির হইতে পারে না।"

বিল্বন কহিলেন, "মহারাজ, এক্ষণে কী উপায় স্থির করিলেন?"

রাজা কহিলেন, "আমি নক্ষত্রের সঙ্গে কোনোক্রমে একবার দেখা করিতে পাই, তাহা হইলে সমস্ত মিটমাট করিয়া দিতে পারি।"

বিল্বন কহিলেন, "আর দেখা যদি না হয়?"

রাজা। তাহা হইলে আমি রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইব।

বিল্বন কহিলেন, "আচ্ছা, আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।"

পাহাড়ের উপর নক্ষত্ররায়ের শিবির। ঘন জঙ্গল। বাঁশবন, বেতবন, খাগড়ার বন। নানাবিধ লতাগুল্মে ভূমি আচ্ছন্ন। সৈন্যেরা বন্য হস্তীদের চলিবার পথ অনুসরণ করিয়া শিখরে উঠিয়াছে। তখন অপরাহ্ণ। সূর্য পাহাড়ের পশ্চিমপ্রান্তে হেলিয়া পড়িয়াছে। পূর্বপ্রান্তে অন্ধকার করিয়াছে। গোধূলির ছায়া ও তরুর ছায়ায় মিলিয়া বনের মধ্যে অকালে সন্ধ্যার আবির্ভাব হইয়াছে। শীতের সায়াহ্নে ভূমিতল হইতে কুয়াশার মতো বাষ্প উঠিতেছে। ঝিল্লির শব্দে নিস্তব্ধ বন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। বিল্বন যখন শিবিরে গিয়া পৌঁছিলেন, তখন সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত গেছেন, কিন্তু পশ্চিম-আকাশে স্বর্ণরেখা মিলাইয়া যায় নাই। পশ্চিম দিকের সমতল উপত্যকায় স্বর্ণচ্ছায়ায় রঞ্জিত ঘন বন নিস্তব্ধ সবুজ সমুদ্রের মতো দেখাইতেছে। সৈন্যেরা কাল প্রভাতে যাত্রা করিবে। রঘুপতি একদল সেনা ও সেনাপতিকে সঙ্গে লইয়া পথ অন্বেষণে বাহির হইয়াছেন, এখনো ফিরিয়া আসেন নাই। যদিও রঘুপতির অজ্ঞাতসারে নক্ষত্ররায়ের নিকটে কোনো লোক আসা নিষেধ ছিল, তথাপি সন্ন্যাসীবেশধারী বিল্বনকে কেহই বাধা দিল না।

বিল্বন নক্ষত্ররায়কে গিয়া কহিলেন, "মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য আপনাকে স্মরণ করিয়া এই পত্র লিখিয়াছেন।" বলিয়া পত্র নক্ষত্ররায়ের হস্তে দিলেন। নক্ষত্ররায় কম্পিত হস্তে পত্র গ্রহণ করিলেন। সে পত্র খুলিতে তাঁহার লজ্জা ও ভয় হইতে লাগিল। যতক্ষণ রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্য ও তাঁহার মধ্যে আড়াল

করিয়া দাঁড়ায়, ততক্ষণ নক্ষত্ররায় বেশ নিশ্চিন্ত থাকেন। তিনি কোনোমতেই গোবিন্দমাণিক্যকে যেন দেখিতে চান না। গোবিন্দমাণিক্যের এই দূত একেবারে নক্ষত্ররায়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে নক্ষত্ররায় কেমন যেন সংকুচিত হইয়া পড়িলেন, এবং মনে মনে ঈষৎ বিরক্ত হইলেন। ইচ্ছা হইতে লাগিল রঘুপতি যদি উপস্থিত থাকিতেন এবং এই দূতকে তাঁহার কাছে আসিতে না দিতেন। মনের মধ্যে নানা ইতস্তত করিয়া পত্র খুলিলেন।

তাহার মধ্যে কিছুমাত্র ভর্ৎসনা ছিল না। গোবিন্দমাণিক্য তাঁহাকে লজ্জা দিয়া একটি কথাও বলেন নাই। ভাইয়ের প্রতি লেশমাত্র অভিমান প্রকাশ করেন নাই। নক্ষত্ররায় যে সৈন্যসামন্ত লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন, সে কথার উল্লেখ মাত্র করেন নাই। উভয়ের মধ্যে পূর্বে যেমন ভাব ছিল, এখনও অবিকল যেন সেই ভাবই আছে। অথচ সমস্ত পত্রের মধ্যে একটি সুগভীর স্নেহ ও বিষাদ প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে— তাহা কোনো স্পষ্ট কথায় ব্যক্ত হয় নাই বলিয়া নক্ষত্ররায়ের হৃদয়ে অধিক আঘাত লাগিল।

চিঠি পড়িতে পড়িতে অল্পে অল্পে তাঁহার মুখভাবের পরিবর্তন হইতে লাগিল। হৃদয়ের পাষাণ-আবরণ দেখিতে দেখিতে ফাটিয়া গেল। চিঠি তাহার কম্পমান হাতে কাঁপিতে লাগিল। সে চিঠি লইয়া কিয়ৎক্ষণ মাথায় ধারণ করিয়া রাখিলেন। সে চিঠির মধ্যে ভ্রাতার যে আশীর্বাদ ছিল তাহা যেন শীতল নির্ঝরের মতো তাঁহার তপ্ত হৃদয়ে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পর্যন্ত স্থির হইয়া সুদূর পশ্চিমে সন্ধ্যারাগরক্ত শ্যামল বনভূমির দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। চারি দিকে নিস্তব্ধ সন্ধ্যা অতলস্পর্শ শব্দহীন শান্ত সমুদ্রের মতো জাগিয়া রহিল। ক্রমে তাঁহার চক্ষে জল দেখা দিল, দ্রুতবেগে অশ্রু পড়িতে লাগিল। সহসা লজ্জায় ও অনুতাপে নক্ষত্ররায় দুই হাতে মুখ প্রচ্ছন্ন করিয়া ধরিলেন।

কাঁদিয়া বলিলেন, "আমি এ রাজ্য চাই না। দাদা, আমার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিয়া আমাকে তোমার পদতলে স্থান দাও, আমাকে তোমার কাছে রাখিয়া দাও, আমাকে দূরে তাড়াইয়া দিয়ো না।"

বিল্বন একটি কথাও বলিলেন না— আর্দ্র হৃদয়ে চুপ করিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে নক্ষত্ররায় যখন প্রশান্ত হইলেন, তখন বিল্বন কহিলেন, "যুবরাজ, আপনার পথ চাহিয়া গোবিন্দমাণিক্য বসিয়া আছেন, আর বিলম্ব করিবেন না।"

নক্ষত্ররায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কি তিনি মাপ করিবেন ?"

বিল্বন কহিলেন, "তিনি যুবরাজের প্রতি কিছুমাত্র রাগ করেন নাই। অধিক

রাত্রি হইলে পথে কষ্ট হইবে। শীঘ্র একটি অশ্ব লউন। পর্বতের নীচে মহারাজের লোক অপেক্ষা করিয়া আছে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "আমি গোপনে পলায়ন করি, সৈন্যদের কিছু জানাইয়া কাজ নাই। আর তিলমাত্র বিলম্ব করিয়া কাজ নাই, যত শীঘ্র এখান হইতে বাহির হইয়া পড়া যায় ততই ভালো।"

বিল্বন কহিলেন, "ঠিক কথা।"

তিনমুড়া পাহাড়ে সন্ন্যাসীর সহিত শিবলিঙ্গের পূজা করিতে যাইতেছেন বলিয়া নক্ষত্ররায় বিল্বনের সহিত অশ্বারোহণে যাত্রা করিলেন। অনুচরগণ সঙ্গে যাইতে চাহিল, তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন।

সবে বাহির হইয়াছেন মাত্র, এমন সময়ে অশ্বের ক্ষুরধ্বনি ও সৈন্যদের কোলাহল শুনিতে পাইলেন। নক্ষত্ররায় নিতান্ত সংকুচিত হইয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে রঘুপতি সৈন্য লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "মহারাজ, কোথায় যাইতেছেন?"

নক্ষত্ররায় কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না। নক্ষত্ররায়কে নিরুত্তর দেখিয়া বিল্বন কহিলেন, "মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন।"

রঘুপতি বিল্বনের আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিলেন, একবার ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, তার পরে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন, "আজ এমন অসময়ে আমরা আমাদের মহারাজকে বিদায় দিতে পারি না। ব্যস্ত হইবার তো কোনো কারণ নাই। কাল প্রাতঃকালে যাত্রা করিলেই তো হইবে। কী বলেন মহারাজ?"

নক্ষত্ররায় মৃদুস্বরে কহিলেন, "কাল সকালেই যাইব, আজ রাত হইয়া গেছে।"

বিল্বন নিরাশ হইয়া সে রাত্রি শিবিরেই যাপন করিলেন। পরদিন প্রভাতে নক্ষত্র-রায়ের নিকট যাইতে চেষ্টা করিলেন, সৈন্যেরা বাধা দিল। দেখিলেন চতুর্দিকে পাহারা, কোনো দিকে ছিদ্র নাই। অবশেষে রঘুপতির নিকট গিয়া কহিলেন, "যাত্রার সময় হইয়াছে, যুবরাজকে সংবাদ দিন।"

রঘুপতি কহিলেন, "মহারাজ যাইবেন না স্থির করিয়াছেন।"

বিল্বন কহিলেন, "আমি একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।"

রঘুপতি। সাক্ষাৎ হইবে না তিনি বলিয়া দিয়াছেন।

বিল্বন কহিলেন, "মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের পত্রের উত্তর চাই।"

রঘুপতি। পত্রের উত্তর ইতিপূর্বে আর-একবার দেওয়া হইয়াছে।

বিল্বন। আমি তাঁহার নিজমুখে উত্তর শুনিতে চাই।

রঘুপতি। তাহার কোনো উপায় নাই।

বিল্বন বুঝিলেন বৃথা চেষ্টা ; কেবল সময় ও বাক্য -ব্যয়। যাইবার সময় রঘুপতিকে বলিয়া গেলেন, "ব্রাহ্মণ, এ কী সর্বনাশ-সাধনে তুমি প্রবৃত্ত হইয়াছ! এ তো ব্রাহ্মণের কাজ নয়।"

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিল্বন ফিরিয়া গিয়া দেখিলেন, ইতিমধ্যে রাজা কুকিদের বিদায় করিয়া দিয়াছেন। তাহারা রাজ্যমধ্যে উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। সৈন্যদল প্রায় ভাঙিয়া দিয়াছেন। যুদ্ধের উদ্‌যোগ বড়ো একটা কিছু নাই। বিল্বন ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে সমস্ত বিবরণ বলিলেন।

রাজা কহিলেন, "তবে ঠাকুর, আমি বিদায় হই। নক্ষত্রের জন্য রাজ্য ধন রাখিয়া দিয়া চলিলাম।"

বিল্বন কহিলেন, "অসহায় প্রজাদিগকে পরহস্তে ফেলিয়া দিয়া তুমি পলায়ন করিবে, ইহা স্মরণ করিয়া আমি কোনোমতেই প্রসন্ন মনে বিদায় দিতে পারি না মহারাজ! বিমাতার হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিয়া ভারমুক্ত মাতা শান্তিলাভ করিলেন, ইহা কি কল্পনা করা যায়?"

রাজা কহিলেন, "ঠাকুর, তোমার বাক্য আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া প্রবেশ করে। কিন্তু এবার আমাকে মার্জনা করো, আমাকে আর অধিক কিছু বলিয়ো না। আমাকে বিচলিত করিবার চেষ্টা করিয়ো না। তুমি জানো ঠাকুর, আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম রক্তপাত আর করিব না, সে প্রতিজ্ঞা আমি ভাঙিতে পারি না।

বিল্বন কহিলেন, "তবে এখন মহারাজ কী করিবেন?"

রাজা কহিলেন, "তবে তোমাকে সমস্ত বলি। আমি ধ্রুবকে সঙ্গে করিয়া বনে যাইব। ঠাকুর, আমার জীবন অত্যন্ত অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। যাহা মনে করিয়াছিলাম তাহার কিছুই করিতে পারি নাই— জীবনের যতখানি চলিয়া গেছে তাহা ফিরিয়া পাইয়া আর নূতন করিয়া গড়িতে পারিব না— আমার মনে হইতেছে, ঠাকুর, অদৃষ্ট যেন আমাদিগকে তীরের মতো নিক্ষেপ করিয়াছে, লক্ষ্য হইতে যদি একবার একটু বাঁকিয়া গিয়া থাকি, তবে আর যেন সহস্র চেষ্টায় লক্ষ্যের মুখে ফিরিতে পারি না। জীবনের আরম্ভ-সময়ে আমি সেই যে বাঁকিয়া গিয়াছি, জীবনের শেষকালে আমি আর লক্ষ্য খুঁজিয়া পাইতেছি না। যাহা মনে করি তাহা আর হয় না।

যে সময়ে জাগিলে আত্মরক্ষা করিতে পারিতাম সে সময়ে জাগি নাই, যে সময়ে ডুবিয়াছি তখন চৈতন্য হইয়াছে। সমুদ্রে পড়িলে লোকে যেভাবে কাষ্ঠখণ্ড অবলম্বন করে আমি বালক ধ্রুবকে সেইভাবে অবলম্বন করিতেছি। আমি ধ্রুবের মধ্যে আত্মসমাধান করিয়া ধ্রুবের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করিব। আমি প্রথম হইতে ধ্রুবকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিব। ধ্রুবের সহিত তিলে তিলে আমিই বাড়িতে থাকিব। আমার মানবজন্ম সম্পূর্ণ করিব। ঠাকুর, আমি মানুষের মতো নই, আমি রাজা হইয়া কী করিব!"

শেষ কথাটা রাজা অত্যন্ত আবেগের সহিত উচ্চারণ করিলেন— শুনিয়া ধ্রুব রাজার হাঁটুর উপর তাহার মাথা ঘষিয়া ঘষিয়া কহিল, "আমি আজা।"

বিল্বন হাসিয়া ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইলেন। অনেকক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অবশেষে রাজাকে কহিলেন, "বনে কি কখনো মানুষ গড়া যায়? বনে কেবল একটা উদ্ভিদ পালন করিয়া তোলা যাইতে পারে। মানুষ মনুষ্যসমাজেই গঠিত হয়।"

রাজা কহিলেন, "আমি নিতান্তই বনবাসী হইব না, মনুষ্যসমাজ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে থাকিব মাত্র, অথচ সমাজের সহিত সমস্ত যোগ বিচ্ছিন্ন করিব না। এ কেবল দিন-কতকের জন্য।"

এ দিকে নক্ষত্ররায় সৈন্য-সমেত রাজধানীর নিকটবর্তী হইলেন। প্রজাদের ধনধান্য লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। প্রজারা কেবল গোবিন্দমাণিক্যকেই অভিশাপ দিতে লাগিল। তাহারা কহিল, "এ সমস্তই কেবল রাজার পাপে ঘটিতেছে।"

রাজা একবার রঘুপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। রঘুপতি উপস্থিত হইলে তাঁহাকে কহিলেন, "আর কেন প্রজাদিগকে কষ্ট দিতেছ? আমি নক্ষত্ররায়কে রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছি। তোমার মোগল-সৈন্যদের বিদায় করিয়া দাও।"

রঘুপতি কহিলেন, "যে আজ্ঞা, আপনি বিদায় হইলেই আমি মোগল-সৈন্যদের বিদায় করিয়া দিব— ত্রিপুরা লুণ্ঠিত হয় ইহা আমার ইচ্ছা নহে।"

রাজা সেইদিনই রাজ্য ছাড়িয়া যাত্রার উদ্‌যোগ করিলেন, তাঁহার রাজবেশ ত্যাগ করিলেন, গেরুয়া বসন পরিলেন। নক্ষত্ররায়কে রাজার সমস্ত কর্তব্য স্মরণ করাইয়া এক দীর্ঘ আশীর্বাদ-পত্র লিখিলেন।

অবশেষে রাজা ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া বলিলেন, "ধ্রুব, আমার সঙ্গে বনে যাবে বাছা?"

ধ্রুব তৎক্ষণাৎ রাজার গলা জড়াইয়া কহিল, "যাব।"

এমন সময়ে রাজার সহসা মনে হইল ধ্রুবকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইলে তাহার খুড়া কেদারেশ্বরের সম্মতি আবশ্যক; কেদারেশ্বরকে ডাকাইয়া রাজা কহিলেন, "কেদারেশ্বর, তোমার সম্মতি পাইলে আমি ধ্রুবকে আমার সঙ্গে লইয়া যাই।"

ধ্রুব দিনরাত্রি রাজার কাছেই থাকিত, তাহার খুড়ার সহিত তাহার বড়ো একটা সম্পর্ক ছিল না, এইজন্যই বোধ করি রাজার কখনো মনে হয় নাই যে, ধ্রুবকে সঙ্গে লইয়া গেলে কেদারেশ্বরের কোনো আপত্তি হইতে পারে।

রাজার কথা শুনিয়া কেদারেশ্বর কহিল, "সে আমি পারিব না মহারাজ।"

শুনিয়া রাজার চমক ভাঙিয়া গেল। সহসা তাঁহার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "কেদারেশ্বর, তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো।"

কেদারেশ্বর। না মহারাজ, বনে যাইতে পারিব না।

রাজা কাতর হইয়া কহিলেন, "আমি বনে যাইব না; আমি ধনজন লইয়া লোকালয়ে থাকিব।"

কেদারেশ্বর কহিল, "আমি দেশ ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।"

রাজা কিছু না বলিয়া গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। তাঁহার সমস্ত আশা ম্রিয়মাণ হইয়া গেল। নিমেষের মধ্যে সমস্ত ধরণীর মুখ যেন পরিবর্তিত হইয়া গেল। ধ্রুব আপন মনে খেলা করিতেছিল— অনেক ক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন অথচ তাহাকে যেন চোখে দেখিতে পাইলেন না। ধ্রুব তাঁহার কাপড়ের প্রান্ত ধরিয়া টানিয়া কহিল, "খেলা করো।"

রাজার সমস্ত হৃদয় গলিয়া অশ্রু হইয়া চোখের কাছে আসিল, অনেক কষ্টে অশ্রুজল দমন করিলেন। মুখ ফিরাইয়া ভগ্নহৃদয়ে কহিলেন, "তবে ধ্রুব রহিল। আমি একাই যাই।"

অবশিষ্ট জীবনের সুদীর্ঘ মরুময় পথ যেন নিমেষের মধ্যে বিদ্যুদালোকে তাঁহার চক্ষুতারকায় অঙ্কিত হইল।

কেদারেশ্বর ধ্রুবের খেলা ভাঙিয়া দিয়া তাহাকে বলিল, "আয়, আমার সঙ্গে আয়।"

বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিল। ধ্রুব ক্রন্দনের স্বরে বলিয়া উঠিল, "না।"

রাজা সচকিত হইয়া ধ্রুবের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। ধ্রুব ছুটিয়া আসিয়া রাজাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকাইল। রাজা

ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিলেন। বিশাল হৃদয় বিদীর্ণ হইতে চাহিতেছিল, ক্ষুদ্র ধ্রুবকে বুকের কাছে চাপিয়া হৃদয়কে দমন করিলেন। ধ্রুবকে সেই অবস্থায় কোলে রাখিয়া তিনি দীর্ঘ কক্ষে পদচারণ করিতে লাগিলেন। ধ্রুব কাঁধে মাথা রাখিয়া অত্যন্ত স্থির হইয়া পড়িয়া রহিল।

অবশেষে যাত্রার সময় হইল। ধ্রুব রাজার কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘুমন্ত ধ্রুবকে ধীরে ধীরে কেদারেশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিয়া রাজা যাত্রা করিলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পূর্বদ্বার দিয়া সৈন্যসামন্ত লইয়া নক্ষত্রমাণিক্য রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন, কিঞ্চিৎ অর্থ ও গুটিকতক অনুচর লইয়া পশ্চিমদ্বারাভিমুখে গোবিন্দমাণিক্য যাত্রা করিলেন। নগরের লোক বাঁশি বাজাইয়া ঢাকঢোলের শব্দ করিয়া হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির সহিত নক্ষত্ররায়কে আহ্বান করিল। গোবিন্দমাণিক্য যে পথ দিয়া অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন সে পথে কেহই তাঁহাকে সমাদর করা আবশ্যক বিবেচনা করিল না। দুই পার্শ্বের কুটিরবাসিনী রমণীরা তাঁহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া গালি দিতে লাগিল, ক্ষুধায় ও ক্ষুধিত সন্তানের ক্রন্দনে তাহাদের জিহ্বা শাণিত হইয়াছে। পরশ্ব গুরুতর দুর্ভিক্ষের সময় যে বৃদ্ধা রাজদ্বারে গিয়া আহার পাইয়াছিল এবং রাজা স্বয়ং যাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন সে তাহার শীর্ণ হস্ত তুলিয়া রাজাকে অভিশাপ দিতে লাগিল। ছেলেরা জননীর কাছ হইতে শিক্ষা পাইয়া বিদ্রূপ করিয়া চীৎকার করিতে করিতে রাজার পিছন পিছন চলিল।

দক্ষিণে বামে কোনো দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সম্মুখে চাহিয়া রাজা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। একজন জুমিয়া ক্ষেত্র হইতে আসিতেছিল, সে রাজাকে দেখিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল। রাজার হৃদয় আর্দ্র হইয়া গেল। তিনি তাহার নিকটে স্নেহ-আকুল কণ্ঠে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। কেবল এই একটি জুমিয়া তাঁহার সমুদয় সন্তান প্রজাদের হইয়া তাঁহার রাজত্বের অবসানে তাঁহাকে ভক্তিভরে ম্লানহৃদয়ে বিদায় দিল। রাজার পশ্চাতে ছেলের পাল চীৎকার করিতেছে দেখিয়া সে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে তাড়া করিয়া গেল। রাজা তাহাকে নিষেধ করিলেন।

অবশেষে পথের যে অংশে কেদারেশ্বরের কুটির ছিল, রাজা সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন একবার দক্ষিণে ফিরিয়া চাহিলেন। এখন শীতের প্রাতঃকাল। কুয়াশা কাটিয়া সূর্যরশ্মি সবে দেখা দিয়াছে। কুটিরের দিকে চাহিয়া রাজার গত বৎসরের আষাঢ় মাসের এক প্রাতঃকাল মনে পড়িল। তখন ঘনমেঘ, ঘনবর্ষা। দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্রের ন্যায় বালিকা হাসি অচেতনে শয্যার প্রান্তে মিলাইয়া শুইয়া আছে। ক্ষুদ্র তাতা কিছুই না বুঝিতে পারিয়া কখনো বা দিদির অঞ্চলের প্রান্ত মুখে পুরিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া আছে, কখনো বা তাহার গোল গোল ছোটো ছোটো মোটা মোটা হাত দিয়া আস্তে আস্তে দিদির মুখ চাপড়াইতেছে। আজিকার এই অগ্রহায়ণ মাসের শিশিরসিক্ত শুভ্র প্রাতঃকাল সেই আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। রাজার কি মনে পড়িল যে, যে অদৃষ্ট আজ তাঁহাকে রাজ্যত্যাগী ও অপমানিত করিয়া গৃহ হইতে বিদায় করিয়া দিতেছে, সেই অদৃষ্ট এই ক্ষুদ্র কুটিরদ্বারে সেই আষাঢ়ের অন্ধকার প্রাতঃকালে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল। এই-খানেই তাহার সহিত সেই প্রথম সাক্ষাৎ। রাজা অন্যমনস্ক হইয়া এই কুটিরের সম্মুখে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। তাঁহার অনুচরগণ ছাড়া তখন পথে আর কেহ লোক ছিল না। জুমিয়ার নিকট তাড়া খাইয়া ছেলেগুলো পালাইয়াছে, কিন্তু জুমিয়া দূরবর্তী হইতেই আবার তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাদের চীৎকারে চেতনালাভ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া রাজা আবার ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন।

সহসা বালকদিগের চীৎকারের মধ্যে একটি সুমিষ্ট পরিচিত কণ্ঠ তাঁহার কানে আসিয়া প্রবেশ করিল। দেখিলেন, ছোটো ধ্রুব তাহার ছোটো ছোটো পা ফেলিয়া দুই হাত তুলিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিতেছে। কেদারেশ্বর নূতন রাজাকে আগেভাগে সম্মান প্রদর্শন করিতে গিয়াছে, কুটিরে কেবল ধ্রুব এবং এক বৃদ্ধা পরিচারিকা ছিল। গোবিন্দমাণিক্য ঘোড়া থামাইয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলেন। ধ্রুব ছুটিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া একেবারে তাঁহার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল ; ধ্রুব তাঁহার কাপড় ধরিয়া টানিয়া, তাঁহার হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া, তাহার প্রথম আনন্দের উচ্ছ্বাস অবসান হইলে পর, গম্ভীর হইয়া রাজাকে বলিল, "আমি টক্‌টক্ চ'ব।"

রাজা তাহাকে ঘোড়ায় চড়াইয়া দিলেন। ঘোড়ার উপর চড়িয়া সে রাজার গলা জড়াইয়া ধরিল, এবং তাহার কোমল কপোলখানি রাজার কপোলের উপরে নিবিষ্ট করিয়া রহিল। ধ্রুব তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে রাজার মধ্যে কী একটা পরিবর্তন অনুভব করিতে লাগিল। গভীর ঘুম ভাঙাইবার জন্য লোকে যেমন নানারূপ চেষ্টা করে,

ধ্রুব তেমনি তাঁহাকে টানিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া তাঁহাকে চুমো খাইয়া কোনোক্রমে তাঁহার পূর্বভাব ফিরাইয়া আনিবার অনেক চেষ্টা করিল। অবশেষে অকৃতকার্য হইয়া মুখের মধ্যে গোটা দুয়েক আঙুল পুরিয়া দিয়া বসিয়া রহিল। রাজা ধ্রুবের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বারবার চুম্বন করিলেন।

অবশেষে কহিলেন, "ধ্রুব, আমি তবে যাই।"

ধ্রুব রাজার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমি যাব।"

রাজা কহিলেন, "তুমি কোথায় যাবে, তুমি তোমার কাকার কাছে থাকো।"

ধ্রুব কহিল, "না, আমি যাব।"

এমন সময় কুটির হইতে বৃদ্ধা পরিচারিকা বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া বকিতে বকিতে উপস্থিত হইল; সবেগে ধ্রুবের হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল, "চল্‌।"

ধ্রুব অমনি সভয়ে সবলে দুই হাতে রাজাকে জড়াইয়া রাজার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া রহিল। রাজা কাতর হইয়া ভাবিলেন, বক্ষের শিরা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলা যায় তবু এ দুটি হাতের বন্ধন কি ছেঁড়া যায়! কিন্তু তাও ছিঁড়িতে হইল। আস্তে আস্তে ধ্রুবের দুই হাত খুলিয়া বলপূর্বক ধ্রুবকে পরিচারিকার হাতে দিলেন। ধ্রুব প্রাণপণে কাঁদিয়া উঠিল; হাত তুলিয়া কহিল, "বাবা, আমি যাব।" রাজা আর পিছনে না চাহিয়া দ্রুত ঘোড়ায় চড়িয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। যতদূর যান ধ্রুবের আকুল ক্রন্দন শুনিতে পাইলেন, ধ্রুব কেবল তাহার দুই হাত তুলিয়া বলিতে লাগিল, "বাবা, আমি যাব।" অবশেষে রাজার প্রশান্ত চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি আর পথঘাট কিছুই দেখিতে পাইলেন না। বাষ্পজালে সূর্যালোক এবং সমস্ত জগৎ যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ঘোড়া যে দিকে ইচ্ছা ছুটিতে লাগিল।

পথের মধ্যে এক জায়গায় একদল মোগল-সৈন্য আসিয়া রাজাকে লক্ষ্য করিয়া হাসিতে লাগিল, এমন-কি তাঁহার অনুচরদের সহিত কিঞ্চিৎ কঠোর বিদ্রূপ আরম্ভ করিল। রাজার একজন সভাসদ অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন, তিনি এই দৃশ্য দেখিয়া রাজার নিকটে ছুটিয়া আসিলেন। কহিলেন, "মহারাজ, এ অপমান তো আর সহ্য হয় না। মহারাজের এই দীন বেশ দেখিয়া ইহারা এরূপ সাহসী হইয়াছে। এই লউন তরবারি, এই লউন উষ্ণীষ। মহারাজ কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমি আমার লোক লইয়া আসিয়া এই বর্বরদিগকে একবার শিক্ষা দিই।"

রাজা কহিলেন, "না নয়নরায়, আমার তরবারি-উষ্ণীষে প্রয়োজন নাই। ইহারা আমার কী করিবে? আমি এখন ইহা অপেক্ষা অনেক গুরুতর অপমান সহ্য করিতে পারি। মুক্ত তরবারি তুলিয়া আমি এ পৃথিবীর লোকের নিকট হইতে আর সম্মান

আদায় করিতে চাহি না। পৃথিবীর সর্বসাধারণে যেরূপ সুসময়ে দুঃসময়ে মান-অপমান সুখ-দুঃখ সহ্য করিয়া থাকে, আমিও জগদীশ্বরের মুখ চাহিয়া সেইরূপ সহ্য করিব। বন্ধুরা বিপক্ষ হইতেছে, আশ্রিতেরা কৃতঘ্ন হইতেছে, প্রণতেরা দুর্বিনীত হইয়া উঠিতেছে, এক কালে হয়তো ইহা আমার অসহ্য হইত, কিন্তু এখন ইহা সহ্য করিয়াই আমি হৃদয়ের মধ্যে আনন্দ লাভ করিতেছি। যিনি আমার বন্ধু তাঁহাকে আমি জানিয়াছি। যাও নয়নরায়, তুমি ফিরিয়া যাও, নক্ষত্রকে সমাদরপূর্বক আহ্বান করিয়া আনো, আমাকে যেমন সম্মান করিতে নক্ষত্রকেও তেমনি সম্মান করিয়ো। তোমরা সকলে মিলিয়া সর্বদা নক্ষত্রকে সুপথে এবং প্রজার কল্যাণে রক্ষা করো, তোমাদের কাছে আমার বিদায়কালের এই প্রার্থনা। দেখিয়ো, ভ্রমেও কখনো যেন আমার কথার উল্লেখ করিয়া বা আমার সহিত তুলনা করিয়া তাহার তিলমাত্র নিন্দা করিয়ো না। তবে আমি বিদায় হই।"

বলিয়া রাজা তাঁহার সভাসদের সহিত কোলাকুলি করিয়া অগ্রসর হইলেন, সভাসদ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অশ্রুজল মুছিয়া চলিয়া গেলেন।

যখন গোমতীতীরের উচ্চ পাড়ের কাছে গিয়া পৌঁছিলেন তখন বিল্বন ঠাকুর অরণ্য হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া অঞ্জলি তুলিয়া কহিলেন, "জয় হউক।"

রাজা অশ্ব হইতে নামিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

বিল্বন কহিলেন, "আমি তোমার কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

রাজা কহিলেন, "ঠাকুর, তুমি নক্ষত্রের কাছে থাকিয়া তাহাকে সৎপরামর্শ দাও। রাজ্যের হিতসাধন করো।"

বিল্বন কহিলেন, "না। তুমি যেখানে রাজা নও, সেখানে আমি অকর্মণ্য। এখানে থাকিয়া আমি আর কোনো কাজ করিতে পারিব না।"

রাজা কহিলেন, "তবে কোথায় যাইবে ঠাকুর? আমাকে তবে দয়া করো, তোমাকে পাইলে আমি দুর্বল হৃদয়ে বল পাই।"

বিল্বন কহিলেন, "কোথায় আমার কাজ আছে আমি তাহাই অনুসন্ধান করিতে চলিলাম। আমি কাছে থাকি আর দূরে থাকি তোমার প্রতি আমার প্রেম কখনো বিচ্ছিন্ন হইবে না জানিয়ো। কিন্তু তোমার সহিত বনে গিয়া আমি কী করিব?"

রাজা মৃদুস্বরে কহিলেন, "তবে আমি বিদায় হই।"

বলিয়া দ্বিতীয়বার প্রণাম করিলেন। বিল্বন এক দিকে চলিয়া গেলেন, রাজা অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নক্ষত্ররায় ছত্রমাণিক্য নাম ধারণ করিয়া মহাসমারোহে রাজপদ গ্রহণ করিলেন। রাজকোষে অর্থ অধিক ছিল না। প্রজাদের যথাসর্বস্ব হরণ করিয়া প্রতিশ্রুত অর্থ দিয়া মোগল-সৈন্যদের বিদায় করিতে হইল। ঘোরতর দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য লইয়া ছত্রমাণিক্য রাজত্ব করিতে লাগিলেন। চতুর্দিক হইতে অভিশাপ ও ক্রন্দন বর্ষিত হইতে লাগিল।

যে আসনে গোবিন্দমাণিক্য বসিতেন, যে শয্যায় গোবিন্দমাণিক্য শয়ন করিতেন, যে-সকল লোক গোবিন্দমাণিক্যের প্রিয় সহচর ছিল, তাহারা যেন রাত্রিদিন নীরবে ছত্রমাণিক্যকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। ছত্রমাণিক্যের ক্রমে তাহা অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। তিনি চোখের সম্মুখ হইতে গোবিন্দমাণিক্যের সমস্ত চিহ্ন মুছিতে আরম্ভ করিলেন। গোবিন্দমাণিক্যের ব্যবহার্য সামগ্রী নষ্ট করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার প্রিয় অনুচরদিগকে দূর করিয়া দিলেন। গোবিন্দমাণিক্যের নামগন্ধ তিনি আর সহ্য করিতে পারিতেন না। গোবিন্দমাণিক্যের কোনো উল্লেখ হইলেই তাঁহার মনে হইত সকলে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই এই উল্লেখ করিতেছে। সর্বদা মনে হইত সকলে তাঁহাকে রাজা বলিয়া যথেষ্ট সম্মান করিতেছে না; এইজন্য সহসা অকারণে ক্ষাপা হইয়া উঠিতেন, সভাসদ্‌দিগকে শশব্যস্ত থাকিতে হইত।

তিনি রাজকার্য কিছুই বুঝিতেন না; কিন্তু কেহ পরামর্শ দিতে আসিলে তিনি চটিয়া উঠিয়া বলিতেন, "আমি আর এইটে বুঝি নে! তুমি কি আমাকে নির্বোধ পাইয়াছ!"

তাঁহার মনে হইত, সকলে তাঁহাকে সিংহাসনে অনধিকারী রাজ্যাপহারক জ্ঞান করিয়া মনে মনে তাচ্ছিল্য করিতেছে। এইজন্য সজোরে অত্যধিক রাজা হইয়া উঠিলেন; যথেচ্ছাচরণ করিয়া সর্বত্র তাঁহার একাধিপত্য প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি যে রাখিলে রাখিতে পারেন, মারিলে মারিতে পারেন, ইহা বিশেষরূপে প্রমাণ করিবার জন্য যাহাকে রাখা উচিত নহে তাহাকে রাখিলেন— যাহাকে মারা উচিত নহে তাহাকে মারিলেন। প্রজারা অন্নাভাবে মরিতেছে, কিন্তু তাঁহার দিনরাত্রি সমারোহের শেষ নাই— অহরহ নৃত্য গীত বাদ্য ভোজ। ইতিপূর্বে আর-কোনো রাজা সিংহাসনে চড়িয়া বসিয়া রাজত্বের পেখম সমস্তটা ছড়াইয়া দিয়া এমন অপূর্ব নৃত্য করে নাই।

*

প্রজারা চারি দিকে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল— ছত্রমাণিক্য তাহাতে অত্যন্ত জলিয়া উঠিলেন ; তিনি মনে করিলেন, এ কেবল রাজার প্রতি অসম্মান-প্রদর্শন। তিনি অসন্তোষের দ্বিগুণ কারণ জন্মাইয়া দিয়া বলপূর্বক পীড়নপূর্বক ভয় দেখাইয়া সকলের মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন, সমস্ত রাজ্য নিদ্রিত নিশীথের মতো নীরব হইয়া গেল। সেই শান্ত নক্ষত্ররায় ছত্রমাণিক্য হইয়া যে সহসা এরূপ আচরণ করিবেন ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। অনেক সময়ে দুর্বলহৃদয়েরা প্রভুত্ব পাইলে এইরূপ প্রচণ্ড ও যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠে।

রঘুপতির কাজ শেষ হইয়া গেল। শেষ পর্যন্তই প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে সমান জাগ্রত ছিল তাহা নহে। ক্রমে প্রতিহিংসার ভাব ঘুচিয়া গিয়া যে কাজে হাত দিয়াছেন সেই কাজটা সম্পন্ন করিয়া তোলা তাঁহার একমাত্র ব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। নানা কৌশলে বাধাবিপত্তি সমস্ত অতিক্রম করিয়া দিনরাত্রি একটা উদ্দেশ্যসাধনে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি একপ্রকার মাদক সুখ অনুভব করিতেছিলেন। অবশেষে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া গেল। পৃথিবীতে আর কোথাও সুখ নাই।

রঘুপতি তাঁহার মন্দিরে গিয়া দেখিলেন সেখানে জনপ্রাণী নাই। যদিও রঘুপতি বিলক্ষণ জানিতেন যে জয়সিংহ নাই, তথাপি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া যেন দ্বিতীয় বার নূতন করিয়া জানিলেন যে, জয়সিংহ নাই। এক-একবার মনে হইতে লাগিল যেন আছে, তার পরে স্মরণ হইতে লাগিল যে নাই। সহসা বায়ুতে কপাট খুলিয়া গেল, তিনি চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, জয়সিংহ আসিল না। জয়সিংহ যে ঘরে থাকিত মনে হইল সে ঘরে জয়সিংহ থাকিতেও পারে— কিন্তু অনেকক্ষণ সে ঘরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না, মনে ভয় হইতে লাগিল পাছে গিয়া দেখেন জয়সিংহ সেখানে নাই।

অবশেষে যখন গোধূলির ঈষৎ অন্ধকারে বনের ছায়া গাঢ়তর ছায়ায় মিলাইয়া গেল তখন রঘুপতি ধীরে ধীরে জয়সিংহের গৃহে প্রবেশ করিলেন— শূন্য বিজন গৃহ সমাধিভবনের মতো নিস্তব্ধ। ঘরের মধ্যে এক পাশে একটি কাঠের সিন্দুক এবং সিন্দুকের পার্শ্বে জয়সিংহের একজোড়া খড়ম ধূলিমলিন হইয়া পড়িয়া আছে। ভিত্তিতে জয়সিংহের স্বহস্তে আঁকা কালীমূর্তি। ঘরের পূর্বকোণে একটি ধাতুপ্রদীপ ধাতু-আধারের উপর দাঁড়াইয়া আছে, গত বৎসর হইতে সে প্রদীপ কেহ জ্বালায় নাই— মাকড়সার জালে সে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। নিকটবর্তী দেয়ালে প্রদীপ-শিখার কালো দাগ পড়িয়া আছে। গৃহে পূর্বোক্ত কয়েকটি দ্রব্য ছাড়া আর কিছুই নাই। রঘুপতি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। সে নিশ্বাস শূন্য গৃহে ধ্বনিত হইয়া

উঠিল। ক্রমে অন্ধকারে আর কিছুই দেখা যায় না। একটা টিকটিকি মাঝে মাঝে কেবল টিক্‌টিক্‌ শব্দ করিতে লাগিল। মুক্ত দ্বার দিয়া ঘরের মধ্যে শীতের বায়ু প্রবেশ করিতে লাগিল। রঘুপতি সিন্দুকের উপরে বসিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

এইরূপে এক মাস এই বিজন মন্দিরে কাটাইলেন, কিন্তু এমন করিয়া আর দিন কাটে না। পৌরোহিত্য ছাড়িতে হইল। রাজসভায় গেলেন। রাজ্যশাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, অবিচার উৎপীড়ন ও বিশৃঙ্খলা ছত্রমাণিক্য নাম ধরিয়া রাজত্ব করিতেছে। তিনি রাজ্যে শৃঙ্খলাস্থাপনের চেষ্টা করিলেন। ছত্রমাণিক্যকে পরামর্শ দিতে গেলেন।

ছত্রমাণিক্য চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, রাজ্যশাসনকার্যের তুমি কী জানো? এ-সব বিষয় তুমি কিছু বোঝ না।"

রঘুপতি রাজার প্রতাপ দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। দেখিলেন, সে নক্ষত্ররায় আর নাই। রঘুপতির সহিত রাজার ক্রমাগত খিটিমিটি বাধিতে লাগিল। ছত্রমাণিক্য মনে করিলেন যে, রঘুপতি কেবলই ভাবিতেছে যে রঘুপতিই তাঁহাকে রাজা করিয়া দিয়াছে। এই জন্য রঘুপতিকে দেখিলে তাঁহার অসহ্য বোধ হইত।

অবশেষে এক দিন স্পষ্ট বলিলেন, "ঠাকুর, তুমি তোমার মন্দিরের কাজ করোগে। রাজসভায় তোমার কোনো প্রয়োজন নাই।"

রঘুপতি ছত্রমাণিক্যের প্রতি জ্বলন্ত তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ছত্রমাণিক্য ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

নক্ষত্ররায় যেদিন নগরপ্রবেশ করেন কেদারেশ্বর সেইদিনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়, কিন্তু বহু চেষ্টাতেও সে তাঁহার নজরে পড়িল না। সৈন্যেরা ও প্রহরীরা তাহাকে ঠেলিয়াঠুলিয়া, তাড়া দিয়া, নাড়া দিয়া, বিব্রত করিয়া তুলিল। অবশেষে সে প্রাণ লইয়া পলাইয়া যায়। গোবিন্দমাণিক্যের আমলে সে রাজভোগে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া প্রাসাদে বাস করিত, যুবরাজ নক্ষত্ররায়ের সহিত তাহার বিশেষ প্রণয়ও ছিল। কিছুকাল প্রাসাদচ্যুত হইয়া তাহার জীবনধারণ করা দায় হইয়া উঠিয়াছে; যখন সে রাজার ছায়ায় ছিল তখন সকলে তাহাকে সভয়ে সম্মান করিত, কিন্তু এখন তাহাকে কেহই আর গ্রাহ্য করে না। পূর্বে রাজসভায় কাহারও

কিছু প্রয়োজন হইলে তাহাকে হাতে-পায়ে আসিয়া ধরিত, এখন পথ দিয়া চলিবার সময় কেহ তাহার সঙ্গে দুটো কথা কহিবার অবসর পায় না। ইহার উপরে আবার অন্নকষ্টও হইয়াছে। এমন অবস্থায় প্রাসাদে পুনর্বার প্রবেশ করিতে পারিলে তাহার বিশেষ সুবিধা হয়। সে একদিন অবসরমত কিছু ভেট সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ্য রাজ-দরবারে ছত্রমাণিক্যের সহিত দেখা করিতে গেল। পরম পরিতোষ প্রকাশ-পূর্বক অত্যন্ত পোষ-মানা বিনীত হাস্য হাসিতে হাসিতে রাজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাজা তাহাকে দেখিয়াই জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "হাসি কিসের জন্য! তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা পাইয়াছ! তুমি একি রহস্য করিতে আসিয়াছ!"

অমনি চোপদার জমাদার বরকন্দাজ মন্ত্রী অমাত্য সকলেই হাঁকার দিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ কেদারেশ্বরের বিকশিত দন্তপংক্তির উপর যবনিকাপতন হইল।

ছত্রমাণিক্য কহিলেন, "তোমার কী বলিবার আছে শীঘ্র বলিয়া চলিয়া যাও।"

কেদারেশ্বরের কী বলিবার ছিল মনে পড়িল না। অনেক কষ্টে সে মনে মনে যে বক্তৃতাটুকু গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা পেটের মধ্যেই চুরমার হইয়া গেল।

অবশেষে রাজা যখন বলিলেন "তোমার যদি কিছু বলিবার না থাকে তো চলিয়া যাও", তখন কেদারেশ্বর চটপট একটা যা-হয়-কিছু বলা আবশ্যক বিবেচনা করিল। চোখে মুখে কণ্ঠস্বরে সহসা প্রচুর পরিমাণে করুণ রস সঞ্চার করিয়া বলিল, "মহারাজ, ধ্রুবকে কি ভুলিয়া গিয়াছেন?"

ছত্রমাণিক্য অত্যন্ত আগুন হইয়া উঠিলেন। মূর্খ কেদারেশ্বর কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কহিল, "সে যে মহারাজের জন্য কাকা কাকা করিয়া কাঁদিয়া সারা হইতেছে।"

ছত্রমাণিক্য কহিলেন, "তোমার আস্পর্ধা তো কম নয় দেখিতেছি। তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাকে কাকা বলে? তুমি তাহাকে এই শিক্ষা দিয়াছ!"

কেদারেশ্বর অত্যন্ত কাতর ভাবে জোড়হস্তে কহিল, "মহারাজ—"

ছত্রমাণিক্য কহিলেন, "কে আছ হে— ইহাকে আর সেই ছেলেটাকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দাও তো।"

সহসা স্কন্ধের উপর এতগুলো প্রহরীর হাত আসিয়া পড়িল যে, কেদারেশ্বর তীরের মতো একেবারে বাহিরে ছিটকাইয়া পড়িল। হাত হইতে তাহার ডালি কাড়িয়া লইয়া প্রহরীরা তাহা ভাগ করিয়া লইল। ধ্রুবকে লইয়া কেদারেশ্বর ত্রিপুরা পরিত্যাগ করিল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

রঘুপতি আবার মন্দিরে ফিরিয়া গেলেন। গিয়া দেখিলেন, কোনো প্রেমপূর্ণ হৃদয় বস্ত্রাদি লইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া নাই। পাষাণমন্দির দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মধ্যে কোথাও হৃদয়ের লেশমাত্র নাই। তিনি গিয়া গোমতীতীরের শ্বেত সোপানের উপর বসিলেন। সোপানের বাম পার্শ্বে জয়সিংহের স্বহস্তে রোপিত শেফালিকা গাছে অসংখ্য ফুল ফুটিয়াছে। এই ফুলগুলি দেখিয়া জয়সিংহের সুন্দর মুখ, সরল হৃদয়, সরল জীবন এবং অত্যন্ত সহজ বিশুদ্ধ উন্নত ভাব তাঁহার স্পষ্ট মনে পড়িতে লাগিল। সিংহের ন্যায় সবল তেজস্বী এবং হরিণশিশুর মতো সুকুমার জয়সিংহ রঘুপতির হৃদয়ে সম্পূর্ণ আবির্ভূত হইল, তাঁহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া লইল। ইতিপূর্বে তিনি আপনাকে জয়সিংহের চেয়ে অনেক বড়ো জ্ঞান করিতেন, এখন জয়সিংহকে তাঁহার নিজের চেয়ে অনেক বড়ো মনে হইতে লাগিল। তাঁহার প্রতি জয়সিংহের সেই সরল ভক্তি স্মরণ করিয়া জয়সিংহের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ভক্তির উদয় হইল, এবং নিজের প্রতি তাঁহার অভক্তি জন্মিল। জয়সিংহকে যে-সকল অন্যায় তিরস্কার করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। তিনি মনে মনে কহিলেন, 'জয়সিংহের প্রতি ভর্ৎসনার আমি অধিকারী নই। জয়সিংহের সহিত যদি এক মুহূর্তের জন্য একটিবার দেখা হয়, তবে আমি আমার হীনত্ব স্বীকার করিয়া তাহার নিকট একবার মার্জনা প্রার্থনা করিয়া লই।' জয়সিংহ যখন যাহা যাহা বলিয়াছে করিয়াছে সমস্ত তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। জয়সিংহের সমস্ত জীবন সংহত ভাবে তাঁহার মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল। তিনি এইরূপ একটি মহৎ চরিত্রের মধ্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া সমস্ত বিবাদ বিদ্বেষ ভুলিয়া গেলেন। চারি দিকের গুরুভার সংসার লঘু হইয়া গিয়া তাঁহাকে পীড়ন করিতে বিরত হইল। যে নক্ষত্রমাণিক্যকে তিনিই রাজা করিয়া দিয়াছেন সে যে রাজা হইয়া আজ তাঁহাকেই অপমান করিয়াছে ইহা স্মরণ করিয়া তাঁহার কিছুমাত্র রোষ জন্মিল না। এই মান-অপমান সমস্তই সামান্য মনে করিয়া তাঁহার ঈষৎ হাসি আসিল। কেবল তাঁহার ইচ্ছা করিতে লাগিল জয়সিংহ যাহাতে যথার্থ সন্তুষ্ট হয় এমন একটা-কিছু কাজ করেন। অথচ চতুর্দিকে কাজ কিছুই দেখিতে পাইলেন না— চতুর্দিকে শূন্য হাহাকার করিতেছে। এই বিজন মন্দির তাঁহাকে যেন চাপিয়া ধরিল, তাঁহার যেন নিশ্বাস রোধ করিল। একটা-কিছু বৃহৎ কাজ করিয়া তিনি হৃদয়বেদনা শান্ত করিয়া রাখিবেন, কিন্তু এই-সকল নিস্তব্ধ নিরুদ্যম নিরালয় মন্দিরের দিকে চাহিয়া পিঞ্জরবদ্ধ পাখির

মতো তাঁহার হৃদয় অধীর হইয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া বনের মধ্যে অধীর ভাবে পদচারণ করিতে লাগিলেন। মন্দিরের ভিতরকার অলস অচেতন অকর্মণ্য জড়প্রতিমাগুলির প্রতি তাঁহার অতিশয় ঘৃণার উদয় হইল। হৃদয় যখন বেগে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে তখন কতকগুলি নিরুদ্যম স্থূল পাষাণমূর্তির নিরুদ্যম সহচর হইয়া চিরদিন অতিবাহিত করা তাঁহার নিকটে অত্যন্ত হেয় বলিয়া বোধ হইল। যখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইল, রঘুপতি চক্‌মকি ঠুকিয়া একটি প্রদীপ জ্বালাইলেন। দীপহস্তে চতুর্দশ দেবতার মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গিয়া দেখিলেন, চতুর্দশ দেবতা সমান ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে; গত বৎসর আষাঢ়ের কালরাত্রে ক্ষীণ দীপালোকে ভক্তের মৃতদেহের সম্মুখে রক্তপ্রবাহের মধ্যে যেমন বুদ্ধিহীন হৃদয়হীনের মতো দাঁড়াইয়া ছিল, আজও তেমনি দাঁড়াইয়া আছে।

রঘুপতি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মিথ্যা কথা! সমস্ত মিথ্যা! হা বৎস জয়সিংহ, তোমার অমূল্য হৃদয়ের রক্ত কাহাকে দিলে! এখানে কোনো দেবতা নাই, কোনো দেবতা নাই। পিশাচ রঘুপতি সে রক্ত পান করিয়াছে।"

বলিয়া কালীর প্রতিমা রঘুপতি আসন হইতে টানিয়া তুলিয়া লইলেন। মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া সবলে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। অন্ধকারে পাষাণসোপানের উপর দিয়া পাষাণপ্রতিমা শব্দ করিয়া গড়াইতে গড়াইতে গোমতীর জলের মধ্যে পড়িয়া গেল। অজ্ঞানরাক্ষসী পাষাণ-আকৃতি ধারণ করিয়া এতদিন রক্তপান করিতেছিল, সে আজ গোমতীগর্ভের সহস্র পাষাণের মধ্যে অদৃশ্য হইল, কিন্তু মানবের কঠিন হৃদয়াসন কিছুতেই পরিত্যাগ করিল না। রঘুপতি দীপ নিবাইয়া দিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলেন, সেই রাত্রেই রাজধানী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

নোয়াখালির নিজামতপুরে বিল্বন ঠাকুর কিছুদিন হইতে বাস করিতেছেন। সেখানে ভয়ংকর মড়কের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি একদিন সমস্ত দিন মেঘ করিয়া থাকে, মাঝে মাঝে অল্প অল্প বৃষ্টিও হয়; অবশেষে সন্ধ্যার সময় রীতিমত ঝড় আরম্ভ হয়। প্রথমে পূর্বদিক হইতে প্রবল বায়ু বহিতে থাকে। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় উত্তর ও উত্তর-পূর্ব হইতে প্রবল বেগে ঝড় বহিতে লাগিল। অবশেষে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া ঝড়ের বেগ কমিয়া গেল। এমন সময়ে রব উঠিল— বন্যা আসিতেছে। কেহ

ঘরের চালে উঠিল, কেহ পুষ্করিণীর পাড়ের উপর গিয়া দাঁড়াইল, কেহ বৃক্ষশাখায় কেহ মন্দিরের চূড়ায় আশ্রয় লইল। অন্ধকার রাত্রি, অবিশ্রাম বৃষ্টি— বন্যার গর্জন ক্রমে নিকটবর্তী হইল, আতঙ্কে গ্রামের লোকেরা দিশাহারা হইয়া গেল। এমন সময়ে বন্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। উপরি-উপরি দুই বার তরঙ্গ আসিল, দ্বিতীয় বারের পরে গ্রামে প্রায় আট হাত জল দাঁড়াইল। পরদিন যখন সূর্য উঠিল এবং জল নামিয়া গেল, তখন দেখা গেল— গ্রামে গৃহ অল্পই অবশিষ্ট আছে, এবং লোক নাই— অন্য গ্রাম হইতে মানুষ-গোরু, মহিষ-ছাগল এবং শৃগাল-কুকুরের মৃতদেহ ভাসিয়া আসিয়াছে। সুপারির গাছগুলা ভাঙিয়া ভাসিয়া গেছে, গুঁড়ির কিয়দংশ মাত্র অবশিষ্ট আছে। বড়ো বড়ো আম-কাঁঠালের গাছ সমূলে উৎপাটিত হইয়া কাত হইয়া পড়িয়া আছে। অন্য গ্রামের গৃহের চাল ভাসিয়া আসিয়া ভিত্তির শোকে ইতস্তত উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। অনেকগুলো হাঁড়ি-কলসী বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। অধিকাংশ কুটিরই বাঁশঝাড় আম কাঁঠাল মাদার প্রভৃতি বড়ো বড়ো গাছের দ্বারা আবৃত ছিল, এইজন্য অনেকগুলি মানুষ একেবারে ভাসিয়া না গিয়া গাছে আটকাইয়া গিয়াছিল। কেহ বা সমস্ত রাত্রি বন্যাবেগে দোদুল্যমান বাঁশঝাড়ে দুলিয়াছে, কেহ বা মাদারের কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত, কেহ বা উৎপাটিত বৃক্ষ-সমেত ভাসিয়া গেছে। জল সরিয়া গেলে জীবিত ব্যক্তিরা নামিয়া আসিয়া মৃতের মধ্যে বিচরণ করিয়া আত্মীয়দিগকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। অধিকাংশ মৃতদেহই অপরিচিত এবং ভিন্ন গ্রাম হইতে আগত। কেহই তাহাদিগকে সংকার করিল না। পালে পালে শকুনি আসিয়া মৃতদেহ ভক্ষণ করিতে লাগিল। শৃগাল-কুকুরের সহিত তাহাদের কোনো বিবাদ নাই, কারণ শৃগাল-কুকুরও সমস্ত মরিয়া গিয়াছে। বারো ঘর পাঠান গ্রামে বাস করিত; তাহারা অনেক উচ্চ জমিতে বাস করিত বলিয়া তাহাদের প্রায় কাহারও কোনো ক্ষতি হয় নাই। অবশিষ্ট জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা গৃহ পাইল, তাহারা গৃহে আশ্রয় লইল— যাহারা পাইল না, তাহারা আশ্রয়-অন্বেষণে অন্যত্র গেল। যাহারা বিদেশে ছিল তাহারা দেশে ফিরিয়া আসিয়া নূতন গৃহ নির্মাণ করিল। ক্রমে অল্পে অল্পে পুনশ্চ লোকের বসতি আরম্ভ হইল। এই সময়ে মৃতদেহে পুষ্করিণীর জল দূষিত হইয়া এবং অন্যান্য নানা কারণে গ্রামে মড়ক আরম্ভ হইল। পাঠানদের পাড়ায় মড়কের প্রথম আরম্ভ হইল। মৃতদেহের গোর দিবার বা পরস্পরকে সেবা করিবার অবসর কাহারও রহিল না। হিন্দুরা কহিল, মুসলমানেরা গোহত্যা-পাপের ফল ভোগ করিতেছে। জাতি-বৈরিতায় এবং জাতিচ্যুতিভয়ে কোনো হিন্দু তাহাদিগকে জল দিল না বা কোনো

প্রকার সাহায্য করিল না। বিল্বন সন্ন্যাসী যখন গ্রামে আসিলেন তখন গ্রামের এইরূপ অবস্থা। বিল্বনের কতকগুলি চেলা জুটিয়াছিল, মড়কের ভয়ে তাহারা পালাইবার চেষ্টা করিল। বিল্বন ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে বিরত করিলেন। তিনি পীড়িত পাঠানদিগকে সেবা করিতে লাগিলেন— তাহাদিগকে পথ্য পানীয় ঔষধ এবং তাহাদের মৃতদেহ গোর দিতে লাগিলেন। হিন্দুরা হিন্দু সন্ন্যাসীর অনাচার দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। বিল্বন কহিতেন, 'আমি সন্ন্যাসী, আমার কোনো জাত নাই। আমার জাত মানুষ। মানুষ যখন মরিতেছে তখন কিসের জাত! ভগবানের সৃষ্ট মানুষ যখন মানুষের প্রেম চাহিতেছে তখনই বা কিসের জাত!' হিন্দুরা বিল্বনের অনাসক্ত পরহিতৈষণা দেখিয়া তাঁহাকে ঘৃণা বা নিন্দা করিতে যেন সাহস করিল না। বিল্বনের কাজ ভালো কি মন্দ তাহারা স্থির করিতে পারিল না। তাহাদের অসম্পূর্ণ শাস্ত্রজ্ঞান সন্দিগ্ধভাবে বলিল 'ভালো নহে', কিন্তু তাহাদের হৃদয়ের ভিতরে যে মনুষ্য বাস করিতেছে সে বলিল 'ভালো'। যাহা হউক, বিল্বন অন্য লোকের 'ভালোমন্দে'র দিকে না তাকাইয়া কাজ করিতে লাগিলেন। মুমূর্ষু পাঠানেরা তাঁহাকে দেবতা জ্ঞান করিতে লাগিল। পাঠানের ছোটো ছোটো ছেলেদের তিনি মড়ক হইতে দূরে রাখিবার জন্য হিন্দুদের কাছে লইয়া গেলেন। হিন্দুরা বিষম শশব্যস্ত হইয়া উঠিল, কেহ তাহাদিগকে আশ্রয় দিল না। তখন বিল্বন একটা বড়ো পরিত্যক্ত ভাঙা মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ছেলের পাল সেইখানে রাখিলেন। প্রাতে উঠিয়া বিল্বন তাঁহার ছেলেদের জন্য ভিক্ষা করিতে বাহির হইতেন। কিন্তু ভিক্ষা কে দিবে? দেশে শস্য কোথায়? অনাহারে কত লোক মরিবার উপক্রম করিতেছে। গ্রামের মুসলমান জমিদার অনেক দূরে বাস করিতেন। বিল্বন তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। বহু কষ্টে তাঁহাকে রাজী করিয়া তিনি ঢাকা হইতে চাউল আমদানি করিতে লাগিলেন। তিনি পীড়িতদের সেবা করিতেন এবং তাঁহার চেলারা চাউল বিতরণ করিত। মাঝে মাঝে বিল্বন ছেলেদের সঙ্গে গিয়া খেলা করিতেন। তাহারা তাঁহাকে দেখিলে তুমুল কোলাহল উত্থাপন করিত— সন্ধ্যার সময় মন্দিরের পাশ দিয়া গেলে মনে হইত যেন মন্দিরে সহস্র টিয়াপাখি বাসা করিয়াছে। বিল্বনের এসরাজের আকারের একপ্রকার যন্ত্র ছিল, যখন অত্যন্ত শ্রান্ত হইতেন তখন তাহাই বাজাইয়া গান করিতেন। ছেলেগুলো তাঁহাকে ঘিরিয়া কেহ বা গান শুনিত, কেহ বা যন্ত্রের তার টানিত, কেহ বা তাঁহার অনুকরণে গান করিবার চেষ্টা করিয়া বিষম চীৎকার করিত।

অবশেষে মড়ক মুসলমানপাড়া হইতে হিন্দুপাড়ায় আসিল। গ্রামে একপ্রকার

অরাজকতা উপস্থিত হইল— চুরি-ডাকাতির শেষ নাই, যে যাহা পায় লুঠ করিয়া লয়। মুসলমানেরা দল বাঁধিয়া ডাকাতি আরম্ভ করিল। তাহারা পীড়িতদিগকে শয্যা হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া তক্তা মাদুর বিছানা পর্যন্ত হরণ করিয়া লইয়া যাইত। বিল্বন প্রাণপণে তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বিল্বনের কথা তাহারা অত্যন্ত মান্য করিত— লঙ্ঘন করিতে সাহস করিত না। এইরূপে বিল্বন যথাসাধ্য গ্রামের শান্তি রক্ষা করিতেন।

একদিন সকালে বিল্বনের এক চেলা আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, একটি ছেলে সঙ্গে লইয়া একজন বিদেশী গ্রামের অশথতলায় আশ্রয় লইয়াছে, তাহাকে মড়কে ধরিয়াছে, বোধ করি সে আর বাঁচিবে না। বিল্বন দেখিলেন— কেদারেশ্বর অচেতন হইয়া পড়িয়া, ধ্রুব ধুলায় শুইয়া ঘুমাইয়া আছে। কেদারেশ্বরের মুমূর্ষু অবস্থা— পথকষ্টে এবং অনাহারে সে দুর্বল হইয়াছিল, এইজন্য পীড়া তাহাকে বলপূর্বক আক্রমণ করিয়াছে, কোনো ঔষধে কিছু ফল হইল না, সেই বৃক্ষতলেই তাহার মৃত্যু হইল। ধ্রুবকে দেখিয়া বোধ হইল যেন বহুক্ষণ অনাহারে ক্ষুধায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিল্বন অতি সাবধানে তাহাকে কোলে তুলিয়া তাঁহার শিশুশালায় লইয়া গেলেন।

দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

চট্টগ্রাম এখন আরাকানের অধীন। গোবিন্দমাণিক্য নির্বাসিতভাবে চট্টগ্রামে আসিয়াছেন শুনিয়া আরাকানের রাজা মহাসমারোহপূর্বক তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। বলিয়া পাঠাইলেন, যদি সিংহাসন পুনরায় অধিকার করিতে চান, তাহা হইলে আরাকানপতি তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারেন।

গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন, "না, আমি সিংহাসন চাই না।"

দূত কহিল, "তবে আরাকান-রাজসভায় পূজনীয় অতিথি হইয়া মহারাজ কিছু কাল বাস করুন।"

রাজা কহিলেন, "আমি রাজসভায় থাকিব না। চট্টগ্রামের এক পার্শ্বে আমাকে স্থান দান করিলে আমি আরাকানরাজের নিকটে ঋণী হইয়া থাকিব।"

দূত কহিল, "মহারাজের যেখানে অভিরুচি সেইখানেই থাকিতে পারেন। এ-সমস্ত আপনারই রাজ্য মনে করিবেন।"

আরাকানরাজের কতকগুলি অনুচর রাজার সঙ্গে সঙ্গেই রহিল। গোবিন্দমাণিক্য তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন না; তিনি মনে করিলেন, হয়তো বা আরাকানপতি তাঁহাকে সন্দেহ করিয়া তাঁহার নিকট লোক রাখিতে ইচ্ছা করেন।

ময়ানি নদীর ধারে মহারাজ কুটির বাঁধিয়াছেন। স্বচ্ছসলিলা ক্ষুদ্র নদী ছোটো বড়ো শিলাখণ্ডের উপর দিয়া দ্রুতবেগে চলিয়াছে। দুই পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণের পাহাড় খাড়া হইয়া আছে, কালো পাথরের উপর বিচিত্র বর্ণের শৈবাল ঝুলিতেছে, মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো গহ্বর আছে, তাহার মধ্যে পাখি বাসা করিয়াছে। স্থানে স্থানে দুই পার্শ্বের পাহাড় এত উচ্চ যে, অনেক বিলম্বে সূর্যের দুই-একটি কর নদীর জলে আসিয়া পতিত হয়। বড়ো বড়ো গুল্ম বিবিধ আকারের পল্লব বিস্তার করিয়া পাহাড়ের গাত্রে ঝুলিতেছে। মাঝে মাঝে নদীর দুই তীরে ঘন জঙ্গলের বাহু অনেক দূর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। একটা দীর্ঘ শাখাহীন শ্বেত গর্জনবৃক্ষ পাহাড়ের উপরে হেলিয়া রহিয়াছে, নীচে নদীর চঞ্চল জলে তাহার ছায়া নাচিতেছে, বড়ো বড়ো লতা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে। ঘন সবুজ জঙ্গলের মাঝে মাঝে স্নিগ্ধ শ্যামল কদলীবন। মাঝে মাঝে দুই তীর বিদীর্ণ করিয়া ছোটো ছোটো নির্ঝর শিশুদিগের ন্যায় আকুল বাহু, চঞ্চল আবেগ ও কলকল শুভ্র হাস্য লইয়া নদীতে আসিয়া পড়িতেছে। নদী কিছুদূর সমভাবে গিয়া স্থানে স্থানে শিলাসোপান বাহিয়া ফেনাইয়া নিম্নাভিমুখে ঝরিয়া পড়িতেছে। সেই অবিশ্রাম ঝর্ঝর শব্দ নিস্তব্ধ শৈলপ্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

এই ছায়া, শীতল প্রবাহ, স্নিগ্ধ ঝর্ঝর শব্দের মধ্যে স্তব্ধ শৈলতলে গোবিন্দ-মাণিক্য বাস করিতে লাগিলেন। হৃদয় বিস্তারিত করিয়া দিয়া হৃদয়ের মধ্যে শান্তি সঞ্চয় করিতে লাগিলেন— নির্জন প্রকৃতির সান্ত্বনাময় গভীর প্রেম নানা দিক দিয়া সহস্র নির্ঝরের মতো তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে পড়িতে লাগিল। তিনি আপনার হৃদয়ের গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেখান হইতে ক্ষুদ্র অভিমান-সকল মুছিয়া ফেলিতে লাগিলেন— দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া আপনার মধ্যে বিমল আলোক ও বায়ুর প্রবাহ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কে তাঁহাকে দুঃখ দিয়াছে, ব্যথা দিয়াছে, কে তাঁহার স্নেহের বিনিময় দেয় নাই, কে তাঁহার নিকট হইতে এক হস্তে উপকার গ্রহণ করিয়া অপর হস্তে কৃতঘ্নতা অর্পণ করিয়াছে, কে তাঁহার নিকট সমাদৃত হইয়া তাঁহাকে অপমান করিয়াছে —সমস্ত তিনি ভুলিয়া গেলেন। এই শৈলাসনবাসিনী অতি পুরাতন প্রকৃতির অবিশ্রাম কার্যশীলতা অথচ চিরনিশ্চিন্ত প্রশান্ত নবীনতা দেখিয়া তিনি নিজেও যেন সেইরূপ পুরাতন, সেইরূপ বৃহৎ, সেইরূপ প্রশান্ত হইয়া উঠিলেন।

তিনি যেন সুদূর জগৎ পর্যন্ত আপনার কামনাশূন্য স্নেহ বিস্তারিত করিয়া দিলেন— সমস্ত বাসনা দূর করিয়া দিয়া জোড়হস্তে কহিলেন, 'হে ঈশ্বর, পতনোন্মুখ সম্পৎশিখর হইতে তোমার ক্রোড়ের মধ্যে ধারণ করিয়া আমাকে এ যাত্রা রক্ষা করিয়াছ। আমি মরিতে বসিয়াছিলাম, আমি বাঁচিয়া গিয়াছি। যখন রাজা হইয়াছিলাম তখন আমি আমার মহত্ত্ব জানিতাম না, আজ সমস্ত পৃথিবীময় আমার মহত্ত্ব অনুভব করিতেছি।' অবশেষে দুই চক্ষে জল পড়িতে লাগিল; বলিলেন, 'মহারাজ, তুমি আমার স্নেহের ধ্রুবকে কাড়িয়া লইয়াছ, সে বেদনা এখনো হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ যায় নাই। আজ আমি বুঝিতেছি যে, তুমি ভালোই করিয়াছ। আমি সেই বালকের প্রতি স্বার্থপর স্নেহে আমার সমুদয় কর্তব্য আমার জীবন বিসর্জন দিতেছিলাম। তুমি আমাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ। আমি ধ্রুবকে আমার সমস্ত পুণ্যের পুরস্কার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম; তুমি তাহাকে কাড়িয়া লইয়া শিক্ষা দিতেছ যে, পুণ্যের পুরস্কার পুণ্য। তাই আজ সেই ধ্রুবের পবিত্র বিরহদুঃখকে সুখ বলিয়া, তোমার প্রসাদ বলিয়া অনুভব করিতেছি। আমি বেতন লইয়া ভৃত্যের মতো কাজ করিব না প্রভু, আমি তোমার প্রেমের বশ হইয়া তোমার সেবা করিব।'

গোবিন্দমাণিক্য দেখিলেন, নির্জনে ধ্যানপরায়ণা প্রকৃতি যে স্নেহধারা সঞ্চয় করিতেছে, সজনে লোকালয়ের মধ্যে তাহা নদীরূপে প্রেরণ করিতেছে— যে তাহা গ্রহণ করিতেছে তাহার তৃষ্ণা নিবারণ হইতেছে, যে করিতেছে না তাহার প্রতিও প্রকৃতির কোনো অভিমান নাই। গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন, 'আমিও আমার এই বিজনে সঞ্চিত প্রেম সজনে বিতরণ করিতে বাহির হইব।' বলিয়া তাঁহার পর্বতাশ্রম ছাড়িয়া তিনি বাহির হইলেন।

সহসা রাজত্ব ছাড়িয়া দিয়া উদাসীন হওয়া, লেখায় যতটা সহজ মনে হয় বাস্তবিক ততটা সহজ নহে। রাজবেশ ছাড়িয়া দিয়া গেরুয়া বস্ত্র পরা নিতান্ত অল্প কথা নহে। বরঞ্চ রাজ্য পরিত্যাগ করা সহজ, কিন্তু আমাদের আজন্মকালের ছোটো ছোটো অভ্যাস আমরা অনায়াসে ছাড়িতে পারি না, তাহারা তাহাদের তীব্র ক্ষুধাতৃষ্ণা লইয়া আমাদের অস্থিমাংসের সহিত লিপ্ত হইয়া আছে; তাহাদিগকে নিয়মিত খোরাক না যোগাইলে তাহারা আমাদের রক্তশোষণ করিতে থাকে। কেহ যেন মনে না করেন যে, গোবিন্দমাণিক্য যতদিন তাঁহার বিজন কুটিরে বাস করিতেছিলেন, ততদিন কেবল অবিচলিত চিত্তে স্থাণুর মতো বসিয়া ছিলেন। তিনি পদে পদে আপনার সহস্র ক্ষুদ্র অভ্যাসের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। যখনই কিছুর অভাবে তাঁহার হৃদয় কাতর হইতেছিল তখনই তিনি তাহাকে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন।

তিনি তাঁহার মনের সহস্রমুখী ক্ষুধাকে কিছু না খাইতে দিয়া বিনাশ করিতেছিলেন। পদে পদে এই শত শত অভাবের উপর জয়ী হইয়া তিনি সুখ লাভ করিতেছিলেন। যেমন দুরন্ত অশ্বকে দ্রুতবেগে ছুটাইয়া শান্ত করিতে হয়, তেমনি তিনি তাঁহার অভাবকাতর অশান্ত হৃদয়কে অভাবের মরুময় প্রান্তরের মধ্যে অবিশ্রাম দৌড় করাইয়া শান্ত করিতেছিলেন। অনেক দিন পর্যন্ত এক মুহূর্তও তাঁহার বিশ্রাম ছিল না।

পার্বত্য প্রদেশ ছাড়িয়া গোবিন্দমাণিক্য দক্ষিণে সমুদ্রাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। সমস্ত বাসনার দ্রব্য বিসর্জন দিয়া তিনি হৃদয়ের মধ্যে আশ্চর্য স্বাধীনতা অনুভব করিতে লাগিলেন। কেহ তাঁহাকে আর বাঁধিতে পারে-না, অগ্রসর হইবার সময় কেহ তাঁহাকে আর বাধা দিতে পারে না। প্রকৃতিকে অত্যন্ত বৃহৎ দেখিলেন এবং আপনাকেও তাহার সহিত এক বলিয়া মনে হইল। বৃক্ষলতার সে এক নূতন শ্যামল বর্ণ, সূর্যের সে এক নূতন কনককিরণ, প্রকৃতির সে এক নূতন মুখশ্রী দেখিতে লাগিলেন। গ্রামে গিয়া মানবের প্রত্যেক কাজের মধ্যে তিনি এক নূতন সৌন্দর্য দেখিতে লাগিলেন। মানবের হাস্যালাপ, ওঠাবসা, চলাফেরার মধ্যে তিনি এক অপূর্ব নৃত্যগীতের মাধুরী দেখিতে পাইলেন। যাহাকে দেখিলেন তাহাকে কাছে ডাকিয়া কথা কহিয়া সুখ পাইলেন— যে তাঁহাকে উপেক্ষা প্রদর্শন করিল তাহার নিকট হইতে তাঁহার হৃদয় দূরে গমন করিল না। সর্বত্র দুর্বলকে সাহায্য করিতে এবং দুঃখীকে সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, 'আমার নিজের সমস্ত বল এবং সমস্ত সুখ আমি পরের জন্য উৎসর্গ করিলাম, কেননা আমার নিজের কোনো কাজ নাই, কোনো বাসনা নাই।' সচরাচর যে-সকল দৃশ্য কাহারও চোখে পড়ে না, তাহা নূতন আকার ধারণ করিয়া তাঁহার চোখে পড়িতে লাগিল। যখন দুই ছেলেকে পথে বসিয়া খেলা করিতে দেখিতেন— দুই ভাইকে, পিতাপুত্রকে, মাতা ও শিশুকে একত্র দেখিতেন— তাহারা ধূলিলিপ্ত হউক, দরিদ্র হউক, কদর্য হউক, তিনি তাহাদের মধ্যে দূরদূরান্তব্যাপী মানবহৃদয়সমুদ্রের অনন্ত গভীর প্রেম দেখিতে পাইতেন। একটি শিশুক্রোড়া জননীর মধ্যে তিনি যেন অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত মানবশিশুর জননীকে দেখিতে পাইতেন। দুই বন্ধুকে একত্র দেখিলেই তিনি সমস্ত মানবজাতিকে বন্ধুপ্রেমে সহায়বান অনুভব করিতেন। পূর্বে যে পৃথিবীকে মাঝে মাঝে মাতৃহীনা বলিয়া বোধ হইত, সেই পৃথিবীকে আনতনয়না চিরজাগ্রত জননীর কোলে দেখিতে পাইলেন। পৃথিবীর দুঃখশোকদারিদ্র্য বিবাদবিদ্বেষ দেখিলেও তাঁহার মনে আর

নৈরাশ্য জন্মিত না। একটিমাত্র মঙ্গলের চিহ্ন দেখিলেই তাঁহার আশা সহস্র অমঙ্গল ভেদ করিয়া স্বর্গাভিমুখে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিত। আমাদের সকলের জীবনেই কি কোনো-না-কোনোদিন এমন এক অভূতপূর্ব নূতন প্রেম ও নূতন স্বাধীনতার প্রভাত উদিত হয় নাই, যেদিন সহসা এই হাস্যক্রন্দনময় জগৎকে এক সুকোমল নবকুমারের মতো এক অপূর্ব সৌন্দর্য প্রেম ও মঙ্গলের ক্রোড়ে বিকশিত দেখিয়াছি! যেদিন কেহ আমাদিগকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে না, কেহ আমাদিগকে জগতের কোনো সুখ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না, কেহ আমাদিগকে কোনো প্রাচীরের মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না! যেদিন এক অপূর্ব বাঁশি বাজিয়া উঠে, এক অপূর্ব বসন্ত জাগিয়া উঠে, চরাচর চিরযৌবনের আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যায়! যেদিন সমস্ত দুঃখ-দারিদ্র্য-বিপদকে কিছুই মনে হয় না! নূতন স্বাধীনতার আনন্দে প্রসারিতহৃদয় গোবিন্দ-মাণিক্যের জীবনে সেই দিন উপস্থিত হইয়াছে।

দক্ষিণ-চট্টগ্রামের রামু শহর এখনো দশ ক্রোশ দূরে। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে গোবিন্দমাণিক্য যখন আলমখাল-নামক ক্ষুদ্র গ্রামে গিয়া পৌঁছিলেন, তখন গ্রামপ্রান্তবর্তী একটি কুটির হইতে ক্ষীণকণ্ঠ বালকের ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলেন। গোবিন্দ-মাণিক্যের হৃদয় সহসা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই কুটিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন ; দেখিলেন, যুবক কুটিরস্বামী একটি শীর্ণ বালককে কোলে করিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতেছে। বালক থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছে এবং থাকিয়া থাকিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে কাঁদিতেছে। কুটিরস্বামী তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। সন্ন্যাসবেশী গোবিন্দমাণিক্যকে দেখিয়া সে শশব্যস্ত হইয়া পড়িল। কাতর স্বরে কহিল, "ঠাকুর, ইহাকে আশীর্বাদ করো।"

গোবিন্দমাণিক্য আপনার কম্বল বাহির করিয়া কম্পমান বালকের চারি দিকে জড়াইয়া দিলেন। বালক একবার কেবল তাহার শীর্ণ মুখ তুলিয়া গোবিন্দমাণিক্যের দিকে চাহিল। তাহার চোখের নীচে কালী পড়িয়াছে— তাহার ক্ষীণ মুখের মধ্যে দুখানি চোখ ছাড়া আর কিছু নাই যেন। একবার গোবিন্দমাণিক্যকে দেখিয়াই দুইখানি পাণ্ডুবর্ণ পাতলা ঠোঁট নাড়িয়া ক্ষীণ অব্যক্ত শব্দ করিল। আবার তখনই তাহার পিতার স্কন্ধের উপর মুখ রাখিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। তাহার পিতা তাহাকে কম্বল-সমেত ভূমিতে রাখিয়া রাজাকে প্রণাম করিল এবং রাজার পদধূলি লইয়া ছেলের গায়ে মাথায় দিল। রাজা ছেলেকে তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেটির বাপের নাম কী ?"

কুটিরস্বামী কহিল "আমি ইহার বাপ, আমার নাম যাদব। ভগবান একে একে

আমার সকল-ক'টিকে লইয়াছেন, কেবল এইটি এখনো বাকি আছে।" বলিয়া গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

রাজা কুটিরস্বামীকে বলিলেন, "আজ রাত্রে আমি তোমার এখানে অতিথি। আমি কিছুই খাইব না, অতএব আমার জন্য আহারাদির উদ্‌যোগ করিতে হইবে না। কেবল এখানে রাত্রিযাপন করিব।" বলিয়া সে রাত্রি সেইখানে রহিলেন। অনুচরগণ গ্রামের এক ধনী কায়স্থের বাড়ি আতিথ্য গ্রহণ করিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। নিকটে একটা পানাপুকুর ছিল, তাহার উপর হইতে বাষ্প উঠিতে লাগিল। গোয়াল-ঘর হইতে খড় এবং শুষ্ক পত্র জ্বালানোর গুরুভার ধোঁয়া আকাশে উঠিতে পারিল না, গুঁড়ি মারিয়া সম্মুখের বিস্তৃত জলামাঠকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল। আস্‌শেওড়ার বেড়ার কাছ হইতে কর্কশ স্বরে ঝিঁঝিঁ ডাকিতে লাগিল। বাতাস একেবারে বন্ধ, গাছের পাতাটি নড়িতেছে না। পুকুরের অপর পাড়ে ঘন বাঁশঝাড়ের মধ্য হইতে একটা পাখি থাকিয়া থাকিয়া টিটি করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে। ক্ষীণালোকে গোবিন্দমাণিক্য সেই রুগ্‌ণ বালকের বিবর্ণ শীর্ণ মুখ দেখিতেছেন। তিনি তাহাকে ভালোরূপে কম্বলে আবৃত করিয়া তাহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে নানাবিধ গল্প শুনাইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইল, দূরে শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। বালক গল্প শুনিতে শুনিতে রোগের কষ্ট ভুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

রাজা তাহার পার্শ্বের ঘরে আসিয়া শয়ন করিলেন। রাত্রে তাঁহার ঘুম হইল না। কেবল ধ্রুবকে মনে পড়িতে লাগিল। রাজা কহিলেন, 'ধ্রুবকে হারাইয়া সকল বালককেই আমার ধ্রুব বলিয়া বোধ হয়।' খানিক রাত্রে শুনিলেন, পাশের ঘরে ছেলেটি জাগিয়া উঠিয়া তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "বাবা, ও কী বাজে?"

বাপ কহিল, "বাঁশি বাজিতেছে।"

ছেলে। বাঁশি কেন বাজে?

বাপ। কাল যে পূজা বাপ আমার!

ছেলে। কাল পূজা? পূজার দিন আমাকে কিছু দেবে না?

বাপ। কী দেব বাবা?

ছেলে। আমাকে একটা রাঙা শাল দেবে না?

বাপ। আমি শাল কোথায় পাব? আমার যে কিছু নেই, মানিক আমার!

ছেলে। বাবা, তোমার কিছু নেই বাবা?

বাপ। কিছু নেই বাবা, কেবল তুমি আছ।

ভগ্নহৃদয় পিতার গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পাশের ঘর হইতে শুনা গেল। ছেলে আর-কিছু বলিল না। বোধ করি বাপকে জড়াইয়া ধরিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি শেষ না হইতে হইতেই গোবিন্দমাণিক্য গৃহস্বামীর নিকট বিদায় না লইয়াই অশ্বারোহণে রামু শহরের অভিমুখে চলিয়া গেলেন। আহার করিলেন না, বিশ্রাম করিলেন না। পথের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র নদী ছিল; ঘোড়াসুদ্ধ নদী পার হইলেন। প্রখর রৌদ্রের সময় রামুতে গিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে অধিক বিলম্ব করিলেন না। আবার সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই যাদবের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যাদবকে আড়ালে ডাকিয়া আনিলেন। তাঁহার ঝুলির মধ্য হইতে একখানি লাল শাল বাহির করিয়া যাদবের হাতে দিয়া কহিলেন, "আজ পূজার দিনে এই শালটি তোমার ছেলেকে দাও।"

যাদব কাঁদিয়া গোবিন্দমাণিক্যের পা জড়াইয়া ধরিল। কহিল, "প্রভু, তুমি আনিয়াছ, তুমিই দাও।"

রাজা কহিলেন, "না, আমি দিব না, তুমি দাও। আমি দিলে কোনো ফল নাই। আমার নাম করিয়ো না। আমি কেবল তোমার ছেলের মুখে আনন্দের হাসি দেখিয়া চলিয়া যাইব।"

রুগ্‌ণ বালকের অতি শীর্ণ ম্লান মুখ প্রফুল্ল দেখিয়া রাজা চলিয়া গেলেন। রাজা বিষণ্ণ হইয়া মনে মনে কহিলেন, 'আমি কোনো কাজ করিতে পারি না। আমি কেবল কয়টা বৎসর রাজত্বই করিয়াছি, কিছুই শিক্ষা করি নাই। কী করিলে একটি ক্ষুদ্র বালকের রোগের কষ্ট একটু নিবারণ হইবে তাহা জানি না। আমি কেবল অসহায় অকর্মণ্য ভাবে শোক করিতেই জানি। বিল্বন ঠাকুর যদি থাকিতেন তো ইহাদের কিছু উপকার করিয়া যাইতেন। আমি যদি বিল্বন ঠাকুরের মতো হইতাম!' গোবিন্দমাণিক্য বলিলেন, 'আমি আর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইব না, লোকালয়ের মধ্যে বাস করিয়া কাজ করিতে শিখিব।'

রামুর দক্ষিণে রাজাকুলের নিকটে মগদিগের যে দুর্গ আছে, আরাকানরাজের অনুমতি লইয়া সেইখানে তিনি বাস করিতে লাগিলেন।

গ্রামবাসীদের যতগুলো ছেলেপিলে ছিল, সকলেই দুর্গে গোবিন্দমাণিক্যের নিকটে আসিয়া জুটিল। গোবিন্দমাণিক্য তাহাদিগকে লইয়া একটা বড়ো পাঠশালা খুলিলেন। তিনি তাহাদিগকে পড়াইতেন, তাহাদের সহিত খেলিতেন, তাহাদের বাড়িতে গিয়া তাহাদের সহিত বাস করিতেন, পীড়া হইলে তাহাদিগকে দেখিতে যাইতেন। ছেলেপিলেরা সাধারণত যে নিতান্তই স্বর্গ হইতে আসিয়াছে এবং তাহারা

যে দেবশিশু তাহা নহে, তাহাদের মধ্যে মানব এবং দানব ভাবের কিছুমাত্র অপ্রতুল নাই। স্বার্থপরতা ক্রোধ লোভ দ্বেষ হিংসা তাহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ বলবান, তাহার উপরে আবার বাড়িতে পিতামাতার নিকট হইতেও সকল সময়ে ভালো শিক্ষা পায় যে তাহা নহে। এই জন্য মগের দুর্গে মগের রাজত্ব হইয়া উঠিল— দুর্গের মধ্যে যেন ঊনপঞ্চাশ বায়ু এবং চৌষট্টি ভূতে একত্র বাসা করিয়াছে। গোবিন্দমাণিক্য এই-সকল উপকরণ লইয়া ধৈর্য ধরিয়া মানুষ গড়িতে লাগিলেন। একটি মানুষের জীবন যে কত মহৎ ও কী প্রাণপণ যত্নে পালন ও রক্ষা করিবার দ্রব্য, তাহা গোবিন্দমাণিক্যের হৃদয়ে সর্বদা জাগরূক। তাঁহার চারি দিকে অনন্তফলপরিপূর্ণ মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়, ইহাই দেখিয়া এবং নিজের চেষ্টায় ইহাই সাধন করিয়া গোবিন্দমাণিক্য নিজের অসম্পূর্ণ জীবন বিসর্জন করিতে চান। ইহার জন্য তিনি সকল কষ্ট সকল উপদ্রব সহ্য করিতে পারেন। কেবল মাঝে মাঝে এক-একবার হতাশ্বাস হইয়া দুঃখ করিতেন, 'আমার কার্য আমি নিপুণরূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেছি না। বিল্বন থাকিলে ভালো হইত।'

এইরূপে গোবিন্দমাণিক্য এক শত ধ্রুবকে লইয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

স্টুয়ার্ট্-কৃত বাংলার ইতিহাস হইতে এই পরিচ্ছেদ সংগৃহীত

এ দিকে শা সুজা তাঁহার ভ্রাতা ঔরংজীবের সৈন্য-কর্তৃক তাড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছেন। এলাহাবাদের নিকট যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার পরাজয় হয়। বিপক্ষ পরাক্রান্ত, এবং এই বিপদের সময় সুজা স্বপক্ষীয়দেরও বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি অপমানিত ও ভীত ভাবে ছদ্মবেশে সামান্য লোকের মতো একাকী পলায়ন করিতে লাগিলেন। যেখানেই যান পশ্চাতে শত্রুসৈন্যের ধূলিধ্বজা ও তাহাদের অশ্বের ক্ষুরধ্বনি তাঁহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। অবশেষে পাটনায় পৌঁছিয়া তিনি পুনর্বার নবাব-বেশে আপন পরিবার ও প্রজাদের নিকটে আগমনসংবাদ ঘোষণা করিলেন। তিনিও যেমন পাটনায় পৌঁছিলেন, তাহার কিছু কাল পরেই ঔরংজীবের পুত্র কুমার মহম্মদ সৈন্য-সহিত পাটনার দ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন। সুজা পাটনা ছাড়িয়া মুঙ্গেরে পালাইলেন।

মুঙ্গেরে তাঁহার বিক্ষিপ্ত দলবল কতক কতক তাঁহার নিকট আসিয়া জুটিল এবং সেখানে তিনি নূতন সৈন্যও সংগ্রহ করিলেন। তেরিয়াগড়ি ও শিক্‌লিগলির দুর্গ সংস্কার করিয়া এবং নদীতীরে পাহাড়ের উপরে প্রাচীর নির্মাণ করিয়া তিনি দৃঢ় হইয়া বসিলেন।

এ দিকে ঔরংজীব তাঁহার বিচক্ষণ সেনাপতি মীর্‌জুম্‌লাকে কুমার মহম্মদের সাহায্যে পাঠাইলেন। কুমার মহম্মদ প্রকাশ্য ভাবে মুঙ্গেরের দুর্গের অনতিদূরে আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন, এবং মীর্‌জুম্‌লা অন্য গোপন পথ দিয়া মুঙ্গের-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যখন সুজা কুমার মহম্মদের সহিত ছোটোখাটো যুদ্ধে ব্যাপৃত আছেন, এমন সময় সহসা সংবাদ পাইলেন যে, মীর্‌জুম্‌লা বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া বসন্তপুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সুজা ব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমস্ত সৈন্য লইয়া মুঙ্গের ছাড়িয়া রাজমহলে পলায়ন করিলেন। সেখানেই তাঁহার সমস্ত পরিবার বাস করিতেছিল। সম্রাট্‌সৈন্য অবিলম্বে সেখানেও তাঁহার অনুসরণ করিল। সুজা ছয় দিন ধরিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া শত্রুসৈন্যকে অগ্রসর হইতে দিলেন না। কিন্তু যখন দেখিলেন আর রক্ষা হয় না, তখন একদিন অন্ধকার ঝড়ের রাত্রে তাঁহার পরিবারসকল ও যথাসম্ভব ধনসম্পত্তি লইয়া নদী পার হইয়া তোণ্ডায় পলায়ন করিলেন এবং অবিলম্বে সেখানকার দুর্গ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে ঘনবর্ষা আসিল, নদী অত্যন্ত স্ফীত এবং পথ দুর্গম হইয়া উঠিল। সম্রাট্‌সৈন্যেরা অগ্রসর হইতে পারিল না।

এই যুদ্ধবিগ্রহের পূর্বে কুমার মহম্মদের সহিত সুজার কন্যার বিবাহের সমস্ত স্থির হইয়াছিল। কিন্তু এই যুদ্ধের উপদ্রবে সে প্রস্তাব উভয় পক্ষই বিস্মৃত হইয়াছিল।

বর্ষায় তখন যুদ্ধ স্থগিত আছে এবং মীর্‌জুম্‌লা রাজমহল হইতে কিছু দূরে তাঁহার শিবির লইয়া গেছেন, এমন সময় সুজার একজন সৈনিক তোণ্ডার শিবির হইতে আসিয়া গোপনে কুমার মহম্মদের হস্তে একখানি পত্র দিল। কুমার খুলিয়া দেখিলেন সুজার কন্যা লিখিতেছেন,— 'কুমার, এই কি আমার অদৃষ্টে ছিল? যাঁহাকে মনে মনে স্বামীরূপে বরণ করিয়া আমার সমগ্র হৃদয় সমর্পণ করিয়াছি, যিনি অঙ্গুরীয়-বিনিময় করিয়া আমাকে গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তিনি আজ নিষ্ঠুর তরবারি হস্তে আমার পিতার প্রাণ লইতে আসিয়াছেন এই কি আমাকে দেখিতে হইল! কুমার, এই কি আমাদের বিবাহ-উৎসব! তাই কি এত সমারোহ! তাই কি আমাদের রাজমহল আজ রক্তবর্ণ! তাই কি কুমার দিল্লি হইতে লোহার শৃঙ্খল হাতে করিয়া আনিয়াছেন। এই কি প্রেমের শৃঙ্খল!'

*

এই পত্র পড়িয়া সহসা প্রবল ভূমিকম্পে যেন কুমার মহম্মদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি এক মুহূর্ত আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ সাম্রাজ্যের আশা, বাদশাহের অনুগ্রহ, সমস্ত তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন। প্রথম যৌবনের দীপ্ত হুতাশনে তিনি ক্ষতিলাভের বিবেচনা সমস্ত বিসর্জন করিলেন। তাঁহার পিতার সমস্ত কার্য তাঁহার অত্যন্ত অন্যায় ও নিষ্ঠুর বলিয়া বোধ হইল। পিতার ষড়যন্ত্রপ্রবণ নিষ্ঠুর নীতির বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে তিনি পিতার সমক্ষেই আপন মত স্পষ্ট ব্যক্ত করিতেন, এবং কখনো কখনো তিনি সম্রাটের বিরাগভাজন হইতেন। আজ তিনি তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে ডাকিয়া সম্রাটের নিষ্ঠুরতা খলতা ও অত্যাচার সম্বন্ধে বিরাগ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "আমি তোণ্ডায় আমার পিতৃব্যের সহিত যোগ দিতে যাইব। তোমরা যাহারা আমাকে ভালোবাস, আমার অনুবর্তী হও!"

তাহারা দীর্ঘ সেলাম করিয়া তৎক্ষণাৎ কহিল, "শাহজাদা যাহা বলিতেছেন তাহা অতি যথার্থ, কালই দেখিবেন অর্ধেক সৈন্য তোণ্ডার শিবিরে শাহজাদার সহিত মিলিত হইবে।"

মহম্মদ সেইদিনই নদী পার হইয়া সুজার শিবিরে উপস্থিত হইলেন।

তোণ্ডায় উৎসব পড়িয়া গেল। যুদ্ধবিগ্রহের কথা সকলে একেবারেই ভুলিয়া গেল। এতদিন কেবল পুরুষেরাই ব্যস্ত ছিল, এখন সুজার পরিবারে রমণীদের হাতেও কাজের অন্ত রহিল না। সুজা অত্যন্ত স্নেহ ও আনন্দের সহিত মহম্মদকে গ্রহণ করিলেন। অবিশ্রাম রক্তপাতের পরে রক্তের টান যেন আরও বাড়িয়া উঠিল। নৃত্যগীতবাদ্যের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। নৃত্যগীত শেষ হইতে না হইতেই সংবাদ আসিল সম্রাট্‌সৈন্য নিকটবর্তী হইয়াছে।

মহম্মদ যেমনি সুজার শিবিরে গেছেন, সৈন্যেরা অমনি মীরজুমলার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিল। একটি সৈন্যও মহম্মদের সহিত যোগ দিল না, তাহারা বুঝিয়াছিল মহম্মদ ইচ্ছাপূর্বক বিপদসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন, সেখানে তাঁহার দলভুক্ত হইতে যাওয়া বাতুলতা।

সুজা এবং মহম্মদের বিশ্বাস ছিল যে, সম্রাট্‌সৈন্যের অধিকাংশই যুদ্ধক্ষেত্রে কুমার মহম্মদের সহিত যোগ দিবে। এই আশায় মহম্মদ নিজের নিশান উড়াইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বৃহৎ একদল সম্রাট্‌সৈন্য তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল। মহম্মদ আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। নিকটে আসিয়াই তাহারা মহম্মদের সৈন্যদলের উপরে গোলা বর্ষণ করিল। তখন মহম্মদ সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তখন আর

সময় নাই। সৈন্যেরা পলায়নতৎপর হইল। সুজার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুদ্ধে মারা পড়িল।

সেই রাত্রেই হতভাগ্য সুজা এবং তাঁহার জামাতা সপরিবারে দ্রুতগামী নৌকায় চড়িয়া ঢাকায় পলায়ন করিলেন। মীরজুমলা ঢাকায় সুজার অনুসরণ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না। তিনি বিজিত দেশে শৃঙ্খলাস্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন।

দুর্দশার দিনে বিপদের সময় যখন বন্ধুরা একে একে বিমুখ হইতে থাকে তখন মহম্মদ ধন প্রাণ মান তুচ্ছ করিয়া সুজার পক্ষাবলম্বন করাতে সুজার হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তিনি প্রাণের সহিত মহম্মদকে ভালোবাসিলেন। এমন সময়ে ঢাকা শহরে ঔরংজীবের একজন পত্রবাহক চর ধরা পড়িল। সুজার হাতে তাহার পত্র গিয়া পড়িল। ঔরংজীব মহম্মদকে লিখিতেছেন, 'প্রিয়তম পুত্র মহম্মদ, তুমি তোমার কর্তব্য অবহেলা করিয়া পিতৃবিদ্রোহী হইয়াছ এবং তোমার অকলঙ্ক যশে কলঙ্ক নিক্ষেপ করিয়াছ। রমণীর ছলনাময় হাস্যে মুগ্ধ হইয়া আপন ধর্ম বিসর্জন দিয়াছ। ভবিষ্যতে সমস্ত মোগল-সাম্রাজ্য শাসনের ভার যাঁহার হস্তে, তিনি আজ এক রমণীর দাস হইয়া আছেন! যাহা হউক, ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া মহম্মদ যখন অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে মাপ করিলাম। কিন্তু যে কার্যের জন্য গিয়াছেন সেই কার্য সাধন করিয়া আসিলে তবে তিনি আমাদের অনুগ্রহের অধিকারী হইবেন।'

সুজা এই পত্র পাঠ করিয়া বজ্রাহত হইলেন। মহম্মদ বার বার করিয়া বলিলেন, তিনি কখনোই পিতার নিকটে অনুতাপ প্রকাশ করেন নাই। এ-সমস্তই তাঁহার পিতার কৌশল। কিন্তু সুজার সন্দেহ দূর হইল না। সুজা তিন দিন ধরিয়া চিন্তা করিলেন। অবশেষে চতুর্থ দিনে কহিলেন, "বৎস, আমাদের মধ্যে বিশ্বাসের বন্ধন শিথিল হইয়াছে। অতএব আমি অনুরোধ করিতেছি, তুমি তোমার স্ত্রীকে লইয়া প্রস্থান করো, নহিলে আমাদের মনে আর শান্তি থাকিবে না। আমার রাজকোষের দ্বার মুক্ত করিয়া দিলাম, শ্বশুরের উপহারস্বরূপ যত ইচ্ছা ধনরত্ন লইয়া যাও।"

মহম্মদ অশ্রুবিসর্জন করিয়া বিদায় লইলেন, তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সঙ্গে গেলেন।

সুজা কহিলেন, "আর যুদ্ধ করিব না। চট্টগ্রামের বন্দর হইতে জাহাজ লইয়া মক্কায় চলিয়া যাইব।"

বলিয়া ঢাকা ছাড়িয়া ছদ্মবেশে চলিয়া গেলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

যে দুর্গে গোবিন্দমাণিক্য বাস করিতেন, একদিন বর্ষার অপরাহ্ণে সেই দুর্গের পথে একজন ফকির সঙ্গে তিনজন বালক ও একজন প্রাপ্তবয়স্ক তল্পিদার লইয়া চলিয়াছেন। বালকদের অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাইতেছে। বাতাস বেগে বহিতেছে এবং অবিশ্রাম বর্ষার ধারা পড়িতেছে। সকলের চেয়ে ছোটো বালকটির বয়স চৌদ্দর অধিক হইবে না, সে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে কাতর স্বরে কহিল, "পিতা, আর তো পারি না।" বলিয়া অধীর ভাবে কাঁদিতে লাগিল।

ফকির কিছু না বলিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন।

বড়ো বালকটি ছোটোকে তিরস্কার করিয়া কহিল, "পথের মধ্যে এমন করিয়া কাঁদিয়া ফল কী? চুপ কর্। অনর্থক পিতাকে কাতর করিস নে।"

ছোটো বালকটি তখন তাহার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন দমন করিয়া শান্ত হইল।

মধ্যম বালকটি ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিল, "পিতা, আমরা কোথায় যাইতেছি?"

ফকির কহিলেন, "ঐ যে দুর্গের চূড়া দেখা যাইতেছে, ঐ দুর্গে যাইতেছি।"

"ওখানে কে আছে পিতা?"

"শুনিয়াছি কোথাকার একজন রাজা সন্ন্যাসী হইয়া ওখানে বাস করেন।"

"রাজা সন্ন্যাসী কেন হইল পিতা!"

ফকির কহিলেন, "জানি না বাছা! হয়তো তাঁহার আপনার সহোদর ভ্রাতা সৈন্য লইয়া তাঁহাকে একটা গ্রাম্য কুকুরের মতো দেশ হইতে দেশান্তরে তাড়া করিয়াছে। রাজ্য ও সুখসম্পদ হইতে তাঁহাকে পথে বাহির করিয়া দিয়াছে। এখন হয়তো কেবল দারিদ্র্যের অন্ধকার ক্ষুদ্র গহ্বর ও সন্ন্যাসীর গেরুয়া বসন পৃথিবীর মধ্যে তাঁহার একমাত্র লুকাইবার স্থান। আপনার ভ্রাতার বিদ্বেষ হইতে, বিষদন্ত হইতে, আর কোথাও রক্ষা নাই।"

বলিয়া ফকির দৃঢ়রূপে আপন ওষ্ঠাধর চাপিয়া হৃদয়ের আবেগ দমন করিলেন। বড়ো ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল, "পিতা, এই সন্ন্যাসী কোন্ দেশের রাজা ছিল?"

ফকির কহিলেন, "তাহা জানি না বাছা!"

"যদি আমাদের আশ্রয় না দেয়?"

"তবে আমরা বৃক্ষতলে শয়ন করিব। আর আমাদের স্থান কোথায়!"

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দুর্গে সন্ন্যাসী ও ফকিরে দেখা হইল। উভয়েই উভয়কে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন। গোবিন্দমাণিক্য চাহিয়া দেখিলেন, ফকিরকে ফকির

বলিয়া বোধ হইল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থপর বাসনা হইতে হৃদয়কে প্রত্যাহরণ করিয়া একমাত্র বৃহৎ উদ্দেশ্যের মধ্যে স্থাপন করিলে মুখে যে একপ্রকার জ্বালাবিহীন বিমল জ্যোতি প্রকাশ পায়, ফকিরের মুখে তাহা দেখিতে পাইলেন না। ফকির সর্বদা সতর্ক সচকিত। তাঁহার হৃদয়ের তৃষিত বাসনাসকল তাঁহার দুই জ্বলন্ত নেত্র হইতে যেন অগ্নি পান করিতেছে। অধীর হিংসা তাঁহার দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধর এবং দৃঢ়লগ্ন দন্তের মধ্যে বিফলে প্রতিহত হইয়া পুনরায় যেন হৃদয়ের অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করিয়া আপনাকে আপনি দংশন করিতেছে। সঙ্গে তিনজন বালক, তাহাদের অত্যন্ত সুকুমার সুন্দর শ্রান্ত ক্লিষ্ট দেহ ও একপ্রকার গর্বিত সংকোচ দেখিয়া মনে হইল যেন তাহারা আজন্মকাল অতি সযত্নে সম্মানের শিকার উপরে তোলা ছিল, এই প্রথম তাহাদের ভূমিতলে পদার্পণ। চলিতে গেলে যে চরণের অঙ্গুলিতে ধূলি লাগে, ইহা যেন পূর্বে তাহাদের প্রত্যক্ষ জানা ছিল না। পৃথিবীর এই ধূলিময় মলিন দারিদ্র্যে প্রতিপদে যেন পৃথিবীর উপরে তাহাদের ঘৃণা জন্মিতেছে, মছলন্দ ও মাটির প্রভেদ দেখিয়া প্রতিপদে তাহারা যেন পৃথিবীকে তিরস্কার করিতেছে। পৃথিবী যেন তাহাদেরই প্রতি বিশেষ আড়ি করিয়া আপনার বড়ো মছলন্দখানা গুটাইয়া রাখিয়াছে। সকলেই যেন তাহাদের নিকটে অপরাধ করিতেছে। দরিদ্র যে ভিক্ষা করিবার জন্য তাহার মলিন বসন লইয়া তাহাদের কাছে ঘেঁষিতে সাহস করিতেছে এ কেবল তাহার স্পর্ধা; ঘৃণ্য কুকুর পাছে কাছে আসে এই জন্য লোকে যেমন খাদ্যখণ্ড দূর হইতে ছুঁড়িয়া দেয়, ইহারাও যেন তেমনি ক্ষুধার্ত মলিন ভিক্ষুককে দেখিলে দূর হইতে মুখ ফিরাইয়া এক মুঠা মুদ্রা অনায়াসে ফেলিয়া দিতে পারে। তাহাদের চক্ষে অধিকাংশ পৃথিবীর একপ্রকার যৎসামান্য ভাব ও ছিন্নবস্ত্র অকিঞ্চনতা যেন কেবল একটা মস্ত বেয়াদবি। তাহারা যে পৃথিবীতে সুখী ও সম্মানিত হইতেছে না, এ কেবল পৃথিবীর দোষ।

গোবিন্দমাণিক্য যে ঠিক এতটা ভাবিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি লক্ষণ দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে, এই ফকির, এ যে আপনার বাসনাসকল বিসর্জন দিয়া স্বাধীন ও সুস্থ হইয়া জগতের কাজ করিতে বাহির হইয়াছে তাহা নহে; এ কেবল আপনার বাসনা তৃপ্ত হয় নাই বলিয়া রাগ করিয়া সমস্ত জগতের প্রতি বিমুখ হইয়া বাহির হইয়াছে। তিনি যাহা চান তাহাই তাঁহার পাওনা এইরূপ ফকিরের বিশ্বাস, এবং জগৎ তাঁহার নিকটে যাহা চায় তাহা সুবিধামত দিলেই চলিবে এবং না দিলেও কোনো ক্ষতি নাই। ঠিক এই বিশ্বাস-অনুসারে কাজ হয় নাই বলিয়া তিনি জগৎকে একঘরে করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন।

গোবিন্দমাণিক্যকে দেখিয়া ফকিরের রাজা বলিয়াও মনে হইল সন্ন্যাসী বলিয়াও বোধ হইল। তিনি ঠিক এরূপ আশা করেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন হয় একটা লম্বোদর পাগড়ি-পরা স্ফীত মাংসপিণ্ড দেখিবেন, নয় তো একটা দীনবেশধারী মলিন সন্ন্যাসী অর্থাৎ ভস্মাচ্ছাদিত ধূলিশয্যাশায়ী উদ্ধত স্পর্ধা দেখিতে পাইবেন। কিন্তু দুয়ের মধ্যে কোনোটাই দেখিতে পাইলেন না। গোবিন্দমাণিক্যকে দেখিয়া বোধ হইল তিনি যেন সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন, তবু যেন সমস্তই তাঁহারই। তিনি কিছুই চান না বলিয়াই যেন পাইয়াছেন— তিনি আপনাকে দিয়াছেন বলিয়া পাইয়াছেন। তিনি যেমন আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, তেমনি সমস্ত জগৎ আপন ইচ্ছায় তাঁহার নিকটে ধরা দিয়াছে। কোনোপ্রকার আড়ম্বর নাই বলিয়া তিনি রাজা, এবং সমস্ত সংসারের নিতান্ত নিকটবর্তী হইয়াছেন বলিয়া তিনি সন্ন্যাসী। এইজন্য তাঁহাকে রাজাও সাজিতে হয় নাই, সন্ন্যাসীও সাজিতে হয় নাই।

রাজা তাঁহার অতিথিদিগকে সযত্নে সেবা করিলেন। তাঁহারা তাঁহার সেবা পরম অবহেলার সহিত গ্রহণ করিলেন। ইহাতে যেন তাঁহাদের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। তাঁহাদের আরামের জন্য কী কী দ্রব্য আবশ্যক তাহাও রাজাকে জানাইয়া দিলেন। রাজা বড়ো ছেলেটিকে স্নেহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "পথশ্রমে অত্যন্ত শ্রান্তিবোধ হইয়াছে কি?"

বালক তাহার ভালোরূপ উত্তর না দিয়া ফকিরের কাছে ঘেঁষিয়া বসিল। রাজা তাহাদের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "তোমাদের এই সুকুমার শরীর তো পথে চলিবার জন্য নহে। তোমরা আমার এই দুর্গে বাস করো, আমি তোমাদিগকে যত্ন করিয়া রাখিব।"

রাজার এই কথার উত্তর দেওয়া উচিত কি না এবং এই-সকল লোকের সহিত ঠিক কিরূপ ভাবে ব্যবহার করা কর্তব্য তাহা বালকেরা ভাবিয়া পাইল না— তাহারা ফকিরের অধিকতর কাছে ঘেঁষিয়া বসিল। যেন মনে করিল, কোথাকার এই ব্যক্তি মলিন হাত বাড়াইয়া তাহাদিগকে এখনই আত্মসাৎ করিতে আসিতেছে!

ফকির গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আমরা কিছুকাল তোমার এই দুর্গে বাস করিতে পারি।"

রাজাকে যেন অনুগ্রহ করিলেন। মনে মনে কহিলেন, 'আমি কে তাহা যদি জানিতে, তবে এই অনুগ্রহে তোমার আর আনন্দের সীমা থাকিত না।'

তিনটি বালককে রাজা কিছুতেই পোষ মানাইতে পারিলেন না। এবং ফকির নিতান্ত যেন নির্লিপ্ত হইয়া রহিলেন।

ফকির গোবিন্দমাণিক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনিয়াছি তুমি এক কালে রাজা ছিলে, কোথাকার রাজা ?"

গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন, "ত্রিপুরার।"

শুনিয়া বালকেরা তাঁহাকে অত্যন্ত ছোটো বিবেচনা করিল। তাহারা কোনো কালে ত্রিপুরার নাম শুনে নাই। কিন্তু ফকির ঈষৎ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার রাজত্ব গেল কী করিয়া ?"

গোবিন্দমাণিক্য কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, "বাংলার নবাব শা সুজা আমাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছেন।"

নক্ষত্ররায়ের কোনো কথা বলিলেন না।

এই কথা শুনিয়া বালকেরা সকলে চমকিয়া উঠিয়া ফকিরের মুখের দিকে চাহিল। ফকিরের মুখ যেন বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি সহসা বলিয়া ফেলিলেন, "এ-সকল বুঝি তোমার ভাইয়ের কাজ? তোমার ভাই বুঝি তোমাকে রাজ্য হইতে তাড়া করিয়া সন্ন্যাসী করিয়াছে ?"

রাজা আশ্চর্য হইয়া গেলেন ; কহিলেন, "তুমি এত সংবাদ কোথায় পাইলে সাহেব ?"

পরে মনে করিলেন, আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই, কাহারও নিকট হইতে শুনিয়া থাকিবেন।

ফকির তাড়াতাড়ি কহিলেন, "আমি কিছুই জানি না। আমি কেবল অনুমান করিতেছি।"

রাত্রি হইলে সকলে শয়ন করিতে গেলেন। সে রাত্রে ফকিরের আর ঘুম হইল না। জাগিয়া দুঃস্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন এবং প্রত্যেক শব্দে চমকিয়া উঠিলেন।

পরদিন ফকির গোবিন্দমাণিক্যকে কহিলেন, "বিশেষ প্রয়োজনবশত এখানে আর থাকা হইল না। আমরা আজ বিদায় হই।"

গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন, "বালকেরা পথের কষ্টে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, উহাদিগকে আর কিছুকাল বিশ্রাম করিতে দিলে ভালো হয়।"

বালকেরা কিছু বিরক্ত হইল— তাহাদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠটি ফকিরের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমরা কিছু নিতান্ত শিশু না, যখন আবশ্যক তখন অনায়াসে কষ্ট সহ্য করিতে পারি।"

গোবিন্দমাণিক্যের নিকট হইতে তাহারা স্নেহ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে। গোবিন্দমাণিক্য আর কিছু বলিলেন না।

ফকির যখন যাত্রার উদ্‌যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে দুর্গে আর-একজন অতিথি

আগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা ও ফকির উভয়ে আশ্চর্য হইয়া গেলেন। ফকির কী করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। রাজা তাঁহার অতিথিকে প্রণাম করিলেন। অতিথি আর কেহ নহেন, রঘুপতি। রঘুপতি রাজার প্রণাম গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "জয় হউক।"

রাজা কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নক্ষত্রের নিকট হইতে আসিতেছ ঠাকুর ? বিশেষ কোনো সংবাদ আছে ?"

রঘুপতি কহিলেন, "নক্ষত্ররায় ভালো আছেন, তাঁহার জন্য ভাবিবেন না।"

আকাশের দিকে হাত তুলিয়া কহিলেন, "আমাকে জয়সিংহ তোমার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছে। সে বাঁচিয়া নাই। তাহার ইচ্ছা আমি সাধন করিব, নহিলে আমার শান্তি নাই। তোমার কাছে থাকিয়া তোমার সঙ্গী হইয়া তোমার সকল কার্যে আমি যোগ দিব।"

রাজা প্রথমে রঘুপতির ভাব কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তিনি একবার মনে করিলেন, রঘুপতি বুঝি পাগল হইয়া থাকিবেন। রাজা চুপ করিয়া রহিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "আমি সমস্ত দেখিয়াছি, কিছুতেই সুখ নাই। হিংসা করিয়া সুখ নাই, আধিপত্য করিয়া সুখ নাই, তুমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছ তাহাতেই সুখ। আমি তোমার পরম শত্রুতা করিয়াছি, আমি তোমাকে হিংসা করিয়াছি, তোমাকে আমার কাছে বলি দিতে চাহিয়াছিলাম, আজ আমাকে তোমার কাছে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে আসিয়াছি।"

গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন, "ঠাকুর, তুমি আমার পরম উপকার করিয়াছ। আমার শত্রু আমার ছায়ার মতো আমার সঙ্গে সঙ্গেই লিপ্ত হইয়া ছিল, তাহার হাত হইতে তুমি আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছ।"

রঘুপতি সে কথায় বড়ো-একটা কান না দিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আমি জগতের রক্তপাত করিয়া যে পিশাচীকে এতকাল সেবা করিয়া আসিয়াছি, সে অবশেষে আমারই হৃদয়ের সমস্ত রক্ত শোষণ করিয়া পান করিয়াছে। সেই শোণিতপিপাসী জড়তা-মূঢ়তাকে আমি দূর করিয়া আসিয়াছি ; সে এখন মহারাজের রাজ্যের দেবমন্দিরে নাই, এখন সে রাজসভায় প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে চড়িয়া বসিয়াছে।"

রাজা কহিলেন, "দেবমন্দির হইতে যদি সে দূর হয় তো ক্রমে মানবের হৃদয় হইতেও দূর হইতে পারিবে।"

পশ্চাৎ হইতে একটি পরিচিত স্বর কহিল, "না, মহারাজ, মানবহৃদয়ই প্রকৃত মন্দির, সেইখানেই খড়্গ শাণিত হয় এবং সেইখানেই শত সহস্র নরবলি হয়! দেব-

মন্দিরে তাহার সামান্য অভিনয় হয় মাত্র।"

রাজা সচকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন সহাস্য সৌম্যমূর্তি বিল্বন। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "আজ আমার কী আনন্দ!"

বিল্বন কহিলেন, "মহারাজ, আপনাকে জয় করিয়াছেন বলিয়া সকলকেই জয় করিয়াছেন। তাই আজ আপনার দ্বারে শত্রুমিত্র সকলে একত্র হইয়াছে!"

ফকির অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "মহারাজ, আমিও তোমার শত্রু, আমিও তোমার হাতে ধরা দিলাম।"

রঘুপতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন, "এই ব্রাহ্মণ ঠাকুর আমাকে জানেন। আমিই সুজা, বাংলার নবাব, আমিই তোমাকে বিনাপরাধে নির্বাসিত করিয়াছি এবং সে পাপের শাস্তিও পাইয়াছি— আমার ভ্রাতার হিংসা আজ পথে পথে আমার অনুসরণ করিতেছে, আমার রাজ্যে আমার আর দাঁড়াইবার স্থান নাই। ছদ্মবেশে আমি আর থাকিতে পারি না, তোমার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া আমি বাঁচিলাম।"

তখন রাজা ও নবাব উভয়ে কোলাকুলি করিলেন। রাজা কেবলমাত্র কহিলেন, "আমার কী সৌভাগ্য!"

রঘুপতি কহিলেন, "মহারাজ, তোমার সহিত শত্রুতা করিলেও লাভ আছে। তোমার শত্রুতা করিতে গিয়াই তোমার কাছে ধরা পড়িয়াছি, নহিলে কোনোকালে তোমাকে জানিতাম না।"

বিল্বন হাসিয়া কহিলেন, "যেমন ফাঁসের মধ্যে পড়িয়া ফাঁস ছিঁড়িতে গিয়া গলায় আরও অধিক বাধিয়া যায়।"

রঘুপতি কহিলেন, "আমার আর দুঃখ নাই— আমি শান্তি পাইয়াছি।"

বিল্বন কহিলেন, "শান্তি সুখ আপনার মধ্যেই আছে, কেবল জানিতে পাই না। ভগবান এ যেন মাটির হাঁড়িতে অমৃত রাখিয়াছেন, অমৃত আছে বলিয়া কাহারও বিশ্বাস হয় না। আঘাত লাগিয়া হাঁড়ি ভাঙিলে তবে অনেক সময়ে সুধার আস্বাদ পাই। হায় হায়, এমন জিনিসও এমন জায়গায় থাকে!"

এমন সময়ে একটা অভ্রভেদী হো হো শব্দ উঠিল। দেখিতে দেখিতে দুর্গের মধ্যে ছোটোবড়ো নানাবিধ ছেলে আসিয়া পড়িল। রাজা বিল্বনকে কহিলেন, "এই দেখো ঠাকুর, আমার ধ্রুব।"

বলিয়া ছেলেদের দেখাইয়া দিলেন।

বিল্বন কহিলেন, "যাহার প্রসাদে তুমি এতগুলি ছেলে পাইয়াছ সেও তোমাকে

ভোলে নাই, তাহাকেও আনিয়া দিই।"

বলিয়া বাহিরে গেলেন। কিঞ্চিৎ বিলম্বে ধ্রুবকে কোলে করিয়া আনিয়া রাজার কোলে দিলেন। রাজা তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ডাকিলেন, "ধ্রুব!"

ধ্রুব কিছুই বলিল না, গম্ভীর ভাবে নীরবে রাজার কাঁধে মাথা দিয়া পড়িয়া রহিল। বহুদিন পরে প্রথম মিলনে বালকের ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে যেন একপ্রকার অস্ফুট অভিমান ও লজ্জার উদয় হইল। রাজাকে জড়াইয়া মুখ লুকাইয়া রহিল।

রাজা বলিলেন, "আর সব হইল, কেবল নক্ষত্র আমাকে ভাই বলিল না।"

সুজা তীব্রভাবে কহিলেন, "মহারাজ, আর সকলেই অতি সহজেই ভাইয়ের মতো ব্যবহার করে, কেবল নিজের ভাই করে না।"

সুজার হৃদয় হইতে এখনো শেল উৎপাটিত হয় নাই।

উপসংহার

এইখানে বলা আবশ্যক তিনটি বালক সুজার তিন ছদ্মবেশী কন্যা। সুজা মক্কা যাইবার উদ্দেশে চট্টগ্রাম বন্দরে গিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গুরুতর বর্ষার প্রাদুর্ভাবে একখানিও জাহাজ পাইলেন না। অবশেষে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবার পথে, গোবিন্দমাণিক্যের সহিত দুর্গে দেখা হয়। কিছুদিন দুর্গে বাস করিয়া সুজা সংবাদ পাইলেন এখনো সম্রাট্‌সৈন্য তাঁহাকে সন্ধান করিতেছে। গোবিন্দমাণিক্য যানাদি ও বিস্তর অনুচর -সমেত তাঁহার বন্ধু আরাকান-পতির নিকটে তাঁহাকে প্রেরণ করেন। যাইবার সময় সুজা তাঁহাকে বহুমূল্য তরবারি উপহারস্বরূপ দান করেন।

ইতিমধ্যে রাজা রঘুপতি ও বিল্বনে মিলিয়া সমস্ত গ্রামকে যেন সচেতন করিয়া তুলিলেন। রাজার দুর্গ সমস্ত গ্রামের প্রাণ হইয়া উঠিল।

এইরূপে ছয় বৎসর কাটিয়া গেলে ছত্রমাণিক্যের মৃত্যু হইল। গোবিন্দমাণিক্যকে সিংহাসনে ফিরাইয়া লইবার জন্য ত্রিপুরা হইতে দূত আসিল।

গোবিন্দমাণিক্য প্রথমে বলিলেন, "আমি রাজ্যে ফিরিব না।"

বিল্বন কহিলেন, "সে হইবে না মহারাজ! ধর্ম যখন স্বয়ং দ্বারে আসিয়া আহ্বান করিতেছেন তখন তাঁহাকে অবহেলা করিবেন না।"

রাজা তাঁহার ছাত্রদের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমার এতদিনকার আশা অসমাপ্ত, এতদিনকার কার্য অসম্পূর্ণ রহিবে?"

বিল্বন কহিলেন, "এখানে তোমার কার্য আমি করিব।"

রাজা কহিলেন, "তুমি যদি এখানে থাক তাহা হইলে আমার সেখানকার কার্য অসম্পূর্ণ হইবে।"

বিল্বন কহিলেন, "না মহারাজ, এখন আমাকে আর তোমার আবশ্যক নাই। তুমি এখন আপনার প্রতি আপনি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পার। আমি যদি সময় পাই তো মাঝে মাঝে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব।"

রাজা ধ্রুবকে সঙ্গে লইয়া রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। ধ্রুব এখন আর নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। সে বিল্বনের প্রসাদে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া শাস্ত্র-অধ্যয়নে মন দিয়াছে। রঘুপতি পুনর্বার পৌরোহিত্য গ্রহণ করিলেন। এবার মন্দিরে আসিয়া যেন মৃত জয়সিংহকে পুনর্বার জীবিতভাবে প্রাপ্ত হইলেন।

এ দিকে বিশ্বাসঘাতক আরাকান-পতি সুজাকে হত্যা করিয়া তাঁহার সর্বকনিষ্ঠ কন্যাকে বিবাহ করেন।—

'দুর্ভাগা সুজার প্রতি আরাকান-পতির নৃশংসতা স্মরণ করিয়া গোবিন্দমাণিক্য দুঃখ করিতেন। সুজার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি তরবারের বিনিময়ে বহুতর অর্থ-দ্বারা কুমিল্লা-নগরীতে একটি উৎকৃষ্ট মসজিদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাহা অদ্যাপি সুজা-মসজিদ বলিয়া বর্তমান আছে।

'গোবিন্দমাণিক্যের যত্নে মেহেরকুল আবাদ হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণগণকে বিস্তর ভূমি তাম্রপত্রে সনন্দ লিখিয়া দান করেন। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য কুমিল্লার দক্ষিণে বাতিসা গ্রামে একটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। তিনি অনেক সৎকার্যের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, কিন্তু সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। এই জন্য অনুতাপ করিয়া ১৬৬৯ খৃঃ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন।'

শেষ দুই প্যারাগ্রাফ শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ -প্রণীত ত্রিপুরার ইতিহাস হইতে উদ্‌ধৃত

প্রবন্ধ

চিঠিপত্র

চিঠিপত্র

১

চিরঞ্জীবেষু

ভায়া নবীনকিশোর, এখনকার আদব-কায়দা আমার ভালো জানা নাই— সেই জন্য তোমাদের সঙ্গে প্রথম আলাপ বা চিঠিপত্র আরম্ভ করিতে কেমন ভয় করে। আমরা প্রথম আলাপে বাপের নাম জিজ্ঞাসা করিতাম, কিন্তু শুনিয়াছি এখনকার কালে বাপের নাম -জিজ্ঞাসা দস্তুর নয়। সৌভাগ্যক্রমে তোমার বাবার নাম আমার অবিদিত নাই, কারণ আমিই তাঁহার নামকরণ করিয়াছিলাম। ভালো নাম দিতে পারি নাই— গোবর্ধন নামটা কেন দিয়াছিলাম তাহা আজ বুঝিতেছি। তোমাকে বর্ধন করিবার ভার তাঁহার উপরে পড়িবে ভাগ্যদেবতা তাহা জানিতেন। সেই জন্যই বোধ করি সেদিন ন্যায়রত্ন মহাশয় তোমাকে তোমার ঠাকুরের নাম জিজ্ঞাসা করাতে তোমার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। তা, তুমিই নাহয় তোমার বাবার নূতন নামকরণ করো। আমার গোবর্ধন নাম আমি ফিরাইয়া লইতেছি।

আসল কথা কী জান? সেকালে আমরা নাম লইয়া এত ভাবিতাম না। সেটা হয়তো আমাদের অসভ্যতার পরিচয়। আমরা মনে করিতাম নামে মানুষকে বড়ো করে না, মানুষই নামকে জাঁকাইয়া তোলে। মন্দ কাজ করিলেই মানুষের বদনাম হয়, ভালো কাজ করিলেই মানুষের সুনাম হয়। বাবা কেবল একটা নামই দিতে পারে, কিন্তু ভালো নাম কিম্বা মন্দ নাম সে ছেলে নিজেই দেয়। ভাবিয়া দেখো, আমাদের প্রাচীন কালের বড়ো বড়ো নাম শুনিতে নিতান্ত মধুর নয়— যুধিষ্ঠির, রামচন্দ্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, জন্মেজয়, বৈশম্পায়ন ইত্যাদি। কিন্তু ওই-সকল নাম অক্ষয়বটের মতো আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের হৃদয়ে সহস্র শিকড়ে বিরাজ করিতেছে। আমাদের আজকালকার উপন্যাসে ললিত নলিনমোহন প্রভৃতি কত মিঠি মিঠি নাম বাহির হইতেছে, কিন্তু এখনকার পাঠক-পিপীলিকারা এই মিষ্ট নামগুলিকে দুই দণ্ডেই নিঃশেষ করিয়া ফেলে— সকালের নাম বিকালে টিকে না। যাহাই হউক, আমরা নামের প্রতি মনোযোগ করিতাম না। তুমি বলিতেছ সেটা আমাদের ভ্রম। সেজন্য বেশি ভাবিয়ো না ভাই— আমরা শীঘ্রই মরিব এমন সম্ভাবনা আছে, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসমাজের সমস্ত ভ্রম সমূলে সংশোধিত হইয়া যাইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি এখনকার আদব-কায়দা আমার বড়ো জানা নাই; কিন্তু ইহাই দেখিতেছি আদব-কায়দা এখনকার দিনে নাই, আমাদের কালেই ছিল। এখন বাপকে প্রণাম করিতে লজ্জাবোধ হয়, বন্ধুবান্ধবকে কোলাকুলি করিতে সংকোচ বোধ হয়, গুরুজনের সম্মুখে তাকিয়া ঠেসান দিয়া তাস পিটিতে লজ্জাবোধ হয় না, রেলগাড়িতে যে বেঞ্চে পাঁচজনে বসিয়া আছে তাহার উপরে দুইখানা পা তুলিয়া দিতে সংকোচ জন্মে না। তবে হয়তো আজকাল অত্যন্ত সহৃদয়তার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, আদব-কায়দার তেমন আবশ্যক নাই। সহৃদয়তা! তাই বুঝি কেহ পাড়াপ্রতিবেশীর খোঁজ রাখে না; বিপদ-আপদে লোকের সাহায্য করে না; হাতে টাকা থাকিলে সামান্য জাঁক-জমক লইয়াই থাকে, দশজন অনাথকে প্রতিপালন করে না; তাই বুঝি পিতামাতা অযত্নে অনাদরে কষ্টে থাকেন, অথচ নিজের ঘরে সুখস্বচ্ছন্দতার অভাব নাই— নিজের সামান্য অভাবটুকু হইলেই রক্ষা নাই— কিন্তু পরিবারস্থ আর-সকলের ঘরে গুরুতর অনটন হইলেও বলেন 'হাতে টাকা নাই'। এই তো, ভাই, এখনকার সহৃদয়তা। মনের দুঃখে অনেক কথা বলিলাম। আমি কালেজে পড়ি নাই, সুতরাং আমার এত কথা বলিবার কোনো অধিকার নাই। কিন্তু তোমরা কিছু আমাদের নিন্দা করিতে ছাড় না, আমরাও যখন তোমাদের সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলি সে কথাগুলোয় একটু কর্ণপাত করিয়ো।

চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিয়াই তোমাকে কী 'পাঠ' লিখিব এই ভাবনা প্রথম মনে উদয় হয়। একবার ভাবিলাম লিখি 'মাই ডিয়ার নাতি', কিন্তু সেটা আমার সহ্য হইল না; তার পরে ভাবিলাম বাংলা করিয়া লিখি 'আমার প্রিয় নাতি', সেটাও বুড়োমানুষের এই খাকৃড়ার কলম দিয়া বাহির হইল না। থপ করিয়া লিখিয়া ফেলিলাম 'পরমশুভাশীর্বাদরাশয়ঃ সন্তু'। লিখিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ভাবিলাম ছেলেপিলেরা তো আমাদিগকে প্রণাম করা বন্ধ করিয়াছে, তাই বলিয়া কি আমরা তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিতে ভুলিব! তোমাদের ভালো হউক ভাই, আমরা এই চাই; আমাদের যা হইবার হইয়া গিয়াছে। তোমরা আমাদের প্রণাম কর আর না কর আমাদের তাহাতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কিন্তু তোমাদের আছে। ভক্তি করিতে যাহাদের লজ্জাবোধ হয় তাহাদের কোনোকালে মঙ্গল হয় না। বড়োর কাছে নিচু হইয়া আমরা বড়ো হইতে শিখি, মাথাটা তুলিয়া থাকিলেই যে বড়ো হই তাহা নয়। 'পৃথিবীতে আমার চেয়ে উঁচু আর কিছু নাই— আমি বাবার জ্যেষ্ঠতাত— আমি দাদার দাদা' এইটে যে মনে করে সে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তাহার হৃদয় এত ক্ষুদ্র যে সে আপনার চেয়ে বড়ো কিছুই কল্পনা করিতে পারে না। তুমি হয়তো আমাকে বলিবে, 'তুমি

*

আমার দাদামহাশয় বলিয়াই যে তুমি আমার চেয়ে বড়ো এমন কোনো কথা নাই।' আমি তোমার চেয়ে বড়ো নই! তোমার পিতা আমার স্নেহে প্রতিপালিত হইয়াছেন, আমি তোমার চেয়ে বড়ো নই তো কী? আমি তোমাকে স্নেহ করিতে পারি বলিয়া আমি তোমার চেয়ে বড়ো, হৃদয়ের সহিত তোমার কল্যাণ কামনা করিতে পারি বলিয়াই আমি তোমার চেয়ে বড়ো। তুমি নাহয় দু-পাঁচখান ইংরাজি বই আমার চেয়ে বেশি পড়িয়াছ, তাহাতে বেশি আসে যায় না। আঠারো হাজার ওয়েব্‌স্টার ডিক্‌শনারির উপর যদি তুমি চড়িয়া বস তাহা হইলেও তোমাকে আমার হৃদয়ের নীচে দাঁড়াইতে হইবে। তবুও আমার হৃদয় হইতে আশীর্বাদ নামিয়া তোমার মাথায় বর্ষিত হইতে থাকিবে। পুঁথির পর্বতের উপর চড়িয়া তুমি আমাকে নিচু নজরে দেখিতে পারো, তোমার চক্ষের অসম্পূর্ণতাবশত আমাকে ক্ষুদ্র দেখিতে পারো, কিন্তু আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে পারো না। যে ব্যক্তি মাথা পাতিয়া অসংকোচে স্নেহের আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে পারে সে ধন্য, তাহার হৃদয় উর্বর হইয়া ফলে ফুলে শোভিত হইয়া উঠুক। আর, যে ব্যক্তি বালুকাস্তূপের মতো মাথা উঁচু করিয়া স্নেহের আশীর্বাদ উপেক্ষা করে সে তাহার শূন্যতা শুষ্কতা শ্রীহীনতা— তাহার মরুময় উন্নত মস্তক— লইয়া মধ্যাহ্নতেজে দগ্ধ হইতে থাকুক। যাহাই হউক ভাই, আমি তোমাকে এক-শো বার লিখিব 'পরমশুভাশীর্বাদরাশয়ঃ সন্তু', তুমি আমার চিঠি পড় আর নাই পড়।

তুমিও যখন আমার চিঠির উত্তর দিবে, প্রণামপূর্বক চিঠি আরম্ভ করিয়ো। তুমি হয়তো বলিয়া উঠিবে, 'আমার যদি ভক্তি না হয় তো আমি কেন প্রণাম করিব? এ-সব অসভ্য আদব-কায়দার আমি কোনো ধার ধারি না।' তাই যদি সত্য হয় তবে কেন, ভাই, তুমি বিশ্বসুদ্ধ লোককে 'মাই ডিয়ার' লেখ। আমি বুড়ো, তোমার ঠাকুরদাদা, আজ সাড়ে তিন মাস ধরিয়া কাশিয়া মরিতেছি, তুমি একবার খোঁজ লইতে আস না। আর, জগতের সমস্ত লোক তোমার এমনি প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাদিগকে 'মাই ডিয়ার' না লিখিয়া থাকিতে পারো না। এও কি একটা দস্তুর মাত্র নয়? কোনোটা বা ইংরাজি দস্তুর, কোনোটা বাংলা দস্তুর। কিন্তু সেই যদি দস্তুর-মতই চলিতে হইল তবে বাঙালির পক্ষে বাংলা দস্তুরই ভালো। তুমি বলিতে পারো, 'বাংলাই কি ইংরাজিই কি, কোনো দস্তুর, কোনো আদব-কায়দা মানিতে চাহি না। আমি হৃদয়ের অনুসরণ করিয়া চলিব।' তাই যদি তোমার মত হয়, তুমি সুন্দরবনে গিয়া বাস করো, মনুষ্যসমাজে থাকা তোমার কর্ম নয়। সকল মানুষেরই কতকগুলি কর্তব্য আছে, সেই কর্তব্যশৃঙ্খলে সমাজ জড়িত। আমার কর্তব্য আমি না করিলে, তোমার কর্তব্য তুমি ভালোরূপে করিতে পারো না। দাদামহাশয়ের

কতকগুলি কর্তব্য আছে, নাতির কতকগুলি কর্তব্য আছে। তুমি যদি আমার বশ্যতা স্বীকার করিয়া আমার আদেশ পালন কর, তবেই তোমার প্রতি আমার যাহা কর্তব্য তাহা আমি ভালোরূপে সম্পন্ন করিতে পারি। আর, তুমি যদি বল 'আমার মনে যখন ভক্তির উদয় হইতেছে না তখন আমি কেন দাদামহাশয়ের কথা শুনিব', তাহা হইলে যে কেবল তোমার কর্তব্যই অসম্পূর্ণ রহিল তাহা নহে, তাহা হইলে আমার কর্তব্যেরও ব্যাঘাত হয়। তোমার দৃষ্টান্তে তোমার ছোটো ভাইরাও আমার কথা মানিবে না, দাদামহাশয়ের কাজ আমার দ্বারা একেবারেই সম্পন্ন হইতে পারিবে না। এই কর্তব্যপাশে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্তব্য অবিশ্রাম স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য সমাজে অনেকগুলি দস্তুর প্রচলিত আছে। সৈন্যদের যেমন অসংখ্য নিয়মে বদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়, নহিলে তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে না, সকল মানুষকেই তেমনি সহস্র দস্তুরে বদ্ধ থাকিতে হয়, নতুবা তাহারা সমাজের কার্য-পালনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে না। যে গুরুজনকে তুমি প্রণাম করিয়া থাক, যাঁহাকে প্রত্যেক চিঠিপত্রে তুমি ভক্তির সম্ভাষণ কর, যাঁহাকে দেখিলে তুমি উঠিয়া দাঁড়াও, ইচ্ছা করিলেও সহসা তাঁহাকে তুমি অমান্য করিতে পারো না। সহস্র দস্তুর পালন করিয়া এমনি তোমার মনের শিক্ষা হইয়া যায় যে, গুরুজনকে মান্য করা তোমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ হইয়া উঠে, না করা তোমার পক্ষে সাধ্যাতীত হইয়া উঠে। আমাদের প্রাচীন দস্তুর সমস্ত ভাঙিয়া ফেলিয়া আমরা এই-সকল শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইতেছি। ভক্তি-স্নেহের বন্ধন ছিঁড়িয়া যাইতেছে। পারিবারিক সম্বন্ধ উলটা-পালটা হইয়া যাইতেছে। সমাজে বিশৃঙ্খলা জন্মিতেছে। তুমি যে দাদামহাশয়কে প্রণাম করিয়া চিঠি আরম্ভ কর না সেটা শুনিতে অত্যন্ত সামান্য বোধ হইতে পারে, কিন্তু নিতান্ত সামান্য নহে। অনেকগুলি দস্তুর আমাদের হৃদয়ের সহিত জড়িত, তাহা কতটুকু দস্তুর কতটুকু হৃদয়ের কার্য বলা যায় না। অকৃত্রিম ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমরা প্রণাম করি কেন? প্রণাম করাও তো একটা দস্তুর। এমন দেশ আছে যেখানে ভক্তিভাবে প্রণাম না করিয়া আর-কিছু করে। আমরা প্রণাম না করিয়া হাঁ করি না কেন? প্রণামের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, ভক্তির বাহ্যলক্ষণস্বরূপ একপ্রকার অঙ্গভঙ্গি আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে। যাঁহাকে আমরা ভক্তি করি তাঁহাকে স্বভাবতই আমাদের হৃদয়ের ভক্তি দেখাইতে ইচ্ছা হয়, প্রণাম করা সেই ভক্তি দেখাইবার উপায় মাত্র। আমি যদি প্রণাম না করিয়া ভক্তিভরে তিনবার হাততালি দিই তাহা হইলে যাঁহাকে ভক্তি করিলাম তিনি কিছুই বুঝিতে পারিবেন না, এমন-কি তাহা অপমান জ্ঞান করিতে পারেন। ভক্তি দেখাইবার সময়ে হাততালি দেওয়াই যদি দস্তুর থাকিত,

তাহা হইলে প্রণাম করা অত্যন্ত দোষের হইত সন্দেহ নাই। অতএব দস্তুরকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতে পারি না, হৃদয়ের অভাব প্রকাশ করি বটে।

অতএব আমাকে প্রণামপুরঃসর চিঠি লিখিবে, ভক্তি থাক্ আর নাই থাক্— সে দেখিতে বড়ো ভালো হয়। তোমার দেখাদেখি আর পাঁচ জনে দাদামহাশয়কে ভদ্র রকমে চিঠি লিখিতে শিখিবে এবং ক্রমে ভক্তি করিতেও শিখিবে।

আশীর্বাদক
শ্রীষষ্ঠীচরণ দেবশর্মণঃ

২

শ্রীচরণকমলযুগলেষু

আরও ভক্তি চাই! যুগলের উপর আরও এক-জোড়া বাড়াইয়া দিব। দাদামহাশয়, তোমার অন্ত পাওয়া ভার, চিরকাল তুমি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টাতামাশা করিয়া আসিয়াছ, আর আজ হঠাৎ ভক্তি আদায় করিবার জন্য আমাদের উপর এক পরোয়ানাপত্র বাহির করিয়াছ, ইহার অর্থ কী? আমি দেখিয়াছি, যে অবধি তোমার সুমুখের এক-জোড়া দাঁত পড়িয়া গিয়াছে সেই অবধি তোমার মুখে কিছুই বাধে না। তোমার দাঁত গিয়াছে বটে, কিন্তু তীব্র ধারটুকু তোমার জিভের আগায় রহিয়া গিয়াছে। আর আগেকার মতো পরমানন্দে রুইমাছের মুড়ো চিবাইতে পারো না, সুতরাং দংশন করিবার সুখ তোমার নিরীহ নাতিদের কাছ হইতে আদায় কর। তোমার দন্তহীন হাসিটুকু আমার বড়ো মিষ্ট লাগে। কিন্তু তোমার দন্তহীন দংশন আমার তেমন উপাদেয় বলিয়া বোধ হয় না।

তোমাদের কালের সবই ভালো, আমাদের কালের সবই মন্দ, এইটে তুমি প্রমাণ করিতে চাও। এ সম্বন্ধে আমার দু-একটা কথা বলিবার আছে, তাহাতে যদি তোমাদের আদব-কায়দার কোনো ব্যতিক্রম হয় তবে আমাকে মাপ করিতে হইবে। আমরা যাহা করি তাহা তোমাদের চক্ষে বেয়াদবি বলিয়া ঠেকে, এইজন্যই ভয় হয়। তোমরা চোখে কম দেখ, কিন্তু নাতিদের একটি সামান্য ত্রুটি চশমা না লইয়াও বেশ দেখিতে পাও।

যে লোক যে কালে জন্মগ্রহণ করে সে কালের প্রতি তাহার যদি হৃদয়ের অনুরাগ না থাকে তবে সে কালের উপযোগী কাজ সে ভালো করিয়া করিতে পারে না। যদি সে মনে করে 'যে কাল গেছে তাহাই ভালো আর আমাদের কাল অতি হেয়', তবে

তাহার কাজ করিবার বল চলিয়া যায় ; ভূতকালের দিকে শিয়র করিয়া সে কেবল স্বপ্ন দেখে ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এবং ভূতত্ব প্রাপ্ত হওয়াই সে একমাত্র বাঞ্ছনীয় মনে করে। স্বদেশ যেমন একটা আছে স্বকালও তেমনি একটা আছে। স্বদেশকে ভালো না বাসিলে যেমন স্বদেশের কাজ করা যায় না, তেমনি স্বকালকে ভালো না বাসিলে স্বকালের কাজও করা যায় না। যদি ক্রমাগতই স্বদেশের নিন্দা করিতে থাক, স্বদেশের কোনো গুণই দেখিতে না পাও, তবে স্বদেশের উপযোগী কাজ তোমার দ্বারা ভালোরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। কেবলমাত্র কর্তব্য বিবেচনা করিয়া তুমি স্বদেশের উপকার করিতে চেষ্টা করিতে পারো, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় না। তোমার হৃদয়হীন কাজগুলো বিদেশী বীজের মতো স্বদেশের জমিতে ভালো করিয়া অঙ্কুরিত হইতে পারে না। তেমনি স্বকালের যে কেবল দোষই দেখে, কোনো গুণ দেখিতে পায় না, সে চেষ্টা করিলেও স্বকালের কাজ ভালো করিয়া করিতে পারে না। এক হিসাবে সে নাই বলিলেও হয় ; সে জন্মায় নাই, সে অতীতকালে জন্মিয়াছে, সে অতীতকালে বাস করিতেছে ; এ কালের জনসংখ্যার মধ্যে তাহাকে ধরা যায় না। ঠাকুরদাদামশায়, তুমি যে তোমাদের কালকে ভালোবাস এবং ভালো বল, সে তোমার একটা গুণের মধ্যে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে তোমাদের কালের কর্তব্য তুমি করিয়াছ। তুমি তোমার বাপ-মাকে ভক্তি করিয়াছ, তোমার পাড়াপ্রতিবেশীদের বিপদে-আপদে সাহায্য করিয়াছ, শাস্ত্রমতে ধর্মকর্ম করিয়াছ, দানধ্যান করিয়াছ, হৃদয়ের পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছ। যেদিন আমরা আমাদের কর্তব্য কাজ করি, সেদিনের সূর্যালোক আমাদের কাছে উজ্জ্বলতর বলিয়া বোধ হয়, সেদিনের সুখস্মৃতি বহুকাল ধরিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। সেকালের কাজ তোমরা শেষ করিয়াছ, অসম্পূর্ণ রাখ নাই, সেই জন্য আজ এই বৃদ্ধ বয়সে অবসরের দিনে সেকালের স্মৃতি এমন মধুর বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া একালের প্রতি আমাদের বিরাগ জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছ কেন ? ক্রমাগতই একালের নিন্দা করিয়া একালের কাছ হইতে আমাদের হৃদয় কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেছ কেন ? আমাদিগের জন্মভূমি এবং আমাদের জন্মকাল এই দুয়ের উপরেই আমাদের অনুরাগ অটল থাকে এই আশীর্বাদ করো।

গঙ্গোত্রীর সহিত গঙ্গার অবিচ্ছিন্ন সহস্রধারে যোগ রক্ষা হইতেছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া গঙ্গা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পিছু হঠিয়া গঙ্গোত্রীর উপরে আর উঠিতে পারে না। তেমনি, তোমাদের কাল ভালোই হউক আর মন্দই হউক, আমরা কোনোমতেই ঠিক সে জায়গায় যাইতে পারিব না। এটা যদি নিশ্চয় হয় তবে সাধ্যাতীতের জন্য

নিষ্ফল বিলাপ ও পরিতাপ না করিয়া যে অবস্থায় জন্মিয়াছি তাহারই সহিত বনিবনাও করিয়া লওয়াই ভালো। ইহার ব্যাঘাত যে করে সে অনেক অমঙ্গল সৃষ্টি করে।

বর্তমানের প্রতি অরুচি ইহা প্রায়ই বর্তমানের দোষে হয় না, আমাদের নিজের অসম্পূর্ণতাবশত হয়, আমাদের হৃদয়ের গঠনের দোষে হয়। বর্তমানই আমাদের বাসস্থান এবং কার্যক্ষেত্র। কার্যক্ষেত্রের প্রতি যাহার অনুরাগ নাই সে ফাঁকি দিতে চায়। যথার্থ কৃষক আপনার চাষের জমিটুকুকে প্রাণের মতো ভালোবাসে, সেই জমিতে সে শস্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রেম বপন করে। আর, যে কৃষক কাজ করিতে চায় না, ফাঁকি দিতে চায়, নিজের জমিতে পা দিলে তাহার পায়ে যেন কাঁটা ফুটিতে থাকে, সে কেবলই খুঁত খুঁত করিয়া বলে— 'আমার জমির এ দোষ, সে দোষ, আমার জমিতে কাঁকর, আমার জমিতে কাঁটাগাছ' ইত্যাদি। নিজের ছাড়া আর সকলের জমি দেখিলেই তাহার চোখ জুড়াইয়া যায়।

সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে এবং হইয়াই থাকে। সেই পরিবর্তনের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। নহিলে আমাদের জীবনই নিষ্ফল। নহিলে, মিউজিয়মে প্রাচীনকালের জীবেরা যেমন করিয়া স্থিতি করিতেছে আমাদিগকেও ঠিক তেমনি করিয়া পৃথিবীতে অবস্থান করিতে হইবে। পরিবর্তনের মধ্যে যেটুকু সার্থকতা আছে, যেটুকু গুণ আছে, তাহা আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। কারণ, সেইখান হইতে রসাকর্ষণ করিয়া আমাদিগকে বাড়িতে হইবে, আর-কোনো গতি নাই। যদি আমরা সত্যই জলে পড়িয়া থাকি, তবে সেখানে ডাঙার মতো চলিতে চেষ্টা করা বৃথা, সাঁতার দিতে হইবে।

অতএব, তুমি যে বলিতেছ, আমরা আজকাল গুরুজনকে যথেষ্ট মান্য করি না সেটা মানিয়া লওয়া যাক, তার পরে এই পরিবর্তনের ভিতরকার কথাটা একবার দেখিতে চেষ্টা করা যাক। এ কথাটা ঠিক নহে যে, ভক্তিটা সময়ের প্রভাবে মানুষের হৃদয় হইতে একেবারে চলিয়া গেছে। তবে কিনা ভক্তিস্রোতের মুখ এক দিক হইতে অন্য দিকে গেছে এ কথা সম্ভব হইতে পারে বটে। পূর্বে আমাদের দেশে ব্যক্তিগত ভাবের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশি ছিল। ভক্তি বলো ভালোবাসা বলো, একটা ব্যক্তিবিশেষকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারিত না। একজন মূর্তিমান রাজা না থাকিলে আমাদের রাজভক্তি থাকিতে পারিত না। কিন্তু শুদ্ধমাত্র রাজ্যতন্ত্রের প্রতি ভক্তি, সে য়ুরোপীয় জাতিদের মধ্যেই দেখা যায়। তখন সত্য ও জ্ঞান, গুরু-নামক একজন মনুষ্যের আকার ধারণ করিয়া থাকিত। তখন আমরা রাজার জন্য মরিতাম, ব্যক্তিবিশেষের

জন্য প্রাণ দিতাম— কিন্তু য়ুরোপীয়েরা কেবলমাত্র একটা ভাবের জন্য, একটা জ্ঞানের জন্য মরিতে পারে। তাহারা আফ্রিকার মরুভূমিতে, মেরুপ্রদেশের তুষারগর্ভে, প্রাণ বিসর্জন করিয়া আসিতেছে। কাহার জন্য? কোনো মানুষের জন্য নহে। বৃহৎ ভাবের জন্য, জ্ঞানের জন্য, বিজ্ঞানের জন্য। অতএব দেখা যাইতেছে য়ুরোপে মানুষের ভক্তি-অনুরাগ জ্ঞানে ও ভাবে বিস্তৃত হইতেছে, সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের ভাগে কিছু কিছু কম পড়িতেছে। সেই য়ুরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে ব্যক্তিবিশেষের চারি দিক হইতে আমাদের শিকড়ের পাক প্রতিদিন যেন অল্পে অল্পে খুলিয়া আসিতেছে। এখন মতের অনুরোধে অনেকে পিতামাতাকে ত্যাগ করিতেছেন, এখন প্রত্যক্ষ বাস্তুভিটাটুকু ছাড়িয়া অপ্রত্যক্ষ স্বদেশের প্রতি অনেকের প্রেম প্রসারিত হইতেছে, এবং সুদূর উদ্দেশ্যের জন্য অনেকে জীবনযাপন করিতে অগ্রসর হইতেছেন। এরূপ ভাব যে সম্পূর্ণ স্ফূর্তি পাইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ইহার কাজ চলিতেছে, ইহার নানা লক্ষণ অল্পে অল্পে প্রকাশ পাইতেছে। ইহার ভালোমন্দ দুইই আছে। সে কথা সকল অবস্থা সম্বন্ধেই খাটে। তবে, যখন এই পরিবর্তন একেবারে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তখন ইহার মধ্যে যে ভালোটুকু আছে সেটা যদি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি, সেই ভালোটুকুর উপর যদি অনুরাগ বদ্ধ করিতে পারি, তবে সেই ভালোটুকু শীঘ্র শীঘ্র স্ফূর্তি পাইয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে, মন্দটা ম্লান হইয়া যায়। নহিলে, সকল জিনিসের যেমন দস্তুর আছে, মন্দটাই আগেভাগে খুব কণ্টকিত হইয়া সকলের চোখে পড়ে, ভালোটা অনেক বিলম্বে গা-ঝাড়া দিয়া উঠে।

আমার কথা তো আমি বলিলাম, এখন তোমার কথা তুমি বলো। তুমি কালেজে পড় নাই বলিয়া কিছুমাত্র সংকোচ করিয়ো না। কারণ, তোমারও লেখাতে বিলক্ষণ কালেজের গন্ধ ছাড়ে। সেটা সময়ের প্রভাব। ঘ্রাণে অর্ধভোজন হয় সেটা মিথ্যা কথা নয়। অতএব এখনকার সমাজে বসিয়া তুমি যে নিশ্বাস লইতেছ ও নস্য লইতেছ, তাহাতেই কালেজের অর্ধেক বিদ্যা তোমার নাকে সেঁধোইতেছে। নাক বন্ধ করিতে পারিতেছ না, কেবল নাক তুলিয়াই আছ। যেন পেঁয়াজ-রসুনের খেতের মধ্যে বাস করিতেছ এবং তোমার নাতিরাই তাহার এক-একটি হৃষ্টপুষ্ট উৎপন্ন দ্রব্য। কিন্তু ইহা জানিয়ো এ গন্ধ ধুইলে যাইবে না, মাজিলে যাইবে না, নাতিগুলিকে একেবারে সমূলে উৎপাটন করিতে পারো তো যায়। কিন্তু এ তো আর তোমার পাকা চুল নয়, রক্তবীজের ঝাড়।

সেবক
শ্রীনবীনকিশোর শর্মণঃ

৩

চিরঞ্জীবেষু

ভায়া, দাদামহাশয়দের সঙ্গে ঠাট্টাতামাশা করিতে পাও বলিয়া যে তাঁহাদের ভক্তি করিতে হইবে না এটা কোনো কাজের কথা নহে। দাদামহাশয়েরা তোমাদের চেয়ে এত বেশি বড়ো যে তাঁহাদের সঙ্গে ঠাট্টাতামাশা করিলেও চলে। কেমনতরো জানো ? যেমন ছোটো ছেলে বাপের গায়ে পা তুলিয়া দিলে তাহাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। কিন্তু তাহা হইতে এমন প্রমাণ হয় না যে, বাপের প্রতি সেই ছোটো ছেলের ভক্তি নাই, অর্থাৎ নির্ভরের ভাব নাই, অর্থাৎ সে সহজেই বাপকে আপনার চেয়ে বড়ো মনে করে না। তোমরা তেমনি আমাদের কাছে এত ছোটো যে, আমরা নিরাপদে তোমাদের সহিত বেয়াদবি করিতে পারি এবং অকাতরে তোমাদের বেয়াদবি সহিতে পারি। আর-একটা কথা, সন্তানের শুভাশুভ সমস্তই পিতার উপর নির্ভর করিতেছে, এই জন্য স্বভাবতই পিতার স্নেহের সহিত শাসন আছে এবং পুত্রের ভক্তির সহিত ভয় আছে— পদে পদে কঠোর কর্তব্যপথে সন্তানকে নিয়োগ করিবার জন্য পিতার আদেশ করিতে হয় এবং পুত্রের তাহা পালন করিতে হয়, এইজন্য পিতাপুত্রের মধ্যে আচরণের শৈথিল্য শোভা পায় না। এইরূপে পিতার উপরে কঠোর স্নেহের ভার দিয়া দাদামহাশয় কেবলমাত্র মধুর স্নেহ বিতরণ করেন এবং নাতি নির্ভয়ভক্তিভরে দাদামহাশয়ের সহিত আনন্দে হাস্যালাপ করিতে থাকে। কিন্তু সে হাস্যালাপের মর্মের মধ্যে যদি ভক্তি না থাকে তবে তাহা বেয়াদবির অধম। এত কথা তোমাকে বলিবার আবশ্যক ছিল না, কিন্তু তোমার লেখার ভঙ্গি দেখিয়া তোমাকে কিঞ্চিৎ সাবধান করিয়া দিতে হয়।

বাস রে ! আজকাল তোমরা এত কথাও কহিতে শিখিয়াছ ! এখন একটা কথা কহিলে পাঁচটা কথা শুনিতে হয়। তাহার মধ্যে যদি সব কথা বুঝিতে পারিতাম তাহা হইলেও এতটা গায়ে লাগিত না। ভাবের মিল থাকিলেও অনেক সময়ে আমরা পরস্পরের ভাষা বুঝিতে পারি না বলিয়া বিস্তর মনান্তর উপস্থিত হয়। আমি বুড়া-মানুষ, তোমার সমস্ত কথা ঠিক বুঝিয়াছি কি না কে জানে, কিন্তু যেরূপ বুঝিলাম সেই-রূপ উত্তর দিতেছি।

স্বকাল, পরকাল, এ এক নূতন কথা তুমি তুলিয়াছ। পরকালটা নূতন নয়, সমুখের একজোড়া দাঁত বিসর্জন দিয়া অবধি ঐ কালের কথাটাই ভাবিতেছি— কিন্তু স্বকাল আবার কী ?

কালের কি কিছু স্থিরতা আছে না কি ? আমরা কি ভাসিয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি যে কালস্রোতের উপর হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিব ? মহৎ মনুষ্যত্বের

আদর্শ কি স্রোতের মধ্যবর্তী শৈলের মতো কালকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করিতেছে না?

আমরা পরিবর্তনের মধ্যে থাকি বলিয়াই একটা স্থির লক্ষ্যের প্রতি বেশি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। নহিলে কিছুক্ষণ বাদে আর-কিছুই ঠাহর হয় না; নহিলে আমরা পরিবর্তনের দাস হইয়া পড়ি, পরিবর্তনের খেলনা হইয়া পড়ি। তুমি যেরূপ লিখিয়াছ তাহাতে তুমি পরিবর্তনকেই প্রভু বলিয়াছ, কালকেই কর্তা বলিয়া মানিয়াছ। অর্থাৎ, ঘোড়াকেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছ এবং আরোহীকেই তাহার অধীন বলিয়া প্রচার করিতেছ। কালের প্রতি ভক্তি এইটেই তুমি সার কথা ধরিয়া লইয়াছ, কিন্তু মনুষ্যত্বের প্রতি— ধ্রুব আদর্শের প্রতি— ভক্তি তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

মনুষ্যের প্রতি প্রেম, পিতার প্রতি ভক্তি, পুত্রের প্রতি স্নেহ —এ যে কেবল পরিবর্তনশীল ক্ষুদ্র কালবিশেষের ধর্ম এ কথা বলিতে কে সাহস করে! এ ধর্ম সকল কালের উপরেই মাথা তুলিয়া আছে। উনবিংশ শতাব্দীর ধূলি উড়াইয়া ইহাকে চোখের আড়াল করিতে পারো, তাই বলিয়া ফুঁয়ের জোরে ইহাকে একেবারে ধূলিসাৎ করিতে পারো না।

যদি সত্যই এমন দেখিয়া থাকো যে, এখনকার কালে পিতামাতাকে কেহ ভক্তি করে না, অতিথিকে কেহ যত্ন করে না, প্রতিবেশীদিগকে কেহ সাহায্য করে না, তবে এখনকার কালের জন্য শোক করো— কালের দোহাই দিয়া অধর্মকে ধর্ম বলিয়া প্রচার করিয়ো না।

অতীত ও ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া বর্তমানকে সংযত করিতে হয়। যদি ইচ্ছা কর তো চোখ বুজিয়া ছুটিবার সুখ অনুভব করিতে পারো। কিন্তু অবিলম্বে ঘাড় ভাঙিবার সুখটাও টের পাইবে।

বর্তমানকাল ছুটিতেছে বলিয়াই স্তব্ধ অতীতকালের এত মূল্য। অতীতে কালের প্রবল বেগ, প্রচণ্ড গতি, সংহত হইয়া যেন স্থির আকার ধারণ করিয়াছে। কালকে ঠাহর করিতে হইলে অতীতের দিকে চাহিতে হয়। অতীত বিলুপ্ত হইলে বর্তমান কালকে কেই বা চিনিতে পারে, কেই বা বিশ্বাস করে, তাহাকে সামলায় কাহার সাধ্য! কেননা, চিনিতে পারিলে, জানিতে পারিলে তবে বশ করা যায়। যাহাকে জানি না সে আমাদের প্রভু হইয়া দাঁড়ায়। অতএব পরিবর্তনশীল কালকে ভয় করিয়া চলো, তাহাকে বশ করিতে চেষ্টা করো, তাহাকে নিতান্ত বিশ্বাস করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়ো না।

যাহা থাকে না, চলিয়া যায়, মুহুর্মুহু পরিবর্তিত হয়, তাহাকে আপনার বলিবে কী

করিয়া ? একখণ্ড ভূমিকে আপনার বলা যায়, কিন্তু জলের স্রোতকে আপনার বলিবে কে ? তবে আবার স্বকাল জিনিসটা কী ?

তুমি লিখিয়াছ আমাদের সেকালে ব্যক্তির প্রতিই ভক্তি-প্রীতি প্রভৃতি বদ্ধ ছিল, ভাবের প্রতি ভক্তি-প্রীতি ছিল না। ব্যক্তির প্রতি ভক্তি-প্রীতি কিছু মন্দ নহে, সে খুব ভালোই, সুতরাং আমাদের কালে যে সেটা খুব বলবান ছিল সেজন্য আমরা লজ্জিত নহি। কিন্তু তাই বলিয়া যদি বলো যে, ভাবের প্রতি আমাদের কালের লোকের ভক্তি-প্রীতি ছিল না তবে সে কথাটা আমাকে অস্বীকার করিতে হয়। আমাদের কালে দুইই ছিল, এবং উভয়েই পরস্পর বনিবনাও করিয়া বাস করিত। একটা উদাহরণ দিই। আমাদের দেশে যে স্বামীপ্রীতি বা স্বামীভক্তি ছিল (এখনো হয়তো আছে) তাহা কী ? তাহা কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের প্রতি প্রীতি বা ভক্তি নয়, তাহা ব্যক্তি-বিশেষকে অতিক্রম করিয়া বর্তমান, তাহা স্বামী-নামক ভাবগত অস্তিত্বের প্রতি ভক্তি। ব্যক্তিবিশেষ উপলক্ষ মাত্র, স্বামীই প্রধান লক্ষ্য। এইজন্য ব্যক্তির ভালোমন্দের উপর ভক্তির তারতম্য হইত না। সকল স্ত্রীর সকল স্বামীই সমান পূজ্য। য়ুরোপীয় স্ত্রীর ভক্তি-প্রীতি ব্যক্তির মধ্যেই বদ্ধ, ভাবে গিয়া পৌছায় না। এইজন্য স্বামী-নামক ব্যক্তিবিশেষের দোষগুণ-অনুসারে তাহার ভক্তি-প্রীতি নিয়মিত হয়। এইজন্যই সেখানে বিধবাবিবাহে দোষ নাই, কারণ সেখানকার স্ত্রীরা ভাবকে বিবাহ করে না, ব্যক্তিকেই বিবাহ করে, সুতরাং ব্যক্তিত্বের অবসানেই স্বামিত্বের অবসান হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিগত সম্পর্কই এইরূপ সুগভীর ভাবের উপরে স্থায়ী।

কেবল ব্যক্তিগত সম্পর্ক কেন, অন্যান্য বিষয় দেখো-না। আমাদের ব্রাহ্মণেরা কি সমাজের হিতার্থ সমাজ ত্যাগ করেন নাই ? রাজারা কি ধর্মের জন্য বৃদ্ধ বয়সে রাজ্য ত্যাগ করেন নাই ? (য়ুরোপের রাজারা তাড়া না খাইলে কখনো এমন কাজ করেন ?) ঋষিরা কি জ্ঞানের জন্য, অমরতার জন্য, সংসারের সমস্ত সুখ ত্যাগ করেন নাই ? পিতৃসত্য -পালনের জন্য রামচন্দ্র যৌবরাজ্যত্যাগ, সত্যরক্ষার জন্য হরিশ্চন্দ্র স্বর্গত্যাগ, পরহিতের জন্য দধীচি দেহত্যাগ করেন নাই ? কর্তব্য অর্থাৎ ভাবমাত্রের জন্য আত্মত্যাগ আমাদের দেশে ছিল না কে বলে ? কুকুর যেরূপ অন্ধ আসক্তিতে মনিবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়, সীতা কি সেইভাবে রামের সঙ্গে সঙ্গে বনে গিয়াছিলেন, না মহৎ ভাবের পশ্চাতে মনুষ্য যেরূপ অকাতরে বিপদ ও মৃত্যুর মুখে ছুটিয়া যায় সীতা সেইরূপ ভাবে গিয়াছিলেন ?

তবে কি ব্যক্তির প্রতি ও ভাবের প্রতি ভক্তি একই সময়ে থাকিতে পারে না ? বর্তমানের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া 'পারে না' বলিয়া এমন একটি রত্ন

অবহেলায় হারাইয়ো না। এই পর্যন্ত বলা যায় যে, কাহারও বা এক ভাবের প্রতি ভক্তি, কাহারও বা আর-এক ভাবের প্রতি ভক্তি। কেহ বা লৌকিক স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে পারে, কেহ বা আত্মার স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে পারে।

এ-সকল কথা তোমাদের বয়সে আমরা বুঝিতে পারিতাম না ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তোমরা অনেক কূট-কচালে কথা বুঝিতে পারো বলিয়াই এতখানি বকিলাম।

আশীর্বাদক
শ্রীষষ্ঠীচরণ দেবশর্মণঃ

৪

শ্রীচরণেষু

দাদামশায়, তোমার চিঠি ক্রমেই হেঁয়ালি হইয়া উঠিতেছে। আমাদের চোখে এ চিঠি অত্যন্ত ঝাপসা ঠেকে। কোথায় রামচন্দ্র হরিশ্চন্দ্র দধীচি, অত দূরে আমাদের দৃষ্টি চলে না। তোমরাই তো বল আমাদের দূরদর্শিতা নাই, অতএব দূরের কথা দূর করিয়া নিকটের কথা তুলিলেই ভালো হয়।

আমরা যে মস্ত জাতি, আমাদের মতো এতবড়ো জাতি যে পৃথিবীর আর কোথাও মেলে না, তাহাতে আমাদের মনে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। বেদ বেদান্ত আগম নিগম পুরাণ হইতে ইহা অকাট্যরূপে প্রমাণ করিয়া দেওয়া যায়। আমাদের বেলুন ছিল, রেলগাড়ি ছিল, আমাদের স্টাইলোগ্রাফ পেন ছিল, গণপতি তাহাতে মহাভারত লিখিয়াছিলেন, ডারুইনের বহুপূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাঁহাদের পূর্বতর পুরুষদিগকে বানর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, আধুনিক বিজ্ঞানের সমুদয় সিদ্ধান্তই শাণ্ডিল্য-ভৃগু-গৌতমের সম্পূর্ণ জানা ছিল, ইহা সমস্তই মানিলাম— কিন্তু তাই বলিয়াই যে আমরা আমাদের কৌলীন্য লইয়া স্ফীত হইতে থাকিব, সেই সুদূর কুটুম্বিতার মধ্যেই গুটি মারিয়া বসিয়া থাকিব, কাছাকাছির সহিত কোনো সম্পর্ক রাখিব না, এমন হইতে পারে না। বাল্যকালে একদিন উত্তমরূপে পোলাও খাওয়া হইয়াছিল বলিয়া যে অবশিষ্ট জীবন ভাতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই। আমাদের বৈদিক পৌরাণিক যুগ যে চলিয়া গেছে এ বড়ো দুঃখের বিষয়, এখন সকাল-সকাল এই দুঃখ সারিয়া লইয়া বর্তমান যুগের কাজ করিবার জন্য একটু সময় করিয়া লওয়া আবশ্যক।

আমি যখন বলিয়াছিলাম ভাবের প্রতি আমাদের দেশের লোকের নিষ্ঠা নাই, ব্যক্তির প্রতিই আসক্তি, তখন আমি রামচন্দ্র-হরিশ্চন্দ্র-দধীচির কথা মনেও করি নাই— কীটের মতো যেখানকার যত পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে আমার উৎসাহ নাই। আমি অপেক্ষাকৃত আধুনিকের কথাই বলিতেছি। তর্কবিতর্কের প্রবৃত্তি দূর করিয়া একবার ভাবিয়া দেখো দেখি, মহৎ ভাবকে উপন্যাসগত কুহেলিকা জ্ঞান না করিয়া মহৎ ভাবকে সত্য মনে করিয়া, তাহাকে বিশ্বাস করিয়া, তাহার জন্য আমাদের দেশে কয়জন লোক আত্মসমর্পণ করে। কেবল দলাদলি, কেবল 'আমি আমি আমি' এবং 'অমুক অমুক অমুক' করিয়াই মরিতেছি। আমাকে এবং অমুককে অতিক্রম করিয়াও যে দেশের কোনো কাজ, কোনো মহৎ অনুষ্ঠান বিরাজ করিতে পারে, ইহা আমরা মনে করিতে পারি না। এইজন্য আপন আপন অভিমান লইয়াই আমরা থাকি। আমাকে বড়ো চৌকি দেয় নাই, অতএব এ সভায় আমি থাকিব না— আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে নাই, অতএব ও কাজে আমি হাত দিতে পারি না— সে সমাজের সেক্রেটারি অমুক, অতএব সে সমাজে আমার থাকা শোভা পায় না— আমরা কেবল এই ভাবিয়াই মরি। সুপারিশের খাতির এড়াইতে পারি না, চক্ষুলজ্জা অতিক্রম করিতে পারি না, আমার একটা কথা অগ্রাহ্য হইলে সে অপমান সহ্য করতে পারি না। দুর্ভিক্ষনিবারণের উদ্দেশে কেহ যদি আমার সাহায্য লইতে আসে, আমি পাঁচ টাকা দিয়া মনে করি তাহাকেই ভিক্ষা দিলাম, তাহাকেই সবিশেষ বাধিত করিলাম— সে এবং তাহার ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ-সংখ্যক পূর্বপুরুষের নিকট হইতে মনে মনে কৃতজ্ঞতা দাবি করিয়া থাকি। নহিলে মনের তৃপ্তি হয় না। কোনো ব্যক্তিবিশেষকে বাধিত করিলাম না— আমি রহিলাম কলিকাতার এক কোণে, বীরভূমের এক কোণে এক ব্যক্তি আমার টাকায় মাসখানেক ধরিয়া দুই মুঠা ভাত খাইয়া লইল— ভারী তো আমার গরজ! পরোপকারী বলিয়া নাম বাহির হয় কার? যে ব্যক্তি আশ্রিতদের উপকার করে। অর্থাৎ, একজন আসিয়া কহিল, 'মহাশয়, আপনার হাত ঝাড়িলে পর্বত, আপনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে আমার একটা গতি করিতে পারেন— আমি আপনাদেরই আশ্রিত।' মহামহিম মহিমার্ণব অমনি অবহেলে গুড়গুড়ি হইতে ধূমাকর্ষণপূর্বক অকাতরে বলিলেন, 'আচ্ছা!' বলিয়া পত্রযোগে একজন বিশ্বাসপরায়ণ বান্ধবের ঘাড়ে সেই অকর্মণ্য অপদার্থকে নিক্ষেপ করিলেন। আর একজন হতভাগ্য অগ্রে তাঁহার কাছে না গিয়া পাঁচুবাবুর কাছে গিয়াছিল, এই অপরাধে তাহাকে কানা কড়ি সাহায্য করা চুলায় যাক, বাক্যযন্ত্রণায় তাহাকে নাকের জলে চোখের জলে করিয়া তবে ছাড়িয়া দিলেন। আপনার স্থূল উদরটুকু ধারণ করিয়া এবং উদরের চতুষ্পার্শ্বে সহচর-অনুচরগণকে

চক্রাকারে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যে ব্যক্তি বিপুল শনিগ্রহের মতো বিরাজ করিতে থাকে আমাদের এখানে সে ব্যক্তি একজন মহৎ লোক। উদারতার সীমা উদরের চারি পার্শ্বের মধ্যেই অবসিত। আমাদের মহত্ত্ব ব্যাপক দেশে, ব্যাপক কালে, স্থান পায় না। অত কথায় কাজ কী, উদার মহত্ত্বকে আমরা কোনোমতে বিশ্বাস করিতেই পারি না। যদি দেখি কোনো-এক ব্যক্তি টাকাকড়ির দিকে খুব বেশি মনোযোগ না দিয়া খানিকটা করিয়া সময় দেশের কাজে ব্যয় করে, তবে তাহাকে বলি 'হুজুকে'। আমাদের স্ফীত ক্ষুদ্রত্বের নিকট বড়ো কাজ একটা হুজুক বৈ আর কিছুই নয়। আমরা টাকাকড়ি ক্ষুধাতৃষ্ণা এ-সকলের একটা অর্থ বুঝিতে পারি, ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির বশে এবং সংকীর্ণ কর্তব্যজ্ঞানে কাজ করাকেই বুদ্ধিমান প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির লক্ষণ বলিয়া জানি— কিন্তু মহৎ কার্যের উৎসাহে আত্মসমর্পণ করার কোনো অর্থই আমরা খুঁজিয়া পাই না। আমরা বলি, ও ব্যক্তি দল বাঁধিবার জন্য বা নাম করিবার জন্য বা কোনো-একটা গোপনীয় উপায়ে অর্থ উপার্জন করিবার জন্য এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে— স্পষ্ট করিয়া কিছু যদি না বলিতে পারি তো বলি, ওর একটা মৎলব আছে। মৎলব তো আছেই। কিন্তু মৎলব মানে কি কেবলই নিজের উদর বা অহংকার -তৃপ্তি, ইহা ব্যতীত আর দ্বিতীয় কোনো উচ্চতর মৎলব আমরা কি কল্পনাও করিতে পারি না? এমনি আমাদের জাতির হৃদয়গত বদ্ধমূল ক্ষুদ্রতা! কিন্তু এ দিকে দেখো, রামহরি বা কালাচাঁদের উপকারের জন্য কেহ প্রাণপণ করিতেছে এরূপ নিঃস্বার্থ ভাব দেখিলে আমরা তাহার প্রশংসা করিয়াই থাকি। অথচ, মানবজাতির উপকারের জন্য আপিস কামাই করা— এরূপ অবিশ্বাসজনক হাস্যজনক প্রস্তাব আপিস-কোটর-বাসী ক্ষুদ্র বাঙালি-পেচকের নিকটে নিতান্ত রহস্য বলিয়া বোধ হয়। সামাজিক প্রবন্ধ দেখিলে বাঙালি পাঠকেরা ক্রমাগত ঘ্রাণ করিয়া সন্ধান করিতে থাকে ইহা কোন্ ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে লিখিত। সমাজের কোনো কুরুচি বা কদাচারের বিরুদ্ধে কেহ যে রাগ করিতে পারে ইহা তেমন সম্ভব বোধ হয় না— এই উপলক্ষ্য করিয়া কোনো শত্রুর প্রতি আক্রমণ করা ইহাই একমাত্র যুক্তিসংগত, মানুষ্যস্বভাব- অর্থাৎ বাঙালিস্বভাব- সংগত বলিয়া সকলের বোধ হয়। এইজন্য অনেক বাংলা কাগজে ব্যক্তিবিশেষের কথা খুঁটিয়া খুঁটিয়া উঞ্ছবৃত্তি করা হয়— যাকে-তাকে ধরিয়া তাহার উকুন বাছিয়া বা উকুন বাছিবার ভাণ করিয়া বাঙালি দর্শক-সাধারণের পরম আমোদ উৎপাদন করা হয়।

এই-সকল দেখিয়া শুনিয়াই তো বলিয়াছিলাম, আমরা ব্যক্তির জন্য আত্মবিসর্জন করিতেও পারি, কিন্তু মহৎ ভাবের জন্য সিকি পয়সাও দিতে পারি না। আমরা কেবল

ঘরে বসিয়া বড়ো কথা লইয়া হাসিতামাশা করিতে পারি, বড়ো লোককে লইয়া বিদ্রূপ করিতে পারি, তার পরে ফুড়্ ফুড়্ করিয়া খানিকটা তামাক টানিয়া তাস খেলিতে বসি। আমাদের কী হবে তাই ভাবি। অথচ ঘরে বসিয়া আমাদের অহংকার অভিমান খুব মোটা হইতেছে। আমরা ঠিক দিয়া রাখিয়াছি আমরা সমুদয় সভ্য জাতির সমকক্ষ। আমরা না পড়িয়া পণ্ডিত, আমরা না লড়িয়া বীর, আমরা ধাঁ করিয়া সভ্য, আমরা ফাঁকি দিয়া পেট্রিয়ট— আমাদের রসনার অদ্ভুত রাসায়নিক প্রভাবে জগতে যে তুমুল বিপ্লব উপস্থিত হইবে আমরা তাহারই জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি, সমস্ত জগৎও সেই দিকে সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিয়া আছে। দাদামশায়, আর হরিশ্চন্দ্র রামচন্দ্র দধীচির কথা পাড়িয়া ফল কী বলো শুনি। উহাতে আমাদের ফুটন্ত বাগ্মিতার মুখে ফোড়ন দেওয়া হয় মাত্র— আর কী হয়?

আমরা কেবল আপনাকে একে ওকে তাকে এবং এটা ওটা সেটা লইয়া মহা ধুমধাম ছট্‌ফট্ বা খুঁৎখুঁৎ করিয়া বেড়াইতেছি— প্রকৃত বীরত্ব, উদার মনুষ্যত্ব, মহত্ত্বের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, জীবনের গুরুতর কর্তব্যসাধনের জন্য হৃদয়ের অনিবার্য আবেগ, ক্ষুদ্র বৈষয়িকতার অপেক্ষা সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ, এ-সকল আমাদের দেশে কেবল কথার কথা হইয়া রহিল— দ্বার নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়া জাতির হৃদয়ের মধ্যে ইহারা প্রবেশ করিতে পারিল না, কেবল বাষ্পময় ভাষার প্রতিমাগুলি আমাদের সাহিত্যে কুজ্ঝটিকা রচনা করিতে লাগিল।

আমরা আশা করিয়া আছি ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে এ-সকল সংকীর্ণতা ক্রমে আমাদের মন হইতে দূর হইয়া যাইবে। এই শিক্ষার প্রতি বিরাগ জন্মাইয়া দিয়া ইহার অভ্যন্তরস্থিত ভালো জিনিসটুকু দেখিবার পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়া বোধ হয় না।

সেবক

শ্রীনবীনকিশোর শর্মণঃ

৫

চিরঞ্জীবেষু

তোমার চিঠি পড়িয়া বড়ো খুশি হইলাম। বাস্তবিক, বাঙালিজাতি যেরূপ চালাকি করিতে শিখিয়াছে তাহাতে তাহাদের কাছে কোনো গম্ভীর বিষয় বলিতে বা কোনো শ্রদ্ধাস্পদের নাম করিতে মনের মধ্যে সংকোচ উপস্থিত হয়। আমাদের এক কালে গৌরবের দিন ছিল, আমাদের দেশে এক কালে বড়ো বড়ো বীরসকল জন্মিয়া-

ছিলেন— কিন্তু বাঙালির কাছে ইহার কোনো ফল হইল না। তাহারা কেবল ভীষ্ম-দ্রোণ-ভীমার্জুনকে পুরাতত্ত্বের কুলুঙ্গি হইতে পাড়িয়া, ধুলা ঝাড়িয়া, সভাস্থলে পুতুল-নাচ দেখায়। আসল কথা, ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণ আমাদের দেশে মরিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যে বাতাসে ছিলেন সে বাতাস এখন আর নাই। স্মৃতিতে বাঁচিতে হইলেও তাহার খোরাক চাই। নাম মনে করিয়া রাখা তো স্মৃতি নহে, প্রাণ ধরিয়া রাখাই স্মৃতি। কিন্তু প্রাণ জাগাইয়া রাখিতে হইলেই তাহার উপযোগী বাতাস চাই, তাহার উপযোগী খাদ্য চাই। আমাদের হৃদয়ের তপ্ত রক্ত সেই স্মৃতির শিরার মধ্যে প্রবাহিত হওয়া চাই। মনুষ্যত্বের মধ্যেই ভীষ্ম-দ্রোণ বাঁচিয়া আছেন। আমরা তো নকল মানুষ। অনেকটা মানুষের মতো। ঠিক মানুষের মতো খাওয়াদাওয়া করি, চলিয়া ফিরিয়া বেড়াই, হাই তুলি ও ঘুমোই— দেখিলে কে বলিবে যে মানুষ নই! কিন্তু ভিতরে মনুষ্যত্ব নাই। যে জাতির মজ্জার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে সে জাতির কেহ মহত্ত্বকে অবিশ্বাস করিতে পারে না, মহৎ আশাকে কেহ গাঁজাখুরি মনে করিতে পারে না, মহৎ অনুষ্ঠানকে কেহ হুজুক বলিতে পারে না। সেখানে সংকল্প কার্য হইয়া উঠে, কার্য সিদ্ধিতে পরিণত হয়; সেখানে জীবনের সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পায়। সে জাতিতে সৌন্দর্য ফুলের মতো ফুটিয়া উঠে, বীরত্ব ফলের মতো পক্বতা প্রাপ্ত হয়। আমার বিশ্বাস, আমরা যতই মহত্ত্ব উপার্জন করিতে থাকিব, আমাদের হৃদয়ের বল যতই বাড়িয়া উঠিবে, আমাদের দেশের বীরগণ ততই পুনর্জীবন লাভ করিবেন। পিতামহ ভীষ্ম আমাদের মধ্যে বাঁচিয়া উঠিবেন। আমাদের সেই নূতন জীবনের মধ্যে আমাদের দেশের প্রাচীন জীবন জীবন্ত হইয়া উঠিবে। নতুবা মৃত্যুর মধ্যে জীবনের উদয় হইবে কী করিয়া? বিদ্যুৎপ্রয়োগে মৃতদেহ জীবিতের মতো কেবল অঙ্গভঙ্গি ও মুখভঙ্গি করে মাত্র। আমাদের দেশে সেই বিচিত্র ভঙ্গিমার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কিন্তু হায় হায়, কে আমাদিগকে এমন করিয়া নাচাইতেছে? কেন আমরা ভুলিয়া যাইতেছি যে আমরা নিতান্ত অসহায়? আমাদের এত-সব উন্নতির মূল কোথায়? এ-সব উন্নতি রাখিব কিসের উপরে? রক্ষা করিব কী উপায়ে? একটু নাড়া খাইলেই দিন-দুয়ের সুখস্বপ্নের মতো সমস্তই যে কোথায় বিলীন হইয়া যাইবে! অন্ধকারের মধ্যে বঙ্গদেশের উপরে ছায়াবাজির উজ্জ্বল ছায়া পড়িয়াছে, তাহাকেই স্থায়ী উন্নতি মনে করিয়া আমরা ইংরাজি ফ্যাশানে করতালি দিতেছি। উন্নতির চাকচিক্য লাভ করিয়াছি, কিন্তু উন্নতিকে ধারণ করিবার, পোষণ করিবার ও রক্ষা করিবার বিপুল বল কই লাভ করিতেছি? আমাদের হৃদয়ের মধ্যে চাহিয়া দেখো, সেখানে সেই জীর্ণতা, দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতা, ক্ষুদ্রতা, অসত্য, অভিমান, অবিশ্বাস, ভয়। সেখানে চপলতা, লঘুতা,

আলস্য, বিলাস। দৃঢ়তা নাই, উদ্যম নাই ; কারণ, সকলেই মনে করিতেছেন, সিদ্ধি হইয়াছে, সাধনার আবশ্যক নাই। কিন্তু যে সিদ্ধি সাধনা-ব্যতীত হইয়াছে তাহাকে কেহ বিশ্বাস করিয়ো না। তাহাকে তোমার বলিয়া মনে করিতেছ, কিন্তু সে কখনোই তোমার নহে। আমরা উপার্জন করিতে পারি, কিন্তু লাভ করিতে পারি না। আমরা জগতের সমস্ত জিনিসকে যতক্ষণ না আমার মধ্যে ফেলিয়া আমার করিয়া লইতে পারি, ততক্ষণ আমরা কিছুই পাই না। ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িলেই তাহাকে পাওয়া বলে না। আমাদের চক্ষের স্নায়ু সূর্যকিরণকে আমাদের উপযোগী আলো-আকারে গড়িয়া লয়, তা না হইলে আমরা অন্ধ ; আমাদের অন্ধ চক্ষুর উপরে সহস্র সূর্যকিরণ পড়িলেও কোনো ফল নাই। আমাদের হৃদয়ের সেই স্নায়ু কোথায় ! এ পক্ষাঘাতের আরোগ্য কিসে হইবে ! আমরা সাধনা কেন করি না ? সিদ্ধির জন্য আমাদের মাথাব্যথা নাই বলিয়া। সেই মাথাব্যথাটা গোড়ায় চাই।

অর্থাৎ, বাতিকের আবশ্যক। আমাদের শ্লেষ্মাপ্রধান ধাত, আমাদের বাতিকটা আদবেই নাই। আমরা ভারী ভদ্র, ভারী বুদ্ধিমান, কোনো বিষয়ে পাগলামি নাই। আমরা পাশ করিব, রোজগার করিব, ও তামাক খাইব। আমরা এগোইব না, অনুসরণ করিব ; কাজ করিব না, পরামর্শ দিব ; দাঙ্গাহাঙ্গামাতে নাই, কিন্তু মকদ্দমা মামলা ও দলাদলিতে আছি। অর্থাৎ, হাঙ্গামের অপেক্ষা হুজ্জতটা আমাদের কাছে যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়। লড়াইয়ের অপেক্ষা পলায়নেই পিতৃযশ রক্ষা হয় এইরূপ আমাদের বিশ্বাস। এইরূপ আত্যন্তিক স্নিগ্ধ ভাব ও মজ্জাগত শ্লেষ্মার প্রভাবে নিদ্রাটা আমাদের কাছে পরম রমণীয় বলিয়া বোধ হয়, স্বপ্নটাকেই সত্যের আসনে বসাইয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করি।

অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, আমাদের প্রধান আবশ্যক বাতিক। সেদিন এক-জন বৃদ্ধ বাতিকগ্রস্তের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। তিনি বায়ুভরে একেবারে কাত হইয়া পড়িয়াছেন— এমন-কি, অনেক সময়ে বায়ুর প্রকোপ তাঁহার আয়ুর প্রতি আক্রমণ করে। তাঁহার সহিত অনেক ক্ষণ আলোচনা করিয়া স্থির করিলাম যে, আর কিছু না, আমাদের দেশে একটি বাতিকবর্ধনী সভার আবশ্যক হইয়াছে। সভার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, কতকগুলা ভালোমানুষের ছেলেকে খেপাইতে হইবে। বাস্তবিক, প্রকৃত খেপা ছেলেকে দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়।

বায়ুর মাহাত্ম্য কে বর্ণনা করিতে পারে ? যে-সকল জাত উনবিংশ শতাব্দীর ’পরে উনপঞ্চাশ বায়ু লাগাইয়া চলিয়াছেন, আমরা সাবধানীরা কবে তাঁহাদের নাগাল পাইব ?

আমাদের যে অল্প একটু বায়ু আছে, সভার নিয়ম রচনা করিতে ও বক্তৃতা দিতেই তাহা নিঃশেষিত হইয়া যায়।

মহৎ আশা, মহৎ ভাব, মহৎ উদ্দেশ্যকে সাবধানী বিষয়ী লোকেরা বাষ্পের ন্যায় জ্ঞান করেন। কিন্তু এই বাষ্পের বলেই উন্নতির জাহাজ চলিতেছে। এই বাষ্পকে খাটাইতে হইবে, এই বায়ুকে পালে আটক করিতে হইবে। এমন তুমুল শক্তি আর কোথায় আছে? আমাদের দেশে এই বাষ্পের অভাব, বায়ুর অভাব। আমরা উন্নতির পালে একটুখানি ফুঁ দিতেছি, যতখানি গাল ফুলিতেছে ততখানি পাল ফুলিতেছে না।

বৃহৎ ভাবের নিকটে আত্মবিসর্জন করাকে যদি পাগলামি বলে, তবে সেই পাগলামি এক কালে প্রচুর পরিমাণে আমাদের ছিল। ইহাই প্রকৃত বীরত্ব। কর্তব্যের অনুরোধে রাম যে রাজ্য ছাড়িয়া বনে গেলেন তাহাই বীরত্ব, এবং সীতা ও লক্ষ্মণ যে তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন তাহাও বীরত্ব। ভরত যে রামকে ফিরাইয়া আনিতে গেলেন তাহা বীরত্ব, এবং হনুমান যে প্রাণপণে রামের সেবা করিয়াছিলেন তাহাও বীরত্ব। হিংসা অপেক্ষা ক্ষমায় যে অধিক বীরত্ব, গ্রহণের অপেক্ষা ত্যাগে অধিক বীরত্ব, এই কথাই আমাদের কাব্যে ও শাস্ত্রে বলিতেছে। পালোয়ানিকে আমাদের দেশে সর্বাপেক্ষা বড়ো জ্ঞান করিত না। এইজন্য বাল্মীকির রাম রাবণকে পরাজিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, রাবণকে ক্ষমা করিয়াছেন। রাম রাবণকে দুইবার জয় করিয়াছেন। একবার বাণ মারিয়া, একবার ক্ষমা করিয়া। কবি বলেন, তন্মধ্যে শেষের জয়ই শ্রেষ্ঠ। হোমরের একিলিস পরাভূত হেক্টরের মৃতদেহ ঘোড়ার লেজে বাঁধিয়া শহর প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন— রামে একিলিসে তুলনা করো। য়ুরোপীয় মহাকবি হইলে পাণ্ডবদের যুদ্ধজয়েই মহাভারত শেষ করিতেন। কিন্তু আমাদের ব্যাস বলিলেন, রাজ্য গ্রহণ করায় শেষ নহে, রাজ্য ত্যাগ করায় শেষ। যেখানে সব শেষ তাহাই আমাদের লক্ষ্য ছিল। কেবল তাহাই নহে, আমাদের কবিরা পুরস্কারেরও লোভ দেখান নাই। ইংরাজেরা য়ুটিলিটেরিয়ান, কতকটা দোকানদার; তাই তাঁহাদের শাস্ত্রে পোয়েটিক্যাল জাস্টিস -নামক একটা শব্দ আছে, তাহার অর্থ দেনাপাওনা, সৎকাজের দর-দাম করা। আমাদের সীতা চিরদুঃখিনী, রাম-লক্ষ্মণের জীবন দুঃখে কষ্টে শেষ হইল। এতবড়ো অর্জুনের বীরত্ব কোথায় গেল? অবশেষে দস্যুদল আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে যাদবরমণীদের কাড়িয়া লইয়া গেল, তিনি গাণ্ডীব তুলিতে পারিলেন না। পঞ্চপাণ্ডবের সমস্ত জীবন দারিদ্র্যে দুঃখে শোকে অরণ্যে কাটিয়া গেল, শেষেই বা কী সুখ পাইলেন! হরিশ্চন্দ্র যে এত কষ্ট পাইলেন, এত ত্যাগ করিলেন, অবশেষে কবি

*

তাঁহার কাছ হইতে পুণ্যের শেষ পুরস্কার স্বর্গও কাড়িয়া লইলেন। ভীষ্ম যে রাজপুত্র হইয়া সন্ন্যাসীর মতো জীবন কাটাইলেন, তাঁহার সমস্ত জীবনে সুখ কোথায়! সমস্ত জীবন যিনি আত্মত্যাগের কঠিন শয্যায় শুইয়াছিলেন, মৃত্যুকালে তিনি শরশয্যায় বিশ্রাম লাভ করিলেন!

এক কালে মহৎ ভাবের প্রতি আমাদের দেশের লোকের এত বিশ্বাস, এত নিষ্ঠা ছিল। তাঁহারা মহত্ত্বকেই মহত্ত্বের পরিণাম বলিয়া জানিতেন, ধর্মকেই ধর্মের পুরস্কার জ্ঞান করিতেন।

আর আজকাল! আজকাল আমাদের এমনি হইয়াছে যে, কেরানিগিরি ছাড়া আর কিছুরই উপরে আমাদের বিশ্বাস নাই, এমন-কি বাণিজ্যকেও পাগলামি জ্ঞান করি! দরখাস্তকে ভবসাগরের তরণী করিয়াছি, নাম সহি করিয়া আপনাকে বীর মনে করিয়া থাকি।

আজ তোমাতে আমাতে ভাব হইল ভাই! মহত্ত্বের একাল আর সেকাল কী? যাহা ভালো তাহাই আমাদের হৃদয় গ্রহণ করুক, যেখানে ভালো সেখানেই আমাদের হৃদয় অগ্রসর হউক! আমাদের লঘুতা চপলতা সংকীর্ণতা দূরে যাক! অজ্ঞতা ও ক্ষুদ্রতা হইতে প্রসূত বাঙালিসুলভ অভিমানে মোটা হইয়া চক্ষু রুদ্ধ করিয়া আপনাকে সকলের চেয়ে বড়ো মনে না করি ও মহৎ হইবার আগে দেশকালপাত্রনির্বিশেষে মহতের চরণের ধূলি লইতে পারি এমন বিনয় লাভ করি।

শুভাশীর্বাদক
শ্রীষষ্ঠীচরণ দেবশর্মণঃ

৬

শ্রীচরণেষু

দাদামহাশয়, এবার কিছুদিন ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। এই সুদূরবিস্তৃত মাঠ এই অশোকের ছায়ায় বসিয়া, আমাদের সেই কলিকাতা শহরকে একটা মস্ত ইঁটের খাঁচা বলিয়া মনে হইতেছে। শতসহস্র মানুষকে একটা বড়ো খাঁচায় পুরিয়া কে যেন হাটে বিক্রয় করিতে আনিয়াছে। স্বভাবের গীত ভুলিয়া সকলেই কিচিকিচি ও খোঁচাখুঁচি করিয়া মরিতেছে। আমি সেই খাঁচা ছাড়িয়া উড়িয়াছি, আমি হাটে বিকাইতে চাহি না।

গাছপালা নহিলে আমি তো বাঁচি না। আমি ষোলো আনা 'ভেজিটেরিয়ান'।

আমি কায়মনে উদ্ভিদ সেবন করিয়া থাকি। ইট-কাঠ চুন-সুরকি মৃত্যুভারের মতো আমার উপর চাপিয়া থাকে। হৃদয় পলে পলে মরিতে থাকে। বড়ো বড়ো ইমারত-গুলো তাহাদের শক্ত শক্ত কড়ি বরগা মেলিয়া হাঁ করিয়া আমাকে গিলিয়া ফেলে। প্রকাণ্ড কলিকাতাটার কঠিন জঠরের মধ্যে আমি যেন একেবারে হজম হইয়া যাই। কিন্তু এখানে এই গাছপালার মধ্যে প্রাণের হিল্লোল। হৃদয়ের মধ্যে যেখানে জীবনের সরোবর আছে, প্রকৃতির চারি দিক হইতে সেখানে জীবনের স্রোত আসিয়া মিশিতে থাকে।

বঙ্গদেশ এখান হইতে কত শত ক্রোশ দূরে! কিন্তু এখান হইতে বঙ্গভূমির এক নূতন মূর্তি দেখিতে পাইতেছি। যখন বঙ্গদেশের ভিতরে বাস করিতাম, তখন বঙ্গদেশের জন্য বড়ো আশা হইত না। তখন মনে হইত বঙ্গদেশ গোঁফে-তেল-গাছে-কাঁঠালের দেশ। যতবড়ো-না-মুখ-ততবড়ো-কথার দেশ। পেটে-পিলে কানে-কলম ও মাথায়-শামলার দেশ। মনে হইত এখানে বিচিগুলাই দেখিতে দেখিতে তেরো হাত হইয়া কাঁকুড়কে অতিক্রম করিয়া উঠে। এখানে পাড়াগেঁয়ে ছেলেরা হাত-পা নাড়িয়া কেবল একটা প্রহসন অভিনয় করিতেছে, এবং মনে করিতেছে দর্শকেরা শুদ্ধ কেবল আড়ি করিয়া হাসিতেছে, হাসির কোনো যুক্তিসংগত কারণ নাই। কিন্তু আজি এই সহস্র ক্রোশ ব্যবধান হইতে বঙ্গভূমির মুখের চতুর্দিকে এক অপূর্ব জ্যোতির্মণ্ডল দেখিতে পাইতেছি। বঙ্গদেশ আজ মা হইয়া বসিয়াছেন, তাঁহার কোলে বঙ্গবাসী নামে এক সুন্দর শিশু— তিনি হিমালয়ের পদপ্রান্তে, সাগরের উপকূলে, তাঁহার শ্যামল কানন তাঁহার পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্রের মধ্যে, তাঁহার গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের তীরে, এই শিশুটি কোলে করিয়া লালন করিতেছেন। এই সন্তানের মুখের দিকে মাতা অবনত হইয়া চাহিয়া আছেন, ইহাকে দেখিয়া তাঁহার মুখে আশা ও আনন্দের আভা দীপ্তি পাইয়া উঠিয়াছে। সহস্র ক্রোশ অতিক্রম করিয়া আমি মায়ের মুখের সেই আশার আলোক দেখিতে পাইতেছি। আমি আশ্বাস পাইতেছি এ সন্তান মরিবে না। বঙ্গভূমি এই সন্তানটিকে মানুষ করিয়া ইহাকে একদিন পৃথিবীর কাজে উৎসর্গ করিতে পারিবেন। বঙ্গভূমির কোল হইতে আজ মাঝে মাঝে শিশুর হাসি, শিশুর ক্রন্দন শুনিতেছি— বঙ্গভূমির সহস্র নিকুঞ্জ এতদিন নিস্তব্ধ ছিল, বঙ্গভবনে শিশুর কণ্ঠধ্বনি এতদিন শুনা যায় নাই, এতদিন এই ভাগীরথীর উভয় তীর কেবল শ্মশান বলিয়া মনে হইত। আজ বঙ্গভূমির আনন্দ-উৎসব ভারতবর্ষের চারি দিক হইতে শুনা যাইতেছে। আজ ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে যে নবজাতির জন্মসংগীত গান হইতেছে, ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত পশ্চিমঘাটগিরির সীমান্তদেশে বসিয়া আমি তাহা শুনিতে পাইতেছি। বঙ্গদেশের

মধ্যে থাকিয়া যাহা কেবলমাত্র অর্থহীন কোলাহল মনে হইত এখানে তাহার এক বৃহৎ অর্থ দেখিতে পাইতেছি। এই দূর হইতে বঙ্গদেশের কেবল বর্তমান নহে, ভবিষ্যৎ— প্রত্যক্ষ ঘটনাগুলিমাত্র নহে, সুদূর সম্ভাবনাগুলি পর্যন্ত— দেখিতে পাইতেছি। তাই আমার হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় আশার সঞ্চার হইতেছে।

মনের আবেগে কথাগুলো কিছু বড়ো হইয়া পড়িল। তোমার আবার বড়ো কথা সয় না। ছোটো কথা সম্বন্ধে তোমার কিঞ্চিৎ গোঁড়ামি আছে— সেটা ভালো নয়। যাই হোক, তোমাকে বক্তৃতা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। আসল কথা কী জানো? এতদিন বঙ্গদেশ শহরতলিতে পড়িয়া ছিল, এখন আমাদিগকে শহর-ভুক্ত করিবার প্রস্তাব আসিয়াছে। ইহা আমি গোপনে সংবাদ পাইয়াছি। এখন আমরা মানবসমাজ -নামক বৃহৎ মিউনিসিপ্যালিটির জন্য ট্যাক্স দিবার অধিকারী হইয়াছি। আমরা পৃথিবীর রাজধানী-ভুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছি। আমরা রাজধানীকে কর দিব এবং রাজধানীর কর আদায় করিব।

মানুষের জন্য কাজ না করিলে মানুষের মধ্যে গণ্য হওয়া যায় না। একদেশবাসীর মধ্যে যেখানে প্রত্যেকেই সকলের প্রতিনিধিস্বরূপ, সকলের দায় সকলেই নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করে, সেখানেই প্রকৃতরূপে জাতির সৃষ্টি হইয়াছে বলিতে হইবে। আর যাঁহারা স্বজাতিকে অতিক্রম করিয়া মানবসাধারণের জন্য কাজ করেন তাঁহারা মানবজাতির মধ্যে গণ্য। আমরা স্বজাতি ও মানবজাতির জন্য কাজ করিতে পারিব বলিয়া কি আশ্বাস জন্মিতেছে না? আমাদের মধ্যে এক বৃহৎ ভাবের বন্যা আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, আমাদের রুদ্ধ দ্বারে আসিয়া আঘাত করিতেছে, আমাদিগকে সর্বসাধারণের সহিত একাকার করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। অনেকে বিলাপ করিতেছে 'সমস্ত একাক্কার হইয়া গেল'— কিন্তু আমার মনে আজ এই বলিয়া আনন্দ হইতেছে যে, আজ সমস্ত 'একাক্কার' হইবারই উপক্রম হইয়াছে বটে। আমরা যখন বাঙালি হইব তখন একবার 'একাক্কার' হইবে, আর বাঙালি যখন মানুষ হইবে তখন আরও 'একাক্কার' হইবে। বিপুল মানবশক্তি বাংলা-সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছে, ইহা আমি দূর হইতে দেখিতে পাইতেছি। ইহার প্রভাব অতিক্রম করিতে কে পারে? এ আমাদের সংকীর্ণতা আমাদের আলস্য ঘুচাইয়া তবে ছাড়িবে। আমাদের মধ্যে বৃহৎ প্রাণ সঞ্চার করিয়া সেই প্রাণ পৃথিবীর সহিত যোগ করিয়া দিবে। আমাদিগকে তাহার দূত করিয়া পৃথিবীতে নূতন নূতন সংবাদ প্রেরণ করিবে। আমাদের দ্বারা তাহার কাজ করাইয়া লইয়া তবে নিস্তার। আমার মনে নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে— বাঙালিদের একটা কাজ আছেই। আমরা নিতান্ত পৃথিবীর

অন্নধ্বংস করিতে আসি নাই। আমাদের লজ্জা একদিন দূর হইবে। ইহা আমরা হৃদয়ের ভিতর হইতে অনুভব করিতেছি।

আমাদের আশ্বাসের কারণও আছে। আমাদের বাঙালির মধ্য হইতেই তো চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন। তিনি তো বিঘাকাঠার মধ্যেই বাস করিতেন না, তিনি তো সমস্ত মানবকে আপনার করিয়াছিলেন। তিনি বিস্তৃত মানবপ্রেমে বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখন তো বাংলা পৃথিবীর এক প্রান্তভাগে ছিল, তখন তো সাম্য ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি কথাগুলোর সৃষ্টি হয় নাই, সকলেই আপন-আপন আহ্নিক তর্পণ ও চণ্ডীমণ্ডপটি লইয়া ছিল— তখন এমন কথা কী করিয়া বাহির হইল—

'মার খেয়েছি, নাহয় আরও খাব।
তাই বলে কি প্রেম দিব না ? আয়!'

এ কথা ব্যাপ্ত হইল কী করিয়া ? সকলের মুখ দিয়া বাহির হইল কী করিয়া ? আপন-আপন বাঁশবাগানের পার্শ্বস্থ ভদ্রাসনবাটীর মন্‌সাসিজের বেড়া ডিঙাইয়া পৃথিবীর মাঝখানে আসিতে কে আহ্বান করিল এবং সে আহ্বানে সকলে সাড়া দিল কী করিয়া ? একদিন তো বাংলাদেশে ইহাও সম্ভব হইয়াছিল। একজন বাঙালি আসিয়া একদিন বাংলাদেশকে তো পথে বাহির করিয়াছিল। একজন বাঙালি তো একদিন সমস্ত পৃথিবীকে পাগল করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং বাঙালিরা সেই ষড়যন্ত্রে তো যোগ দিয়াছিল। বাংলার সে এক গৌরবের দিন। তখন বাংলা স্বাধীনই থাকুক আর অধীনই থাকুক, মুসলমান নবাবের হাতেই থাকুক আর স্বদেশীয় রাজার হাতেই থাকুক, তাহার পক্ষে সে একই কথা। সে আপন তেজে আপনি তেজস্বী হইয়া উঠিয়াছিল।

আসল কথা, বাংলায় সেই একদিন সমস্ত একাকার হইবার জো হইয়াছিল। তাই কতকগুলো লোক খেপিয়া চৈতন্যকে কলসীর কানা ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল। কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। কলসীর কানা ভাসিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে এমনি একাকার হইল যে, জাতি রহিল না, কুল রহিল না, হিন্দু-মুসলমানেও প্রভেদ রহিল না। তখন তো আর্যকুলতিলকেরা জাতিভেদ লইয়া তর্ক তুলে নাই। আমি তো বলি তর্ক করিলেই তর্ক উঠে। বৃহৎ ভাব যখন অগ্রসর হইতে থাকে তখন তর্কবিতর্ক খুঁটিনাটি সমস্তই অচিরাৎ আপন-আপন গর্তের মধ্যে সুড়্‌সুড়্‌ করিয়া প্রবেশ করে। কারণ, মরার বাড়া আর গাল নাই। বৃহৎ ভাব আসিয়া বলে, সুবিধা-অসুবিধার কথা হইতেছে না, আমার জন্য সকলকে মরিতে হইবে। লোকেও তাহার আদেশ শুনিয়া মরিতে বসে। মরিবার সময় খুঁটিনাটি লইয়া তর্ক করে কে বলো!

চৈতন্য যখন পথে বাহির হইলেন তখন বাংলাদেশের গানের সুর পর্যন্ত ফিরিয়া গেল। তখন এককণ্ঠবিহারী বৈঠকি সুরগুলো কোথায় ভাসিয়া গেল? তখন সহস্র হৃদয়ের তরঙ্গহিল্লোল সহস্র কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত করিয়া নূতন সুরে আকাশে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তখন রাগ রাগিণী ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইল, একজনকে ছাড়িয়া সহস্র জনকে বরণ করিল। বিশ্বকে পাগল করিবার জন্য কীর্তন বলিয়া এক নূতন কীর্তন উঠিল। যেমন ভাব তেমনি তাহার কণ্ঠস্বর— অশ্রুজলে ভাসাইয়া সমস্ত একাকার করিবার জন্য ক্রন্দনধ্বনি। বিজন কক্ষে বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া একটিমাত্র বিরহিণীর বৈঠকি কান্না নয়, প্রেমে আকুল হইয়া নীলাকাশের তলে দাঁড়াইয়া সমস্ত বিশ্বজগতের ক্রন্দনধ্বনি।

তাই আশা হইতেছে— আর একদিন হয়তো আমরা একই মত্ততায় পাগল হইয়া সহসা একজাতি হইয়া উঠিতে পারিব, বৈঠকখানার আসবাব ছাড়িয়া সকলে মিলিয়া রাজপথে বাহির হইতে পারিব, বৈঠকি ধ্রুপদ খেয়াল ছাড়িয়া রাজপথী কীর্তন গাহিতে পারিব। মনে হইতেছে এখনি বঙ্গদেশের প্রাণের মধ্যে একটি বৃহৎ কথা প্রবেশ করিয়াছে, একটি আশ্বাসের গান ধ্বনিত হইতেছে, তাই সমস্ত দেশটা মাঝে মাঝে টল্‌মল্‌ করিয়া উঠিতেছে। এ যখন জাগিয়া উঠিবে তখন আজিকার দিনের এই-সকল সংবাদপত্রের মেকি সংগ্রাম, শতসহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তর্কবিতর্ক ঝগড়াঝাঁটি সমস্ত চুলায় যাইবে— আজিকার দিনের বড়ো বড়ো ছোটোলোকদিগের নখে-আঁকা গণ্ডিগুলি কোথায় মিলাইয়া যাইবে! সেই আর-একদিন বাংলা একাকার হইবে।

প্রকৃত স্বাধীনতা ভাবের স্বাধীনতা। বৃহৎ ভাবের দাস হইলেই আমরা স্বাধীনতার প্রকৃত সুখ ও গৌরব অনুভব করিতে পারি। তখন কেই বা রাজা, কেই বা মন্ত্রী! তখন একটা উঁচু সিংহাসনমাত্র গড়িয়া আমাদের চেয়ে কেহ উঁচু হইতে পারে না। সেই গৌরব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলেই আমাদের সহস্র বৎসরের অপমান দূর হইয়া যাইবে, আমরা সকল বিষয়ে স্বাধীন হইবার যোগ্য হইব।

আমাদের সাহিত্য যদি পৃথিবীর সাহিত্য হয়, আমাদের কথা যদি পৃথিবীর কাজে লাগে, এবং সে সূত্রেও যদি বাংলার অধিবাসীরা পৃথিবীর অধিবাসী হইতে পারে, তাহা হইলেও আমাদের মধ্যে গৌরব জন্মিবে— হীনতা ধুলার মতো আমরা গা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিব।

কেবলমাত্র বন্দুক ছুঁড়িতে পারিলেই যে আমরা বড়োলোক হইব তাহা নহে, পৃথিবীর কাজ করিতে পারিলে তবে আমরা বড়োলোক হইব। আমার তো আশা

হইতেছে আমাদের মধ্যে এমন-সকল বড়োলোক জন্মিবেন যাঁহারা বঙ্গদেশকে পৃথিবীর মানচিত্রের শামিল করিবেন ও এইরূপে পৃথিবীর সীমানা বাড়াইয়া দিবেন।

তুমি নাকি বড়ো চিঠি পড় না, তাই ভয় হইতেছে পাছে এই চিঠি ফেরত দিয়া ইহার সংক্ষেপ মর্ম লিখিয়া পাঠাইতে অনুরোধ কর। কিন্তু তুমি পড় আর নাই পড় আমি লিখিয়া আনন্দলাভ করিলাম। এ যেন আমিই আমাকে চিঠি লিখিলাম, এবং পড়িয়া সম্পূর্ণ পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম।

সেবক
শ্রীনবীনকিশোর শর্মণঃ

৭

চিরঞ্জীবেষু

ভায়া, আমাদের সেকালে পোস্টাপিসের বাহুল্য ছিল না— জরুরি কাজের চিঠি ছাড়া অন্য কোনোপ্রকার চিঠি হাতে আসিত না, এই জন্য সংক্ষেপ চিঠি পড়াই আমাদের অভ্যাস। তা ছাড়া বুড়ামানুষ— প্রত্যেক অক্ষর বানান করিয়া করিয়া পড়িতে হয়— বড়ো চিঠি পড়িতে ডরাই সে কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু তোমার চিঠি পড়িয়া দীর্ঘ পত্র পড়ার দুঃখ আমার সমস্ত দূর হইল। তুমি যে হৃদয়পূর্ণ চিঠি লিখিয়াছ তাহার সমালোচনা করিতে বসিতে আমার মন সরিতেছে না। কিন্তু বুড়ামানুষের কাজই সমালোচনা করা। যৌবনের সহজ চক্ষুতে প্রকৃতির সৌন্দর্যগুলিই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু চশমার ভিতর দিয়া কেবল অনেকগুলা খুঁত এবং খুঁটিনাটি চোখে পড়ে।

বিদেশে গিয়া যে বাঙালি জাতির উন্নতি-আশা তোমার মনে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, তাহার গুটিকতক কারণ আছে। প্রধান কারণ— এখানে তোমার অজীর্ণ রোগ ছিল, সেখানে তোমার খাদ্য জীর্ণ হইতেছে এবং সেই সঙ্গে ধরিয়া লইতেছ যে বাঙালি মাত্রেরই পেটে অন্ন পরিপাক পাইতেছে— এরূপ অবস্থায় কাহার না আশার সঞ্চার হয়! কিন্তু আমি অম্লশূলপীড়ায় কাতর বাঙালিসন্তান— তোমার চিঠিটা আমার কাছে আগাগোড়াই কাহিনী বলিয়া ঠেকিতেছে। পেটে আহার জীর্ণ হওয়া এবং না-হওয়ার উপর পৃথিবীর কত সুখদুঃখ মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ভর করে তাহা কেহ ভাবিয়া দেখে না। পাকযন্ত্রের উপর যে উন্নতির ভিত্তি স্থাপিত হয় নাই সে উন্নতি ক'দিন টিঁকিতে পারে? জঠরানলের প্রখর প্রভাবেই মনুষ্যজাতিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। যে জাতির

ক্ষুধা কম সে জাতি থাকিলেও হয় গেলেও হয়; তাহার দ্বারা কোনো কাজ হইবে না। যে জাতি আহার করে, অথচ হজম করে না, সে জাতি কখনোই সদ্গতি প্রাপ্ত হইতে পারে না।

বাঙালি জাতির অম্লরোগ হইল বলিয়া বাঙালি কেরানিগিরি ছাড়িতে পারিল না। তাহার সাহস হয় না, আশা হয় না, উদ্যম হয় না। এজন্য বেচারাকে দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের শরীর অপটু, বুদ্ধি অপরিপক্ক, উদরান্ন ততোধিক। অতএব সমাজ-সংস্কারের ন্যায় পাকযন্ত্র-সংস্কারও আমাদের আবশ্যক হইয়াছে।

আনন্দ না থাকিলে উন্নতি হইবে কী করিয়া! আশা উৎসাহ সঞ্চয় করিব কোথা হইতে? অকৃতকার্যকে সিদ্ধির পথে বার বার অগ্রসর করিয়া দিবে কে! আমাদের এই নিরানন্দের দেশে উঠিতে ইচ্ছা করে না, কাজ করিতে ইচ্ছা করে না, একবার পড়িয়া গেলেই মেরুদণ্ড ভাঙিয়া যায়। প্রাণ না দিলে কোনো কাজ হয় না— কিন্তু প্রাণ দিব কিসের পরিবর্তে! আমাদের প্রাণ কাড়িয়া লইবে কে! আনন্দ নাই, আনন্দ নাই— দেশে আনন্দ নাই, জাতির হৃদয়ে আনন্দ নাই। কেমন করিয়া থাকিবে! আমাদের এই স্বল্পায়ু ক্ষুদ্র শীর্ণ দেহ, অম্লশূলে বিদ্ধ, ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ, রোগের অবধি নাই— বিশ্বব্যাপিনী আনন্দসুধার অনন্ত প্রস্রবণধারা আমরা যথেষ্ট পরিমাণে ধারণ করিয়া রাখিতে পারি না— এইজন্য নিদ্রা আর ভাঙে না, একবার শ্রান্ত হইয়া পড়িলে শ্রান্তি আর দূর হয় না, একবার কার্য ভাঙিয়া গেলে কার্য আর গঠিত হয় না, একবার অবসাদ উপস্থিত হইলে তাহা ক্রমাগতই ঘনীভূত হইতে থাকে।

অতএব কেবল মাতিয়া উঠিলেই হইবে না; সেই মত্ততা ধারণ করিয়া রাখিবার, সেই মত্ততা সমস্ত জাতির শিরার মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিবার ক্ষমতা সঞ্চয় করা চাই। একটি স্থায়ী আনন্দের ভাব সমস্ত জাতির হৃদয়ে দৃঢ় বদ্ধমূল হওয়া চাই। এমন এক প্রবল উত্তেজনাশক্তি আমাদের জাতিহৃদয়ের কেন্দ্রস্থলে অহরহ দণ্ডায়মান থাকে যাহার আনন্দ-উচ্ছ্বাসবেগে আমাদের জীবনের প্রবাহ সহস্র ধারায় জগতের সহস্র দিকে প্রবাহিত হইতে পারে! কোথায় বা সে শক্তি! কোথায় বা তাহার দাঁড়াইবার স্থান! সে শক্তির পদভারে আমাদের এই জীর্ণ দেহ বিদীর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া যায়।

আমি তো, ভাই, ভাবিয়া রাখিয়াছি, যে দেশের আবহাওয়ায় বেশি মশা জন্মায় সেখানে বড়ো জাতি জন্মিতে পারে না। এই আমাদের জলা-জমি জঙ্গল এই কোমল মৃত্তিকার মধ্যে, কর্মানুষ্ঠানতৎপর প্রবল সভ্যতার স্রোত আসিয়া আমাদের কাননবেষ্টিত প্রচ্ছন্ন নিভৃত ক্ষুদ্র কুটিরগুলি কেবল ভাঙিয়া দিতেছে মাত্র। আকাঙ্ক্ষা আনিয়া

দিতেছে, কিন্তু উপায় নাই; কাজ বাড়াইয়া দিতেছে, কিন্তু শরীর নাই; অসন্তোষ আনিয়া দিতেছে, কিন্তু উদ্যম নাই। আমাদের যে স্বস্তি ছিল তাহা ভাসাইয়া দিতেছে, তাহার পরিবর্তে যে সুখের মরীচিকা রচনা করিতেছে তাহাও আমাদের দুষ্প্রাপ্য। কাজ করিয়া প্রকৃত সিদ্ধি নাই, কেবল অহর্নিশি শ্রান্তিই সার। আমার মনে হয় তার চেয়ে আমরা ছিলাম ভালো— আমাদের সেই স্নিগ্ধ কাননচ্ছায়ায়, পল্লবের মর্মর-শব্দে, নদীর কলস্বরে, সুখের কুটিরে— স্নেহশীল পিতামাতা, পতিপ্রাণা স্ত্রী, স্বজনবৎসল পুত্রকন্যা, পরিবারপ্রতিম পরিচিত প্রতিবেশীদিগকে লইয়া, যে নিরুপদ্রব নীড়টুকু রচনা করিয়াছিলাম, সে ছিলাম ভালো। য়ুরোপীয় বিরাট সভ্যতার পাষাণ-উপকরণসকল আমরা কোথায় পাইব! কোথায় সে বিপুল বল, সে শ্রান্তিমোচন জলবায়ু, সে ধুরন্ধর প্রশস্ত ললাট! অবিশ্রাম কর্মানুষ্ঠান, বাধাবিঘ্নের সহিত অবিশ্রাম যুদ্ধ, নূতন নূতন পথের অনুসন্ধানে অবিশ্রাম ধাবন, অসন্তোষানলে অবিশ্রাম দহন— সে আমাদের এই প্রখর রৌদ্রতপ্ত আর্দ্রসিক্ত দেশে জীর্ণশীর্ণ দুর্বল দেহে পারিব কেন? কেবল আমাদের শ্যামল শীতল তৃণনিবাস পরিত্যাগ করিয়া আমরা পতঙ্গের মতো উগ্র সভ্যতানলে দগ্ধ হইয়া মরিব মাত্র।

বালকেরা শুনিবে এবং বৃদ্ধেরা বলিবে— এইজন্য তোমাদের কাছে সংক্ষেপ চিঠি প্রত্যাশা করি, কিন্তু নিজে বড়ো চিঠি লিখি। অর্বাচীনদের কথা ধৈর্য ধরিয়া বেশিক্ষণ শুনিতে পারি না, কিন্তু নিজের কথা বলিয়া তৃপ্তি হয় না— অতএব 'নিজে যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর অন্যের প্রতি সেইরূপ আচরণ করিবে' বাইবেলের এই উপদেশ -অনুসারে আমার সহিত কাজ করিয়ো না, আগে হইতে সতর্ক করিয়া দিলাম।

আশীর্বাদক

শ্রীষষ্ঠীচরণ দেবশর্মণঃ

৮

শ্রীচরণেষু

তবে আর কী! তবে সমস্ত চুলায় যাক। বাংলাদেশ তাহার আম-কাঁঠালের বাগান এবং বাঁশঝাড়ের মধ্যে বসিয়া কেবল ঘরকন্না করিতেই থাকুক। স্কুল উঠাইয়া দাও, সাপ্তাহিক এবং মাসিক সমুদয় কাগজপত্র বন্ধ করো, পৃথিবীর সকল বিষয় লইয়াই যে আন্দোলন-আলোচনা পড়িয়া গিয়াছে সেটা বলপূর্বক স্থগিত করো, ইংরাজি পড়া একেবারেই বন্ধ করো, বিজ্ঞান শিখিয়ো না, যে-সমস্ত মহাত্মা মানবজাতির জন্য আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের ইতিহাস পড়িয়ো না, পৃথিবীর যে-সকল

মহৎ অনুষ্ঠান বাসুকির ন্যায় সহস্র শিরে মানবজাতিকে বিনাশবিশৃঙ্খলা হইতে রক্ষা করিয়া অটল উন্নতির পথে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইয়া থাকো। অর্থাৎ, যাহাতে করিয়া হৃদয় জাগ্রত হয়, মনে উদ্যমের সঞ্চার হয়, বিশ্বের সঙ্গে মিলিত হইয়া একত্র কাজ করিবার জন্য অনিবার্য আবেগ উপস্থিত হয়— সে-সমস্ত হইতে দূরে থাকো। পড়িবার মধ্যে নূতন পঞ্জিকা পড়ো, কোন্ দিন বার্তাকু নিষেধ ও কোন্ দিন কুষ্মাণ্ড বিধি তাহা লইয়া প্রতিদিন সমালোচনা করো। দালান ডাবাহুঁকা নস্য ও নিন্দা লইয়া এই রৌদ্রতাপদগ্ধ নিদাঘমধ্যাহ্ন অতিবাহিত করো। সন্তানদের মাথার মধ্যে চাণক্যের শ্লোক প্রবেশ করাইয়া সেই মাথাগুলো ইহকাল ও পরকালের মতো ভক্ষণের জোগাড় করিয়া রাখো।

দাদামহাশয়, তুমি কি সত্য-সত্যই বলিতেছ আমরা একশত বৎসর পূর্বে যেরূপ ছিলাম অবিকল সেইরূপ থাকাই ভালো, আর কিছুমাত্র উন্নতি হইয়া কাজ নাই? জ্ঞানলাভ করিয়া কাজ নাই, পাছে প্রবল জ্ঞানলালসা জন্মিয়া আমাদের দুর্বল দেহকে জীর্ণ করিয়া ফেলে! লোকহিতপ্রবর্তক উপদেশ শুনিয়া কাজ নাই, পাছে মানবহিতের জন্য কঠোর ব্রত পালন করিতে গিয়া এই প্রখর রৌদ্রতাপে আমরা শুষ্ক হইয়া যাই! বড়োলোকের জীবনবৃত্তান্ত পড়িয়া কাজ নাই, পাছে এই মশকের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমাদের দুর্বল হৃদয়ে বড়োলোক হইবার দুরাশা জাগ্রত হয়! তুমি পরামর্শ দিতেছ ঠাণ্ডা হও, ছায়ায় থাকো, গৃহের দ্বার রুদ্ধ করো, ডাবের জল খাও, নাসারন্ধ্রে তৈল দাও, এবং স্ত্রীপুত্রপরিবার ও প্রতিবেশীদিগকে লইয়া নিরুপদ্রবে সুখনিদ্রার আয়োজন করো!

কিন্তু এখন পরামর্শ দেওয়া বৃথা, সাবধান করা নিষ্ফল। বাঁশির ধ্বনি কানে আসিয়াছে, আমরা গৃহের বাহির হইব। যে বন্ধনে আমরা সমস্ত মানবজাতির সহিত যুক্ত, সেই বন্ধনে আজ টান পড়িয়াছে। বৃহৎ মানব আমাদিগকে ডাকিয়াছে, তাহার সেবা করিতে না পারিলে আমাদের জীবন নিষ্ফল। আমাদের পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, সৌভ্রাত্র, বাৎসল্য, দাম্পত্যপ্রেম সমস্ত সে চাহিতেছে; তাহাকে যদি বঞ্চিত করি তবে আমাদের সমস্ত প্রেম ব্যর্থ হয়, আমাদের হৃদয় অপরিতৃপ্ত থাকে। যেমন বালিকা স্ত্রী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমে যতই স্বামীপ্রেমের মর্ম অবগত হইতে থাকে ততই তাহার হৃদয়ের সমুদয় প্রবৃত্তি স্বামীর অভিমুখিনী হইতে থাকে— তখন শরীরের কষ্ট, জীবনের ভয় বা কোনো উপদেশই তাহাকে স্বামীসেবা হইতে ফিরাইতে পারে না — তেমনি আমরা মানবপ্রেমের মর্ম অবগত হইতেছি, এখন আমরা মানবসেবায় জীবন উৎসর্গ করিব, কোনো দাদামশায়ের কোনো উপদেশ তাহা হইতে আমাদিগকে নিবৃত্ত

করিতে পারিবে না। মরণ হয় তো মরিব, কোনো উপায় নাই। কী সুখেই বা বাঁচিয়া আছি!

আনন্দের কথা বলিতেছ? এই তো আনন্দ! এই নূতন জ্ঞান, এই নূতন প্রেম, এই নূতন জীবন— এই তো আনন্দ! আনন্দের লক্ষণ কি কিছু ব্যক্ত হইতেছে না! জাগরণের ভাব কি কিছু প্রকাশ পাইতেছে না? বঙ্গসমাজের গঙ্গায় একটা জোয়ার আসিতেছে বলিয়া কি মনে হইতেছে না! তাই কি সমাজের সর্বাঙ্গ আবেগে চঞ্চল হইয়া উঠে নাই! আমাদের এ দেশ নিরানন্দের দেশ, আমাদের এ দেশে রোগ শোক তাপ আছে, রোগে শোকে নিরানন্দে আমরা জীর্ণ হইয়া মরিতে বসিয়াছি— সেইজন্যই আমরা আনন্দ চাই, জীবন চাই— সেইজন্যই বলিতেছি নূতন স্রোত আসিয়া আমাদের মুমূর্ষু হৃদয়ের স্বাস্থ্য বিধান করুক, মরিতেই যদি হয় তো যেন আনন্দের প্রভাবেই মরিতে পারি!

আর, মরিব কেন! তুমি এমনি কি হিসাব জানো যে, একবারে ঠিক দিয়া রাখিয়াছ যে আমরা মরিতেই বসিয়াছি! তোমার বুড়োমানুষের হিসাব-অনুযায়ী মনুষ্যসমাজ চলে না। তুমি কি জানো মানুষ সহসা কোথা হইতে বল পায়, কোথা হইতে দৈবশক্তি লাভ করে! মনুষ্যসমাজ সাধারণত হিসাবে চলে বটে, কিন্তু এক-এক সময়ে সেখানে যেন ভেলকি লাগিয়া যায়, তখন আর হিসাবে মেলে না। অন্য সময়ে দুয়ে দুয়ে চার হয়, সহসা একদিন দুয়ে দুয়ে পাঁচ হইয়া যায়, তখন বুড়োমানুষেরা চক্ষু হইতে চশমা খুলিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে। সহসা যখন নূতন ভাবের প্রবাহ উপস্থিত হইয়া জাতির হৃদয়ে আবর্ত রচনা করে তখনই সেই ভেলকি লাগিবার সময়— তখন যে কী হইতে কী হয় ঠাহর পাইবার জো নাই। অতএব আমবাগানে আমাদের সেই ক্ষুদ্র নীড়ের মধ্যে আর ফিরিব না।

হয় মরিব নয় বাঁচিব, এই কথাই ভালো। মরিবার ভয়ে বাঁচিয়া থাকিবার দরকার নাই। ক্রম্‌ওয়েল যখন প্রজাদলের দাসত্বরজ্জু ছেদন করিতেছিলেন তখন তিনি মরিতেও পারিতেন, বাঁচিতেও পারিতেন। ওয়াশিংটন যখন নূতন জাতির স্বাতন্ত্র্যের ধ্বজা উঠাইয়াছিলেন তখন তিনি মরিতেও পারিতেন, বাঁচিতেও পারিতেন। পৃথিবীর সর্বত্রই এমন কেহ মরে কেহ বাঁচে— তাহাতে আপত্তি কী। নিরুদ্যমই প্রকৃত মৃত্যু। আমরা হয় বাঁচিব নাহয় মরিব— তাই বলিয়া কাজকর্ম ছাড়িয়া দিয়া দাদামশায়ের কোলের কাছে বসিয়া সমস্ত দিন উপকথা শুনিতে পারিব না। তোমার কি ভয় হয় পাছে তোমার বংশে বাতি দিবার কেহ না থাকে! জিজ্ঞাসা করি— এখনই বা কে বাতি দিতেছে! সমস্তই যে অন্ধকার!

বিদায় লইলাম দাদামহাশয়! আমাদের আর চিঠিপত্র চলিবে না। আমাদের কাজ করিবার বয়স। সংসারে কাজের বাধা যথেষ্ট আছে— পদে পদে বিঘ্নবিপত্তি, তাহার 'পরে বুড়োমানুষদের কাছ হইতে যদি নৈরাশ্য সঞ্চয় করিতে হয় তাহা হইলে যৌবন ফুরাইবার আগেই বৃদ্ধ হইতে হইবে। তাহা হইলে পঞ্চাশে পৌঁছিবার পূর্বেই অরণ্যাশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে। সম্মুখে আমাকে আহ্বান করিতেছে, আমি তোমার দিকে ফিরিয়া চাহিব না। তুমি বলিতেছ 'পথের মধ্যে খানা আছে, ডোবা আছে, সেইখানে পড়িয়া তুমি ঘাড় ভাঙিয়া মরিবে, অতএব ঘরের দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া থাকাই ভালো'— আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করি না। আমি দুর্বল সত্য, কিন্তু তোমার উপদেশে আমি তো বল পাইতেছি না। আমার ব্রতপালনের পক্ষে আমি হীনবুদ্ধি বটে, কিন্তু তোমার উপদেশে আমি তো বুদ্ধি পাইতেছি না। অতত্রব আমার যেটুকু বল, যেটুকু বুদ্ধি আছে তাহাই সহায় করিয়া চলিলাম— মরিতে হয় তো চিরজীবনসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া মরিব।

সেবক

শ্রীনবীনকিশোর শর্মণঃ

৯

চিরঞ্জীবেষু

ভায়া, তোমার চিঠিতে কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ পাইতেছে। তাহাতে আমি দুঃখিত নই। তোমাদের রক্তের তেজ আছে; মাঝে মাঝে তোমরা যে গরম হইয়া উঠ, ইহা দেখিয়া আমাদের আনন্দ বোধ হয়। আমাদের মতো শীতল রক্ত যদি তোমাদের হইত তাহা হইলে পৃথিবীর কাজ চলিত কী করিয়া? তাহা হইলে ভূমণ্ডলের সর্বত্র মেরুপ্রদেশে পরিণত হইত।

অনেক বুড়ো আছে বটে, তাহারা পৃথিবী হইতে যৌবনতাপ লোপ করিতে চায়, তাহাদের নিজ হৃদয়ের শৈত্য সর্বত্র সমভাবে ব্যাপ্ত হয় এই তাহাদের ইচ্ছা। যেখানে একটুমাত্র তাত পাওয়া যায় সেইখানেই তাহারা অত্যন্ত ঠাণ্ডা ফুঁ দিয়া সমস্ত জুড়াইয়া হিম করিয়া দিতে চাহে। অর্থাৎ পৃথিবী হইতে কাঁচা চুল আগাগোড়া উৎপাটন করিয়া তাহার পরিবর্তে তাহারা পাকা চুল বুনানি করিতে চায়; তাহারা যে এক কালে যুবা ছিল তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া যায়, এইজন্য যৌবন তাহাদের নিকটে একেবারে দুর্বোধ হইয়া পড়ে। যৌবনের গান শুনিয়া তাহারা কানে আঙুল দেয়, যৌবনের

কাজ দেখিয়া তাহারা মনে করে পৃথিবীতে কলিযুগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। শ্যামল কিশলয়ের অসম্পূর্ণতা দেখিয়া ধূলিশায়ী জীর্ণ পত্র যেমন অত্যন্ত শুষ্ক পীত হাস্য হাসিতে থাকে, অপরিণত যৌবনের সরস শ্যামলতা দেখিয়া অনেক বৃদ্ধ তেমনি করিয়া হাসিয়া থাকে। এইজন্যই ছেলে-বুড়োর মাঝখানে এত দৃঢ় ব্যবধান পড়িয়া গিয়াছে।

আমার কি, ভাই, সাধ যে কেবল কতকগুলো উপদেশের ধোঁওয়া দিয়া তোমাদের কাঁচা মাথা একদিনে পাকাইয়া তুলি! কাজ করিতে যদি পারিতাম তা হইলে কি আর সমালোচনা করিতে বসিতাম! তোমরা যুবা, তোমাদের কত সুখ আছে বলো দেখি। আমাদের উদ্যমের সুখ নাই, কর্মানুষ্ঠানের সুখ নাই, একমাত্র বকুনির সুখ আছে— তাহাও সম্মুখের দন্তাভাবে ভালোরূপে সমাধা হয় না। ইহাতেও তোমরা চটিলে চলিবে কেন!

কাজ নাই ভাই,— আমার সংশয়, আমার বিজ্ঞতা, আমার কাছেই থাক্; তোমরা নিঃসংশয়ে কাজ করো, নির্ভয়ে অগ্রসর হও। নূতন নূতন জ্ঞানের অনুসন্ধান করো, সত্যের জন্য সংগ্রাম করো, জগতের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করো। যে স্রোতে পড়িয়াছ এই স্রোতকেই অবলম্বন করিয়া উন্নতিতীর্থের দিকে ধাবমান হও; নিমগ্ন হইলে লজ্জার কারণ নাই; উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তোমাদের জন্মলাভ সার্থক হইবে, তোমাদের দুঃখিনী জন্মভূমি ধন্য হইবে।

আমি যে চিরজীবন কাটাইয়া অবশেষে যাবার মুখে তোমাদের দুটো-একটা কথা বলিয়া যাইতেছি, তাহা শুনিলে যে তোমাদের উপকার হইবে না, এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না। তাহার সকল কথাই যে বেদবাক্য তাহা নহে, কিম্বা তাহার সকল কথাই যে এখনকার দিনে খাটিবে তাহাও নহে, কিন্তু ইহা নিঃসংশয় যে তাহাতে কিছু-না-কিছু সত্য আছেই— আমার এই সুদীর্ঘ জীবন কিছু সমস্ত ব্যর্থ, সমস্ত মিথ্যা নহে। এই সংশয়াচ্ছন্ন সংসারে আমার দীর্ঘ জীবন যে সত্যপথনির্দেশের কিছুমাত্র সহায়তা করিবে না তাহা আমার মন বলিতে চায় না। এইজন্য, আমি কোনো দৃঢ় অনুশাসন প্রচার করিতে চাই না, আমি বলিতে চাই না আমার সমস্ত কথা আগাগোড়া পালন না করিলে তোমরা উৎসন্ন যাইবে, আমি কেবল এই বলিতে চাই— আমার কথা মনোযোগ দিয়া শুন, একেবারে কানে আঙুল দিয়ো না, তার পরে বিচার করো, বিবেচনা করো, যাহা ভালো বোধ হয় তাহা গ্রহণ করো। সম্মুখের দিকে অগ্রসর হও, কিন্তু পশ্চাতের সহিত বিবাদ করিয়ো না। এক প্রেমের সূত্রে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎকে বাঁধিয়া রাখো।

আমার তো, ভাই, যাবার সময় হইয়াছে। যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনা-

মাবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ। আমরা সেই অস্তগামী চন্দ্র, আমরা রজনীতে বঙ্গভূমির নিদ্রিতাবস্থায় বিরাজ করিতেছিলাম। তখন যে একটি সুগভীর শান্তি ও সুস্নিগ্ধ মাধুর্য ছিল তাহা অস্বীকার করিবার কথা নহে, কিন্তু তাই বলিয়া আজ এই-যে কর্মকোলাহল জাগাইয়া অরুণোদয় হইতেছে, ইহাকে সাদর সম্ভাষণ না করিব কেন? কেন বলিব তীক্ষ্ণপ্রভ দিবসের প্রয়োজন নাই, রজনীর পরে রজনী ফিরিয়া আসুক? এসো অরুণ, এসো, তুমি আকাশ অধিকার করো— আমি নীরবে তোমাকে পথ ছাড়িয়া দিই। আমি তোমার দিকে চাহিয়া ক্ষীণহাস্যে তোমাকে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় গ্রহণ করি। আমার নিদ্রা, আমার শান্ত নীরবতা, আমার স্নিগ্ধ হিমসিক্ত রজনী আমার সঙ্গে সঙ্গেই অবসান হইয়া যাক— তোমারই সমুজ্জ্বল মহিমা জীবন বিতরণ করিয়া জলে স্থলে চরাচরে ব্যাপ্ত হইতে থাকুক।

আশীর্বাদক

শ্রীষষ্ঠীচরণ দেবশর্মণঃ
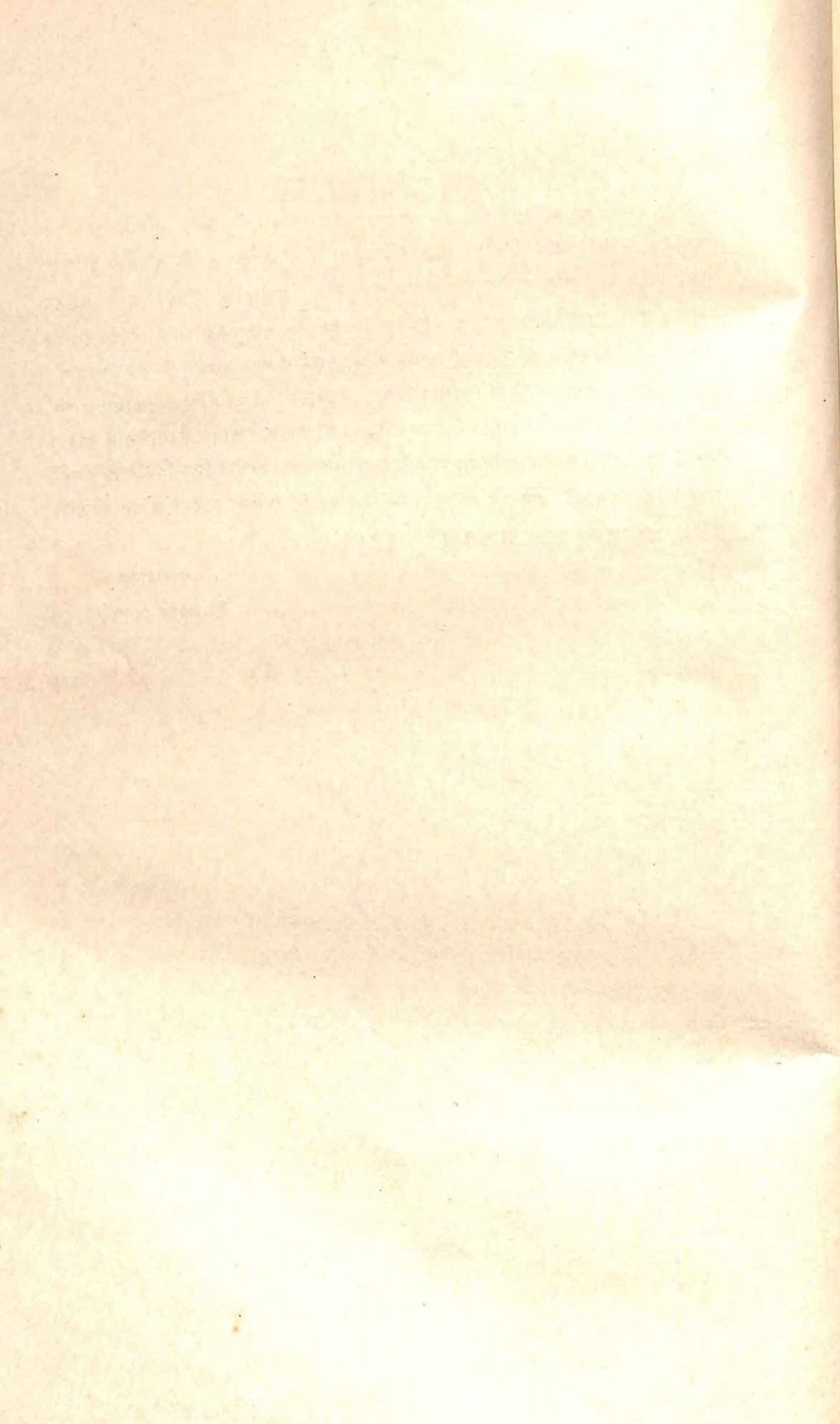
পঞ্চভূত

উৎসর্গ

মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর

সুহৃদ্বরকরকমলেষু

পঞ্চভূত

পরিচয়

রচনার সুবিধার জন্য আমার পাঁচটি পারিপার্শ্বিককে পঞ্চভূত নাম দেওয়া যাক— ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।

একটা গড়া নাম দিতে গেলেই মানুষকে বদল করিতে হয়। তলোয়ারের যেমন খাপ, মানুষের তেমন নামটি ভাষায় পাওয়া অসম্ভব। বিশেষত ঠিক পাঁচ ভূতের সহিত পাঁচটা মানুষ অবিকল মিলাইব কী করিয়া ?

আমি ঠিক মিলাইতেও চাহি না। আমি তো আদালতে উপস্থিত হইতেছি না। কেবল পাঠকের এজলাসে লেখকের একটা এই ধর্মশপথ আছে যে, সত্য বলিব। কিন্তু সে সত্য বানাইয়া বলিব।

এখন পঞ্চভূতের পরিচয় দিই।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতি আমাদের সকলের মধ্যে গুরুভার। তাঁহার অধিকাংশ বিষয়েই অচল অটল ধারণা। তিনি যাহাকে প্রত্যক্ষভাবে একটা দৃঢ় আকারের মধ্যে পান, এবং আবশ্যক হইলে কাজে লাগাইতে পারেন, তাহাকেই সত্য বলিয়া জানেন। তাহার বাহিরেও যদি সত্য থাকে, সে সত্যের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নাই, এবং সে সত্যের সহিত তিনি কোনো সম্পর্ক রাখিতে চান না। তিনি বলেন, যে-সকল জ্ঞান অত্যাবশ্যক তাহারই ভার বহন করা যথেষ্ট কঠিন। বোঝা ক্রমেই ভারী এবং শিক্ষা ক্রমেই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীনকালে যখন জ্ঞানবিজ্ঞান এত স্তরে স্তরে জমা হয় নাই, মানুষের নিতান্ত শিক্ষণীয় বিষয় যখন যৎসামান্য ছিল, তখন শৌখিন শিক্ষার অবসর ছিল। কিন্তু এখন আর তো সে অবসর নাই। ছোটো ছেলেকে কেবল বিচিত্র বেশবাস এবং অলংকারে আচ্ছন্ন করিলে কোনো ক্ষতি নাই, তাহার খাইয়া-দাইয়া আর কোনো কর্ম নাই। কিন্তু তাই বলিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত লোক, যাহাকে করিয়া-কর্মিয়া নড়িয়া-চড়িয়া উঠিয়া-হাঁটিয়া ফিরিতে হইবে, তাহাকে পায়ে নূপুর, হাতে কঙ্কণ, শিখায় ময়ূরপুচ্ছ দিয়া সাজাইলে চলিবে কেন ? তাহাকে কেবল মালকোঁচা এবং শিরস্ত্রাণ আঁটিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে হইবে। এই কারণে সভ্যতা হইতে

প্রতিদিন অলংকার খসিয়া পড়িতেছে। উন্নতির অর্থই এই, ক্রমশ আবশ্যকের সঞ্চয় এবং অনাবশ্যকের পরিহার।

শ্রীমতী অপ্ (ইঁহাকে আমরা স্রোতস্বিনী বলিব) ক্ষিতির এ তর্কের কোনো রীতিমত উত্তর করিতে পারেন না। তিনি কেবল মধুর কাকলি ও সুন্দর ভঙ্গিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া বলিতে থাকেন— না, না, ও কথা কখনোই সত্য না। ও আমার মনে লইতেছে না, ও কখনোই সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে না। কেবল বার বার 'না না, নহে নহে।' তাহার সহিত আর কোনো যুক্তি নাই ; কেবল একটি তরল সংগীতের ধ্বনি, একটি অনুনয়স্বর, একটি তরঙ্গনিন্দিত গ্রীবার আন্দোলন— 'না না, নহে নহে।' আমি অনাবশ্যককে ভালোবাসি, অতএব অনাবশ্যকও আবশ্যক। অনাবশ্যক অনেক সময় আমাদের আর কোনো উপকার করে না— কেবলমাত্র আমাদের স্নেহ, আমাদের ভালোবাসা, আমাদের করুণা, আমাদের স্বার্থবিসর্জনের স্পৃহা উদ্রেক করে ; পৃথিবীতে সেই ভালোবাসার আবশ্যকতা কি নাই ? শ্রীমতী স্রোতস্বিনীর এই অনুনয়-প্রবাহে শ্রীযুক্ত ক্ষিতি প্রায় গলিয়া যান, কিন্তু কোনো যুক্তির দ্বারা তাঁহাকে পরাস্ত করিবার সাধ্য কী।

শ্রীমতী তেজ (ইঁহাকে দীপ্তি নাম দেওয়া গেল) একেবারে নিষ্কাসিত অসি-লতার মতো ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠেন এবং শাণিত সুন্দর সুরে ক্ষিতিকে বলেন— ইস! তোমরা মনে কর পৃথিবীতে কাজ তোমরা কেবল একলাই কর। তোমাদের কাজে যাহা আবশ্যক নয় বলিয়া ছাঁটিয়া ফেলিতে চাও, আমাদের কাজে তাহা আবশ্যক হইতে পারে। তোমাদের আচার-ব্যবহার কথাবার্তা বিশ্বাস শিক্ষা এবং শরীর হইতে অলংকারমাত্রই তোমরা ফেলিয়া দিতে চাও, কেননা, সভ্যতার ঠেলাঠেলিতে স্থান এবং সময়ের বড়ো অনটন হইয়াছে। কিন্তু আমাদের যাহা চিরন্তন কাজ, ঐ অলংকারগুলো ফেলিয়া দিলে তাহা একপ্রকার বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের কত টুকিটাকি, কত ইটি-উটি, কত মিষ্টতা, কত শিষ্টতা, কত কথা, কত কাহিনী, কত ভাব, কত ভঙ্গি, কত অবসর সঞ্চয় করিয়া তবে এই পৃথিবীর গৃহকার্য চালাইতে হয়। আমরা মিষ্ট করিয়া হাসি, বিনয় করিয়া বলি, লজ্জা করিয়া কাজ করি, দীর্ঘকাল যত্ন করিয়া যেখানে যেটি পরিলে শোভা পায় সেটি পরি ; এইজন্যই তোমাদের মাতার কাজ, তোমাদের স্ত্রীর কাজ এত সহজে করিতে পারি। যদি সত্যই সভ্যতার তাড়ায় অত্যাবশ্যক জ্ঞান-বিজ্ঞান ছাড়া আর-সমস্তই দূর হইয়া যায়, তবে একবার দেখিবার ইচ্ছা আছে অনাথ শিশুসন্তানের এবং পুরুষের মতো এতবড়ো অসহায় এবং নির্বোধ জাতির কী দশাটা হয়!

শ্রীযুক্ত বায়ু (ইঁহাকে সমীর বলা যাক) প্রথমটা একবার হাসিয়া সমস্ত উড়াইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন— ক্ষিতির কথা ছাড়িয়া দাও ; একটুখানি পিছন হঠিয়া, পাশ ফিরিয়া, নড়িয়া-চড়িয়া একটা সত্যকে নানা দিক দিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে গেলেই উহার চলৎশক্তিহীন মানসিক রাজ্যে এমনি একটা ভূমিকম্প উপস্থিত হয় যে, বেচারার বহু-যত্ননির্মিত পাকা মতগুলি কোনোটা বিদীর্ণ কোনোটা ভূমিসাৎ হইয়া যায়। কাজেই ও ব্যক্তি বলে, দেবতা হইতে কীট পর্যন্ত সকলই মাটি হইতে উৎপন্ন ; কারণ, মাটির বাহিরে আর-কিছু আছে স্বীকার করিতে গেলে আবার মাটি হইতে অনেকখানি নড়িতে হয়। উহাকে এই কথাটা বুঝানো আবশ্যক যে, মানুষের সহিত জড়ের সম্বন্ধ লইয়াই সংসার নহে, মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধটাই আসল সংসারের সম্বন্ধ। কাজেই বস্তুবিজ্ঞান যতই বেশি শেখ না কেন, তাহাতে করিয়া লোকব্যবহার-শিক্ষার কোনো সাহায্য করে না। কিন্তু যেগুলি জীবনের অলংকার, যাহা কমনীয়তা, যাহা কাব্য, সেইগুলিই মানুষের মধ্যে যথার্থ বন্ধন স্থাপন করে, পরস্পরের পথের কণ্টক দূর করে, পরস্পরের হৃদয়ের ক্ষত আরোগ্য করে, নয়নের দৃষ্টি খুলিয়া দেয়, এবং জীবনের প্রসার মর্ত হইতে স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তারিত করে।

শ্রীযুক্ত ব্যোম কিয়ৎকাল চক্ষু মুদিয়া, বলিলেন— ঠিক মানুষের কথা যদি বল, যাহা অনাবশ্যক তাহাই তাহার পক্ষে সর্বাপেক্ষা আবশ্যক। যে কোনো-কিছুতে সুবিধা হয়, কাজ চলে, পেট ভরে, মানুষ তাহাকে প্রতিদিন ঘৃণা করে। এইজন্য ভারতের ঋষিরা ক্ষুধাতৃষ্ণা শীতগ্রীষ্ম একেবারেই উড়াইয়া দিয়া মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা প্রচার করিয়াছিলেন। বাহিরের কোনো-কিছুরই যে অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা আছে ইহাই জীবাত্মার পক্ষে অপমানজনক। সেই অত্যাবশ্যকটাকেই যদি মানবসভ্যতার সিংহাসনে রাজা করিয়া বসানো হয় এবং তাহার উপরে যদি আর-কোনো সম্রাট্‌কে স্বীকার না করা যায়, তবে সে সভ্যতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা বলা যায় না।

ব্যোম যাহা বলে তাহা কেহ মনোযোগ দিয়া শোনে না। পাছে তাহার মনে আঘাত লাগে এই আশঙ্কায় স্রোতস্বিনী যদিও তাহার কথা প্রণিধানের ভাবে শোনে, তবু মনে মনে তাহাকে 'বেচারা পাগল' বলিয়া বিশেষ দয়া করিয়া থাকে। কিন্তু দীপ্তি তাহাকে সহিতে পারে না। অধীর হইয়া উঠিয়া মাঝখানে অন্য কথা পাড়িতে চায়। তাহার কথা ভালো বুঝিতে পারে না বলিয়া তাহার উপর দীপ্তির যেন একটা আন্তরিক বিদ্বেষ আছে।

কিন্তু ব্যোমের কথা আমি কখনো একেবারে উড়াইয়া দিই না। আমি তাহাকে বলিলাম— ঋষিরা কঠোর সাধনায় যাহা নিজের নিজের জন্য করিয়াছিলেন, বিজ্ঞান

তাহাই সর্বসাধারণের জন্য করিয়া দিতে চায়। ক্ষুধাতৃষ্ণা শীতগ্রীষ্ম এবং মানুষের প্রতি জড়ের যে শতসহস্র অত্যাচার আছে, বিজ্ঞান তাহাই দূর করিতে চায়। জড়ের নিকট হইতে পলায়ন-পূর্বক তপোবনে মনুষ্যত্বের মুক্তিসাধন না করিয়া জড়কেই ক্রীতদাস করিয়া ভৃত্যশালায় পুষিয়া রাখিলে এবং মনুষ্যকেই এই প্রকৃতির প্রাসাদে রাজারূপে অভিষিক্ত করিলে আর তো মানুষের অবমাননা থাকে না। অতএব স্থায়িরূপে জড়ের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন আধ্যাত্মিক সভ্যতায় উপনীত হইতে গেলে মাঝখানে একটা দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক সাধনা অতিবাহন করা নিতান্ত আবশ্যক।

ক্ষিতি যেমন তাঁর বিরোধী পক্ষের কোনো যুক্তি খণ্ডন করিতে বসা নিতান্ত বাহুল্য জ্ঞান করেন, আমাদের ব্যোমও তেমনি একটা কথা বলিয়া চুপ মারিয়া থাকেন, তাহার পর যে যাহা বলে তাঁহার গাম্ভীর্য নষ্ট করিতে পারে না। আমার কথাও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। ক্ষিতি যেখানে ছিল সেইখানেই অটল হইয়া রহিল এবং ব্যোমও আপনার প্রচুর গোঁফ দাড়ি ও গাম্ভীর্যের মধ্যে সমাহিত হইয়া রহিলেন।

এই তো আমি এবং আমার পঞ্চভূত সম্প্রদায়। ইহার মধ্যে শ্রীমতী দীপ্তি একদিন প্রাতঃকালে আমাকে কহিলেন— তুমি তোমার ডায়ারি রাখ না কেন?

মেয়েদের মাথায় অনেকগুলি অন্ধ সংস্কার থাকে, শ্রীমতী দীপ্তির মাথায় তন্মধ্যে এই একটি সংস্কার ছিল যে, আমি নিতান্ত যে-সে লোক নহি। বলা বাহুল্য, এই সংস্কার দূর করিবার জন্য আমি অত্যধিক প্রয়াস পাই নাই।

সমীর উদার চঞ্চল ভাবে আমার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন— লেখো-না হে।

ক্ষিতি এবং ব্যোম চুপ করিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম— ডায়ারি লিখিবার একটি মহদ্দোষ আছে।

দীপ্তি অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন— তা থাক্‌, তুমি লেখো।

স্রোতস্বিনী মৃদুস্বরে কহিলেন— কী দোষ, শুনি।

আমি কহিলাম— ডায়ারি একটা কৃত্রিম জীবন। কিন্তু যখনি উহাকে রচিত করিয়া তোলা যায়, তখনি ও আমাদের প্রকৃত জীবনের উপর কিয়ৎপরিমাণে আধিপত্য না করিয়া ছাড়ে না। একটা মানুষের মধ্যেই সহস্র ভাগ আছে, সব কটাকে সামলাইয়া সংসার চালানো এক বিষম আপদ, আবার বাহির হইতে স্বহস্তে তাহার একটি কৃত্রিম জুড়ি বানাইয়া দেওয়া আপদ বৃদ্ধি করা মাত্র।

কোথাও কিছুই নাই, ব্যোম বলিয়া উঠিলেন— সেইজন্যই তো তত্ত্বজ্ঞানীরা সকল কর্মই নিষেধ করেন। কারণ, কর্মমাত্রই এক-একটি সৃষ্টি। যখনি তুমি একটা কর্ম সৃজন করিলে তখনি সে অমরত্ব লাভ করিয়া তোমার সহিত লাগিয়া রহিল। আমরা যতই ভাবিতেছি, ভোগ করিতেছি, ততই আপনাকে নানা-খানা করিয়া তুলিতেছি। অতএব বিশুদ্ধ আত্মাটিকে যদি চাও, তবে সমস্ত ভাবনা, সমস্ত সংস্কার, সমস্ত কাজ ছাড়িয়া দাও।

আমি ব্যোমের কথার উত্তর না দিয়া কহিলাম— আমি নিজেকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙিতে চাহি না। ভিতরে একটা লোক প্রতিদিন সংসারের উপর নানা চিন্তা, নানা কাজ গাঁথিয়া গাঁথিয়া এক অনাবিষ্কৃত নিয়মে একটি জীবন গড়িয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ডায়ারি লিখিয়া গেলে তাহাকে ভাঙিয়া আর-একটি লোক গড়িয়া আর-একটি দ্বিতীয় জীবন খাড়া করা হয়।

ক্ষিতি হাসিয়া কহিল— ডায়ারিকে কেন যে দ্বিতীয় জীবন বলিতেছ আমি তো এপর্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না।

আমি কহিলাম— আমার কথা এই, জীবন এক দিকে একটা পথ আঁকিয়া চলিতেছে, তুমি যদি ঠিক তার পাশে কলম হস্তে তাহার অনুরূপ আর-একটা রেখা কাটিয়া যাও, তবে ক্রমে এমন অবস্থা আসিবার সম্ভাবনা, যখন বোঝা শক্ত হইয়া দাঁড়ায়— তোমার কলম তোমার জীবনের সমপাতে লাইন কাটিয়া যায় না তোমার জীবন তোমার কলমের লাইন ধরিয়া চলে। দুটি রেখার মধ্যে কে আসল কে নকল ক্রমে স্থির করা কঠিন হয়। জীবনের গতি স্বভাবতই রহস্যময়, তাহার মধ্যে অনেক আত্মখণ্ডন, অনেক স্বতোবিরোধ, অনেক পূর্বাপরের অসামঞ্জস্য থাকে। কিন্তু লেখনী স্বভাবতই একটা সুনির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিতে চাহে। সে সমস্ত বিরোধের মীমাংসা করিয়া, সমস্ত অসামঞ্জস্য সমান করিয়া, কেবল একটা মোটামুটি রেখা টানিতে পারে। সে একটা ঘটনা দেখিলে তাহার যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তে উপস্থিত না হইয়া থাকিতে পারে না। কাজেই তাহার রেখাটা সহজেই তাহার নিজের গড়া সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং জীবনকেও তাহার সহিত মিলাইয়া আপনার অনুবর্তী করিতে চাহে।

কথাটা ভালো করিয়া বুঝাইবার জন্য আমার ব্যাকুলতা দেখিয়া স্রোতস্বিনী দয়ার্দ্রচিত্তে কহিল— বুঝিয়াছি তুমি কী বলিতে চাও। স্বভাবত আমাদের মহাপ্রাণী তাঁহার অতিগোপন নির্মাণশালায় বসিয়া এক অপূর্ব নিয়মে আমাদের জীবন গড়েন, কিন্তু ডায়ারি লিখিতে গেলে দুই ব্যক্তির উপর জীবন গড়িবার ভার

দেওয়া হয়। কতকটা জীবন অনুসারে ডায়ারি হয়, কতকটা ডায়ারি অনুসারে জীবন হয়।

স্রোতস্বিনী এমনি সহিষ্ণুভাবে নীরবে সমনোযোগে সকল কথা শুনিয়া যায় যে, মনে হয় যেন বহুযত্নে সে আমার কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে— কিন্তু হঠাৎ আবিষ্কার করা যায় যে, বহুপূর্বেই সে আমার কথাটা ঠিক বুঝিয়া লইয়াছে।

আমি কহিলাম— সেই বটে।

দীপ্তি কহিল— তাহাতে ক্ষতি কী?

আমি কহিলাম— যে ভুক্তভোগী সেই জানে। যে লোক সাহিত্যব্যবসায়ী সে আমার কথা বুঝিবে। সাহিত্যব্যবসায়ীকে নিজের অন্তরের মধ্য হইতে নানা ভাব এবং নানা চরিত্র বাহির করিতে হয়। যেমন ভালো মালী ফর্মাশ-অনুসারে নানারূপ সংঘটন এবং বিশেষরূপ চাষের দ্বারা একজাতীয় ফুল হইতে নানাপ্রকার ফুল বাহির করে, কোনোটার বা পাতা বড়ো, কোনোটার বা রঙ বিচিত্র, কোনোটার বা গন্ধ সুন্দর, কোনোটার বা ফল সুমিষ্ট, তেমনি সাহিত্যব্যবসায়ী আপনার একটি মন হইতে নানাবিধ ফলন বাহির করে। মনের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবের উপর কল্পনার উত্তাপ প্রয়োগ করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশ করে। যে-সকল ভাব, যে-সকল স্মৃতি, মনোবৃত্তির যে-সকল উচ্ছ্বাস সাধারণ লোকের মনে আপন আপন যথানির্দিষ্ট কাজ করিয়া যথাকালে ঝরিয়া পড়ে, অথবা রূপান্তরিত হইয়া যায়— সাহিত্যব্যবসায়ী সেগুলিকে ভিন্ন করিয়া লইয়া তাহাদিগকে স্থায়ীভাবে রূপবান করিয়া তোলে। যখনি তাহাদিগকে ভালোরূপে মূর্তিমান করিয়া প্রকাশ করে, তখনি তাহারা অমর হইয়া উঠে। এমনি করিয়া ক্রমশ সাহিত্যব্যবসায়ীর মনে এক দল স্ব-স্ব-প্রধান লোকের পল্লী বসিয়া যায়। তাহার জীবনের একটা ঐক্য থাকে না। সে দেখিতে দেখিতে একেবারে শতধা হইয়া পড়ে। তাহার চিরজীবনপ্রাপ্ত ক্ষুধিত মনোভাবের দলগুলি বিশ্বজগতের সর্বত্র আপন হস্ত প্রসারণ করিতে থাকে। সকল বিষয়েই তাহাদের কৌতূহল। বিশ্বরহস্য তাহাদিগকে দশ দিকে ভুলাইয়া লইয়া যায়। সৌন্দর্য তাহাদিগকে বাঁশি বাজাইয়া বেদনাপাশে বদ্ধ করে। দুঃখকেও তাহারা ক্রীড়ার সঙ্গী করে, মৃত্যুকেও তাহারা পরখ করিয়া দেখিতে চায়। নবকৌতূহলী শিশুদের মতো সকল জিনিসই তাহারা স্পর্শ করে, ঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে, কোনো শাসন মানিতে চাহে না। একটা দীপে একেবারে অনেকগুলা পলিতা জ্বালাইয়া দিয়া সমস্ত জীবনটা হূহু শব্দে দগ্ধ করিয়া ফেলা হয়। একটা প্রকৃতির মধ্যে এতগুলা জীবন্ত বিকাশ বিষম বিরোধ-বিশৃঙ্খলার কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

স্রোতস্বিনী ঈষৎ ম্লানভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন— আপনাকে এইরূপ বিচিত্র স্বতন্ত্র ভাবে ব্যক্ত করিয়া তাহার কি কোনো সুখ নাই?

আমি কহিলাম— সৃজনের একটা বিপুল আনন্দ আছে। কিন্তু কোনো মানুষ তো সমস্ত সময় সৃজনে ব্যাপৃত থাকিতে পারে না— তাহার শক্তির সীমা আছে, এবং সংসারে লিপ্ত থাকিয়া তাহাকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেও হয়। এই জীবনযাত্রায় তাহার বড়ো অসুবিধা। মনটির উপর অবিশ্রাম কল্পনার তা দিয়া সে এমনি করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহার গায়ে কিছুই সয় না। সাত-ফুটা-ওয়ালা বাঁশি বাদ্যযন্ত্রের হিসাবে ভালো, ফুৎকারমাত্রে বাজিয়া ওঠে; কিন্তু ছিদ্রহীন পাকা বাঁশের লাঠি সংসারপথের পক্ষে ভালো, তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায়।

সমীর কহিল— দুর্ভাগ্যক্রমে বংশখণ্ডের মতো মানুষের কার্যবিভাগ নাই— মানুষ-বাঁশিকে বাজিবার সময় বাঁশি হইতে হইবে, আবার পথ চলিবার সময় লাঠি না হইলে চলিবে না। কিন্তু ভাই, তোমাদের তো অবস্থা ভালো, তোমরা কেহ বা বাঁশি, কেহ বা লাঠি; আর আমি যে কেবলমাত্র ফুৎকার। আমার মধ্যে সংগীতের সমস্ত আভ্যন্তরিক উপকরণই আছে, কেবল যে-একটা বাহ্য আকারের মধ্য দিয়া তাহাকে বিশেষ রাগিণীরূপে ধ্বনিত করিয়া তোলা যায়, সেই যন্ত্রটা নাই।

দীপ্তি কহিলেন— মানবজন্মে আমাদের অনেক জিনিস অনর্থক লোকসান হইয়া যায়। কত চিন্তা, কত ভাব, কত ঘটনা প্রবল সুখদুঃখের ঢেউ তুলিয়া আমাকে প্রতিদিন নানারূপে বিচলিত করিয়া যায়; তাহাদিগকে যদি লেখায় বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি তাহা হইলে মনে হয় যেন আমার জীবনের অনেকখানি হাতে রহিল। সুখই হউক, দুঃখই হউক, কাহারও প্রতি একেবারে সম্পূর্ণ দখল ছাড়িতে আমার মন চায় না।

ইহার উপরে আমার অনেক কথা বলিবার ছিল, কিন্তু দেখিলাম স্রোতস্বিনী একটা কী বলিবার জন্য ইতস্তত করিতেছে, এমন সময় যদি আমি আমার বক্তৃতা আরম্ভ করি তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ নিজের কথাটা ছাড়িয়া দিবে। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে সে বলিল— কী জানি ভাই, আমার তো আরও ঐটেই সর্বাপেক্ষা আপত্তিজনক মনে হয়। প্রতিদিন আমরা যাহা অনুভব করি তাহা প্রতিদিন লিপিবদ্ধ করিতে গেলে তাহার যথাযথ পরিমাণ থাকে না। আমাদের অনেক সুখদুঃখ, অনেক রাগদ্বেষ অকস্মাৎ সামান্য কারণে গুরুতর হইয়া দেখা দেয়। হয়তো অনেক দিন যাহা অনায়াসে সহ্য করিয়াছি একদিন তাহা একেবারে অসহ্য হইয়াছে, যাহা আসলে অপরাধ নহে একদিন তাহা আমার নিকটে অপরাধ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে, তুচ্ছ কারণে হয়তো একদিনকার একটা দুঃখ আমার কাছে অনেক মহত্তর

দুঃখের অপেক্ষা গুরুতর বলিয়া মনে হইয়াছে, কোনো কারণে আমার মন ভালো নাই বলিয়া আমরা অনেক সময় অন্যের প্রতি অন্যায় বিচার করিয়াছি, তাহার মধ্যে যেটুকু অপরিমিত, যেটুকু অন্যায়, যেটুকু অসত্য তাহা কালক্রমে আমাদের মন হইতে দূর হইয়া যায়— এইরূপে ক্রমশই জীবনের বাড়াবাড়িগুলি চুকিয়া গিয়া জীবনের মোটামুটিটুকু টিঁকিয়া যায়, সেইটেই আমার প্রকৃত আমার'ত্ব। তাহা ছাড়া আমাদের মনে অনেক কথা অর্ধস্ফুট আকারে আসে যায় মিলায়, তাহাদের সবগুলিকে অতিস্ফুট করিয়া তুলিলে মনের সৌকুমার্য নষ্ট হইয়া যায়। ডায়ারি রাখিতে গেলে একটা কৃত্রিম উপায়ে আমরা জীবনের প্রত্যেক তুচ্ছতাকে বৃহৎ করিয়া তুলি, এবং অনেক কচি কথাকে জোর করিয়া ফুটাইতে গিয়া ছিঁড়িয়া অথবা বিকৃত করিয়া ফেলি।

সহসা স্রোতস্বিনীর চৈতন্য হইল, কথাটা সে অনেক ক্ষণ ধরিয়া এবং কিছু আবেগের সহিত বলিয়াছে, অমনি তাহার কর্ণমূল আরক্তিম হইয়া উঠিল, মুখ ঈষৎ ফিরাইয়া কহিল— কী জানি, আমি ঠিক বলিতে পারি না। আমি ঠিক বুঝিয়াছি কি না কে জানে।

দীপ্তি কখনো কোনো বিষয়ে তিলমাত্র ইতস্তত করে না— সে একটা প্রবল উত্তর দিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া আমি কহিলাম— তুমি ঠিক বুঝিয়াছ। আমিও ঐ কথা বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু অমন ভালো করিয়া বলিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। শ্রীমতী দীপ্তির এই কথা মনে রাখা উচিত, বাড়িতে গেলে ছাড়িতে হয়। অর্জন করিতে গেলে ব্যয় করিতে হয়। জীবন হইতে প্রতিদিন অনেক ভুলিয়া, অনেক ফেলিয়া, অনেক বিলাইয়া তবে আমরা অগ্রসর হইতে পারি। কী হইবে প্রত্যেক তুচ্ছ দ্রব্য মাথায় তুলিয়া, প্রত্যেক ছিন্নখণ্ড পুঁটুলিতে পুরিয়া, জীবনের প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত পশ্চাতে টানিয়া লইয়া। প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক ঘটনার উপর যে ব্যক্তি বুক দিয়া চাপিয়া পড়ে, সে অতি হতভাগ্য।

দীপ্তি মৌখিক হাস্য হাসিয়া করজোড়ে কহিল— আমার ঘাট হইয়াছে তোমাকে ডায়ারি লিখিতে বলিয়াছিলাম, এমন কাজ আর কখনো করিব না।

সমীর বিচলিত হইয়া কহিল— অমন কথা বলিতে আছে! পৃথিবীতে অপরাধ স্বীকার করা মহাভ্রম। আমরা মনে করি দোষ স্বীকার করিলে বিচারক দোষ কম করিয়া দেখে, তাহা নহে; অন্য লোককে বিচার করিবার এবং ভর্ৎসনা করিবার সুখ একটা দুর্লভ সুখ, তুমি নিজের দোষ নিজে যতই বাড়াইয়া বলো-না কেন, কঠিন বিচারক সেটাকে ততই চাপিয়া ধরিয়া সুখ পায়। আমি কোন্ পথ অবলম্বন করিব ভাবিতেছিলাম, এখন স্থির করিতেছি আমি ডায়ারি লিখিব।

আমি কহিলাম— আমিও প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমার নিজের কথা লিখিব না। এমন কথা লিখিব যাহা আমাদের সকলের। এই আমরা যে-সব কথা প্রতিদিন আলোচনা করি—

স্রোতস্বিনী কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া উঠিল। সমীর করজোড়ে কহিল— দোহাই তোমার, সব কথা যদি লেখায় ওঠে, তবে বাড়ি হইতে কথা মুখস্থ করিয়া আসিয়া বলিব এবং বলিতে বলিতে যদি হঠাৎ মাঝখানে ভুলিয়া যাই, তবে আবার বাড়ি গিয়া দেখিয়া আসিতে হইবে। তাহাতে ফল হইবে এই যে, কথা বিস্তর কমিবে এবং পরিশ্রম বিস্তর বাড়িবে। যদি খুব-ঠিক সত্য কথা লেখ, তবে তোমার সঙ্গ হইতে নাম কাটাইয়া আমি চলিলাম।

আমি কহিলাম— আরে না, সত্যের অনুরোধ পালন করিব না, বন্ধুর অনুরোধই রাখিব। তোমরা কিছু ভাবিয়ো না, আমি তোমাদের মুখে কথা বানাইয়া দিব।

ক্ষিতি বিশাল চক্ষু প্রসারিত করিয়া কহিল— সে যে আরও ভয়ানক। আমি বেশ দেখিতেছি তোমার হাতে লেখনী পড়িলে যত সব কুযুক্তি আমার মুখে দিবে, আর তাহার অকাট্য উত্তর নিজের মুখ দিয়া বাহির করিবে।

আমি কহিলাম— মুখে যাহার কাছে তর্কে হারি, লিখিয়া তাহার প্রতিশোধ না নিলে চলে না। আমি আগে থাকিতেই বলিয়া রাখিতেছি, তোমার কাছে যত উপদ্রব এবং পরাভব সহ্য করিয়াছি এবারে তাহার প্রতিফল দিব।

সর্বসহিষ্ণু ক্ষিতি সন্তুষ্টচিত্তে কহিল— তথাস্তু।

ব্যোম কোনো কথা না বলিয়া ক্ষণকালের জন্য ঈষৎ হাসিল, তাহার সুগভীর অর্থ আমি এ পর্যন্ত বুঝিতে পারি নাই।

মাঘ ১২৯৯

সৌন্দর্যের সম্বন্ধ

বর্ষায় নদী ছাপিয়া খেতের মধ্যে জল প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের বোট অর্ধমগ্ন ধানের উপর দিয়া সর্ সর্ শব্দ করিতে করিতে চলিয়াছে।

অদূরে উচ্চভূমিতে একটা প্রাচীরবেষ্টিত একতালা কোঠাবাড়ি এবং দুই-চারিটি টিনের-ছাদ-বিশিষ্ট কুটির, কলা কাঁঠাল আম বাঁশঝাড় এবং বৃহৎ বাঁধানো অশথ গাছের মধ্য দিয়া দেখা যাইতেছে।

সেখান হইতে একটা সরু স্বরের সানাই এবং গোটাকতক ঢাক-ঢোলের শব্দ শোনা গেল। সানাই অত্যন্ত বেস্বরে একটা মেঠো রাগিণীর আরম্ভ-অংশ বারম্বার ফিরিয়া ফিরিয়া নিষ্ঠুরভাবে বাজাইতেছে এবং ঢাকঢোলগুলা যেন অকস্মাৎ বিনা কারণে খেপিয়া উঠিয়া বায়ুরাজ্য লণ্ডভণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছে।

স্রোতস্বিনী মনে করিল, নিকটে কোথাও বুঝি একটা বিবাহ আছে। একান্ত কৌতূহলভরে বাতায়ন হইতে মুখ বাহির করিয়া তরুসমাচ্ছন্ন তীরের দিকে উৎসুক দৃষ্টি চালনা করিল।

আমি ঘাটে বাঁধা নৌকার মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলাম— কী রে, বাজনা কিসের?

সে কহিল— আজ জমিদারের পুণ্যাহ।

পুণ্যাহ বলিতে বিবাহ বুঝায় না শুনিয়া স্রোতস্বিনী কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। সে ঐ তরুচ্ছায়াঘন গ্রাম্য পথটার মধ্যে কোনো এক জায়গায় ময়ূরপংখিতে একটি চন্দন-চর্চিত অজাতশ্মশ্রু নববর অথবা লজ্জামণ্ডিতা রক্তাম্বরা নববধূকে দেখিবার প্রত্যাশা করিয়াছিল।

আমি কহিলাম— পুণ্যাহ অর্থে জমিদারি বৎসরের আরম্ভ-দিন। আজ প্রজারা যাহার যেমন ইচ্ছা কিছু কিছু খাজনা লইয়া কাছারি-ঘরে টোপর-পরা বরবেশধারী নায়েবের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিবে। সে টাকা সেদিন গণনা করিবার নিয়ম নাই। অর্থাৎ খাজনা দেনা-পাওনা যেন কেবলমাত্র স্বেচ্ছাকৃত একটা আনন্দের কাজ। ইহার মধ্যে এক দিকে নীচ লোভ অপর দিকে হীন ভয় নাই। প্রকৃতিতে তরুলতা যেমন আনন্দমহোৎসবে বসন্তকে পুষ্পাঞ্জলি দেয় এবং বসন্ত তাহা সঞ্চয়-ইচ্ছায় গণনা করিয়া লয় না, সেইরূপ ভাবটা আর-কি।

দীপ্তি কহিল— কাজটা তো খাজনা-আদায়, তাহার মধ্যে আবার বাজনা বাদ্য কেন?

ক্ষিতি কহিল— ছাগশিশুকে যখন বলিদান দিতে লইয়া যায় তখন কি তাহাকে মালা পরাইয়া বাজনা বাজায় না? আজ খাজনা-দেবীর নিকটে বলিদানের বাদ্য বাজিতেছে।

আমি কহিলাম— সে হিসাবে দেখিতে পার বটে, কিন্তু বলি যদি দিতেই হয় তবে নিতান্ত পশুর মতো পশুহত্যা না করিয়া উহার মধ্যে যতটা পারা যায় উচ্চভাব রাখাই ভালো।

ক্ষিতি কহিল— আমি তো বলি যেটার যাহা সত্য ভাব তাহাই রক্ষা করা ভালো; অনেক সময়ে নীচ কাজের মধ্যে উচ্চ ভাব আরোপ করিয়া উচ্চ ভাবকে নীচ করা হয়।

আমি কহিলাম,— ভাবের সত্যমিথ্যা অনেকটা ভাবনার উপরে নির্ভর করে। আমি এক ভাবে এই বর্ষার পরিপূর্ণ নদীটিকে দেখিতেছি, আর ঐ জেলে আর-এক ভাবে দেখিতেছে— আমার ভাব যে এক-চুল মিথ্যা এ কথা আমি স্বীকার করিতে পারি না।

সমীর কহিল— অনেকের কাছে ভাবের সত্যমিথ্যা ওজন-দরে পরিমাপ হয়। যেটা যে পরিমাণে মোটা সেটা সেই পরিমাণে সত্য। সৌন্দর্যের অপেক্ষা ধূলি সত্য, স্নেহের অপেক্ষা স্বার্থ সত্য, প্রেমের অপেক্ষা ক্ষুধা সত্য।

আমি কহিলাম— কিন্তু তবু চিরকাল মানুষ এই-সমস্ত ওজনে-ভারী মোটা জিনিসকে একেবারে অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিতেছে। ধূলিকে আবৃত করে, স্বার্থকে লজ্জা দেয়, ক্ষুধাকে অন্তরালে নির্বাসিত করিয়া রাখে। মলিনতা পৃথিবীতে বহুকালের আদিম সৃষ্টি; ধূলিজঞ্জালের অপেক্ষা প্রাচীন পদার্থ মেলাই কঠিন; তাই বলিয়া সেইটেই সব চেয়ে সত্য হইল, আর অন্তর-অন্তঃপুরের যে লক্ষ্মীরূপিণী গৃহিণী আসিয়া তাহাকে ক্রমাগত ধৌত করিতে চেষ্টা করিতেছে তাহাকেই কি মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে?

ক্ষিতি কহিল— তোমরা, ভাই, এত ভয় পাইতেছ কেন? আমি তোমাদের সেই অন্তঃপুরের ভিত্তিতলে ডাইনামাইট লাগাইতে আসি নাই। কিন্তু একটু ঠাণ্ডা হইয়া বলো দেখি, পুণ্যাহের দিন ঐ বেসুরো সানাইটা বাজাইয়া পৃথিবীর কী সংশোধন করা হয়? সংগীতকলা তো নহেই।

সমীর কহিল— ও আর কিছুই নহে, একটা সুর ধরাইয়া দেওয়া। সংবৎসরের বিবিধ পদস্খলন এবং ছন্দঃপতনের পর পুনর্বার সমের কাছে আসিয়া একবার ধুয়ায় আনিয়া ফেলা। সংসারের স্বার্থকোলাহলের মাঝে মাঝে একটা পঞ্চম সুর সংযোগ করিয়া দিলে নিদেন ক্ষণকালের জন্য পৃথিবীর শ্রী ফিরিয়া যায়, হঠাৎ হাটের মধ্যে গৃহের শোভা আসিয়া আবির্ভূত হয়, কেনাবেচার উপর ভালোবাসার স্নিগ্ধ দৃষ্টি চন্দ্রালোকের ন্যায় নিপতিত হইয়া তাহার শুষ্ক কঠোরতা দূর করিয়া দেয়। যাহা হইয়া থাকে পৃথিবীতে তাহা চীৎকারস্বরে হইতেছে, আর, যাহা হওয়া উচিত তাহা মাঝে মাঝে এক-একদিন আসিয়া মাঝখানে বসিয়া সুকোমল সুন্দর সুরে সুর দিতেছে, এবং তখনকার মতো সমস্ত চীৎকারস্বর নরম হইয়া আসিয়া সেই সুরের সহিত আপনাকে মিলাইয়া লইতেছে— পুণ্যাহ সেই সংগীতের দিন।

আমি কহিলাম— উৎসবমাত্রই তাই। মানুষ প্রতিদিন যে ভাবে কাজ করে, এক একদিন তাহার উল্টা ভাবে আপনাকে সারিয়া লইতে চেষ্টা করে। প্রতিদিন

উপার্জন করে, একদিন খরচ করে ; প্রতিদিন দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখে, একদিন দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয় ; প্রতিদিন গৃহের মধ্যে আমিই গৃহকর্তা, আর-একদিন আমি সকলের সেবায় নিযুক্ত। সেইদিন শুভদিন, আনন্দের দিন, সেইদিনই উৎসব। সেই দিন সম্বৎসরের আদর্শ। সেদিন ফুলের মালা, স্ফটিকের প্রদীপ, শোভন ভূষণ— এবং দূরে একটি বাঁশি বাজিয়া বলিতে থাকে, আজিকার এই সুরই যথার্থ সুর, আর-সমস্তই বেসুরা। বুঝিতে পারি, আমরা মানুষে মানুষে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত হইয়া আনন্দ করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু প্রতিদিনের দৈন্যবশত তাহা পারিয়া উঠি না ; যেদিন পারি সেই দিনই প্রধান দিন।

সমীর কহিল— সংসারে দৈন্যের শেষ নাই। সে দিক হইতে দেখিতে গেলে মানব-জীবনটা অত্যন্ত শীর্ণ শূন্য শ্রীহীন রূপে চক্ষে পড়ে। মানবাত্মা জিনিসটা যতই উচ্চ হউক-না কেন, দুইবেলা দুইমুষ্টি তণ্ডুল সংগ্রহ করিতেই হইবে, একখণ্ড বস্ত্র না হইলে সে মাটিতে মিশাইয়া যায়। এ দিকে আপনাকে অবিনাশী অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস করে, ও দিকে যেদিন নস্যের ডিবাটা হারাইয়া যায় সেদিন আকাশ বিদীর্ণ করিয়া ফেলে। যেমন করিয়াই হোক, প্রতিদিন তাহাকে আহার-বিহার কেনা-বেচা দর-দাম মারামারি ঠেলাঠেলি করিতেই হয়— সেজন্য সে লজ্জিত। এই কারণে সে এই শুষ্ক ধূলিময় লোকাকীর্ণ হাট-বাজারের ইতরতা ঢাকিবার জন্য সর্বদা প্রয়াস পায়। আহারে-বিহারে আদানে-প্রদানে আত্মা আপনার সৌন্দর্যবিভা বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। সে আপনার আবশ্যকের সহিত আপনার মহত্ত্বের সুন্দর সামঞ্জস্য সাধন করিয়া লইতে চায়।

আমি কহিলাম— তাহারই প্রমাণ এই পুণ্যাহের বাঁশি। একজনের ভূমি, আর-একজন তাহারই মূল্য দিতেছে, এই শুষ্ক চুক্তির মধ্যে লজ্জিত মানবাত্মা একটি ভাবের সৌন্দর্য প্রয়োগ করিতে চাহে। উভয়ের মধ্যে একটি আত্মীয়সম্পর্ক বাঁধিয়া দিতে ইচ্ছা করে। বুঝাইতে চাহে ইহা চুক্তি নহে, ইহার মধ্যে একটি প্রেমের স্বাধীনতা আছে। রাজাপ্রজা ভাবের সম্বন্ধ, আদানপ্রদান হৃদয়ের কর্তব্য। খাজনার টাকার সহিত রাগরাগিণীর কোনো যোগ নাই, খাজাঞ্চিখানা নহবত বাজাইবার স্থান নহে, কিন্তু যেখানেই ভাবের সম্পর্ক আসিয়া দাঁড়াইল— অমনি সেখানেই বাঁশি তাহাকে আহ্বান করে, রাগিণী তাহাকে প্রকাশ করে, সৌন্দর্য তাহার সহচর। গ্রামের বাঁশি যথাসাধ্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে, আজ আমাদের পুণ্যদিন, আজ আমাদের রাজাপ্রজার মিলন। জমিদারি কাছারিতেও মানবাত্মা আপন প্রবেশপথ নির্মাণের চেষ্টা করিতেছে, সেখানেও একখানা ভাবের আসন পাতিয়া রাখিয়াছে।

স্রোতস্বিনী আপনার মনে ভাবিতে ভাবিতে কহিল— আমার বোধ হয় ইহাতে যে কেবল সংসারের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তাহা নহে, যথার্থ দুঃখভার লাঘব করে। সংসারে উচ্চনীচতা যখন আছেই, সৃষ্টিলোপ ব্যতীত কখনোই যখন তাহা ধ্বংস হইবার নহে, তখন উচ্চ এবং নীচের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ থাকিলে উচ্চতার ভার বহন করা সহজ হয়। চরণের পক্ষে দেহভার বহন করা সহজ; বিচ্ছিন্ন বাহিরের বোঝাই বোঝা।

উপমাপ্রয়োগপূর্বক একটা কথা ভালো করিয়া বলিবামাত্র স্রোতস্বিনীর লজ্জা উপস্থিত হয়, যেন একটা অপরাধ করিয়াছে। অনেকে অন্যের ভাব চুরি করিয়া নিজের বলিয়া চালাইতে এরূপ কুণ্ঠিত হয় না।

ব্যোম কহিল— যেখানে একটা পরাভব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে সেখানে মানুষ আপনার হীনতাদুঃখ দূর করিবার জন্য একটা ভাবের সম্পর্ক পাতাইয়া লয়। কেবল মানুষের কাছে বলিয়া নয়, সর্বত্রই। পৃথিবীতে প্রথম আগমন করিয়া মানুষ যখন দাবাগ্নি ঝটিকা বন্যার সহিত কিছুতেই পারিয়া উঠিল না, পর্বত যখন শিবের প্রহরী নন্দীর ন্যায় তর্জনী দিয়া পথরোধপূর্বক নীরবে নীলাকাশ স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আকাশ যখন স্পর্শাতীত অবিচল মহিমায় অমোঘ ইচ্ছাবলে কখনো বৃষ্টি কখনো বজ্র বর্ষণ করিতে লাগিল, তখন মানুষ তাহাদের সহিত দেবতা পাতাইয়া বসিল। নহিলে চিরনিবাসভূমি প্রকৃতির সহিত কিছুতেই মানুষের সন্ধিস্থাপন হইত না। অজ্ঞাতশক্তি প্রকৃতিকে যখন সে ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল তখনই মানবাত্মা তাহার মধ্যে গৌরবের সহিত বাস করিতে পারিল।

ক্ষিতি কহিল— মানবাত্মা কোনোমতে আপনার গৌরব রক্ষা করিবার জন্য নানাপ্রকার কৌশল করিয়া থাকে সন্দেহ নাই। রাজা যখন যথেচ্ছাচার করে, কিছুতেই তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই, তখন প্রজা তাহাকে দেবতা গড়িয়া হীনতাদুঃখ বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করে। পুরুষ যখন সবল এবং একাধিপত্য করিতে সক্ষম তখন অসহায় স্ত্রী তাহাকে দেবতা দাঁড় করাইয়া তাহার স্বার্থপর নিষ্ঠুর অত্যাচার কথঞ্চিৎ গৌরবের সহিত বহন করিতে চেষ্টা করে। এ কথা স্বীকার করি বটে, মানুষের যদি এইরূপ ভাবের দ্বারা অভাব ঢাকিবার ক্ষমতা না থাকিত তবে এতদিনে সে পশুর অধম হইয়া যাইত।

স্রোতস্বিনী ঈষৎ ব্যথিতভাবে কহিল— মানুষ যে কেবল অগত্যা এইরূপ আত্মপ্রতারণা করে তাহা নহে। যেখানে আমরা কোনোরূপে অভিভূত নহি বরং আমরাই যেখানে সবল পক্ষ, সেখানেও আত্মীয়তা-স্থাপনের একটা চেষ্টা দেখিতে

পাওয়া যায়। গাভীকে আমাদের দেশের লোক মা বলিয়া, ভগবতী বলিয়া, পূজা করে কেন? সে তো অসহায় পশুমাত্র; পীড়ন করিলে, তাড়না করিলে, তাহার হইয়া দু কথা বলিবার কেহ নাই। আমরা বলিষ্ঠ, সে দুর্বল; আমরা মানুষ, সে পশু। কিন্তু আমাদের সেই শ্রেষ্ঠতাই আমরা গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছি। যখন তাহার নিকট হইতে উপকার গ্রহণ করিতেছি তখন যে সেটা বলপূর্বক করিতেছি, কেবল আমরা সক্ষম এবং সে নিরুপায় বলিয়াই করিতেছি, আমাদের অন্তরাত্মা সে কথা স্বীকার করিতে চাহে না। সে এই উপকারিণী পরম ধৈর্যবতী প্রশান্তা পশুমাতাকে মা বলিয়া তবেই ইহার দুগ্ধ পান করিয়া যথার্থ তৃপ্তি অনুভব করে; মানুষের সহিত পশুর একটি ভাবের সম্পর্ক, একটি সৌন্দর্যের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তবেই তাহার সৃজনচেষ্টা বিশ্রাম লাভ করে।

ব্যোম গম্ভীরভাবে কহিল— তুমি একটা খুব বড়ো কথা কহিয়াছ।

শুনিয়া স্রোতস্বিনী চমকিয়া উঠিল। এমন দুষ্কর্ম কখন করিল সে জানিতে পারে নাই। এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সলজ্জ সংকুচিত ভাবে সে নীরবে মার্জনা প্রার্থনা করিল।

ব্যোম কহিল— ঐ যে আত্মার সৃজনচেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়াছ উহার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। মাকড়সা যেমন মাঝখানে থাকিয়া চারি দিকে জাল প্রসারিত করিতে থাকে, আমাদের কেন্দ্রবাসী আত্মা সেইরূপ চারি দিকের সহিত আত্মীয়তাবন্ধন স্থাপনের জন্য ব্যস্ত আছে; সে ক্রমাগতই বিসদৃশকে সদৃশ, দূরকে নিকট, পরকে আপনার করিতেছে। বসিয়া বসিয়া আত্ম-পরের মধ্যে সহস্র সেতু নির্মাণ করিতেছে। ঐ যে আমরা যাহাকে সৌন্দর্য বলি সেটা তাহার নিজের সৃষ্টি। সৌন্দর্য আত্মার সহিত জড়ের মাঝখানকার সেতু। বস্তু কেবল পিণ্ডমাত্র; আমরা তাহা হইতে আহার গ্রহণ করি, তাহাতে বাস করি, তাহার নিকট হইতে আঘাতও প্রাপ্ত হই। তাহাকে যদি পর বলিয়া দেখিতাম তবে বস্তুসমষ্টির মতো এমন পর আর কী আছে? কিন্তু আত্মার কার্য আত্মীয়তা করা। সে মাঝখানে একটি সৌন্দর্য পাতাইয়া বসিল। সে যখন জড়কে বলিল সুন্দর, তখন সেও জড়ের অন্তরে প্রবেশ করিল, জড়ও তাহার অন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিল— সেদিন বড়োই পুলকের সঞ্চার হইল। এই সেতুনির্মাণ-কার্য এখনো চলিতেছে। কবির প্রধান গৌরব ইহাই। পৃথিবীতে চারি দিকের সহিত সে আমাদের পুরাতন সম্বন্ধ দৃঢ় ও নব নব সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতেছে। প্রতিদিন পর পৃথিবীকে আপনার এবং জড় পৃথিবীকে আত্মার বাসযোগ্য করিতেছে। বলা বাহুল্য, প্রচলিত ভাষায় যাহাকে জড় বলে আমিও তাহাকে জড় বলিতেছি।

*

জড়ের জড়ত্ব সম্বন্ধে আমার মতামত ব্যক্ত করিতে বসিলে উপস্থিত সভায় সচেতন পদার্থের মধ্যে আমি একা মাত্র অবশিষ্ট থাকিব।

সমীর ব্যোমের কথায় বিশেষ মনোযোগ না করিয়া কহিল— স্রোতস্বিনী কেবল গাভীর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, কিন্তু আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সেদিন যখন দেখিলাম এক ব্যক্তি রৌদ্রে তাতিয়া-পুড়িয়া আসিয়া মাথা হইতে একটা কেরোসিন তেলের শূন্য টিনপাত্র কূলে নামাইয়া 'মা গো' বলিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, মনে বড়ো একটু লাগিল। এই-যে স্নিগ্ধ সুন্দর সুগভীর জলরাশি সুমিষ্ট কলস্বরে দুই তীরকে স্তনদান করিয়া চলিয়াছে ইহারই শীতল ক্রোড়ে তাপিত শরীর সমর্পণ করিয়া দিয়া ইহাকে মা বলিয়া আহ্বান করা, অন্তরের এমন সুমধুর উচ্ছ্বাস আর কী আছে! এই ফলশস্যসুন্দরা বসুন্ধরা হইতে পিতৃপিতামহসেবিত আজন্মপরিচিত বাস্তুগৃহ পর্যন্ত যখন স্নেহসজীব আত্মীয়রূপে দেখা দেয় তখন জীবন অত্যন্ত উর্বর সুন্দর শ্যামল হইয়া উঠে। তখন জগতের সঙ্গে সুগভীর যোগসাধন হয়; জড় হইতে জন্তু এবং জন্তু হইতে মানুষ পর্যন্ত যে-একটি অবিচ্ছেদ্য ঐক্য আছে এ কথা আমাদের কাছে অত্যদ্ভুত বোধ হয় না; কারণ, বিজ্ঞান এ কথার আভাস দিবার পূর্বে আমরা অন্তর হইতে এ কথা জানিয়াছিলাম; পণ্ডিত আসিয়া আমাদের জ্ঞাতিসম্বন্ধের কুলজি বাহির করিবার পূর্বেই আমরা নাড়ির টানে সর্বত্র ঘরকন্না পাতিয়া বসিয়াছিলাম।

আমাদের ভাষায় 'থ্যাঙ্ক্' শব্দের প্রতিশব্দ নাই বলিয়া কোনো কোনো য়ুরোপীয় পণ্ডিত সন্দেহ করেন আমাদের কৃতজ্ঞতা নাই। কিন্তু আমি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতে পাই। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবার জন্য আমাদের অন্তর যেন লালায়িত হইয়া আছে। জন্তুর নিকট হইতে যাহা পাই, জড়ের নিকট হইতে যাহা পাই, তাহাকেও আমরা স্নেহ-দয়া-উপকার-রূপে জ্ঞান করিয়া প্রতিদান দিবার জন্য ব্যগ্র হই। যে জাতির লাঠিয়াল আপনার লাঠিকে, ছাত্র আপনার গ্রন্থকে এবং শিল্পী আপনার যন্ত্রকে কৃতজ্ঞতা-অর্পণ-লালসায় মনে মনে জীবন্ত করিয়া তোলে, একটা বিশেষ শব্দের অভাবে সে জাতিকে অকৃতজ্ঞ বলা যায় না।

আমি কহিলাম— বলা যাইতে পারে। কারণ, আমরা কৃতজ্ঞতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া গিয়াছি। আমরা যে পরস্পরের নিকট অনেকটা পরিমাণে সাহায্য অসংকোচে গ্রহণ করি অকৃতজ্ঞতা তাহার কারণ নহে, পরস্পরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যভাবের অপেক্ষাকৃত অভাবই তাহার প্রধান কারণ। ভিক্ষুক এবং দাতা, অতিথি এবং গৃহস্থ, আশ্রিত এবং আশ্রয়দাতা, প্রভু এবং ভৃত্যের সম্বন্ধ যেন একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধ। সুতরাং সে স্থলে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশপূর্বক ঋণমুক্ত হইবার কথা কাহারও মনে উদয় হয় না।

ব্যোম কহিল— বিলাতি হিসাবের কৃতজ্ঞতা আমাদের দেবতাদের প্রতিও নাই। য়ুরোপীয় যখন বলে 'থ্যাঙ্ক্ গড' তখন তাহার অর্থ এই, ঈশ্বর যখন মনোযোগপূর্বক আমার একটা উপকার করিয়া দিলেন তখন সে উপকারটা স্বীকার না করিয়া বর্বরের মতো চলিয়া যাইতে পারি না। আমাদের দেবতাকে আমরা কৃতজ্ঞতা দিতে পারি না, কারণ, কৃতজ্ঞতা দিলে তাঁহাকে অল্প দেওয়া হয়, তাঁহাকে ফাঁকি দেওয়া হয়। তাঁহাকে বলা হয়, তোমার কাজ তুমি করিলে, আমার কর্তব্যও আমি সারিয়া দিয়া গেলাম। বরঞ্চ স্নেহের একপ্রকার অকৃতজ্ঞতা আছে, কারণ, স্নেহের দাবির অন্ত নাই। সেই স্নেহের অকৃতজ্ঞতাও স্বাতন্ত্র্যের কৃতজ্ঞতা অপেক্ষা গভীরতর মধুরতর। রামপ্রসাদের গান আছে—

তোমায় মা মা বলে আর ডাকব না।
আমায় দিয়েছ দিতেছ কত যন্ত্রণা।

এই উদার অকৃতজ্ঞতা কোনো য়ুরোপীয় ভাষায় তর্জমা হইতে পারে না।

ক্ষিতি কটাক্ষসহকারে কহিল— য়ুরোপীয়দের প্রতি আমাদের যে অকৃতজ্ঞতা, তাহারও বোধ হয় একটা গভীর এবং উদার কারণ কিছু থাকিতে পারে। জড়প্রকৃতির সহিত আত্মীয়সম্পর্ক স্থাপন সম্বন্ধে যে কথাগুলি হইল তাহা সম্ভবত অত্যন্ত সুন্দর; এবং গভীর যে, তাহার আর সন্দেহ নাই, কারণ, এ পর্যন্ত আমি সম্পূর্ণ তলাইয়া উঠিতে পারি নাই। সকলেই তো একে একে বলিলেন যে, আমরাই প্রকৃতির সহিত ভাবের সম্পর্ক পাতাইয়া বসিয়াছি আর য়ুরোপ তাহার সহিত দূরের লোকের মতো ব্যবহার করে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যদি য়ুরোপীয় সাহিত্য, ইংরাজি কাব্য আমাদের না জানা থাকিত, তবে আজিকার সভায় এ আলোচনা কি সম্ভব হইত? এবং যিনি ইংরাজি কখনো পড়েন নাই তিনি কি শেষ পর্যন্ত ইহার মর্মগ্রহণ করিতে পারিবেন?

আমি কহিলাম— না, কখনোই না। তাহার একটু কারণ আছে। প্রকৃতির সহিত আমাদের যেন ভাইবোনের সম্পর্ক এবং ইংরাজ ভাবুকের যেন স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক। আমরা জন্মাবধিই আত্মীয়, আমরা স্বভাবতই এক। আমরা তাহার মধ্যে নব নব বৈচিত্র্য, পরিসূক্ষ্ম ভাবচ্ছায়া দেখিতে পাই না, একপ্রকার অন্ধ অচেতন স্নেহে মাখামাখি করিয়া থাকি। আর ইংরাজ, প্রকৃতির বাহির হইতে অন্তরে প্রবেশ করিতেছে। সে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে বলিয়াই তাহার পরিচয় এমন অভিনব আনন্দময়, তাহার মিলন এমন প্রগাঢ়তর। সেও নববধূর ন্যায় প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে, প্রকৃতিও তাহার মনোহরণের জন্য আপনার নিগূঢ় সৌন্দর্য উদ্ঘাটিত

করিতেছে। সে প্রথমে প্রকৃতিকে জড় বলিয়া জানিত, হঠাৎ একদিন যেন যৌবনারম্ভে তাহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া তাহার অনির্বচনীয় অপরিমেয় আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য আবিষ্কার করিয়াছে। আমরা আবিষ্কার করি নাই, কারণ, আমরা সন্দেহও করি নাই, প্রশ্নও করি নাই।

আত্মা অন্য আত্মার সংঘর্ষে তবেই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারে, তবেই সে মিলনের আধ্যাত্মিকতা পরিপূর্ণ মাত্রায় মন্থিত হইয়া উঠে। একাকার হইয়া থাকা কিছু না থাকার ঠিক পরেই। কোনো একজন ইংরাজ কবি লিখিয়াছেন, ঈশ্বর আপনারই পিতৃ-অংশ এবং মাতৃ-অংশকে স্ত্রীপুরুষরূপে পৃথিবীতে ভাগ করিয়া দিয়াছেন; সেই দুই বিচ্ছিন্ন অংশ এক হইবার জন্য পরস্পরের প্রতি এমন অনিবার্য আনন্দে আকৃষ্ট হইতেছে; কিন্তু এই বিচ্ছেদটি না হইলে পরস্পরের মধ্যে এমন প্রগাঢ় পরিচয় হইত না। ঐক্য অপেক্ষা মিলনেই আধ্যাত্মিকতা অধিক।

আমরা পৃথিবীকে নদীকে মা বলি, আমরা ছায়াময় বট-অশ্বত্থকে পূজা করি, আমরা প্রস্তর-পাষাণকে সজীব করিয়া দেখি, কিন্তু আত্মার মধ্যে তাহার আধ্যাত্মিকতা অনুভব করি না। বরঞ্চ আধ্যাত্মিককে বাস্তবিক করিয়া তুলি। আমরা তাহাতে মনঃকল্পিত মূর্তি আরোপ করি, আমরা তাহার নিকট সুখ সম্পদ সফলতা প্রার্থনা করি। কিন্তু আধ্যাত্মিক সম্পর্ক কেবলমাত্র সৌন্দর্য কেবলমাত্র আনন্দের সম্পর্ক, তাহা সুবিধা-অসুবিধা সঞ্চয়-অপচয়ের সম্পর্ক নহে। স্নেহসৌন্দর্যপ্রবাহিণী জাহ্নবী যখন আত্মার আনন্দ দান করে তখনই সে আধ্যাত্মিক; কিন্তু যখনই তাহাকে মূর্তিবিশেষে নিবদ্ধ করিয়া তাহার নিকট হইতে ইহকাল অথবা পরকালের কোনো বিশেষ সুবিধা প্রার্থনা করি তখন তাহা সৌন্দর্যহীন মোহ, অন্ধ অজ্ঞানতা মাত্র। তখনই আমরা দেবতাকে পুত্তলিকা করিয়া দিই।

ইহকালের সম্পদ এবং পরকালের পুণ্য, হে জাহ্নবী, আমি তোমার নিকট চাহি না এবং চাহিলেও পাইব না, কিন্তু শৈশবকাল হইতে জীবনের কত দিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে, কৃষ্ণপক্ষের অর্ধচন্দ্রালোকে, ঘনবর্ষার মেঘশ্যামল মধ্যাহ্নে, আমার অন্তরাত্মাকে যে-এক অবর্ণনীয় অলৌকিক পুলকে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছ সেই আমার দুর্লভ জীবনের আনন্দসঞ্চয়গুলি যেন জন্মজন্মান্তরে অক্ষয় হইয়া থাকে; পৃথিবী হইতে সমস্ত জীবন যে নিরুপম সৌন্দর্য চয়ন করিতে পারিয়াছি যাইবার সময় যেন একখানি পূর্ণশতদলের মতো সেটি হাতে করিয়া লইয়া যাইতে পারি এবং যদি আমার প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ হয় তবে তাঁহার করপল্লবে সমর্পণ করিয়া দিয়া একটি বারের মানবজন্ম কৃতার্থ করিতে পারি।

ভাদ্র ১৩০০

নরনারী

সমীর এক সমস্যা উত্থাপিত করিলেন, তিনি বলিলেন— ইংরাজি সাহিত্যে গদ্য অথবা পদ্য কাব্যে নায়ক এবং নায়িকা উভয়েরই মাহাত্ম্য পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়। ডেস্‌ডিমোনার নিকট ওথেলো এবং ইয়াগো কিছুমাত্র হীনপ্রভ নহে; ক্লিয়োপাট্রা আপনার শ্যামল বঙ্কিম বন্ধনজালে অ্যাণ্টনিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি লতাপাশবিজড়িত ভগ্ন জয়স্তম্ভের ন্যায় অ্যাণ্টনির উচ্চতা সর্বসমক্ষে দৃশ্যমান রহিয়াছে। লামারমুরের নায়িকা আপনার সকরুণ সরল সুকুমার সৌন্দর্যে যতই আমাদের মনোহরণ করুক-না কেন, রেভ্‌ন্‌স্‌উডের বিষাদঘনঘোর নায়কের নিকট হইতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে না। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় নায়িকারই প্রাধান্য। কুন্দনন্দিনী এবং সূর্যমুখীর নিকট নগেন্দ্র ম্লান হইয়া আছে, রোহিণী এবং ভ্রমরের নিকট গোবিন্দলাল অদৃশ্যপ্রায়, জ্যোতির্ময়ী কপালকুণ্ডলার পার্শ্বে নবকুমার ক্ষীণতম উপগ্রহের ন্যায়। প্রাচীন বাংলা কাব্যেও দেখো। বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে সজীব মূর্তি যদি কাহারও থাকে তবে সে কেবল বিদ্যার ও মালিনীর, সুন্দর-চরিত্রে পদার্থের লেশমাত্র নাই। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর সুবৃহৎ সমভূমির মধ্যে কেবল ফুল্লরা এবং খুল্লনা একটু নড়িয়া বেড়ায়, নতুবা ব্যাধটা একটা বিকৃত বৃহৎ স্থাণুমাত্র এবং ধনপতি ও তাঁহার পুত্র কোনো কাজের নহে। বঙ্গসাহিত্যে পুরুষ মহাদেবের ন্যায় নিশ্চল ভাবে ধূলিশয়ান এবং রমণী তাহার বক্ষের উপর জাগ্রত জীবন্ত ভাবে বিরাজমান। ইহার কারণ কী?

সমীরের এই প্রশ্নের উত্তর শুনিবার জন্য স্রোতস্বিনী অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন এবং দীপ্তি নিতান্ত অমনোযোগের ভাণ করিয়া টেবিলের উপর একটা গ্রন্থ খুলিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

ক্ষিতি কহিলেন— তুমি বঙ্কিমবাবুর যে কয়েকখানি উপন্যাসের উল্লেখ করিয়াছ সকলগুলিই মানসপ্রধান, কার্যপ্রধান নহে। মানসজগতে স্ত্রীলোকের প্রভাব অধিক, কার্য-জগতে পুরুষের প্রভুত্ব। যেখানে কেবলমাত্র হৃদয়বৃত্তির কথা সেখানে পুরুষ স্ত্রীলোকের সহিত পারিয়া উঠিবে কেন? কার্যক্ষেত্রেই তাহার চরিত্রের যথার্থ বিকাশ হয়।

দীপ্তি আর থাকিতে পারিল না— গ্রন্থ ফেলিয়া এবং ঔদাসীন্যের ভাণ পরিহার করিয়া বলিয়া উঠিল— কেন? দুর্গেশনন্দিনীতে বিমলার চরিত্র কি কার্যেই বিকশিত হয় নাই? এমন নৈপুণ্য, এমন তৎপরতা, এমন অধ্যবসায়, উক্ত উপন্যাসের কয় জন নায়ক দেখাইতে পারিয়াছে? আনন্দমঠ তো কার্যপ্রধান উপন্যাস। সত্যানন্দ জীবানন্দ

ভবানন্দ প্রভৃতি সন্তানসম্প্রদায় তাহাতে কাজ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা কবির বর্ণনা-মাত্র, যদি কাহারও চরিত্রের মধ্যে যথার্থ কার্যকারিতা পরিস্ফুট হইয়া থাকে তাহা শান্তির। দেবীচৌধুরানীতে কে কর্তৃত্বপদ লইয়াছে? রমণী। কিন্তু সে কি অন্তঃপুরের কর্তৃত্ব? নহে।

সমীর কহিলেন— ভাই ক্ষিতি, তর্কশাস্ত্রের সরলরেখার দ্বারা সমস্ত জিনিসকে পরিপাটিরূপে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় না। শতরঞ্চফলকেই ঠিক লাল কালো রঙের সমান ছক কাটিয়া ঘর আঁকিয়া দেওয়া যায়, কারণ, তাহা নির্জীব কাষ্ঠমূর্তির রঙ্গভূমি মাত্র; কিন্তু মনুষ্যচরিত্র বড়ো সিধা জিনিস নহে। তুমি যুক্তিবলে ভাবপ্রধান কর্মপ্রধান প্রভৃতি তাহার যেমনই অকাট্য সীমা নির্ণয় করিয়া দেও না কেন, বিপুল সংসারের বিচিত্র কার্যক্ষেত্রে সমস্তই উলট-পালট হইয়া যায়। সমাজের লৌহকটাহের নিম্নে যদি জীবনের অগ্নি না জ্বলিত, তবে মনুষ্যের শ্রেণীবিভাগ ঠিক সমান অটলভাবে থাকিত। কিন্তু জীবনশিখা যখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তখন টগ্‌বগ্‌ করিয়া সমস্ত মানবচরিত্র ফুটিতে থাকে, তখন নব নব বিস্ময়জনক বৈচিত্র্যের আর সীমা থাকে না। সাহিত্য সেই পরিবর্ত্যমান মানবজগতের চঞ্চল প্রতিবিম্ব। তাহাকে সমালোচনাশাস্ত্রের বিশেষণ দিয়া বাঁধিবার চেষ্টা মিথ্যা। হৃদয়বৃত্তিতে স্ত্রীলোকই শ্রেষ্ঠ এমন কেহ লিখিয়া পড়িয়া দিতে পারে না। ওথেলো তো মানসপ্রধান নাটক, কিন্তু তাহাতে নায়কের হৃদয়াবেগের প্রবলতা কী প্রচণ্ড! কিং লিয়ারে হৃদয়ের ঝটিকা কী ভয়ংকর!

ব্যোম সহসা অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন— আহা, তোমরা বৃথা তর্ক করিতেছ। যদি গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখ, তবে দেখিবে কার্যই স্ত্রীলোকের। কার্যক্ষেত্র ব্যতীত স্ত্রীলোকের অন্যত্র স্থান নাই। যথার্থ পুরুষ যোগী, উদাসীন, নির্জনবাসী। ক্যাল্‌ডিয়ার মরুক্ষেত্রের মধ্যে পড়িয়া পড়িয়া মেষপাল পুরুষ যখন একাকী ঊর্ধ্বনেত্রে নিশীথগগনের গ্রহতারকার গতিবিধি নির্ণয় করিত, তখন সে কী সুখ পাইত! কোন্ নারী এমন অকাজে কালক্ষেপ করিতে পারে? যে জ্ঞান কোনো কার্যে লাগিবে না কোন্ নারী তাহার জন্য জীবন ব্যয় করে? যে ধ্যান কেবলমাত্র সংসারনির্মুক্ত আত্মার বিশুদ্ধ আনন্দজনক, কোন্ রমণীর কাছে তাহার মূল্য আছে? ক্ষিতির কথা-মত পুরুষ যদি যথার্থ কার্যশীল হইত, তবে মনুষ্যসমাজের এমন উন্নতি হইত না— তবে একটি নূতন তত্ত্ব একটি নূতন ভাব বাহির হইত না। নির্জনের মধ্যে, অবসরের মধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ, ভাবের আবির্ভাব। যথার্থ পুরুষ সর্বদাই সেই নির্লিপ্ত নির্জনতার মধ্যে থাকে। কার্যবীর নেপোলিয়ানও কখনোই আপনার কার্যের মধ্যে সংলিপ্ত হইয়া থাকিতেন না; তিনি যখন যেখানেই থাকুন একটা মহানির্জনে আপন ভাবাকাশের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন— তিনি সর্বদাই আপনার একটা মস্ত আইডিয়ার দ্বারা পরিরক্ষিত

হইয়া তুমুল কার্যক্ষেত্রের মাঝখানেও বিজনবাস যাপন করিতেন। ভীষ্ম তো কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের একজন নায়ক কিন্তু সেই ভীষণ জনসংঘাতের মধ্যেও তাঁহার মতো একক প্রাণী আর কে ছিল? তিনি কি কাজ করিতেছিলেন না ধ্যান করিতেছিলেন? স্ত্রীলোকই যথার্থ কাজ করে। তাহার কাজের মাঝখানে কোনো ব্যবধান নাই। সে একেবারে কাজের মধ্যে লিপ্ত, জড়িত। সেই যথার্থ লোকালয়ে বাস করে, সংসার রক্ষা করে। স্ত্রীলোকই যথার্থ সম্পূর্ণরূপে সঙ্গদান করিতে পারে, তাহার যেন অব্যবহিত স্পর্শ পাওয়া যায়, সে স্বতন্ত্র হইয়া থাকে না।

দীপ্তি কহিল— তোমার সমস্ত সৃষ্টিছাড়া কথা— কিছুই বুঝিবার জো নাই। মেয়েরা যে কাজ করিতে পারে না এ কথা আমি বলি না, তোমরা তাহাদের কাজ করিতে দাও কই।

ব্যোম কহিলেন— স্ত্রীলোকেরা আপনার কর্মবন্ধনে আপনি বদ্ধ' হইয়া পড়িয়াছে। জলন্ত অঙ্গার যেমন আপনার ভস্ম আপনি সঞ্চয় করে, নারী তেমনি আপনার স্তূপাকার কার্যাবশেষের দ্বারা আপনাকে নিহিত করিয়া ফেলে— সেই তাহার অন্তঃপুর, তাহার চারি দিকে কোনো অবসর নাই। তাহাকে যদি ভস্মমুক্ত করিয়া বহিঃসংসারের কার্য-রাশির মধ্যে নিক্ষেপ করা যায় তবে কি কম কাণ্ড হয়! পুরুষের সাধ্য কী তেমন দ্রুতবেগে তেমন তুমুল ব্যাপার করিয়া তুলিতে! পুরুষের কাজ করিতে বিলম্ব হয়; সে এবং তাহার কার্যের মাঝখানে একটা দীর্ঘ পথ থাকে, সে পথ বিস্তর চিন্তার দ্বারা আকীর্ণ। রমণী যদি একবার বহির্বিপ্লবে যোগ দেয়, নিমেষের মধ্যে সমস্ত ধূ ধূ করিয়া উঠে। এই প্রলয়কারিণী কার্যশক্তিকে সংসার বাঁধিয়া রাখিয়াছে, এই অগ্নিতে কেবল শয়নগৃহের সন্ধ্যাদীপ জ্বলিতেছে, শীতার্ত প্রাণীর শীত নিবারণ ও ক্ষুধার্ত প্রাণীর অন্ন প্রস্তুত হইতেছে। যদি আমাদের সাহিত্যে এই সুন্দরী বহ্নিশিখাগুলির তেজ দীপ্যমান হইয়া থাকে তবে তাহা লইয়া এত তর্ক কিসের জন্য!

আমি কহিলাম— আমাদের সাহিত্যে স্ত্রীলোক যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের স্ত্রীলোক আমাদের দেশের পুরুষের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।

স্রোতস্বিনীর মুখ ঈষৎ রক্তিম এবং সহাস্য হইয়া উঠিল। দীপ্তি কহিল— এ আবার তোমার বাড়াবাড়ি।

বুঝিলাম দীপ্তির ইচ্ছা, আমাকে প্রতিবাদ করিয়া স্বজাতির গুণগান বেশি করিয়া শুনিয়া লইবে। আমি তাহাকে সে কথা বলিলাম, এবং কহিলাম স্ত্রীজাতি স্তুতিবাক্য শুনিতে অত্যন্ত ভালোবাসে। দীপ্তি সবলে মাথা নাড়িয়া কহিল— কখনোই না।

স্রোতস্বিনী মৃদুভাবে কহিল— সে কথা সত্য। অপ্রিয় বাক্য আমাদের কাছে অত্যন্ত অধিক অপ্রিয় এবং প্রিয় বাক্য আমাদের কাছে বড়ো বেশি মধুর।

স্রোতস্বিনী রমণী হইলেও সত্য কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

আমি কহিলাম— তাহার একটু কারণ আছে। গ্রন্থকারদের মধ্যে কবি এবং গুণীদের মধ্যে গায়কগণ বিশেষরূপে স্তুতিমিষ্টান্নপ্রিয়। আসল কথা, মনোহরণ করা যাহাদের কাজ, প্রশংসাই তাহাদের কৃতকার্যতা পরিমাপের একমাত্র উপায়। অন্য সমস্ত কার্যফলের নানারূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে, স্তুতিবাদলাভ ছাড়া মনোরঞ্জনের আর কোনো প্রমাণ নাই। সেইজন্য গায়ক প্রত্যেকবার সমের কাছে আসিয়া বাহবা প্রত্যাশা করে। সেইজন্য অনাদর গুণীমাত্রের কাছে এত অধিক অপ্রীতিকর।

সমীর কহিলেন— কেবল তাহাই নয়, নিরুৎসাহ মনোহরণকার্যের একটি প্রধান অন্তরায়। শ্রোতার মনকে অগ্রসর দেখিলে তবেই গায়কের মন আপনার সমস্ত ক্ষমতা বিকশিত করিতে পারে। অতএব স্তুতিবাদ শুদ্ধ যে তাহার পুরস্কার তাহা নহে, তাহার কার্যসাধনের একটি প্রধান অঙ্গ।

আমি কহিলাম— স্ত্রীলোকেরও প্রধান কার্য আনন্দদান করা। তাহার সমস্ত অস্তিত্বকে সংগীত ও কবিতার ন্যায় সম্পূর্ণ সৌন্দর্যময় করিয়া তুলিলে তবে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সেইজন্যই স্ত্রীলোক স্তুতিবাদে বিশেষ আনন্দলাভ করে। কেবল অহংকার-পরিতৃপ্তির জন্য নহে; তাহাতে সে আপনার জীবনের সার্থকতা অনুভব করে। ত্রুটি-অসম্পূর্ণতা দেখাইলে একেবারে তাহাদের মর্মের মূলে গিয়া আঘাত করে। এইজন্য লোকনিন্দা স্ত্রীলোকের নিকট বড়ো ভয়ানক।

ক্ষিতি কহিলেন— তুমি যাহা বলিলে দিব্য কবিত্ব করিয়া বলিলে, শুনিতে বেশ লাগিল, কিন্তু আসল কথাটা এই যে, স্ত্রীলোকের কার্যের পরিসর সংকীর্ণ। বৃহৎ দেশে ও বৃহৎ কালে তাহার স্থান নাই। উপস্থিতমত স্বামীপুত্র-আত্মীয়স্বজন-প্রতিবেশীদিগকে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করিতে পারিলেই তাহার কর্তব্য সাধিত হয়। যাহার জীবনের কার্যক্ষেত্র দূরদেশ ও দূরকালে বিস্তীর্ণ, যাহার কর্মের ফলাফল সকল সময় আশু প্রত্যক্ষগোচর নহে, নিকটের লোকের ও বর্তমান কালের নিন্দাস্তুতির উপর তাহার তেমন একান্ত নির্ভর নহে; সুদূর আশা ও বৃহৎ কল্পনা, অনাদর উপেক্ষা ও নিন্দার মধ্যেও তাহাকে অবিচলিত বল প্রদান করিতে পারে। লোকনিন্দা লোকস্তুতি সৌভাগ্যগর্ব এবং মান-অভিমানে স্ত্রীলোককে যে এমন বিচলিত করিয়া তোলে তাহার প্রধান কারণ, জীবন লইয়া তাহাদের নগদ কারবার, তাহাদের সমুদায় লাভ-লোকসান বর্তমানে; হাতে হাতে যে ফল প্রাপ্ত হয় তাহাই তাহাদের একমাত্র

পাওনা ; এইজন্য তাহারা কিছু কষাকষি করিয়া আদায় করিতে চায়, এক কানাকড়ি ছাড়িতে চায় না।

দীপ্তি বিরক্ত হইয়া য়ুরোপ ও আমেরিকার বড়ো বড়ো বিশ্বহিতৈষিণী রমণীর দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। স্রোতস্বিনী কহিলেন— বৃহত্ত্ব ও মহত্ত্ব সকল সময়ে এক নহে। আমরা বৃহৎ ক্ষেত্রে কার্য করি না বলিয়া আমাদের কার্যের গৌরব অল্প এ কথা আমি কিছুতেই মনে করিতে পারি না। পেশী স্নায়ু অস্থিচর্ম বৃহৎ স্থান অধিকার করে, মর্মস্থানটুকু অতি ক্ষুদ্র এবং নিভৃত। আমরা সমস্ত মানবসমাজের সেই মর্মকেন্দ্রে বিরাজ করি। পুরুষ-দেবতাগণ বৃষ মহিষ প্রভৃতি বলবান পশুবাহন আশ্রয় করিয়া ভ্রমণ করেন ; স্ত্রী-দেবীগণ হৃদয়শতদলবাসিনী, তাঁহারা একটি বিকশিত ধ্রুব সৌন্দর্যের মাঝখানে পরিপূর্ণ মহিমায় সমাসীন। পৃথিবীতে যদি পুনর্জন্মলাভ করি তবে আমি যেন পুনর্বার নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করি। যেন ভিখারি না হইয়া, অন্নপূর্ণা হই। একবার ভাবিয়া দেখো সমস্ত মানবসংসারের মধ্যে প্রতিদিবসের রোগশোক ক্ষুধাশ্রান্তি কত বৃহৎ, প্রতিমুহূর্তে কর্মচক্রোৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশি কত স্তূপাকার হইয়া উঠিতেছে ; প্রতি গৃহের রক্ষাকার্য কত অসীমপ্রীতিসাধ্য ; যদি কোনো প্রসন্নমূর্তি প্রফুল্লমুখী ধৈর্যময়ী লোক-বৎসলা দেবী প্রতিদিবসের শিয়রে বাস করিয়া তাহার তপ্ত ললাটে স্নিগ্ধ স্পর্শ দান করেন, আপনার কার্যকুশল সুন্দর হস্তের দ্বারা প্রত্যেক মুহূর্ত হইতে তাহার মলিনতা অপনয়ন করেন এবং প্রত্যেক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অশ্রান্ত স্নেহে তাহার কল্যাণ ও শান্তি বিধান করিতে থাকেন, তবে তাঁহার কার্যস্থল সংকীর্ণ বলিয়া তাঁহার মহিমা কে অস্বীকার করিতে পারে? যদি সেই লক্ষ্মীমূর্তির আদর্শখানি হৃদয়ের মধ্যে উজ্জ্বল করিয়া রাখি, তবে নারীজন্মের প্রতি আর অনাদর জন্মিতে পারে না।

ইহার পর আমরা সকলেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। এই অকস্মাৎ নিস্তব্ধতায় স্রোতস্বিনী অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠিয়া আমাকে বলিলেন— তুমি আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের কথা কী বলিতেছিলে— মাঝে হইতে অন্য তর্ক আসিয়া সে-কথা চাপা পড়িয়া গেল।

আমি কহিলাম— আমি বলিতেছিলাম, আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা আমাদের পুরুষের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ।

ক্ষিতি কহিলেন— তাহার প্রমাণ ?

আমি কহিলাম— প্রমাণ হাতে হাতে। প্রমাণ ঘরে ঘরে। প্রমাণ অন্তরের মধ্যে। পশ্চিমে ভ্রমণ করিবার সময় কোনো কোনো নদী দেখা যায়, যাহার অধিকাংশে তপ্ত শুষ্ক বালুকা ধূ ধূ করিতেছে— কেবল এক পার্শ্ব দিয়া স্ফটিকস্বচ্ছসলিলা স্নিগ্ধ নদীটি

অতি নম্রমধুর স্রোতে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। সেই দৃশ্য দেখিলে আমাদের সমাজ মনে পড়ে। আমরা অকর্মণ্য, নিষ্ফল নিশ্চল বালুকারাশি স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া আছি, প্রত্যেক সমীরশ্বাসে হূহু করিয়া উড়িয়া যাইতেছি এবং যে-কোনো কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করিবার চেষ্টা করিতেছি তাহাই দুই দিনে ধসিয়া ধসিয়া পড়িয়া যাইতেছে। আর আমাদের বাম পার্শ্বে আমাদের রমণীগণ নিম্নপথ দিয়া বিনম্র সেবিকার মতো আপনাকে সংকুচিত করিয়া স্বচ্ছ সুধাস্রোতে প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে। তাহাদের এক মুহূর্ত বিরাম নাই। তাহাদের গতি, তাহাদের প্রীতি, তাহাদের সমস্ত জীবন, এক ধ্রুব লক্ষ্য ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে। আমরা লক্ষ্যহীন, ঐক্যহীন, সহস্রপদতলে দলিত হইয়াও মিলিত হইতে অক্ষম। যে দিকে জলস্রোত, যে দিকে আমাদের নারীগণ, কেবল সেই দিকে সমস্ত শোভা এবং ছায়া এবং সফলতা, এবং যে দিকে আমরা সে দিকে কেবল মরুচাকচিক্য, বিপুল শূন্যতা এবং দগ্ধ দাস্যবৃত্তি। সমীর, তুমি কী বল?

সমীর স্রোতস্বিনী ও দীপ্তির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া হাসিয়া কহিলেন— অদ্যকার সভায় নিজেদের অসারতা স্বীকার করিবার দুইটি মূর্তিমতী বাধা বর্তমান। আমি তাঁহাদের নাম করিতে চাহি না। বিশ্বসংসারের মধ্যে বাঙালি পুরুষের আদর কেবল আপন অন্তঃপুরের মধ্যে। সেখানে তিনি কেবলমাত্র প্রভু নহেন, তিনি দেবতা। আমরা যে দেবতা নহি, তৃণ ও মৃত্তিকার পুত্তলিকামাত্র, সে কথা আমাদের উপাসকদের নিকট প্রকাশ করিবার প্রয়োজন কী ভাই? ঐ যে আমাদের মুগ্ধ বিশ্বস্ত ভক্তটি আপন হৃদয়-কুঞ্জের সমুদয় বিকশিত সুন্দর পুষ্পগুলি সোনার থালে সাজাইয়া আমাদের চরণতলে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে, ও কোথায় ফিরাইয়া দিব? আমাদিগকে দেবসিংহাসনে বসাইয়া ঐ-যে চিরব্রতধারিণী সেবিকাটি আপন নিভৃত নিত্য প্রেমের নির্নিমেষ সন্ধ্যা-দীপটি লইয়া আমাদের এই গৌরবহীন মুখের চতুর্দিকে অনন্ত অতৃপ্তিভরে শতসহস্র বার প্রদক্ষিণ করাইয়া আরতি করিতেছে, উহার কাছে যদি খুব উচ্চ হইয়া না বসিয়া রহিলাম, নীরবে পূজা না গ্রহণ করিলাম, তবে উহাদেরই বা কোথায় সুখ আর আমাদেরই বা কোথায় সম্মান! যখন ছোটো ছিল তখন মাটির পুতুল লইয়া এমনিভাবে খেলা করিত যেন তাহার প্রাণ আছে, যখন বড়ো হইল তখন মানুষ-পুতুল লইয়া এমনিভাবে পূজা করিতে লাগিল যেন তাহার দেবত্ব আছে— তখন যদি কেহ তাহার খেলার পুতুল ভাঙিয়া দিত তবে কি বালিকা কাঁদিত না? এখন যদি কেহ ইহার পূজার পুতুল ভাঙিয়া দেয় তবে কি রমণী ব্যথিত হয় না? যেখানে মনুষ্যত্বের যথার্থ গৌরব আছে সেখানে মনুষ্যত্ব বিনা ছদ্মবেশে সম্মান আকর্ষণ করিতে পারে,

যেখানে মনুষ্যত্বের অভাব সেখানে দেবত্বের আয়োজন করিতে হয়। পৃথিবীতে কোথাও যাহাদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা নাই তাহারা কি সামান্য মানবভাবে স্ত্রীর নিকট সম্মান প্রত্যাশা করিতে পারে? কিন্তু আমরা যে এক-একটি দেবতা, সেইজন্য এমন সুন্দর সুকুমার হৃদয়গুলি লইয়া অসংকোচে আপনার পঙ্কিল চরণের পাদপীঠ নির্মাণ করিতে পারিয়াছি।

দীপ্তি কহিলেন— যাহার যথার্থ মনুষ্যত্ব আছে, সে মানুষ হইয়া দেবতার পূজা গ্রহণ করিতে লজ্জা অনুভব করে এবং যদি পূজা পায় তবে আপনাকে সেই পূজার যোগ্য করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু বাংলাদেশে দেখা যায়, পুরুষসম্প্রদায় আপন দেবত্ব লইয়া নির্লজ্জভাবে আস্ফালন করে। যাহার যোগ্যতা যত অল্প তাহার আড়ম্বর তত বেশি। আজকাল স্ত্রীদিগকে পতিমাহাত্ম্য পতিপূজা শিখাইবার জন্য পুরুষগণ কায়মনোবাক্যে লাগিয়াছেন। আজকাল নৈবেদ্যের পরিমাণ কিঞ্চিৎ কমিয়া আসিতেছে বলিয়া তাঁহাদের আশঙ্কা জন্মিতেছে। কিন্তু পত্নীদিগকে পূজা করিতে শিখানো অপেক্ষা পতিদিগকে দেবতা হইতে শিখাইলে কাজে লাগিত। পতিদেবপূজা হ্রাস হইতেছে বলিয়া যাঁহারা আধুনিক স্ত্রীলোকদিগকে পরিহাস করেন, তাঁহাদের যদি লেশমাত্র রসবোধ থাকিত তবে সে বিদ্রূপ ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের নিজেকে বিদ্ধ করিত। হায় হায়, বাঙালির মেয়ে পূর্বজন্মে কত পুণ্যই করিয়াছিল তাই এমন দেবলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কী বা দেবতার শ্রী! কী বা দেবতার মাহাত্ম্য!

স্রোতস্বিনীর পক্ষে ক্রমে অসহ্য হইয়া আসিল। তিনি মাথা নাড়িয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন— তোমরা উত্তরোত্তর সুর এমনি নিখাদে চড়াইতেছ যে, আমাদের স্তবগানের মধ্যে যে মাধুর্যটুকু ছিল তাহা ক্রমেই চলিয়া যাইতেছে। এ কথা যদি বা সত্য হয় যে আমরা তোমাদের যতটা বাড়াই তোমরা তাহার যোগ্য নহ, তোমরাও কি আমাদিগকে অযথারূপে বাড়াইয়া তুলিতেছ না? তোমরা যদি দেবতা না হও, আমরাও দেবী নহি। আমরা যদি উভয়েই আপোষের দেবদেবী হই, তবে আর ঝগড়া করিবার প্রয়োজন কী? তা ছাড়া আমাদের তো সকল গুণ নাই— হৃদয়মাহাত্ম্যে যদি আমরা শ্রেষ্ঠ হই, মনোমাহাত্ম্যে তো তোমরা বড়ো।

আমি কহিলাম— মধুর কণ্ঠস্বরে এই স্নিগ্ধ কথাগুলি বলিয়া তুমি বড়ো ভালো করিলে, নতুবা দীপ্তির বাক্যবাণবর্ষণের পর সত্য কথা বলা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। দেবী, তোমরা কেবল কবিতার মধ্যে দেবী, মন্দিরের মধ্যে আমরা দেবতা। দেবতার ভোগ যাহা-কিছু সে আমাদের, আর তোমাদের জন্য কেবল মনুসংহিতা হইতে দুইখানি কিম্বা আড়াইখানি মাত্র মন্ত্র আছে। তোমরা আমাদের এমনি দেবতা যে,

তোমরা যে সুখস্বাস্থ্যসম্পদের অধিকারী এ কথা মুখে উচ্চারণ করিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। সমগ্র পৃথিবী আমাদের, অবশিষ্ট ভাগ তোমাদের; আহারের বেলা আমরা, উচ্ছিষ্টের বেলা তোমরা। প্রকৃতির শোভা, মুক্ত বায়ু, স্বাস্থ্যকর ভ্রমণ আমাদের; এবং দুর্লভ মানবজন্ম ধারণ করিয়া কেবল গৃহের কোণ, রোগের শয্যা এবং বাতায়নের প্রান্ত তোমাদের। আমরা দেবতা হইয়া সমস্ত পদসেবা পাই এবং তোমরা দেবী হইয়া সমস্ত পদপীড়ন সহ্য কর— প্রণিধান করিয়া দেখিলে এ দুই দেবত্বের মধ্যে প্রভেদ লক্ষিত হইবে।

একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, বঙ্গদেশে পুরুষের কোনো কাজ নাই। এ দেশে গার্হস্থ্য ছাড়া আর-কিছু নাই, সেই গৃহগঠন এবং গৃহবিচ্ছেদ স্ত্রীলোকেই করিয়া থাকে। আমাদের দেশে ভালোমন্দ সমস্ত শক্তি স্ত্রীলোকের হাতে; আমাদের রমণীরা সেই শক্তি চিরকাল চালনা করিয়া আসিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র ছিপ্‌ছিপে তক্‌তকে স্টিম্‌নৌকা যেমন বৃহৎ বোঝাই-ভরা গাধাবোটটাকে স্রোতের অনুকূলে ও প্রতিকূলে টানিয়া লইয়া চলে, তেমনি আমাদের দেশীয় গৃহিণী, লোকলৌকিকতা-আত্মীয়কুটুম্বিতা-পরিপূর্ণ বৃহৎ সংসার এবং স্বামী-নামক একটি চলৎশক্তিরহিত অনাবশ্যক বোঝা পশ্চাতে টানিয়া লইয়া আসিয়াছে। অন্য দেশে পুরুষেরা সন্ধিবিগ্রহ রাজ্যচালনা প্রভৃতি বড়ো বড়ো পুরুষোচিত কার্যে বহুকাল ব্যাপৃত থাকিয়া নারীদের হইতে স্বতন্ত্র একটি প্রকৃতি গঠিত করিয়া তোলে। আমাদের দেশে পুরুষেরা গৃহপালিত, মাতৃলালিত, পত্নীচালিত। কোনো বৃহৎ ভাব, বৃহৎকার্য, বৃহৎ ক্ষেত্রের মধ্যে তাহাদের জীবনের বিকাশ হয় নাই; অথচ অধীনতার পীড়ন, দাসত্বের হীনতা-দুর্বলতার লাঞ্ছনা তাহাদিগকে নতশিরে সহ্য করিতে হইয়াছে। তাহাদিগকে পুরুষের কোনো কর্তব্য করিতে হয় নাই এবং কাপুরুষের সমস্ত অপমান বহিতে হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে স্ত্রীলোককে কখনো বাহিরে গিয়া কর্তব্য খুঁজিতে হয় না, তরুশাখায় ফলপুষ্পের মতো কর্তব্য তাহার হাতে আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। সে যখনই ভালোবাসিতে আরম্ভ করে তখনই তাহার কর্তব্য আরম্ভ হয়। তখনই তাহার চিন্তা, বিবেচনা, যুক্তি, কার্য, তাহার সমস্ত চিত্তবৃত্তি সজাগ হইয়া উঠে— তাহার সমস্ত চরিত্র উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতে থাকে। বাহিরের কোনো রাষ্ট্রবিপ্লব তাহার কার্যের ব্যাঘাত করে না, তাহার গৌরবের হ্রাস করে না, জাতীয় অধীনতার মধ্যেও তাহার তেজ রক্ষিত হয়।

স্রোতস্বিনীর দিকে ফিরিয়া কহিলাম— আজ আমরা একটি নূতন শিক্ষা এবং বিদেশী ইতিহাস হইতে পুরুষকারের নূতন আদর্শ প্রাপ্ত হইয়া বাহিরের কর্মক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হইতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু ভিজা কাষ্ঠ জ্বলে না, মরিচা-ধরা চাকা

চলে না ; যত জলে তাহার চেয়ে ধোঁওয়া বেশি হয়, যত চলে তাহার চেয়ে শব্দ বেশি করে। আমরা চিরদিন অকর্মণ্যভাবে কেবল দলাদলি কানাকানি হাসাহাসি করিয়াছি, তোমরা চিরকাল তোমাদের কাজ করিয়া আসিয়াছ। এইজন্য শিক্ষা তোমরা যত সহজে যত শীঘ্র গ্রহণ করিতে পারো, আপনার আয়ত্ত করিতে পারো, তাহাকে আপনার জীবনের মধ্যে প্রবাহিত করিতে পারো, আমরা তেমন পারি না।

স্রোতস্বিনী অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তার পর ধীরে ধীরে কহিলেন— যদি বুঝিতে পারিতাম আমাদের কিছু করিবার আছে এবং কী উপায়ে কী কর্তব্যসাধন করা যায়, তাহা হইলে আর কিছু না হোক চেষ্টা করিতে পারিতাম।

আমি কহিলাম— আর তো কিছুই করিতে হইবে না। যেমন আছ তেমনি থাকো। লোকে দেখিয়া বুঝিতে পারুক সত্য, সরলতা, শ্রী যদি মূর্তি গ্রহণ করে তবে তাহাকে কেমন দেখিতে হয়। যে গৃহে লক্ষ্মী আছে, সে গৃহে বিশৃঙ্খলা কুশ্রীতা নাই। আজকাল আমরা যে-সমস্ত অনুষ্ঠান করিতেছি তাহার মধ্যে লক্ষ্মীর হস্ত নাই, এইজন্য তাহার মধ্যে বড়ো বিশৃঙ্খলতা, বড়ো বাড়াবাড়ি— তোমরা শিক্ষিতা নারীরা তোমাদের হৃদয়ের সৌন্দর্য লইয়া যদি এই সমাজের মধ্যে এই অসংযত কার্যস্তূপের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াও তবেই ইহার মধ্যে লক্ষ্মীস্থাপনা হয়, তবে অতি সহজেই সমস্ত শোভন পরিপাটি এবং সামঞ্জস্যবদ্ধ হইয়া আসে।

স্রোতস্বিনী আর কিছু না বলিয়া সকৃতজ্ঞ স্নেহদৃষ্টির দ্বারা আমার ললাট স্পর্শ করিয়া গৃহকার্যে চলিয়া গেল।

দীপ্তি ও স্রোতস্বিনী সভা ছাড়িয়া গেলে ক্ষিতি হাঁপ ছাড়িয়া কহিল— এইবার সত্য কথা বলিবার সময় পাইলাম। বাতাসটা এইবার মোহমুক্ত হইবে। তোমাদের কথাটা অত্যুক্তিতে বড়ো, আমি তাহা নীরবে সহ্য করিয়াছি ; আমার কথাটা লম্বায় যদি বড়ো হয় সেটা তোমাদের সহ্য করিতে হইবে।

আমাদের সভাপতি মহাশয় সকল বিষয়ের সকল দিক দেখিবার সাধনা করিয়া থাকেন এইরূপ তাঁহার নিজের ধারণা। এই গুণটি যে সদ্‌গুণ আমার তাহাতে সন্দেহ আছে। ওকে বলা যায় বুদ্ধির পেটুকতা। লোভ সম্বরণ করিয়া যে মানুষ বাদ-সাদ দিয়া বাছিয়া খাইতে জানে সেই যথার্থ খাইতে পারে। আহারে যাহার পক্ষপাতের সংযম আছে সেই করে স্বাদগ্রহণ, এবং ধারণ করে সম্যক্‌রূপে। বুদ্ধির যদি কোনো পক্ষপাত না থাকে, যদি বিষয়ের সবটাকেই গিলিয়া ফেলার কুশ্রী অভ্যাস তাহার থাকে, তবে সে বেশি পায় কল্পনা করিয়া আসলে কম পায়।

যে মানুষের বুদ্ধি সাধারণত অতিরিক্ত পরিমাণে অপক্ষপাতী সে যখন বিশেষ ক্ষেত্রে পক্ষপাতী হইয়া পড়ে তখন একেবারে আত্মবিস্মৃত হইতে থাকে, তখন তার সেই অমিতাচারে ধৈর্য রক্ষা করা কঠিন হয়। সভাপতিমহাশয়ের একমাত্র পক্ষপাতের বিষয় নারী। সে সম্বন্ধে তাঁহার অতিশয়োক্তি মনের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিকূল এবং সত্য-বিচারের বিরোধী।

পুরুষের জীবনের ক্ষেত্র বৃহৎ সংসারে, সেখানে সাধারণ মানুষের ভুল-চুক ত্রুটি পরিমাণে বেশি হইয়াই থাকে। বৃহতের উপযুক্ত শক্তি সাধনাসাপেক্ষ, কেবলমাত্র সহজ বুদ্ধির জোরে সেখানে ফল পাওয়া যায় না। স্ত্রীলোকের জীবনের ক্ষেত্র ছোটো সংসারে, সেখানে সহজ বুদ্ধিই কাজ চালাইতে পারে। সহজ বুদ্ধি জৈব অভ্যাসের অনুগামী, তাহার অশিক্ষিতপটুত্ব— তাই বলিয়াই সে সুশিক্ষিত-পটুত্বের উপরে বাহাদুরি লইবে এ তো সহ্য করা চলে না। ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে যাহা সহজে সুন্দর তার চেয়ে বড়ো জাতের সুন্দর তাহাই— বৃহৎ সীমায় যুদ্ধের ক্ষতচিহ্নে যাহা চিহ্নিত, অসুন্দরের সংঘর্ষে ও সংযোগে যাহা কঠিন, যাহা অতিসৌষম্যে অতিললিত অতিনিখুঁত নয়।

দেশের পুরুষদের প্রতি তোমরা যে ঐকান্তিক ভাবে অবিচার করিয়াছ তাহাকে আমি ধিক্কার দিই, তাহার অমিতভাষণেই প্রমাণ হয় তাহার অমূলকতা। পৃথিবীতে কাপুরুষ অনেক আছে, আমাদের দেশে হয়তো বা সংখ্যায় আরও বেশি। তার প্রধান কারণটার আভাস পূর্বেই দিয়াছি। যথার্থ পুরুষ হওয়া সহজ নয়, তাহা দুর্মূল্য বলিয়াই দুর্লভ। আদর্শ নারীর উপকরণ-আয়োজন অনেকখানিই যোগাইয়াছে প্রকৃতি। প্রকৃতির আদুরে সন্তান নয় পুরুষ, বিশ্বের শক্তিভাণ্ডার তাহাকে লুঠ করিয়া লইতে হয়। এইজন্য পৃথিবীতে অনেক পুরুষ অকৃতার্থ। কিন্তু যাহারা সার্থক হইতে পারে তাহাদের তুলনা তোমার মেয়েমহলে মিলিবে কোথায়, অন্তত আমাদের দেশে এই অকৃতার্থতার কি একটা কারণ নয় মেয়েরাই? তাহাদের অন্ধসংস্কার, তাহাদের আসক্তি, তাহাদের ঈর্ষা, তাহাদের কৃপণতা! মেয়েরা সেখানেই ত্যাগ করে যেখানে তাহাদের প্রবৃত্তি ত্যাগ করায়, তাহাদের সন্তানের জন্য, প্রিয়জনের জন্য। পুরুষের যথার্থ ত্যাগের ক্ষেত্র প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে। এ কথা মনে রাখিয়া দুই জাতের তুলনা করিয়ো।

স্ত্রৈণকে মনে মনে স্ত্রীলোক পরিহাস করে, জানে সেটা মোহ, সেটা দুর্বলতা। একান্তমনে আশা করি দীপ্তি ও স্রোতস্বিনী তোমাদের বাড়াবাড়ি লইয়া উচ্চহাসি হাসিতেছে; না যদি হাসে তবে তাহাদের 'পরে আমার শ্রদ্ধা থাকিবে না। তাহারা

নিজের স্বভাবের সীমা কি নিজেরাও জানে না? পরকে ভোলাইবার জন্য অহংকার মার্জনীয়, কিন্তু সেই সঙ্গে মনে মনে চাপা হাসি হাসা দরকার। নিজেকে ভোলাইবার জন্য যাহারা অপরিমিত অহংকার অবিচলিত গাম্ভীর্যের সহিত আত্মসাৎ করিতে পারে, তাহারা যদি স্ত্রীজাতীয় হয় তবে বলিতে হইবে মেয়েদের হাস্যতাবোধ নাই—সেটাই হসনীয়, এমন-কি শোচনীয়। স্বর্গের দেবীরা স্তবের কোনো অতিভাষণে কুণ্ঠিত হন না, আমাদের মর্তের দেবীদেরও যদি সেই গুণটি থাকে তবে তাঁহাদের দেবী উপাধি কেবলমাত্র সেই কারণেই সার্থক।

তার পরে একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু তোমাদের আলোচনার ওজন রক্ষার জন্য বলা দরকার। মেয়েদের ছোটো সংসারে সর্বত্রই অথবা প্রায় সর্বত্রই যে মেয়েরা লক্ষ্মীর আদর্শ এ কথা যদি বলি তবে লক্ষ্মীর প্রতি লাইবেল করা হইবে। তাহার কারণ, সহজ প্রবৃত্তি, যাহাকে ইংরেজিতে ইন্‌স্‌টিংক্‌ট্‌ বলে তাহার ভালো আছে মন্দও আছে। বুদ্ধির দুর্বলতার সংযোগে এই-সমস্ত অন্ধ প্রবৃত্তি কত ঘরে কত অসহ্য দুঃখ কত দারুণ সর্বনাশ ঘটায়, সে কথা কি দীপ্তি ও স্রোতস্বিনীর অসাক্ষাতেও বলা চলিবে না? দেশের বক্ষে মেয়েদের স্থান বটে, সেই বক্ষে তাহারা মূঢ়তার যে জগদ্দল পাথর চাপাইয়া রাখিয়াছে, সেটাকে-সুদ্ধ দেশকে টানিয়া তুলিতে পারিবে কি? তুমি বলিবে সেটার কারণ অশিক্ষা। শুধু অশিক্ষা নয়, অতিমাত্রায় হৃদয়ালুতা।

তোমাদের শিভল্‌রি সাংঘাতিক তেজে উদ্যত হইয়া উঠিতেছে। আজ তোমরা অনেক কটুভাষা নিক্ষেপ করিবে জানি, কেননা মনে মনে বুঝিয়াছ আমার কথাটা সত্য। সেই গর্ব মনে লইয়া দৌড় মারিলাম; গাড়ি ধরিতে হইবে।

চৈত্র ১২৯৯

পল্লীগ্রামে

আমি এখন বাংলাদেশের এক প্রান্তে যেখানে বাস করিতেছি এখানে কাছাকাছি কোথাও পুলিশের থানা, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারি নাই। রেলোয়ে স্টেশন অনেকটা দূরে। যে পৃথিবী কেনাবেচা বাদানুবাদ মামলা-মকদ্দমা এবং আত্মগরিমার বিজ্ঞাপন প্রচার করে, কোনো-একটা প্রস্তরকঠিন পাকা বড়ো রাস্তার দ্বারা তাহার সহিত এই লোকালয়গুলির যোগস্থাপন হয় নাই। কেবল একটি ছোটো নদী আছে। যেন সে

কেবল এই কয়খানি গ্রামেরই ঘরের ছেলেমেয়েদের নদী। অন্য কোনো বৃহৎ নদী, সুদূর সমুদ্র, অপরিচিত গ্রাম নগরের সহিত যে তাহার যাতায়াত আছে তাহা এখানকার গ্রামের লোকেরা যেন জানিতে পারে নাই, তাই তাহারা অত্যন্ত সুমিষ্ট একটা আদরের নাম দিয়া ইহাকে নিতান্ত আত্মীয় করিয়া লইয়াছে।

এখন ভাদ্র মাসে চতুর্দিক জলমগ্ন, কেবল ধান্যক্ষেত্রের মাথাগুলি অল্পই জাগিয়া আছে। বহু দূরে দূরে এক-একখানি তরুবেষ্টিত গ্রাম উচ্চভূমিতে দ্বীপের মতো দেখা যাইতেছে।

এখানকার মানুষগুলি এমনি অনুরক্ত ভক্তস্বভাব, এমনি সরল বিশ্বাসপরায়ণ যে, মনে হয় আডাম ও ইভ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইবার পূর্বেই ইহাদের বংশের আদিপুরুষকে জন্মদান করিয়াছিলেন। সেইজন্য শয়তান যদি ইহাদের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করে তাহাকেও ইহারা শিশুর মতো বিশ্বাস করে এবং মান্য অতিথির মতো নিজের আহারের অংশ দিয়া সেবা করিয়া থাকে।

এই-সমস্ত মানুষগুলির স্নিগ্ধ হৃদয়াশ্রমে যখন বাস করিতেছি এমন সময়ে আমাদের পঞ্চভূত-সভার কোনো-একটি সভ্য আমাকে কতকগুলি খবরের কাগজের টুকরা কাটিয়া পাঠাইয়া দিলেন। পৃথিবী যে ঘুরিতেছে, স্থির হইয়া নাই, তাহাই স্মরণ করাইয়া দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি লণ্ডন হইতে, প্যারিস হইতে, গুটিকতক সংবাদের ঘূর্ণাবাতাস সংগ্রহ করিয়া ডাকযোগে এই জলনিমগ্ন শ্যামসুকোমল ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

একপ্রকার ভালোই করিয়াছেন। কাগজগুলি পড়িয়া আমার অনেক কথা মনে উদয় হইল যাহা কলিকাতায় থাকিলে আমার ভালোরূপ হৃদয়ংগম হইত না।

আমি ভাবিতে লাগিলাম, এখানকার এই-যে সমস্ত নিরক্ষর নির্বোধ চাষাভুষার দল— থিওরিতে আমি ইহাদিগকে অসভ্য বর্বর বলিয়া অবজ্ঞা করি, কিন্তু কাছে আসিয়া প্রকৃতপক্ষে আমি ইহাদিগকে আত্মীয়ের মতো ভালোবাসি। এবং ইহাও দেখিয়াছি আমার অন্তঃকরণ গোপনে ইহাদের প্রতি একটি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে।

কিন্তু লণ্ডন-প্যারিসের সহিত তুলনা করিলে ইহারা কোথায় গিয়া পড়ে! কোথায় সে শিল্প, কোথায় সে সাহিত্য, কোথায় সে রাজনীতি! দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া দূরে থাক্‌, দেশ কাহাকে বলে তাহাও ইহারা জানে না।

এ-সমস্ত কথা সম্পূর্ণরূপে পর্যালোচনা করিয়াও আমার মনের মধ্যে একটি দৈববাণী ধ্বনিত হইতে লাগিল— তবু এই নির্বোধ সরল মানুষগুলি কেবল ভালোবাসা নহে, শ্রদ্ধার যোগ্য।

কেন আমি ইহাদিগকে শ্রদ্ধা করি তাই ভাবিয়া দেখিতেছিলাম। দেখিলাম ইহাদের মধ্যে যে-একটি সরল বিশ্বাসের ভাব আছে তাহা অত্যন্ত বহুমূল্য। এমন-কি তাহাই মনুষ্যত্বের চিরসাধনার ধন। যদি মনের ভিতরকার কথা খুলিয়া বলিতে হয় তবে এ কথা স্বীকার করিব আমার কাছে তাহা অপেক্ষা মনোহর আর কিছু নাই।

সেই সরলতাটুকু চলিয়া গেলে সভ্যতার সমস্ত সৌন্দর্যটুকু চলিয়া যায়। কারণ, স্বাস্থ্য চলিয়া যায়। সরলতাই মনুষ্যপ্রকৃতির স্বাস্থ্য।

যতটুকু আহার করা যায় ততটুকু পরিপাক হইলে শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। মসলা দেওয়া ঘৃতপক্ক সুস্বাদু চর্ব্যচোষ্যলেহ্য পদার্থকে স্বাস্থ্য বলে না।

সমস্ত জ্ঞান ও বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ পরিপাক করিয়া স্বভাবের সহিত একীভূত করিয়া লওয়ার অবস্থাকেই বলে সরলতা, তাহাই মানসিক স্বাস্থ্য। বিবিধ জ্ঞান ও বিচিত্র মতামতকে মনের স্বাস্থ্য বলে না।

এখানকার এই নির্বোধ গ্রাম্য লোকেরা যে-সকল জ্ঞান ও বিশ্বাস লইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করে, সে সমস্তই ইহাদের প্রকৃতির সহিত এক হইয়া মিশিয়া গেছে। যেমন নিশ্বাসপ্রশ্বাস রক্তচলাচল আমাদের হাতে নাই, তেমনি এ-সমস্ত মতামত রাখা না-রাখা তাহাদের হাতে নাই। তাহারা যাহা-কিছু জানে, যাহা-কিছু বিশ্বাস করে, নিতান্তই সহজে জানে ও সহজে বিশ্বাস করে। সেইজন্য তাহাদের জ্ঞানের সহিত, বিশ্বাসের সহিত, কাজের সহিত, মানুষের সহিত এক হইয়া গিয়াছে।

একটা উদাহরণ দিই। অতিথি ঘরে আসিলে ইহারা তাহাকে কিছুতেই ফিরায় না। আন্তরিক ভক্তির সহিত অক্ষুণ্ণমনে তাহার সেবা করে। সেজন্য কোনো ক্ষতিকে ক্ষতি, কোনো ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া তাহাদের মনে উদয় হয় না। আমিও আতিথ্যকে কিয়ৎপরিমাণে ধর্ম বলিয়া জানি; কিন্তু তাহাও জ্ঞানে জানি, বিশ্বাসে জানি না। অতিথি দেখিবামাত্র আমার সমস্ত চিত্তবৃত্তি তৎক্ষণাৎ তৎপর হইয়া আতিথ্যের দিকে ধাবমান হয় না। মনের মধ্যে নানারূপ তর্ক ও বিচার করিয়া থাকি। এ সম্বন্ধে কোনো বিশ্বাস আমার প্রকৃতির সহিত এক হইয়া যায় নাই।

কিন্তু স্বভাবের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য ঐক্যই মনুষ্যত্বের চরম লক্ষ্য। নিম্নতম জীবশ্রেণীর মধ্যে দেখা যায়, তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন করিলেও, তাহাদিগকে দুই-চারি অংশে বিভক্ত করিলেও, কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না; কিন্তু জীবগণ যতই উন্নতিলাভ করিয়াছে ততই তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে।

*

মানবস্বভাবের মধ্যেও জ্ঞান বিশ্বাস ও কার্যের বিচ্ছিন্নতা উন্নতির নিম্নপর্যায়গত। তিনের মধ্যে অভেদ সংযোগই চরম উন্নতি।

কিন্তু যেখানে জ্ঞান বিশ্বাস কার্যের বৈচিত্র্য নাই সেখানে এই ঐক্য অপেক্ষাকৃত সুলভ। ফুলের পক্ষে সুন্দর হওয়া যত সহজ জীবশরীরের পক্ষে তত নহে। জীবদেহের বিবিধকার্যোপযোগী বিচিত্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সমাবেশের মধ্যে তেমন নিখুঁত সম্পূর্ণতা বড়ো দুর্লভ। জন্তুদের অপেক্ষা মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণতা আরও দুর্লভ। মানসিক প্রকৃতি সম্বন্ধেও এ কথা খাটে।

আমার এই ক্ষুদ্র গ্রামের চাষাদের প্রকৃতির মধ্যে যে-একটি ঐক্য দেখা যায় তাহার মধ্যে বৃহত্ত্ব জটিলতা কিছুই নাই। এই ধরাপ্রান্তে ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে সামান্য গুটিকতক অভাব মোচন করিয়া জীবনধারণ করিতে অধিক দর্শন বিজ্ঞান সমাজতত্ত্বের প্রয়োজন হয় না। যে-গুটিকয়েক আদিম পরিবারনীতি গ্রামনীতি এবং প্রজানীতির আবশ্যক, সে-কয়েকটি অতিসহজেই মানুষের জীবনের সহিত মিশিয়া অখণ্ড জীবন্তভাব ধারণ করিতে পারে।

তবু, ক্ষুদ্র হইলেও ইহার মধ্যে যে-একটি সৌন্দর্য আছে তাহা চিত্তকে আকর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারে না, এবং এই সৌন্দর্যটুকু অশিক্ষিত ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্য হইতে পদ্মের ন্যায় উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়া সমস্ত গর্বিত সভ্যসমাজকে একটি আদর্শ দেখাইতেছে। সেইজন্য লণ্ডন-প্যারিসের তুমুল সভ্যতাকোলাহল দূর হইতে সংবাদপত্রযোগে কানে আসিয়া বাজিলেও, আমার গ্রামটি আমার হৃদয়ের মধ্যে অন্য প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে।

আমার নানাচিন্তাবিক্ষিপ্ত চিত্তের কাছে এই ছোটো পল্লীটি তানপুরার সরল সুরের মতো একটি নিত্য আদর্শ উপস্থিত করিয়াছে। সে বলিতেছে— আমি মহৎ নহি, বিস্ময়জনক নহি, কিন্তু আমি ছোটোর মধ্যে সম্পূর্ণ, সুতরাং অন্য সমস্ত অভাব সত্ত্বেও আমার যে-একটি মাধুর্য আছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমি ছোটো বলিয়া তুচ্ছ, কিন্তু সম্পূর্ণ বলিয়া সুন্দর এবং এই সৌন্দর্য তোমাদের জীবনের আদর্শ।

অনেকে আমার কথায় হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না, কিন্তু তবু আমার বলা উচিত, এই মূঢ় চাষাদের সুষমাহীন মুখের মধ্যে আমি একটি সৌন্দর্য অনুভব করি যাহা রমণীর সৌন্দর্যের মতো। আমি নিজেই তাহাতে বিস্মিত হইয়াছি এবং চিন্তা করিয়াছি, এ সৌন্দর্য কিসের! আমার মনে তাহার একটা উত্তরও উদয় হইয়াছে।

যাহার প্রকৃতি কোনো-একটি বিশেষ স্থায়ী ভাবকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহার মুখে সেই ভাব ক্রমশ একটি স্থায়ী লাবণ্য অঙ্কিত করিয়া দেয়।

আমার এই গ্রাম্য লোকসকল জন্মাবধি কতকগুলি স্থির ভাবের প্রতি স্থির দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেই কারণে সেই ভাবগুলি ইহাদের দৃষ্টিতে আপনাকে অঙ্কিত করিয়া দিবার সুদীর্ঘ অবসর পাইয়াছে। সেই জন্য ইহাদের দৃষ্টিতে একটি সকরুণ ধৈর্য, ইহাদের মুখে একটি নির্ভরপরায়ণ বৎসল ভাব, স্থিররূপে প্রকাশ পাইতেছে।

যাহারা সকল বিশ্বাসকেই প্রশ্ন করে এবং নানা বিপরীত ভাবকে পরখ করিয়া দেখে তাহাদের মুখে একটা বুদ্ধির তীব্রতা এবং সন্ধানপরতার পটুত্ব প্রকাশ পায়, কিন্তু ভাবের গভীর স্নিগ্ধ সৌন্দর্য হইতে সে অনেক তফাত।

আমি যে ক্ষুদ্র নদীটিতে নৌকা লইয়া আছি ইহাতে স্রোত নাই বলিলেও হয়, সেইজন্য এই নদী কুমুদে কহ্লারে পদ্মে শৈবালে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে। সেইরূপ একটা স্থায়িত্বের অবলম্বন না পাইলে ভাবসৌন্দর্যও গভীরভাবে বদ্ধমূল হইয়া আপনাকে বিকশিত করিবার অবসর পায় না।

প্রাচীন য়ুরোপ নব্য-আমেরিকার প্রধান অভাব অনুভব করে সেই ভাবের। তাহার ঔজ্জ্বল্য আছে, চাঞ্চল্য আছে, কাঠিন্য আছে, কিন্তু ভাবের গভীরতা নাই। সে বড়োই বেশিমাত্রায় নূতন, তাহাতে ভাব জন্মাইবার সময় পায় নাই। এখনো সে সভ্যতা মানুষের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়া মানুষের হৃদয়ের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া উঠে নাই। সত্য মিথ্যা বলিতে পারি না, এইরূপ তো শুনা যায়, এবং অ্যামেরিকার প্রকৃত সাহিত্যের বিরলতায় এইরূপ অনুমান করাও যাইতে পারে। প্রাচীন য়ুরোপের ছিদ্রে ছিদ্রে কোণে কোণে অনেক শ্যামল পুরাতন ভাব অঙ্কুরিত হইয়া তাহাকে বিচিত্র লাবণ্যে মণ্ডিত করিয়াছে, অ্যামেরিকার সেই লাবণ্যটি নাই। বহু স্মৃতি জনপ্রবাদ বিশ্বাস ও সংস্কারের দ্বারা এখনো তাহাতে মানবজীবনের রঙ ধরিয়া যায় নাই।

আমার এই চাষাদের মুখে অন্তঃপ্রকৃতির সেই রঙ ধরিয়া গেছে! সারল্যের সেই পুরাতন শ্রীটুকু সকলকে দেখাইবার জন্য আমার বড়ো একটি আকাঙ্ক্ষা হইতেছে। কিন্তু সেই শ্রী এতই সুকুমার যে, কেহ যদি বলেন 'দেখিলাম না' এবং কেহ যদি হাস্য করেন তবে তাহা নির্দেশ করিয়া দেওয়া আমার ক্ষমতার অতীত।

এই খবরের কাগজের টুকরাগুলা পড়িতেছি আর আমার মনে হইতেছে যে, বাইবেলে লেখা আছে, যে নম্র সেই পৃথিবীর অধিকার প্রাপ্ত হইবে। আমি যে নম্রতাটুকু এখানে দেখিতেছি ইহার একটি স্বর্গীয় অধিকার আছে। পৃথিবীতে সৌন্দর্যের অপেক্ষা নম্র আর-কিছু নাই— সে বলের দ্বারা কোনো কাজ করিতে চায় না— এক সময় পৃথিবী তাহারই হইবে। এই-যে গ্রামবাসিনী সুন্দরী সরলতা আজ একটি নগরবাসী নবসভ্যতার পোষ্যপুত্রের মন অতর্কিতভাবে হরণ করিয়া লইতেছে,

এক কালে সে এই সমস্ত সভ্যতার রাজরানী হইয়া বসিবে। এখনো হয়তো তার অনেক বিলম্ব আছে। কিন্তু অবশেষে সভ্যতা সরলতার সহিত যদি সম্মিলিত না হয় তবে সে আপনার পরিপূর্ণতার আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি, স্থায়িত্বের উপর ভাবসৌন্দর্যের নির্ভর। পুরাতন স্মৃতির যে সৌন্দর্য তাহা কেবল অপ্রাপ্যতা-নিবন্ধন নহে; হৃদয় বহুকাল তাহার উপর বাস করিতে পায় বলিয়া সহস্র সজীব কল্পনাসূত্র প্রসারিত করিয়া তাহাকে আপনার সহিত একীকৃত করিতে পারে, সেই কারণেই তাহার মাধুর্য। পুরাতন গৃহ, পুরাতন দেবমন্দিরের প্রধান সৌন্দর্যের কারণ এই যে, বহুকালের স্থায়িত্ববশত তাহারা মানুষের সহিত অত্যন্ত সংযুক্ত হইয়া গেছে, তাহারা অবিশ্রাম মানবহৃদয়ের সংস্রবে সর্বাংশে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে— সমাজের সহিত তাহাদের সর্বপ্রকার বিচ্ছেদ দূর হইয়া তাহারা সমাজের অঙ্গ হইয়া গেছে, এই ঐক্যেই তাহাদের সৌন্দর্য। মানবসমাজে স্ত্রীলোক সর্বাপেক্ষা পুরাতন; পুরুষ নানা কার্য নানা অবস্থা নানা পরিবর্তনের মধ্যে সর্বদাই চঞ্চলভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে; স্ত্রীলোক স্থায়িভাবে কেবলই জননী এবং পত্নীরূপে বিরাজ করিতেছে, কোনো বিপ্লবেই তাহাকে বিক্ষিপ্ত করে নাই; এইজন্য সমাজের মর্মের মধ্যে নারী এমন সুন্দররূপে সংহতরূপে মিশ্রিত হইয়া গেছে; কেবল তাহাই নহে, সেইজন্য সে তাহার ভাবের সহিত, কাজের সহিত, শক্তির সহিত, সবসুদ্ধ এমন সম্পূর্ণ এক হইয়া গেছে— এই দুর্লভ সর্বাঙ্গীণ ঐক্য লাভ করিবার জন্য তাহার দীর্ঘ অবসর ছিল।

সেইরূপ যখন দীর্ঘকালের স্থায়িত্ব আশ্রয় করিয়া তর্ক যুক্তি জ্ঞান ক্রমশ সংস্কারে বিশ্বাসে আসিয়া পরিণত হয় তখনই তাহার সৌন্দর্য ফুটিতে থাকে। তখন সে স্থির হইয়া দাঁড়ায় এবং ভিতরে যে-সকল জীবনের বীজ থাকে সেইগুলি মানুষের বহুদিনের আনন্দালোকে ও অশ্রুজলবর্ষণে অঙ্কুরিত হইয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

য়ুরোপে সম্প্রতি যে এক নব সভ্যতার যুগ আবির্ভূত হইয়াছে এ যুগে ক্রমাগতই নব নব জ্ঞানবিজ্ঞান মতামত স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে; যন্ত্রতন্ত্র উপকরণসামগ্রীতেও একেবারে স্থানাভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবিশ্রাম চাঞ্চল্যে কিছুই পুরাতন হইতে পাইতেছে না।

কিন্তু দেখিতেছি এই সমস্ত আয়োজনের মধ্যে মানবহৃদয় কেবলই ক্রন্দন করিতেছে, য়ুরোপের সাহিত্য হইতে সহজ আনন্দ সরল শান্তির গান একেবারে নির্বাসিত হইয়া গিয়াছে।— হয় প্রমোদের মাদকতা, নয় নৈরাশ্যের বিলাপ, নয় বিদ্রোহের অট্টহাস্য।

তাহার কারণ, মানবহৃদয় যতক্ষণ এই বিপুল সভ্যতাস্তূপের মধ্যে একটি সুন্দর ঐক্য স্থাপন করিতে না পারিবে ততক্ষণ কখনোই ইহার মধ্যে আরামে ঘরকন্না পাতিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। ততক্ষণ সে কেবল অস্থির অশান্ত হইয়া বেড়াইবে। আর-সমস্তই জড়ো হইয়াছে, কেবল এখনো স্থায়ী সৌন্দর্য— এখনো নব সভ্যতার রাজলক্ষ্মী— আসিয়া দাঁড়ান নাই। জ্ঞান বিশ্বাস ও কার্য পরস্পরকে কেবলই পীড়ন করিতেছে— ঐক্যলাভের জন্য নহে, জয়লাভের জন্য পরস্পরের মধ্যে সংগ্রাম বাধিয়া গিয়াছে।

কেবল যে প্রাচীন স্মৃতির মধ্যে সৌন্দর্য তাহা নহে, নবীন আশার মধ্যেও সৌন্দর্য; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে য়ুরোপের নূতন সভ্যতার মধ্যে এখনো আশার সঞ্চার হয় নাই। বৃদ্ধ য়ুরোপ অনেকবার অনেক আশায় প্রতারিত হইয়াছে; যে-সকল উপায়ের উপর তাহার বড়ো বিশ্বাস ছিল সে-সমস্ত একে একে ব্যর্থ হইতে দেখিয়াছে। ফরাসি বিপ্লবকে একটা বৃহৎ চেষ্টার বৃথা পরিণাম বলিয়া অনেকে মনে করে। এক সময় লোকে মনে করিয়াছিল আপামর সাধারণকে ভোট দিতে দিলেই পৃথিবীর অধিকাংশ অমঙ্গল দূর হইবে— এখন সকলে ভোট দিতেছে, অথচ অধিকাংশ অমঙ্গল বিদায় লইবার জন্য কোনোরূপ ব্যস্ততা দেখাইতেছে না। কখনো বা লোকে আশা করিয়াছিল স্টেটের দ্বারা মানুষের সকল দুর্দশা মোচন হইতে পারে, এখন আবার পণ্ডিতেরা আশঙ্কা করিতেছেন স্টেটের দ্বারা দুর্দশামোচনের চেষ্টা করিলে হিতে বিপরীত হইবারই সম্ভাবনা। কয়লার খনি, কাপড়ের কল এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রের উপর কাহারও কাহারও কিছু কিছু বিশ্বাস হয়, কিন্তু তাহাতেও দ্বিধা ঘোচে না; অনেক বড়ো বড়ো লোক বলিতেছেন কলের দ্বারা মানুষের পূর্ণতা-সাধন হয় না। আধুনিক য়ুরোপ বলে— আশা করিয়ো না, বিশ্বাস করিয়ো না, কেবল পরীক্ষা করো।

নবীনা সভ্যতা যেন এক বৃদ্ধ পতিকে বিবাহ করিয়াছে, তাহার সমৃদ্ধি আছে, কিন্তু যৌবন নাই; সে আপনার সহস্র পূর্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা জীর্ণ। উভয়ের মধ্যে ভালোরূপ প্রণয় হইতেছে না, গৃহের মধ্যে কেবল অশান্তি।

এই-সমস্ত আলোচনা করিয়া আমি এই পল্লীর ক্ষুদ্র সম্পূর্ণতার সৌন্দর্য দ্বিগুণ আনন্দে সম্ভোগ করিতেছি।

তাই বলিয়া আমি এমন অন্ধ নহি যে, য়ুরোপীয় সভ্যতার মর্যাদা বুঝি না। প্রভেদের মধ্যে ঐক্যই ঐক্যের পূর্ণ আদর্শ, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই সৌন্দর্যের প্রধান কারণ। সম্প্রতি য়ুরোপে সেই প্রভেদের যুগ পড়িয়াছে, তাই বিচ্ছেদ, বৈষম্য। যখন ঐক্যের যুগ আসিবে তখন এই বৃহৎ স্তূপের মধ্যে অনেক ঝরিয়া গিয়া, পরিপাক

প্রাপ্ত হইয়া, একখানি সমগ্র সুন্দর সভ্যতা দাঁড়াইয়া যাইবে। ক্ষুদ্র পরিণামের মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়া সন্তুষ্টভাবে থাকার মধ্যে একটি শান্তি সৌন্দর্য ও নির্ভয়তা আছে সন্দেহ নাই— আর, যাহারা মনুষ্যপ্রকৃতিকে ক্ষুদ্র ঐক্য হইতে মুক্তি দিয়া বিপুল বিস্তারের দিকে লইয়া যায় তাহারা অনেক অশান্তি অনেক বিঘ্নবিপদ সহ্য করে, বিপ্লবের রণক্ষেত্রের মধ্যে তাহাদিগকে অশ্রান্ত সংগ্রাম করিতে হয়, কিন্তু তাহারাই পৃথিবীর মধ্যে বীর এবং তাহারা যুদ্ধে পতিত হইলেও অক্ষয় স্বর্গ লাভ করে। এই বীর্য এবং সৌন্দর্যের মিলনেই যথার্থ সম্পূর্ণতা। উভয়ের বিচ্ছেদে অর্ধসভ্যতা। তথাপি আমরা সাহস করিয়া য়ুরোপকে অর্ধসভ্য বলি না, বলিলেও কাহারও গায়ে বাজে না। য়ুরোপ আমাদিগকে অর্ধসভ্য বলে এবং বলিলে আমাদের গায়ে বাজে, কারণ সে আমাদের কর্ণধার হইয়া বসিয়াছে।

আমি এই পল্লীপ্রান্তে বসিয়া আমার সাদাসিধা তানপুরার চারটি তারের গুটি-চারেক সুন্দর স্বরসম্মিশ্রণের সহিত মিলাইয়া য়ুরোপীয় সভ্যতাকে বলিতেছি 'তোমার সুর এখনো ঠিক মিলিল না' এবং তানপুরাটিকেও বলিতে হয়, 'তোমার ঐ গুটিকয়েক সুরের পুনঃপুন ঝংকারকেও পরিপূর্ণ সংগীত জ্ঞান করিয়া সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। বরঞ্চ আজিকার ঐ বিচিত্র বিশৃঙ্খল স্বরসমষ্টি কাল প্রতিভার প্রভাবে মহাসংগীতে পরিণত হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু হায়, তোমার ঐ কয়েকটি তারের মধ্য হইতে মহৎ মূর্তিমান সংগীত বাহির করা প্রতিভার পক্ষেও দুঃসাধ্য।'

আশ্বিন-কার্তিক ১৩০০

মনুষ্য

স্রোতস্বিনী প্রাতঃকালে আমার বৃহৎ খাতাটি হাতে করিয়া আনিয়া কহিল— এ সব তুমি কী লিখিয়াছ! আমি যে-সকল কথা কস্মিনকালে বলি নাই তুমি আমার মুখে কেন বসাইয়াছ?

আমি কহিলাম— তাহাতে দোষ কী হইয়াছে?

স্রোতস্বিনী কহিল— এমন করিয়া আমি কখনো কথা কহি না এবং কহিতে পারি না। যদি তুমি আমার মুখে এমন কথা দিতে, যাহা আমি বলি বা না বলি আমার পক্ষে বলা সম্ভব, তাহা হইলে আমি এমন লজ্জিত হইতাম না। কিন্তু এ যেন তুমি একখানা বই লিখিয়া আমার নামে চালাইতেছ।

আমি কহিলাম— তুমি আমাদের কাছে কতটা বলিয়াছ তাহা তুমি কী করিয়া বুঝিবে। তুমি যতটা বল, তাহার সহিত, তোমাকে যতটা জানি, দুই মিশিয়া অনেকখানি হইয়া উঠে। তোমার সমস্ত জীবনের দ্বারা তোমার কথাগুলি ভরিয়া উঠে। তোমার সেই অব্যক্ত উহ্য কথাগুলি তো বাদ দিতে পারি না।

স্রোতস্বিনী চুপ করিয়া রহিল। জানি না, বুঝিল কি না-বুঝিল। বোধ হয় বুঝিল, কিন্তু তথাপি আবার কহিলাম— তুমি জীবন্ত বর্তমান, প্রতিক্ষণে নব নব ভাবে আপনাকে ব্যক্ত করিতেছ— তুমি যে আছ, তুমি যে সত্য, তুমি যে সুন্দর, এ বিশ্বাস উদ্রেক করিবার জন্য তোমাকে কোনো চেষ্টাই করিতে হইতেছে না। কিন্তু লেখায় সেই প্রথম সত্যটুকু প্রমাণ করিবার জন্য অনেক উপায় অবলম্বন এবং অনেক বাক্য ব্যয় করিতে হয়। নতুবা প্রত্যক্ষের সহিত অপ্রত্যক্ষ সমকক্ষতা রক্ষা করিতে পারিবে কেন? তুমি যে মনে করিতেছ আমি তোমাকে বেশি বলাইয়াছি তাহা ঠিক নহে, আমি বরং তোমাকে সংক্ষেপ করিয়া লইয়াছি— তোমার লক্ষ লক্ষ কথা, লক্ষ লক্ষ কাজ, চিরবিচিত্র আকার-ইঙ্গিতের কেবলমাত্র সারসংগ্রহ করিয়া লইতে হইয়াছে। নহিলে তুমি যে কথাটি আমার কাছে বলিয়াছ ঠিক সেই কথাটি আমি আর-কাহারও কর্ণগোচর করাইতে পারিতাম না, লোকে ঢের কম শুনিত এবং ভুল শুনিত।

স্রোতস্বিনী দক্ষিণ পার্শ্বে ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া একটা বহি খুলিয়া তাহার পাতা উলটাইতে উলটাইতে কহিল— তুমি আমাকে স্নেহ কর বলিয়া আমাকে যতখানি দেখ আমি তো বাস্তবিক ততখানি নহি।

আমি কহিলাম— আমার কি এত স্নেহ আছে যে, তুমি বাস্তবিক যতখানি আমি তোমাকে ততখানি দেখিতে পাইব? একটি মানুষের সমস্ত কে ইয়ত্তা করিতে পারে? ঈশ্বরের মতো কাহার স্নেহ?

ক্ষিতি তো একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল, কহিল— এ আবার তুমি কী কথা তুলিলে! স্রোতস্বিনী তোমাকে এক ভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আর-এক ভাবে তাহার উত্তর দিলে।

আমি কহিলাম— জানি। কিন্তু কথাবার্তায় এমন অসংলগ্ন উত্তর-প্রত্যুত্তর হইয়া থাকে। মন এমন একপ্রকার দাহ্য পদার্থ যে, ঠিক যেখানে প্রশ্নস্ফুলিঙ্গ পড়িল সেখানে কিছু না হইয়া হয়তো দশ হাত দূরে আর-এক জায়গায় দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। নির্বাচিত কমিটিতে বাহিরের লোকের প্রবেশ নিষেধ, কিন্তু বৃহৎ উৎসবের স্থলে যে আসে তাহাকেই ডাকিয়া বসানো যায়। আমাদের কথোপকথন-সভা সেই উৎসব-সভা; সেখানে যদি একটা অসংলগ্ন কথা অনাহূত আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ

তাহাকে 'আসুন মশায়, বসুন' বলিয়া আহ্বান করিয়া হাস্যমুখে তাহার পরিচয় না লইলে উৎসবের উদারতা দূর হয়।

ক্ষিতি কহিল— ঘাট হইয়াছে! তবে তাই করো, কী বলিতেছিলে বলো। ক উচ্চারণমাত্র কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া প্রহ্লাদ কাঁদিয়া উঠে, তাহার আর বর্ণমালা শেখা হয় না। একটা প্রশ্ন শুনিবামাত্র যদি আর-একটা উত্তর তোমার মনে ওঠে তবে তো কোনো কথাই এক পা অগ্রসর হয় না। কিন্তু প্রহ্লাদজাতীয় লোককে নিজের খেয়াল অনুসারে চলিতে দেওয়াই ভালো, যাহা মনে আসে বলো।

আমি কহিলাম— আমি বলিতেছিলাম, যাহাকে আমরা ভালোবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন-কি, জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালোবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য-সম্ভোগ। ইহা হইতে মনে পড়িল, সমস্ত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে।

ক্ষিতি মনে মনে ভাবিল— কী সর্বনাশ! আবার তত্ত্বকথা কোথা হইতে আসিয়া পড়িল! স্রোতস্বিনী এবং দীপ্তিও যে তত্ত্বকথা শুনিবার জন্য অতিশয় লালায়িত তাহা নহে— কিন্তু একটা কথা যখন মনের অন্ধকারের ভিতর হইতে হঠাৎ লাফাইয়া ওঠে তখন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শেষ পর্যন্ত ধাবিত হওয়া ভাব-শিকারীর একটা চিরাভ্যস্ত কাজ। নিজের কথা নিজে আয়ত্ত করিবার জন্য বকিয়া যাই, লোকে মনে করে আমি অন্যকে তত্ত্বোপদেশ দিতে বসিয়াছি।

আমি কহিলাম— বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম এবং প্রিয়তমা পরস্পরের নিকটে আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন এই-সমস্ত পরম প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করিয়াছে।

ক্ষিতি কহিল— সীমার মধ্যে অসীম, প্রেমের মধ্যে অনন্ত, এ সব কথা যতই বেশি শুনি ততই বেশি দুর্বোধ হইয়া পড়ে। প্রথম প্রথম মনে হইত যেন কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি বা, এখন দেখিতেছি অনন্ত অসীম প্রভৃতি শব্দগুলা স্তূপাকার হইয়া বুঝিবার পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমি কহিলাম— ভাষা ভূমির মতো। তাহাতে একই শস্য ক্রমাগত বপন করিলে তাহার উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। 'অনন্ত' এবং 'অসীম' শব্দদুটা আজকাল সর্বদা ব্যবহারে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, এই জন্য যথার্থ ই একটা কথা বলিবার না থাকিলে ও দুটা শব্দ ব্যবহার করা উচিত হয় না। মাতৃভাষার প্রতি একটু দয়ামায়া করা কর্তব্য।

ক্ষিতি কহিল— ভাষার প্রতি তোমার তো যথেষ্ট সদয় আচরণ দেখা যাইতেছে না।

সমীর এতক্ষণ আমার খাতাটি পড়িতেছিল, শেষ করিয়া কহিল— এ কী করিয়াছ! তোমার ডায়ারির এই লোকগুলা কি মানুষ না যথার্থ ই ভূত? ইহারা দেখিতেছি কেবল বড়ো বড়ো ভালো ভালো কথাই বলে, কিন্তু ইহাদের আকার-আয়তন কোথায় গেল?

আমি বিষণ্ণমুখে কহিলাম— কেন বলো দেখি।

সমীর কহিল— তুমি মনে করিয়াছ, আম্রের অপেক্ষা আমসত্ত্ব ভালো, তাহাতে সমস্ত আঁঠি আঁশ আবরণ এবং জলীয় অংশ পরিহার করা যায়— কিন্তু তাহার সেই লোভন গন্ধ, সেই শোভন আকার কোথায়? তুমি কেবল আমার সারটুকু লোককে দিবে, আমার মানুষটুকু কোথায় গেল? আমার বেবাক বাজে কথাগুলো তুমি বাজেয়াপ্ত করিয়া যে-একটি নিরেট মূর্তি দাঁড় করাইয়াছ তাহাতে দন্তস্ফুট করা দুঃসাধ্য। আমি কেবল দুই-চারিটি চিন্তাশীল লোকের কাছে বাহবা পাইতে চাহি না, আমি সাধারণ লোকের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে চাহি।

আমি কহিলাম— সে জন্য কী করিতে হইবে?

সমীর কহিল— সে আমি কী জানি। আমি কেবল আপত্তি জানাইয়া রাখিলাম। আমার যেমন সার আছে তেমনি আমার স্বাদ আছে; সারাংশ মানুষের পক্ষে আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু স্বাদ মানুষের নিকট প্রিয়। আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া মানুষ কতকগুলো মত কিম্বা তর্ক আহরণ করিবে এমন ইচ্ছা করি না, আমি চাই মানুষ আমাকে আপনার লোক বলিয়া চিনিয়া লইবে। এই ভ্রমসংকুল সাধের মানবজন্ম ত্যাগ করিয়া একটা মাসিক পত্রের নির্ভুল প্রবন্ধ-আকারে জন্মগ্রহণ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। আমি দার্শনিক তত্ত্ব নই, আমি ছাপার বই নই, আমি তর্কের সুযুক্তি অথবা কুযুক্তি নই, আমার বন্ধুরা আমার আত্মীয়েরা আমাকে সর্বদা যাহা বলিয়া জানেন আমি তাহাই।

ব্যোম এতক্ষণ একটা চৌকিতে ঠেসান দিয়া আর-একটা চৌকির উপর পা-দুটা

তুলিয়া অটল প্রশান্ত ভাবে বসিয়াছিল। সে হঠাৎ বলিল— তর্ক বলো, তত্ত্ব বলো, সিদ্ধান্ত এবং উপসংহারেই তাহাদের চরম গতি; সমাপ্তিতেই তাহাদের প্রধান গৌরব। কিন্তু মানুষ স্বতন্ত্রজাতীয় পদার্থ— অমরতা অসমাপ্তিই তাহার সর্বপ্রধান যাথার্থ্য। বিশ্রামহীন গতিই তাহার প্রধান লক্ষণ। অমরতা কে সংক্ষেপ করিবে? গতির সারাংশ কে দিতে পারে? ভালো ভালো পাকা কথাগুলি যদি অতি অনায়াস-ভাবে মানুষের মুখে বসাইয়া দাও, তবে ভ্রম হয় তাহার মনের যেন একটা গতিবৃদ্ধি নাই— তাহার যতদূর হইবার শেষ হইয়া গেছে। চেষ্টা ভ্রম অসম্পূর্ণতা পুনরুক্তি যদিও আপাতত দারিদ্র্যের মতো দেখিতে হয়, কিন্তু মানুষের প্রধান ঐশ্বর্য তাহার দ্বারাই প্রমাণ হয়। তাহার দ্বারা চিন্তার একটা গতি, একটা জীবন, নির্দেশ করিয়া দেয়। মানুষের কথাবার্তা চরিত্রের মধ্যে কাঁচা রঙটুকু, অসমাপ্তির কোমলতা দুর্বলতা-টুকু, না রাখিয়া দিলে তাহাকে একেবারে সাঙ্গ করিয়া ছোটো করিয়া ফেলা হয়। তাহার অনন্ত পর্বের পালা একেবারে সূচীপত্রেই সারিয়া দেওয়া হয়।

সমীর কহিল— মানুষের ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা অতিশয় অল্প; এইজন্য প্রকাশের সঙ্গে নির্দেশ, ভাষার সঙ্গে ভঙ্গী, ভাবের সহিত ভাবনা যোগ করিয়া দিতে হয়। কেবল রথ নহে, রথের মধ্যে তাহার গতি সঞ্চারিত করিয়া দিতে হয়। যদি একটা মানুষকে উপস্থিত কর তাহাকে খাড়া দাঁড় করাইয়া কতকগুলি কলে-ছাঁটা কথা কহাইয়া গেলেই হইবে না, তাহাকে চালাইতে হইবে, তাহাকে স্থান পরিবর্তন করাইতে হইবে, তাহার অত্যন্ত বৃহত্ত্ব বুঝাইবার জন্য তাহাকে অসমাপ্তভাবেই দেখাইতে হইবে।

আমি কহিলাম— সেইটাই তো কঠিন। কথা শেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে এখনো শেষ হয় নাই, কথার মধ্যে সেই উদ্যত ভঙ্গিটি দেওয়া বিষম ব্যাপার।

স্রোতস্বিনী কহিল— এইজন্যই সাহিত্যে বহুকাল ধরিয়া একটা তর্ক চলিয়া আসিতেছে যে, বলিবার বিষয়টা বেশি না বলিবার ভঙ্গিটা বেশি। আমি এ কথাটা লইয়া অনেকবার ভাবিয়াছি, ভালো বুঝিতে পারি না। আমার মনে হয় তর্কের খেয়াল অনুসারে যখন যেটাকে প্রাধান্য দেওয়া যায় তখন সেইটাই প্রধান হইয়া উঠে।

ব্যোম মাথাটা কড়িকাঠের দিকে তুলিয়া বলিতে লাগিল— সাহিত্যে বিষয়টা শ্রেষ্ঠ না ভঙ্গিটা শ্রেষ্ঠ ইহা বিচার করিতে হইলে আমি দেখি, কোন্‌টা অধিক রহস্যময়। বিষয়টা দেহ, ভঙ্গিটা জীবন। দেহটা বর্তমানেই সমাপ্ত; জীবনটা একটা চঞ্চল অসমাপ্তি তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে, তাহাকে বৃহৎ ভবিষ্যতের দিকে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে, সে যতখানি দৃশ্যমান তাহা অতিক্রম করিয়াও তাহার সহিত অনেকখানি আশাপূর্ণ নব নব সম্ভাবনা জুড়িয়া রাখিয়াছে। যতটুকু বিষয়রূপে

প্রকাশ করিলে ততটুকু জড় দেহ মাত্র, ততটুকু সীমাবদ্ধ; যতটুকু ভঙ্গির দ্বারা তাহার মধ্যে সঞ্চার করিয়া দিলে তাহাই জীবন, তাহাতেই তাহার বুদ্ধিশক্তি, তাহার চলৎশক্তি সূচনা করিয়া দেয়।

সমীর কহিল— সাহিত্যের বিষয়মাত্রই অতি পুরাতন, আকার গ্রহণ করিয়া সে নূতন হইয়া উঠে।

স্রোতস্বিনী কহিল— আমার মনে হয় মানুষের পক্ষেও ঐ একই কথা। এক-এক জন মানুষ এমন একটি মনের আকৃতি লইয়া প্রকাশ পায় যে, তাহার দিকে চাহিয়া আমরা পুরাতন মনুষ্যত্বের যেন একটা নূতন বিস্তার আবিষ্কার করি।

দীপ্তি কহিল— মনের এবং চরিত্রের সেই আকৃতিটাই আমাদের স্টাইল। সেইটের দ্বারাই আমরা পরস্পরের নিকট প্রচলিত পরিচিত পরীক্ষিত হইতেছি। আমি এক-একবার ভাবি আমার স্টাইলটা কী রকমের। সমালোচকেরা যাহাকে প্রাঞ্জল বলে তাহা নহে—

সমীর কহিল— কিন্তু ওজস্বী বটে। তুমি যে আকৃতির কথা কহিলে, যেটা বিশেষ-রূপে আমাদের আপনার, আমিও তাহারই কথা বলিতেছিলাম। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে চেহারাখানা যাহাতে বজায় থাকে আমি সেই অনুরোধ করিতেছিলাম।

দীপ্তি ঈষৎ হাসিয়া কহিল— কিন্তু চেহারা সকলের সমান নহে, অতএব অনুরোধ করিবার পূর্বে বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক। কোনো চেহারায় বা প্রকাশ করে, কোনো চেহারায় বা গোপন করে। হীরকের জ্যোতি হীরকের মধ্যে স্বতই প্রকাশমান, তাহার আলো বাহির করিবার জন্য তাহার চেহারা ভাঙিয়া ফেলিতে হয় না, কিন্তু তৃণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলে তবেই তাহার আলোকটুকু বাহির হয়। আমাদের মতো ক্ষুদ্র প্রাণীর মুখে এ বিলাপ শোভা পায় না যে, সাহিত্যে আমাদের চেহারা বজায় থাকিতেছে না। কেহ কেহ আছে কেবল যাহার অস্তিত্ব, যাহার প্রকৃতি, যাহার সমগ্র সমষ্টি আমাদের কাছে একটি নূতন শিক্ষা, নূতন আনন্দ। সে যেমনটি তাহাকে তেমনি অবিকল রক্ষা করিতে পারিলেই যথেষ্ট। কেহ বা আছে যাহাকে ছাড়াইয়া ফেলিয়া ভিতর হইতে শাঁস বাহির করিতে হয়। শাঁসটুকু যদি বাহির হয় তবে সেইজন্যই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কারণ, তাহাই বা কয় জন লোকের আছে এবং কয় জন বাহির করিয়া দিতে পারে।

সমীর হাস্যমুখে কহিল— মাপ করিবেন দীপ্তি, আমি যে তৃণ এমন দীনতা আমি কখনও স্বপ্নেও অনুভব করি না। বরঞ্চ অনেক সময় ভিতর দিকে চাহিলে আপনাকে খনির হীরক বলিয়া অনুমান হয়। এখন কেবল চিনিয়া লইতে পারে এমন একটা

জহরির প্রত্যাশায় বসিয়া আছি। ক্রমে যত দিন যাইতেছে তত আমার বিশ্বাস হইতেছে— পৃথিবীতে জহরের তত অভাব নাই যত জহরির। তরুণ বয়সে সংসারে মানুষ চোখে পড়িত না, মনে হইত যথার্থ মানুষগুলা উপন্যাস নাটক এবং মহাকাব্যেই আশ্রয় লইয়াছে, সংসারে কেবল একটিমাত্র অবশিষ্ট আছে। এখন দেখিতে পাই লোকালয়ে মানুষ ঢের আছে, কিন্তু 'ভোলা মন, ও ভোলা মন, মানুষ কেন চিনলি না!' ভোলা মন, এই সংসারের মাঝখানে একবার প্রবেশ করিয়া দেখ্, এই মানব-হৃদয়ের ভিড়ের মধ্যে। সভাস্থলে যাহারা কথা কহিতে পারে না সেখানে তাহারা কথা কহিবে; লোকসমাজে যাহারা এক প্রান্তে উপেক্ষিত হয় সেখানে তাহাদের এক নূতন গৌরব প্রকাশিত হইবে; পৃথিবীতে যাহাদিগকে অনাবশ্যক বোধ হয় সেখানে দেখিব তাহাদেরই সরল প্রেম, অবিশ্রাম সেবা, আত্মবিস্মৃত আত্মবিসর্জনের উপরে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জুন মহাকাব্যের নায়ক, কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুরুক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজাতি আছে, সেই আত্মীয়তা কোন্ নবদ্বৈপায়ন আবিষ্কার করিবে এবং প্রকাশ করিবে!

আমি কহিলাম— না করিলে কী এমন আসে যায়! মানুষ পরস্পরকে না যদি চিনিবে তবে পরস্পরকে এত ভালোবাসে কী করিয়া? একটি যুবক তাহার জন্মস্থান ও আত্মীয়বর্গ হইতে বহু দূরে দু-দশ টাকা বেতনে ঠিকা মুহুরিগিরি করিত। আমি তাহার প্রভু ছিলাম, কিন্তু প্রায় তাহার অস্তিত্বও অবগত ছিলাম না, সে এত সামান্য লোক ছিল। একদিন রাত্রে সহসা তাহার ওলাউঠা হইল। আমার শয়নগৃহ হইতে শুনিতে পাইলাম সে 'পিসিমা' 'পিসিমা' করিয়া কাতরস্বরে কাঁদিতেছে। তখন সহসা তাহার গৌরবহীন ক্ষুদ্র জীবনটি আমার নিকট কতখানি বৃহৎ হইয়া দেখা দিল। সেই-যে একটি অজ্ঞাত অখ্যাত মূর্খ নির্বোধ লোক বসিয়া বসিয়া ঈষৎ গ্রীবা হেলাইয়া কলম খাড়া করিয়া ধরিয়া একমনে নকল করিয়া যাইত, তাহাকে তাহার পিসিমা আপন নিঃসন্তান বৈধব্যের সমস্ত সঞ্চিত স্নেহরাশি দিয়া মানুষ করিয়াছেন। সন্ধ্যাবেলায় শ্রান্তদেহে শূন্য বাসায় ফিরিয়া যখন সে স্বহস্তে উনান ধরাইয়া পাক চড়াইত, যতক্ষণ অন্ন টগ্‌বগ্ করিয়া না ফুটিয়া উঠিত, ততক্ষণ কম্পিত অগ্নিশিখার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া সে কি সেই দূরকুটিরবাসিনী স্নেহশালিনী কল্যাণময়ী পিসিমার কথা ভাবিত না? একদিন যে তাহার নকলে ভুল হইল, ঠিকে মিল হইল না, তাহার উচ্চতন কর্মচারীর নিকট সে লাঞ্ছিত হইল, সেদিন কি সকালের চিঠিতে তাহার পিসিমার পীড়ার সংবাদ পায় নাই? এই নগণ্য লোকটার প্রতিদিনের মঙ্গলবার্তার জন্য একটি স্নেহপরিপূর্ণ পবিত্র হৃদয়ে কি সামান্য উৎকণ্ঠা ছিল! এই

দরিদ্র যুবকের প্রবাসবাসের সহিত কি কম করুণা কাতরতা উদ্‌বেগ জড়িত হইয়া ছিল! সহসা সেই রাত্রে এই নির্বাণপ্রায় ক্ষুদ্র প্রাণশিখা এক অমূল্য মহিমায় আমার নিকটে দীপ্যমান হইয়া উঠিল। বুঝিতে পরিলাম, এই তুচ্ছ লোকটিকে যদি কোনো মতে বাঁচাইতে পারি তবে এক বৃহৎ কাজ করা হয়। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহার সেবাশুশ্রূষা করিলাম, কিন্তু পিসিমার ধনকে পিসিমার নিকট ফিরাইয়া দিতে পারিলাম না— আমার সেই ঠিকা মুহুরির মৃত্যু হইল। ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জুন খুব মহৎ, তথাপি এই লোকটিরও মূল্য অল্প নহে। তাহার মূল্য কোনো কবি অনুমান করে নাই, কোনো পাঠক স্বীকার করে নাই, তাই বলিয়া সে মূল্য পৃথিবীতে অনাবিষ্কৃত ছিল না— একটি জীবন আপনাকে তাহার জন্য একান্ত উৎসর্গ করিয়াছিল— কিন্তু খোরাক-পোশাক সমেত লোকটার বেতন ছিল আট টাকা, তাহাও বারো মাস নহে। মহত্ত্ব আপনার জ্যোতিতে আপনি প্রকাশিত হইয়া উঠে, আর আমাদের মতো দীপ্তিহীন ছোটো ছোটো লোকদিগকে বাহিরের প্রেমের আলোকে প্রকাশ করিতে হয়; পিসিমার ভালোবাসা দিয়া দেখিলে আমরা সহসা দীপ্যমান হইয়া উঠি। যেখানে অন্ধকারে কাহাকেও দেখা যাইতেছিল না, সেখানে প্রেমের আলোক ফেলিলে সহসা দেখা যায়— মানুষে পরিপূর্ণ।

স্রোতস্বিনী দয়াস্নিগ্ধ মুখে কহিল— তোমার ঐ বিদেশী মুহুরির কথা তোমার কাছে পূর্বে শুনিয়াছি। জানি না, উহার কথা শুনিয়া কেন আমাদের হিন্দুস্থানি বেহারা নিহরকে মনে পড়ে। সম্প্রতি দুটি শিশুসন্তান রাখিয়া তাহার স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে। এখন সে কাজকর্ম করে, দুপরবেলা বসিয়া পাখা টানে, কিন্তু এমন শুষ্ক শীর্ণ ভগ্ন লক্ষ্মীছাড়ার মতো হইয়া গেছে! তাহাকে যখনই দেখি কষ্ট হয়, কিন্তু সে কষ্ট যেন ইহার একলার জন্য নহে— আমি ঠিক বুঝাইতে পারি না, কিন্তু মনে হয় যেন সমস্ত মানবের জন্য একটা বেদনা অনুভূত হইতে থাকে।

আমি কহিলাম— তাহার কারণ উহার যে ব্যথা সমস্ত মানবের সেই ব্যথা। সমস্ত মানুষই ভালোবাসে এবং বিরহ বিচ্ছেদ মৃত্যুর দ্বারা পীড়িত ও ভীত। তোমার ঐ পাখাওয়ালা ভৃত্যের আনন্দহারা বিষণ্ণ মুখে সমস্ত পৃথিবীবাসী মানুষের বিষাদ অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

স্রোতস্বিনী কহিল— কেবল তাহাই নয়। মনে হয়, পৃথিবীতে যত দুঃখ তত দয়া কোথায় আছে! কত দুঃখ আছে যেখানে মানুষের সান্ত্বনা কোনোকালে প্রবেশও করে না, অথচ কত জায়গা আছে যেখানে ভালোবাসার অনাবশ্যক অতিবৃষ্টি হইয়া যায়! যখন দেখি আমার ঐ বেহারা ধৈর্যসহকারে মূকভাবে পাখা টানিয়া যাইতেছে,

ছেলেছুটো উঠানে গড়াইতেছে, পড়িয়া গিয়া চীৎকারপূর্বক কাঁদিয়া উঠিতেছে, বাপ মুখ ফিরাইয়া কারণ জানিবার চেষ্টা করিতেছে, পাখা ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতে পারিতেছে না— জীবনে আনন্দ অল্প, অথচ পেটের জ্বালা কম নহে, জীবনে যতবড়ো দুর্ঘটনাই ঘটুক দুই মুষ্টি অন্নের জন্য নিয়মিত কাজ চালাইতেই হইবে, কোনো ত্রুটি হইলে কেহ মাপ করিবে না— যখন ভাবিয়া দেখি এমন অসংখ্য লোক আছে যাহাদের দুঃখকষ্ট যাহাদের মনুষ্যত্ব আমাদের কাছে যেন অনাবিষ্কৃত, যাহাদিগকে আমরা কেবল ব্যবহারে লাগাই এবং বেতন দিই, স্নেহ দিই না, সান্ত্বনা দিই না, শ্রদ্ধা দিই না— তখন বাস্তবিকই মনে হয় পৃথিবীর অনেকখানি যেন নিবিড় অন্ধকারে আবৃত, আমাদের দৃষ্টির একেবারে অগোচর। কিন্তু সেই অজ্ঞাতনামা দীপ্তিহীন দেশের লোকেরাও ভালোবাসে এবং ভালোবাসার যোগ্য! আমার মনে হয়, যাহাদের মহিমা নাই, যাহারা একটা অস্বচ্ছ আবরণের মধ্যে বদ্ধ হইয়া আপনাকে ভালোরূপ ব্যক্ত করিতে পারে না, এমন-কি নিজেকেও ভালোরূপ চেনে না, মূকমুগ্ধ-ভাবে সুখদুঃখবেদনা সহ্য করে, তাহাদিগকে মানবরূপে প্রকাশ করা, তাহাদিগকে আমাদের আত্মীয়রূপে পরিচিত করাইয়া দেওয়া, তাহাদের উপরে কাব্যের আলো নিক্ষেপ করা, আমাদের এখনকার কবিদের কর্তব্য।

ক্ষিতি কহিল— পূর্বকালে এক সময়ে সকল বিষয়ে প্রবলতার আদর কিছু অধিক ছিল। তখন মনুষ্যসমাজ অনেকটা অসহায় অরক্ষিত ছিল; যে প্রতিভাশালী, যে ক্ষমতাশালী, সেই তখনকার সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া লইত। এখন সভ্যতার সুশাসনে সুশৃঙ্খলায় বিঘ্নবিপদ দূর হইয়া প্রবলতার অত্যধিক মর্যাদা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। এখন অকৃতী অক্ষমেরাও সংসারের খুব একটা বৃহৎ অংশের শরিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখনকার কাব্য-উপন্যাসও ভীষ্মদ্রোণকে ছাড়িয়া এই-সমস্ত মূক-জাতির ভাষা, এই-সমস্ত ভস্মাচ্ছন্ন অঙ্গারের আলোক, প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

সমীর কহিল— নবোদিত সাহিত্যসূর্যের আলোক প্রথমে অত্যুচ্চ পর্বতশিখরের উপরেই পতিত হইয়াছিল, এখন ক্রমে নিম্নবর্তী উপত্যকার মধ্যে প্রসারিত হইয়া ক্ষুদ্র দরিদ্র কুটিরগুলিকেও প্রকাশমান করিয়া তুলিতেছে।

বৈশাখ ১৩০০

মন

এই-যে মধ্যাহ্নকালে নদীর ধারে পাড়াগাঁয়ের একটি একতলা ঘরে বসিয়া আছি, টিকটিকি ঘরের কোণে টিকটিক করিতেছে, দেয়ালে পাখা টানিবার ছিদ্রের মধ্যে একজোড়া চড়ুই পাখি বাসা তৈরি করিবার অভিপ্রায়ে বাহির হইতে কুটা সংগ্রহ করিয়া কিচ্‌মিচ্‌ শব্দে মহাব্যস্তভাবে ক্রমাগত যাতায়াত করিতেছে— নদীর মধ্যে নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে, উচ্চতটের অন্তরালে নীলাকাশে তাহাদের মাস্তুল এবং স্ফীত পালের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে— বাতাসটি স্নিগ্ধ, আকাশটি পরিষ্কার, পরপারের অতিদূর তীররেখা হইতে আর আমার বারান্দার সম্মুখবর্তী বেড়া-দেওয়া ছোটো বাগানটি পর্যন্ত উজ্জ্বল রৌদ্রে একখণ্ড ছবির মতো দেখাইতেছে— এই তো বেশ আছি; মায়ের কোলের মধ্যে সন্তান যেমন একটি উত্তাপ, একটি আরাম, একটি স্নেহ পায়, তেমনি এই পুরাতন প্রকৃতির কোল ঘেঁষিয়া বসিয়া একটি জীবনপূর্ণ আদরপূর্ণ মৃদু উত্তাপ চতুর্দিক হইতে আমার সর্বাঙ্গে প্রবেশ করিতেছে। তবে এই ভাবে থাকিয়া গেলে ক্ষতি কী? কাগজ-কলম লইয়া বসিবার জন্য কে তোমাকে খোঁচাইতেছিল? কোন্ বিষয়ে তোমার কী মত, কিসে তোমার সম্মতি বা অসম্মতি, সে কথা লইয়া হঠাৎ ধুমধাম করিয়া কোমর বাঁধিয়া বসিবার কী দরকার ছিল? ঐ দেখো, মাঠের মাঝখানে, কোথাও কিছু নাই, একটা ঘূর্ণা বাতাস খানিকটা ধুলা এবং শুকনো পাতার ওড়না উড়াইয়া কেমন চমৎকার ভাবে ঘুরিয়া নাচিয়া গেল! পদাঙ্গুলিমাত্রের উপর ভর করিয়া দীর্ঘ সরল হইয়া কেমন ভঙ্গিটি করিয়া মুহূর্তকাল দাঁড়াইল, তাহার পর হুস্‌হাস্‌ করিয়া সমস্ত উড়াইয়া ছড়াইয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গেল তাহার ঠিকানা নাই। সম্বল তো ভারী! গোটাকতক খড়কুটা, ধুলাবালি, সুবিধামত যাহা হাতের কাছে আসে তাহাই লইয়া বেশ একটু ভাবভঙ্গি করিয়া কেমন একটি খেলা খেলিয়া লইল। এমনি করিয়া জনহীন মধ্যাহ্নে সমস্ত মাঠ-ময় নাচিয়া বেড়ায়। না আছে তাহার কোনো উদ্দেশ্য, না আছে তাহার কেহ দর্শক। না আছে তাহার মত, না আছে তাহার তত্ত্ব; না আছে সমাজ এবং ইতিহাস সম্বন্ধে অতিসমীচীন উপদেশ। পৃথিবীতে যাহা-কিছু সর্বাপেক্ষা অনাবশ্যক সেই-সমস্ত বিস্মৃত পরিত্যক্ত পদার্থগুলির মধ্যে একটি উত্তপ্ত ফুৎকার দিয়া তাহাদিগকে মুহূর্ত-কালের জন্য জীবিত জাগ্রত সুন্দর করিয়া তোলে।

অমনি যদি অত্যন্ত সহজে এক নিশ্বাসে কতকগুলা যাহা-তাহা খাড়া করিয়া সুন্দর করিয়া ঘুরাইয়া উড়াইয়া লাঠিম খেলাইয়া চলিয়া যাইতে পারিতাম। অমনি

অবলীলাক্রমে সৃজন করিতাম, অমনি ফুঁ দিয়া ভাঙিয়া ফেলিতাম। চিন্তা নাই, চেষ্টা নাই, লক্ষ্য নাই ; শুধু একটা নৃত্যের আনন্দ, শুধু একটা সৌন্দর্যের আবেগ, শুধু একটা জীবনের ঘূর্ণা! অবারিত প্রান্তর, অনাবৃত আকাশ, পরিব্যাপ্ত সূর্যালোক— তাহারই মাঝখানে মুঠা মুঠা ধূলি লইয়া ইন্দ্রজাল নির্মাণ করা, সে কেবল খ্যাপা হৃদয়ের উদার উল্লাসে।

এ হইলে তো বুঝা যায়। কিন্তু বসিয়া বসিয়া পাথরের উপর পাথর চাপাইয়া গলদ্‌ঘর্ম হইয়া কতকগুলা নিশ্চল মতামত উচ্চ করিয়া তোলা! তাহার মধ্যে না আছে গতি, না আছে প্রীতি, না আছে প্রাণ! কেবল একটা কঠিন কীর্তি। তাহাকে কেহ বা হাঁ করিয়া দেখে কেহ বা পা দিয়া ঠেলে— যোগ্যতা যেম্‌নি থাক্!

কিন্তু ইচ্ছা করিলেও এ কাজে ক্ষান্ত হইতে পারি কই। সভ্যতার খাতিরে মানুষ মন-নামক আপনার এক অংশকে অপরিমিত প্রশ্রয় দিয়া অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছে, এখন তুমি যদি তাহাকে ছাড়িতে চাও সে তোমাকে ছাড়ে না।

লিখিতে লিখিতে আমি বাহিরে চাহিয়া দেখিতেছি ঐ একটি লোক রৌদ্রনিবারণের জন্য মাথায় একটি চাদর চাপাইয়া দক্ষিণ হস্তে শালপাতের ঠোঙায় খানিকটা দহি লইয়া রন্ধনশালা অভিমুখে চলিয়াছে। ওটি আমার ভৃত্য, নাম নারায়ণসিং। দিব্য হৃষ্টপুষ্ট, নিশ্চিন্ত, প্রফুল্লচিত্ত। উপযুক্ত সারপ্রাপ্ত পর্যাপ্ত পল্লবপূর্ণ মসৃণ চিক্কণ কাঁঠাল গাছটির মতো। এইরূপ মানুষ এই বহিঃপ্রকৃতির সহিত ঠিক মিশ খায়। প্রকৃতি এবং ইহার মাঝখানে বড়ো একটা বিচ্ছেদচিহ্ন নাই। এই জীবধাত্রী শস্যশালিনী বৃহৎ বসুন্ধরার অঙ্গসংলগ্ন হইয়া এ লোকটি বেশ সহজে বাস করিতেছে, ইহার নিজের মধ্যে নিজের তিলমাত্র বিরোধ-বিসম্বাদ নাই। ঐ গাছটি যেমন শিকড় হইতে পল্লবাগ্র পর্যন্ত কেবল একটি আতাগাছ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার আর-কিছুর জন্য কোনো মাথাব্যথা নাই, আমার হৃষ্টপুষ্ট নারায়ণসিং'টি তেমনি আদ্যোপান্ত কেবলমাত্র একখানি আস্ত নারায়ণসিং।

কোনো কৌতুকপ্রিয় শিশু-দেবতা যদি দুষ্টামি করিয়া ঐ আতাগাছটির মাঝখানে কেবল একটি ফোঁটা মন ফেলিয়া দেয়! তবে ঐ সরস শ্যামল দারুজীবনের মধ্যে কী এক বিষম উপদ্রব বাধিয়া যায়! তবে চিন্তায় উহার চিকন সবুজ পাতাগুলি ভূর্জপত্রের মতো পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায়, এবং গুঁড়ি হইতে প্রশাখা পর্যন্ত বৃদ্ধের ললাটের মতো কুঞ্চিত হইয়া আসে। তখন বসন্তকালে আর কি অমন দুই-চারি দিনের মধ্যে সর্বাঙ্গ কচিপাতায় পুলকিত হইয়া উঠে? ঐ গুটি-আঁকা গোল গোল গুচ্ছ গুচ্ছ ফলে

প্রত্যেক শাখা ভরিয়া যায়? তখন সমস্ত দিন এক পায়ের উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে থাকে, আমার কেবল কতকগুলা পাতা হইল কেন, পাখা হইল না কেন? প্রাণপণে সিধা হইয়া এত উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, তবু কেন যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাইতেছি না? ঐ দিগন্তের পরপারে কী আছে? ঐ আকাশের তারাগুলি যে গাছের শাখায় ফুটিয়া আছে সে গাছের কেমন করিয়া নাগাল পাইব? আমি কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় যাইব, এ কথা যতক্ষণ না স্থির হইবে ততক্ষণ আমি পাতা ঝরাইয়া, ডাল শুকাইয়া, কাঠ হইয়া, দাঁড়াইয়া ধ্যান করিতে থাকিব। আমি আছি অথবা আমি নাই, অথবা আমি আছিও বটে নাইও বটে, এ প্রশ্নের যতক্ষণ মীমাংসা না হয় ততক্ষণ আমার জীবনে কোনো সুখ নাই। দীর্ঘ বর্ষার পর যেদিন প্রাতঃকালে প্রথম সূর্য ওঠে সেদিন আমার মজ্জার মধ্যে যে-একটি পুলক-সঞ্চার হয় সেটা আমি ঠিক কেমন করিয়া প্রকাশ করিব, এবং শীতান্তে ফাল্গুনের মাঝামাঝি যেদিন হঠাৎ সায়ংকালে একটা দক্ষিণের বাতাস উঠে সেদিন ইচ্ছা করে— কী ইচ্ছা করে কে আমাকে বুঝাইয়া দিবে!

এই-সমস্ত কাণ্ড! গেল বেচারার ফুল ফোটানো, রসশস্যপূর্ণ আতাফল পাকানো। যাহা আছে তাহা অপেক্ষা বেশি হইবার চেষ্টা করিয়া, যে-রকম আছে আর-এক রকম হইবার ইচ্ছা করিয়া, না হয় এ দিক, না হয় ও দিক। অবশেষে এক দিন হঠাৎ অন্তর্বেদনায় গুঁড়ি হইতে অগ্রশাখা পর্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া বাহির হয়— একটা সাময়িক পত্রের প্রবন্ধ, একটা সমালোচনা, আরণ্যসমাজ সম্বন্ধে একটা অসাময়িক তত্ত্বোপদেশ। তাহার মধ্যে না থাকে সেই পল্লবমর্মর, না থাকে সেই ছায়া, না থাকে সর্বাঙ্গব্যাপ্ত সরস সম্পূর্ণতা।

যদি কোনো প্রবল শয়তান সরীসৃপের মতো লুকাইয়া মাটির নীচে প্রবেশ করিয়া, শতলক্ষ আঁকাবাঁকা শিকড়ের ভিতর দিয়া পৃথিবীর সমস্ত তরুলতা-তৃণগুল্মের মধ্যে মনঃসঞ্চার করিয়া দেয় তাহা হইলে পৃথিবীতে কোথায় জুড়াইবার স্থান থাকে! ভাগ্যে বাগানে আসিয়া পাখির গানের মধ্যে কোনো অর্থ পাওয়া যায় না এবং অক্ষরহীন সবুজ পত্রের পরিবর্তে শাখায় শাখায় শুষ্ক শ্বেতবর্ণ মাসিক পত্র, সংবাদপত্র এবং বিজ্ঞাপন ঝুলিতে দেখা যায় না!

ভাগ্যে গাছেদের মধ্যে চিন্তাশীলতা নাই! ভাগ্যে ধুতুরাগাছ কামিনীগাছকে সমালোচনা করিয়া বলে না 'তোমার ফুলের মধ্যে কোমলতা আছে কিন্তু ওজস্বিতা নাই' এবং কুলফল কাঁঠালকে বলে না 'তুমি আপনাকে বড়ো মনে কর কিন্তু আমি তোমা অপেক্ষা কুষ্মাণ্ডকে ঢের উচ্চ আসন দিই'। কদলী বলে না 'আমি সর্বাপেক্ষা অল্প

*

মূল্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পত্র প্রচার করি' এবং কচু তাহার প্রতিযোগিতা করিয়া তদপেক্ষা সুলভ মূল্যে তদপেক্ষা বৃহৎ পত্রের আয়োজন করে না!

তর্কতাড়িত চিন্তাতাপিত বক্তৃতাশ্রান্ত মানুষ উদার উন্মুক্ত আকাশের চিন্তারেখা-হীন জ্যোতির্ময় প্রশস্ত ললাট দেখিয়া, অরণ্যের ভাষাহীন মর্মর ও তরঙ্গের অর্থহীন কলধ্বনি শুনিয়া, এই মনোবিহীন অগাধ প্রশান্ত প্রকৃতির মধ্যে অবগাহন করিয়া তবে কতকটা স্নিগ্ধ ও সংযত হইয়া আছে। ঐ একটুখানি মনঃস্ফুলিঙ্গের দাহ-নিবৃত্তি করিবার জন্য এই অনন্ত প্রসারিত অমনঃসমুদ্রের প্রশান্ত নীলাম্বুরাশির আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

আসল কথা পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের ভিতরকার সমস্ত সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া আমাদের মনটা অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে কোথাও আর কুলাইয়া উঠিতেছে না। খাইবার, পরিবার, জীবনধারণ করিবার, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবার পক্ষে যতখানি আবশ্যক মনটা তাহার অপেক্ষা ঢের বেশি বড়ো হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্য, প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ সারিয়া ফেলিয়াও চতুর্দিকে অনেকখানি মন বাকি থাকে। কাজেই সে বসিয়া বসিয়া ডায়ারি লেখে, তর্ক করে, সংবাদপত্রের সংবাদদাতা হয়, যাহাকে সহজে বোঝা যায় তাহাকে কঠিন করিয়া তুলে, যাহাকে এক ভাবে বোঝা উচিত তাহাকে আর-এক ভাবে দাঁড় করায়, যাহা কোনো কালে কিছুতেই বোঝা যায় না অন্য সমস্ত ফেলিয়া তাহা লইয়াই লাগিয়া থাকে, এমন-কি, এ-সকল অপেক্ষাও অনেক গুরুতর গর্হিত কার্য করে।

কিন্তু আমার ঐ অনতিসভ্য নারায়ণসিংহের মনটি উহার শরীরের মাপে; উহার আবশ্যকের গায়ে গায়ে ঠিক ফিট করিয়া লাগিয়া আছে। উহার মনটি উহার জীবনকে শীতাতপ অসুখ অস্বাস্থ্য এবং লজ্জা হইতে রক্ষা করে, কিন্তু যখন তখন উনপঞ্চাশ বায়ু-বেগে চতুর্দিকে উড়ু-উড়ু করে না। এক-আধটা বোতামের ছিদ্র দিয়া বাহিরের চোরা হাওয়া উহার মানস-আবরণের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে যে কখনো একটু-আধটু স্ফীত করিয়া তোলে না তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ততটুকু মনশ্চাঞ্চল্য তাহার জীবনের স্বাস্থ্যের পক্ষেই বিশেষ আবশ্যক।

জ্যৈষ্ঠ ১৩০০

অখণ্ডতা

দীপ্তি কহিল— সত্য কথা বলিতেছি, আমার তো মনে হয় আজকাল প্রকৃতির স্তব লইয়া তোমরা সকলে কিছু বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছ।

আমি কহিলাম— দেবী, আর-কাহারও স্তব বুঝি তোমাদের গায়ে সহে না?

দীপ্তি কহিল— যখন স্তব ছাড়া আর বেশি কিছু পাওয়া যায় না, তখন ওটার অপব্যয় দেখিতে পারি না।

সমীর অত্যন্ত বিনম্রমনোহর হাস্যে গ্রীবা আনমিত করিয়া কহিল— ভগবতী, প্রকৃতির স্তব এবং তোমাদের স্তবে বড়ো-একটা প্রভেদ নাই। ইহা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া থাকিবে, যাহারা প্রকৃতির স্তবগান রচনা করিয়া থাকে তাহারা তোমাদেরই মন্দিরের প্রধান পূজারি।

দীপ্তি অভিমানভরে কহিল— অর্থাৎ যাহারা জড়ের উপাসনা করে তাহারাই আমাদের ভক্ত।

সমীর কহিল— এত বড়ো ভুলটা বুঝিলে, কাজেই একটা সুদীর্ঘ কৈফিয়ত দিতে হয়। আমাদের ভূতসভার বর্তমান সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বাবু তাঁর ডায়ারিতে মন-নামক একটা দুরন্ত পদার্থের উপদ্রবের কথা বর্ণনা করিয়া যে-একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সে তোমরা সকলেই পাঠ করিয়াছ। আমি তাহার নীচেই গুটি-কতক কথা লিখিয়া রাখিয়াছি, যদি সভ্যগণ অনুমতি করেন তবে পাঠ করি— আমার মনের ভাবটা তাহাতে পরিষ্কার হইবে।

ক্ষিতি করজোড়ে কহিল— দেখো ভাই সমীরণ, লেখক এবং পাঠকে যে সম্পর্ক সেইটেই স্বাভাবিক সম্পর্ক— তুমি ইচ্ছা করিয়া লিখিলে, আমি ইচ্ছা করিয়া পড়িলাম, কোনো পক্ষে কিছু বলিবার রহিল না। যেন খাপের সহিত তরবারি মিলিয়া গেল। কিন্তু তরবারি যদি অনিচ্ছুক অস্থিচর্মের মধ্যে সেই-প্রকার সুগভীর আত্মীয়তা স্থাপনে প্রবৃত্ত হয় তবে সেটা তেমন বেশ স্বাভাবিক এবং মনোহররূপে সম্পন্ন হয় না। লেখক এবং শ্রোতার সম্পর্কটাও সেইরূপ অস্বাভাবিক, অসদৃশ। হে চতুরানন, পাপের যেমন শাস্তিই বিধান কর, যেন আর-জন্মে ডাক্তারের ঘোড়া, মাতালের স্ত্রী এবং প্রবন্ধলেখকের বন্ধু হইয়া জন্মগ্রহণ না করি।

ব্যোম একটা পরিহাস করিতে চেষ্টা করিল, কহিল— একে তো বন্ধু অর্থেই বন্ধন, তাহার উপরে প্রবন্ধবন্ধন হইলে ফাঁসের উপরে ফাঁস হয়: গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকম্।

দীপ্তি কহিল— হাসিবার জন্য দুইটি বৎসর সময় প্রার্থনা করি ; ইতিমধ্যে পাণিনি অমরকোষ এবং ধাতুপাঠ আয়ত্ত করিয়া লইতে হইবে।

শুনিয়া ব্যোম অত্যন্ত কৌতুকলাভ করিল। হাসিতে হাসিতে কহিল— বড়ো চমৎকার বলিয়াছ ; আমার একটা গল্প মনে পড়িতেছে—

স্রোতস্বিনী কহিল— তোমরা সমীরের লেখাটা আজ আর শুনিতে দিবে না দেখিতেছি। সমীর, তুমি পড়ো, উহাদের কথায় কর্ণপাত করিয়ো না।

স্রোতস্বিনীর আদেশের বিরুদ্ধে কেহ আর আপত্তি করিল না। এমন-কি, স্বয়ং ক্ষিতি শেল্‌ফের উপর হইতে ডায়ারির খাতাটি পাড়িয়া আনিল এবং নিতান্ত নিরীহ নিরুপায়ের মতো সংযত হইয়া বসিয়া রহিল।

সমীর পড়িতে লাগিল— মানুষকে বাধ্য হইয়া পদে পদে মনের সাহায্য লইতে হয়, এইজন্য ভিতরে ভিতরে আমরা সেটাকে দেখিতে পারি না। মন আমাদের অনেক উপকার করে, কিন্তু তাহার স্বভাব এমনই যে, আমাদের সঙ্গে কিছুতেই সে সম্পূর্ণ মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে না। সর্বদা খিট্‌খিট্ করে, পরামর্শ দেয়, উপদেশ দিতে আসে, সকল কাজেই হস্তক্ষেপ করে। সে যেন একজন বাহিরের লোক ঘরের হইয়া পড়িয়াছে— তাহাকে ত্যাগ করাও কঠিন, তাহাকে ভালোবাসাও দুঃসাধ্য।

সে যেন অনেকটা বাঙালির দেশে ইংরাজের গবর্মেণ্টের মতো। আমাদের সরল দিশি রকমের ভাব, আর তাহার জটিল বিদেশী রকমের আইন। উপকার করে, কিন্তু আত্মীয় মনে করে না। সেও আমাদের বুঝিতে পারে না, আমরাও তাহাকে বুঝিতে পারি না। আমাদের যে-সকল স্বাভাবিক সহজ ক্ষমতা ছিল তাহার শিক্ষায় সেগুলি নষ্ট হইয়া গেছে, এখন উঠিতে বসিতে তাহার সাহায্য ব্যতীত আর চলে না।

ইংরাজের সহিত আমাদের মনের আরও কতকগুলি মিল আছে। এতকাল সে আমাদের মধ্যে বাস করিতেছে, তবু সে বাসিন্দা হইল না, তবু সে সর্বদা উড়ু উড়ু করে। যেন কোনো সুযোগে একটা ফর্লো পাইলেই মহাসমুদ্রপারে তাহার জন্মভূমিতে পাড়ি দিতে পারিলেই বাঁচে। সব চেয়ে আশ্চর্য সাদৃশ্য এই যে, তুমি যতই তাহার কাছে নরম হইবে, যতই 'যো হুজুর খোদাবন্দ্‌' বলিয়া হাত জোড় করিবে ততই তাহার প্রতাপ বাড়িয়া উঠিবে ; আর তুমি যদি ফস্ করিয়া হাতের আস্তিন গুটাইয়া ঘুষি উঁচাইতে পারো, খৃস্টান শাস্ত্রের অনুশাসন অগ্রাহ্য করিয়া চড়টির পরিবর্তে চাপড়টি প্রয়োগ করিতে পারো, তবে সে জল হইয়া যাইবে।

মনের উপর আমাদের বিদ্বেষ এতই সুগভীর যে, যে কাজে তাহার হাত কম দেখা যায় তাহাকেই আমরা সব চেয়ে অধিক প্রশংসা করি। নীতিগ্রন্থে হঠকারিতার নিন্দা আছে বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার প্রতি আমাদের আন্তরিক অনুরাগ দেখিতে পাই। যে ব্যক্তি অত্যন্ত বিবেচনাপূর্বক অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া অতি সতর্কভাবে কাজ করে তাহাকে আমরা ভালোবাসি না; কিন্তু যে ব্যক্তি সর্বদা নিশ্চিন্ত, অম্লানবদনে বেফাঁস কথা বলিয়া বসে এবং অবলীলাক্রমে বেয়াড়া কাজ করিয়া ফেলে লোকে তাহাকে ভালোবাসে। যে ব্যক্তি ভবিষ্যতের হিসাব করিয়া বড়ো সাবধানে অর্থসঞ্চয় করে, লোকে ঋণের আবশ্যক হইলে তাহার নিকট গমন করে এবং তাহাকে মনে মনে অপরাধী করে; আর, যে নির্বোধ নিজের ও পরিবারের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ গণনামাত্র না করিয়া যাহা পায় তৎক্ষণাৎ মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়া বসে, লোকে অগ্রসর হইয়া তাহাকে ঋণদান করে এবং সকল সময় পরিশোধের প্রত্যাশা রাখে না। অনেক সময় অবিবেচনা অর্থাৎ মনোবিহীনতাকেই আমরা উদারতা বলি এবং যে মনস্বী হিতাহিতজ্ঞানের অনুদেশক্রমে যুক্তির লণ্ঠন হাতে লইয়া অত্যন্ত কঠিন সংকল্পের সহিত নিয়মের চুল-চেরা পথ ধরিয়া চলে তাহাকে লোকে হিসাবী, বিষয়ী, সংকীর্ণমনা প্রভৃতি অপবাদসূচক কথা বলিয়া থাকে।

মনটা যে আছে এইটুকু যে ভুলাইতে পারে তাহাকেই বলি মনোহর। মনের বোঝাটা যে অবস্থায় অনুভব করি না সেই অবস্থাটাকে বলি আনন্দ। নেশা করিয়া বরং পশুর মতো হইয়া যাই, নিজের সর্বনাশ করি সেও স্বীকার, তবু কিছুক্ষণের জন্য থানার মধ্যে পড়িয়াও সে উল্লাস সম্বরণ করিতে পারি না। মন যদি যথার্থ আমাদের আত্মীয় হইত এবং আত্মীয়ের মতো ব্যবহার করিত, তবে কি এমন উপকারী লোকটার প্রতি এতটা দূর অকৃতজ্ঞতার উদয় হইত?

বুদ্ধির অপেক্ষা প্রতিভাকে আমরা উচ্চাসন কেন দিই? বুদ্ধি প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে আমাদের সহস্র কাজ করিয়া দিতেছে, সে না হইলে আমাদের জীবন রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইত, আর প্রতিভা কালেভদ্রে আমাদের কাজে আসে এবং অনেক সময় অকাজেও আসে। কিন্তু বুদ্ধিটা হইল মনের, তাহাকে পদক্ষেপ গণনা করিয়া চলিতে হয়, আর প্রতিভা মনের নিয়মাবলী রক্ষা না করিয়া হাওয়ার মতো আসে— কাহারও আহ্বানও মানে না, নিষেধও অগ্রাহ্য করে।

প্রকৃতির মধ্যে সেই মন নাই, এইজন্য প্রকৃতি আমাদের কাছে এমন মনোহর। প্রকৃতিতে একটার ভিতরে আর-একটা নাই। আরসোলার স্কন্ধে কাঁচপোকা বসিয়া তাহাকে শুষিয়া খাইতেছে না। মৃত্তিকা হইতে আর ঐ জ্যোতিঃসিঞ্চিত আকাশ পর্যন্ত

তাহার এই প্রকাণ্ড ঘরকন্নার মধ্যে একটা ভিন্নদেশী পরের ছেলে প্রবেশ লাভ করিয়া দৌরাত্ম্য করিতেছে না।

সে একাকী, অখণ্ডসম্পূর্ণ, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্‌বিগ্ন। তাহার অসীমনীল ললাটে বুদ্ধির রেখামাত্র নাই, কেবল প্রতিভার জ্যোতি চিরদীপ্যমান। যেমন অনায়াসে একটি সর্বাঙ্গসুন্দরী পুষ্পমঞ্জরী বিকশিত হইয়া উঠিতেছে তেমনি অবহেলে একটা দুর্দান্ত ঝড় আসিয়া সুখস্বপ্নের মতো সমস্ত ভাঙিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে। সকলই যেন ইচ্ছায় হইতেছে, চেষ্টায় হইতেছে না। সে ইচ্ছা কখনো আদর করে, কখনো আঘাত করে। কখনো প্রেয়সী অপ্সরীর মতো গান করে, কখনো ক্ষুধিত রাক্ষসীর ন্যায় গর্জন করে।

চিন্তাপীড়িত সংশয়াপন্ন মানুষের কাছে এই দ্বিধাশূন্য অব্যবস্থিত ইচ্ছাশক্তির বড়ো একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ আছে। রাজভক্তি, প্রভুভক্তি তাহার একটা নিদর্শন। যে রাজা ইচ্ছা করিলেই প্রাণ দিতে এবং প্রাণ লইতে পারে তাহার জন্য যত লোক ইচ্ছা করিয়া প্রাণ দিয়াছে, বর্তমান যুগের নিয়মপাশবদ্ধ রাজার জন্য এত লোক স্বেচ্ছা-পূর্বক আত্মবিসর্জনে উদ্যত হয় না।

যাহারা মনুষ্যজাতির নেতা হইয়া জন্মিয়াছে তাহাদের মন দেখা যায় না। তাহারা কেন কী ভাবিয়া কী যুক্তি অনুসারে কী কাজ করিতেছে, তৎক্ষণাৎ তাহা কিছুই বুঝা যায় না— এবং মানুষ নিজের সংশয়তিমিরাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র গহ্বর হইতে বাহির হইয়া পতঙ্গের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে তাহাদের মহত্ত্বশিখার মধ্যে আত্মঘাতী হইয়া ঝাঁপ দেয়।

রমণীও প্রকৃতির মতো। মন আসিয়া তাহাকে মাঝখান হইতে দুই ভাগ করিয়া দেয় নাই। সে পুষ্পের মতো আগাগোড়া একখানি। এইজন্য তাহার গতিবিধি আচারব্যবহার এমন সহজসম্পূর্ণ। এইজন্য দ্বিধান্দোলিত পুরুষের পক্ষে রমণী 'মরণং ধ্রুবং'।

প্রকৃতির ন্যায় রমণীরও কেবল ইচ্ছাশক্তি— তাহার মধ্যে যুক্তিতর্ক বিচার-আলোচনা কেন-কী-বৃত্তান্ত নাই। কখনো সে চারি হস্তে অন্ন বিতরণ করে, কখনো সে প্রলয়মূর্তিতে সংহার করিতে উদ্যত হয়। ভক্তেরা করজোড়ে বলে, তুমি মহামায়া, তুমি ইচ্ছাময়ী, তুমি প্রকৃতি, তুমি শক্তি!

সমীর হাঁপ ছাড়িবার জন্য একটু থামিবামাত্র ক্ষিতি গম্ভীর মুখ করিয়া কহিল— বাঃ! চমৎকার! কিন্তু তোমার গা ছুঁইয়া বলিতেছি, এক বর্ণ যদি বুঝিয়া থাকি! বোধ করি তুমি যাহাকে মন ও বুদ্ধি বলিতেছ প্রকৃতির মতো আমার মধ্যেও সে জিনিসটার অভাব আছে, কিন্তু তৎপরিবর্তে প্রতিভার জন্যও কাহারও নিকট হইতে

প্রশংসা পাই নাই এবং আকর্ষণশক্তিও যে অধিক আছে তাহার কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

দীপ্তি সমীরকে কহিল— তুমি যে মুসলমানের মতো কথা কহিলে, তাহাদের শাস্ত্রেই তো বলে মেয়েদের আত্মা নাই।

স্রোতস্বিনী চিন্তান্বিতভাবে কহিল— মন এবং বুদ্ধি শব্দটা যদি তুমি একই অর্থে ব্যবহার কর আর যদি বল আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত, তবে তোমার সহিত আমার মতের মিল হইল না।

সমীর কহিল— আমি যে কথাটা বলিয়াছি তাহা রীতিমত তর্কের যোগ্য নহে। প্রথম বর্ষায় পদ্মা যে চরটা গড়িয়া দিয়া গেল তাহা বালি, তাহার উপরে লাঙল লইয়া পড়িয়া তাহাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিলে কোনো ফল পাওয়া যায় না ; ক্রমে ক্রমে দুই-তিন বর্ষায় স্তরে স্তরে যখন তাহার উপর মাটি পড়িবে তখন সে কর্ষণ সহিবে। আমিও তেমনি চলিতে চলিতে স্রোতোবেগে একটা কথাকে কেবল প্রথম দাঁড় করাইলাম মাত্র। হয়তো দ্বিতীয় স্রোতে একেবারে ভাঙিতেও পারে, অথবা পলি পড়িয়া উর্বরা হইতেও আটক নাই। যাহা হউক, আসামির সমস্ত কথাটা শুনিয়া তার পর বিচার করা হউক।—

মানুষের অন্তঃকরণের দুই অংশ আছে। একটা অচেতন বৃহৎ গুপ্ত এবং নিশ্চেষ্ট, আর-একটা সচেতন সক্রিয় চঞ্চল পরিবর্তনশীল। যেমন মহাদেশ এবং সমুদ্র। সমুদ্র চঞ্চলভাবে যাহা-কিছু সঞ্চয় করিতেছে, ত্যাগ করিতেছে, গোপন তলদেশে তাহাই দৃঢ় নিশ্চল আকারে উত্তরোত্তর রাশীকৃত হইয়া উঠিতেছে। সেইরূপ আমাদের চেতনা প্রতিদিন যাহা-কিছু আনিতেছে, ফেলিতেছে, সেই-সমস্ত ক্রমে সংস্কার স্মৃতি অভ্যাস -আকারে একটি বৃহৎ গোপন আধারে অচেতন ভাবে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। তাহাই আমাদের জীবনের ও চরিত্রের স্থায়ী ভিত্তি। সম্পূর্ণ তলাইয়া তাহার সমস্ত স্তরপর্যায় কেহ আবিষ্কার করিতে পারে না। উপর হইতে যতটা দৃশ্যমান হইয়া উঠে, অথবা আকস্মিক ভূমিকম্পবেগে যে নিগূঢ় অংশ ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয় তাহাই আমরা দেখিতে পাই।

এই মহাদেশেই শস্য পুষ্প ফল, সৌন্দর্য ও জীবন, অতি সহজে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে। ইহা দৃশ্যত স্থির ও নিষ্ক্রিয়, কিন্তু ইহার ভিতরে একটি অনায়াসনৈপুণ্য একটি গোপন জীবনীশক্তি নিগূঢ়ভাবে কাজ করিতেছে। সমুদ্র কেবল ফুলিতেছে এবং দুলিতেছে, বাণিজ্যতরী ভাসাইতেছে এবং ডুবাইতেছে, অনেক আহরণ এবং সংহরণ করিতেছে, তাহার বলের সীমা নাই, কিন্তু তাহার মধ্যে জীবনীশক্তি ও ধারণীশক্তি নাই— সে কিছুই জন্ম দিতে ও পালন করিতে পারে না।

রূপকে যদি কাহারও আপত্তি না থাকে তবে আমি বলি আমাদের এই চঞ্চল বহিরংশ পুরুষ, এবং এই বৃহৎ গোপন অচেতন অন্তরংশ নারী।

এই স্থিতি এবং গতি সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে ভাগ হইয়া গিয়াছে। সমাজের সমস্ত আহরণ, উপার্জন, জ্ঞান ও শিক্ষা স্ত্রীলোকের মধ্যে গিয়া নিশ্চল স্থিতি লাভ করিতেছে। এইজন্য তাহার এমন সহজ বুদ্ধি, সহজ শোভা, অশিক্ষিতপটুতা। মনুষ্যসমাজে স্ত্রীলোক বহুকালের রচিত; এইজন্য তাহার সংস্কারগুলি এমন দৃঢ় ও পুরাতন, তাহার সকল কর্তব্য এমন চিরাভ্যস্ত সহজসাধ্যের মতো হইয়া চলিতেছে। পুরুষ উপস্থিত আবশ্যকের সন্ধানে সময়স্রোতে অনুক্ষণ পরিবর্তিত হইয়া চলিতেছে, কিন্তু সেই সমুদয় চঞ্চল প্রাচীন পরিবর্তনের ইতিহাস স্ত্রীলোকের মধ্যে স্তরে স্তরে নিত্য ভাবে সঞ্চিত হইতেছে।

পুরুষ আংশিক, বিচ্ছিন্ন, সামঞ্জস্যবিহীন। আর স্ত্রীলোক এমন একটি সংগীত যাহা সমে আসিয়া সুন্দর সুগোল ভাবে সম্পূর্ণ হইতেছে; তাহাতে উত্তরোত্তর যতই পদ সংযোগ ও নব নব তান যোজনা করো-না কেন, সেই সমটি আসিয়া সমস্তটিকে একটি সুগোল সম্পূর্ণ গণ্ডি দিয়া ঘিরিয়া লয়। মাঝখানে একটি স্থির কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া আবর্ত আপনার পরিধিবিস্তার করে, সেইজন্য হাতের কাছে যাহা আছে তাহা সে এমন সুনিপুণ সুন্দর -ভাবে টানিয়া আপনার করিয়া লইতে পারে।

এই-যে কেন্দ্রটি ইহা বুদ্ধি নহে, ইহা একটি সহজ আকর্ষণশক্তি। ইহা একটি ঐক্যবিন্দু। মনঃপদার্থটি যেখানে আসিয়া উঁকি মারেন সেখানে এই সুন্দর ঐক্য শতধা বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়।

ব্যোম অধীরের মতো হইয়া হঠাৎ আরম্ভ করিয়া দিল— তুমি যাহাকে ঐক্য বলিতেছ আমি তাহাকে আত্মা বলি; তাহার ধর্মই এই, সে পাঁচটা বস্তুকে আপনার চারি দিকে টানিয়া আনিয়া একটা গঠন দিয়া গড়িয়া তোলে; আর যাহাকে মন বলিতেছ সে পাঁচটা বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আপনাকে এবং তাহাদিগকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ফেলে। সেইজন্য আত্মযোগের প্রধান সোপান হইতেছে মনটাকে অবরুদ্ধ করা।

ইংরাজের সহিত সমীর মনের যে তুলনা করিয়াছেন এখানেও তাহা খাটে। ইংরাজ সকল জিনিসকেই অগ্রসর হইয়া, তাড়াইয়া, খেদাইয়া ধরে। তাহার 'আশাবধিং কো গতঃ', শুনিয়াছি সূর্যদেবও নহেন— তিনি তাহার রাজ্যে উদয় হইয়া এ পর্যন্ত অস্ত হইতে পারিলেন না। আর আমরা আত্মার ন্যায় কেন্দ্রগত হইয়া আছি; কিছু

হরণ করিতে চাহি না, চতুর্দিকে যাহা আছে তাহাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে আকৃষ্ট করিয়া গঠন করিয়া তুলিতে চাই। এইজন্য আমাদের সমাজের মধ্যে, গৃহের মধ্যে, ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার মধ্যে, এমন একটা রচনার নিবিড়তা দেখিতে পাওয়া যায়। আহরণ করে মন, আর সৃজন করে আত্মা।

যোগের সকল তথ্য জানি না, কিন্তু শোনা যায় যোগবলে যোগীরা সৃষ্টি করিতে পারিতেন। প্রতিভার সৃষ্টিও সেইরূপ। কবিরা সহজ ক্ষমতাবলে মনটাকে নিরস্ত করিয়া দিয়া অর্ধ-অচেতনভাবে যেন একটা আত্মার আকর্ষণে ভাব রস দৃশ্য বর্ণ ধ্বনি কেমন করিয়া সঞ্চিত করিয়া, পুঞ্জিত করিয়া, জীবনে সুগঠনে মণ্ডিত করিয়া, খাড়া করিয়া তুলেন।

বড়ো বড়ো লোকেরা যে বড়ো বড়ো কাজ করেন সেও এই ভাবে। যেখানকার যেটি সে যেন একটি দৈবশক্তিপ্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া রেখায় রেখায় বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যায়, একটি সুসম্পন্ন সুসম্পূর্ণ কার্যরূপে দাঁড়াইয়া যায়। প্রকৃতির সর্বকনিষ্ঠজাত মন-নামক দুরন্ত বালকটি যে একেবারে তিরস্কৃত বহিষ্কৃত হয় তাহা নহে, কিন্তু সে তদপেক্ষা উচ্চতর মহত্তর প্রতিভার অমোঘমায়ামন্ত্রবলে মুগ্ধের মতো কাজ করিয়া যায়; মনে হয় সমস্তই যেন জাদুতে হইতেছে; যেন সমস্ত ঘটনা, যেন বাহ্য অবস্থাগুলিও, যোগবলে যথেচ্ছামত যথাস্থানে বিন্যস্ত হইয়া যাইতেছে। গারিবাল্ডি এমনি করিয়া ভাঙাচোরা ইটালিকে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন, ওয়াশিংটন অরণ্যপর্বতবিক্ষিপ্ত অ্যামেরিকাকে আপনার চারি দিকে টানিয়া আনিয়া একটি সাম্রাজ্যরূপে গড়িয়া দিয়া যান।

এই সমস্ত কার্য এক-একটি যোগসাধন।

কবি যেমন কাব্য গঠন করেন, তানসেন যেমন তান লয় ছন্দে এক-একটি গান সৃষ্টি করিতেন, রমণী তেমনি আপনার জীবনটি রচনা করিয়া তোলে। তেমনি অচেতনভাবে, তেমনি মায়ামন্ত্রবলে। পিতাপুত্র ভ্রাতাভগ্নী অতিথিঅভ্যাগতকে সুন্দর বন্ধনে বাঁধিয়া সে আপনার চারি দিকে গঠিত সজ্জিত করিয়া তোলে; বিচিত্র উপাদান লইয়া বড়ো সুনিপুণ হস্তে একখানি গৃহ নির্মাণ করে; কেবল গৃহ কেন, রমণী যেখানে যায় আপনার চারি দিককে একটি সৌন্দর্যসংযমে বাঁধিয়া আনে। নিজের চলাফেরা বেশভূষা কথাবার্তা আকার-ইঙ্গিতকে একটি অনির্বচনীয় গঠন দান করে। তাহাকে বলে শ্রী। ইহা তো বুদ্ধির কাজ নহে, অনির্দেশ্য প্রতিভার কাজ; মনের শক্তি নহে, আত্মার অভ্রান্ত নিগূঢ় শক্তি। এই-যে ঠিক সুরটি ঠিক জায়গায় গিয়া লাগে, ঠিক কথাটি ঠিক জায়গায় আসিয়া বসে, ঠিক কাজটি ঠিক সময়ে নিষ্পন্ন হয়

—ইহা একটি মহারহস্যময় নিখিলজগৎকেন্দ্রভূমি হইতে স্বাভাবিক স্ফটিকধারার ন্যায় উচ্ছ্বসিত উৎস। সেই কেন্দ্রভূমিটিকে অচেতন না বলিয়া অতিচেতন নাম দেওয়া উচিত।

প্রকৃতিতে যাহা সৌন্দর্য, মহৎ ও গুণী লোকে তাহাই প্রতিভা, এবং নারীতে তাহাই শ্রী, তাই নারীত্ব। ইহা কেবল পাত্রভেদে ভিন্ন বিকাশ।

অতঃপর ব্যোম সমীরের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল— তার পরে? তোমার লেখাটা শেষ করিয়া ফেলো।

সমীর কহিল— আর আবশ্যক কী? আমি যাহা আরম্ভ করিয়াছি তুমি তো তাহার একপ্রকার উপসংহার করিয়া দিয়াছ।

ক্ষিতি কহিল— কবিরাজ মহাশয় শুরু করিয়াছিলেন, ডাক্তার মহাশয় সাঙ্গ করিয়া গেলেন, এখন আমরা হরি হরি বলিয়া বিদায় হই। মন কী, বুদ্ধি কী, আত্মা কী, সৌন্দর্য কী এবং প্রতিভাই বা কাহাকে বলে, এ-সকল তত্ত্ব কস্মিন্‌কালে বুঝি নাই, কিন্তু বুঝিবার আশা ছিল, আজ সেটুকুও জলাঞ্জলি দিয়া গেলাম।

পশমের গুটিতে জটা পাকাইয়া গেলে যেমন নতমুখে সতর্ক অঙ্গুলিতে ধীরে ধীরে খুলিতে হয়, স্রোতস্বিনী চুপ করিয়া বসিয়া যেন তেমনি ভাবে মনে মনে কথাগুলিকে বহুযত্নে ছাড়াইতে লাগিল।

দীপ্তিও মৌনভাবে ছিল; সমীর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল— কী ভাবিতেছ?

দীপ্তি কহিল— বাঙালির মেয়েদের প্রতিভাবলে বাঙালির ছেলেদের মতো এমন অপরূপ সৃষ্টি কী করিয়া হইল তাই ভাবিতেছি।

আমি কহিলাম— মাটির গুণে সকল সময়ে শিব গড়িতে কৃতকার্য হওয়া যায় না।

শ্রাবণ ১৩০০

গদ্য ও পদ্য

আমি বলিতেছিলাম— বাঁশির শব্দে, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায়, কবিরা বলেন, হৃদয়ের মধ্যে স্মৃতি জাগিয়া উঠে। কিন্তু কিসের স্মৃতি তাহার কোনো ঠিকানা নাই। যাহার কোনো নির্দিষ্ট আকার নাই তাহাকে এত দেশ থাকিতে স্মৃতিই বা কেন বলিব, বিস্মৃতিই বা না বলিব কেন, তাহার কোনো কারণ পাওয়া যায় না। কিন্তু 'বিস্মৃতি জাগিয়া ওঠে' এমন একটা কথা ব্যবহার করিলে শুনিতে বড়ো অসংগত বোধ হয়। অথচ কথাটা নিতান্ত অমূলক নহে। অতীত জীবনের যে-সকল শত সহস্র স্মৃতি

স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া একাকার হইয়াছে, যাহাদের প্রত্যেককে পৃথক করিয়া চিনিবার জো নাই, আমাদের হৃদয়ের চেতন মহাদেশের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া যাহারা বিস্মৃতিমহাসাগররূপে নিস্তব্ধ হইয়া শয়ান আছে, তাহারা কোনো কোনো সময়ে চন্দ্রোদয়ে অথবা দক্ষিণের বায়ুবেগে একসঙ্গে চঞ্চল ও তরঙ্গিত হইয়া উঠে, তখন আমাদের চেতন হৃদয় সেই বিস্মৃতিতরঙ্গের আঘাত-অভিঘাত অনুভব করিতে থাকে, তাহাদের রহস্যপূর্ণ অগাধ অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়, সেই মহাবিস্মৃত অতিবিস্তৃত বিপুলতার একতান ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতি আমার এই আকস্মিক ভাবোচ্ছ্বাসে হাস্যসম্বরণ করিতে না পারিয়া কহিলেন— ভ্রাতঃ, করিতেছ কী! এইবেলা সময় থাকিতে ক্ষান্ত হও। কবিতা ছন্দে শুনিতেই ভালো লাগে, তাহাও সকল সময়ে নহে। কিন্তু সরল গদ্যের মধ্যে যদি তোমরা পাঁচজনে পড়িয়া কবিতা মিশাইতে থাকো, তবে তাহা প্রতিদিনের ব্যবহারের পক্ষে অযোগ্য হইয়া উঠে। বরং দুধে জল মিশাইলে চলে, কিন্তু জলে দুধ মিশাইলে তাহাতে প্রাত্যহিক স্নান-পান চলে না। কবিতার মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে গদ্য মিশ্রিত করিলে আমাদের মতো গদ্যজীবী লোকের পরিপাকের পক্ষে সহজ হয়— কিন্তু গদ্যের মধ্যে কবিত্ব একেবারে অচল।

বাস্। মনের কথা আর নহে। আমার শরৎপ্রভাতের নবীন ভাবাঙ্কুরটি প্রিয়বন্ধু ক্ষিতি তাঁহার তীক্ষ্ণ নিড়ানির একটি খোঁচায় একেবারে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিলেন। একটা তর্কের কথায় সহসা বিরুদ্ধ মত শুনিলে মানুষ তেমন অসহায় হইয়া পড়ে না, কিন্তু ভাবের কথায় কেহ মাঝখানে ব্যাঘাত করিলে বড়োই দুর্বল হইয়া পড়িতে হয়। কারণ, ভাবের কথায় শ্রোতার সহানুভূতির প্রতিই একমাত্র নির্ভর। শ্রোতা যদি বলিয়া উঠে 'কী পাগলামি করিতেছ', তবে কোনো যুক্তিশাস্ত্রে তাহার কোনো উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

এইজন্য ভাবের কথা পাড়িতে হইলে প্রাচীন গুণীরা শ্রোতাদের হাতে-পায়ে ধরিয়া কাজ আরম্ভ করিতেন। বলিতেন, সুধীগণ মরালের মতো নীর পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীর গ্রহণ করেন। নিজের অক্ষমতা স্বীকার করিয়া সভাস্থ লোকের গুণগ্রাহিতার প্রতি একান্ত নির্ভর প্রকাশ করিতেন। কখনো বা ভবভূতির ন্যায় সুমহৎ দম্ভের দ্বারা আরম্ভ হইতেই সকলকে অভিভূত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেন। এবং এত করিয়াও ঘরে ফিরিয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিতেন, যে দেশে কাচ এবং মানিকের এক দর, সে দেশকে নমস্কার। দেবতার কাছে, প্রার্থনা করিতেন, 'হে চতুরানন, পাপের ফল আর যেমনই দাও সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু

অরসিকের কাছে রসের কথা বলা এ কপালে লিখিয়ো না, লিখিয়ো না, লিখিয়ো না।' বাস্তবিক এমন শাস্তি আর নাই। জগতে অরসিক না থাকুক, এতবড়ো প্রার্থনা দেবতার কাছে করা যায় না, কারণ তাহা হইলে জগতের জনসংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হইয়া যায়। অরসিকের দ্বারাই পৃথিবীর অধিকাংশ কার্য সম্পন্ন হয়, তাঁহারা জনসমাজের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; তাঁহারা না থাকিলে সভা বন্ধ, কমিটি অচল, সংবাদপত্র নীরব, সমালোচনার কোটা একেবারে শূন্য; এজন্য তাঁহাদের প্রতি আমার যথেষ্ট সম্মান আছে। কিন্তু ঘানিযন্ত্রে সর্ষপ ফেলিলে অজস্রধারে তৈল বাহির হয় বলিয়া তাহার মধ্যে ফুল ফেলিয়া কেহ মধুর প্রত্যাশা করিতে পারে না— অতএব হে চতুর্মুখ, ঘানিকে চিরদিন সংসারে রক্ষা করিয়ো, কিন্তু তাহার মধ্যে ফুল ফেলিয়ো না এবং গুণিজনের হৃৎপিণ্ড নিক্ষেপ করিয়ো না।

শ্রীমতী স্রোতস্বিনীর কোমল হৃদয় সর্বদাই আর্তের পক্ষে। তিনি আমার দুরবস্থায় কিঞ্চিৎ কাতর হইয়া কহিলেন— কেন, গদ্যে পদ্যে এতই কি বিচ্ছেদ?

আমি কহিলাম— পদ্য অন্তঃপুর, গদ্য বহির্ভবন। উভয়ের ভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট আছে। অবলা বাহিরে বিচরণ করিলে তাহার বিপদ ঘটিবেই এমন কোনো কথা নাই। কিন্তু যদি কোনো রূঢ়স্বভাব ব্যক্তি তাহাকে অপমান করে, তবে ক্রন্দন ছাড়া তাহার আর কোনো অস্ত্র নাই। এইজন্য অন্তঃপুর তাহার পক্ষে নিরাপদ দুর্গ। পদ্য কবিতার সেই অন্তঃপুর। ছন্দের প্রাচীরের মধ্যে সহসা কেহ তাহাকে আক্রমণ করে না। প্রত্যহের এবং প্রত্যেকের ভাষা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া সে আপনার জন্য একটি দুরূহ অথচ সুন্দর সীমা রচনা করিয়া রাখিয়াছে। আমার হৃদয়ের ভাবটিকে যদি সেই সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতাম, তবে ক্ষিতি কেন, কোনো ক্ষিতিপতির সাধ্য ছিল না তাহাকে সহসা আসিয়া পরিহাস করিয়া যায়।

ব্যোম গুড়গুড়ির নল মুখ হইতে নামাইয়া নিমীলিতনেত্রে কহিলেন— আমি ঐক্যবাদী। একা গদ্যের দ্বারাই আমাদের সকল আবশ্যক সুসম্পন্ন হইতে পারিত, মাঝে হইতে পদ্য আসিয়া মানুষের মনোরাজ্যে একটা অনাবশ্যক বিচ্ছেদ আনয়ন করিয়াছে; কবি-নামক একটা স্বতন্ত্র জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। সম্প্রদায়-বিশেষের হস্তে যখন সাধারণের সম্পত্তি অর্পিত হয়, তখন তাহার স্বার্থ হয় যাহাতে সেটা অন্যের অনায়ত্ত হইয়া উঠে। কবিরাও ভাবের চতুর্দিকে কঠিন বাধা নির্মাণ করিয়া কবিত্ব-নামক একটা কৃত্রিম পদার্থ গড়িয়া তুলিয়াছে। কৌশলবিমুগ্ধ জনসাধারণ বিস্ময় রাখিবার স্থান পায় না। এমনি তাহাদের অভ্যাস বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে, ছন্দ মিল আসিয়া

ক্রমাগত হাতুড়ি না পিটাইলে তাহাদের হৃদয়ের চৈতন্য হয় না, স্বাভাবিক সরল ভাষা ত্যাগ করিয়া ভাবকে পাঁচরঙা ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হয়। ভাবের পক্ষে এমন হীনতা আর-কিছুই হইতে পারে না। পদ্যটা নাকি আধুনিক সৃষ্টি, সেইজন্য সে হঠাৎ-নবাবের মতো সর্বদাই পেখম তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়ায়, আমি তাহাকে দু চক্ষে দেখিতে পারি না।

এই বলিয়া ব্যোম পুনর্বার গুড়গুড়ি মুখে দিয়া টানিতে লাগিলেন।

শ্রীমতী দীপ্তি ব্যোমের প্রতি অবজ্ঞাকটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন— বিজ্ঞানে প্রাকৃতিক নির্বাচন বলিয়া একটা তত্ত্ব বাহির হইয়াছে। সেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম কেবল জন্তুদের মধ্যে নহে, মানুষের রচনার মধ্যেও খাটে। সেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রভাবেই ময়ূরীর কলাপের আবশ্যক হয় নাই, ময়ূরের পেখম ক্রমে প্রসারিত হইয়াছে। কবিতার পেখমও সেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল, কবিদিগের ষড়যন্ত্র নহে। অসভ্য হইতে সভ্য এমন কোন্ দেশ আছে যেখানে কবিত্ব স্বভাবতই ছন্দের মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠে নাই।

শ্রীযুক্ত সমীর এতক্ষণ মৃদুহাস্যমুখে চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। দীপ্তি যখন আমাদের আলোচনায় যোগ দিলেন, তখন তাঁহার মাথায় একটা ভাবের উদয় হইল। তিনি একটা সৃষ্টিছাড়া কথার অবতারণা করিলেন। তিনি বলিলেন— কৃত্রিমতাই মনুষ্যের সর্বপ্রধান গৌরব। মানুষ ছাড়া আর-কাহারও কৃত্রিম হইবার অধিকার নাই। গাছকে আপনার পল্লব প্রস্তুত করিতে হয় না, আকাশকে আপনার নীলিমা নির্মাণ করিতে হয় না, ময়ূরের পুচ্ছ প্রকৃতি স্বহস্তে চিত্রিত করিয়া দেন। কেবল মানুষকেই বিধাতা আপনার সৃজনকার্যের অ্যাপ্রেন্টিস করিয়া দিয়াছেন, তাহার প্রতি ছোটোখাটো সৃষ্টির ভার দিয়াছেন। সেই কার্যে যে যত দক্ষতা দেখাইয়াছে সে তত আদর পাইয়াছে। পদ্য গদ্য অপেক্ষা অধিক কৃত্রিম বটে ; তাহাতে মানুষের সৃষ্টি বেশি আছে ; তাহাতে বেশি রঙ ফলাইতে হইয়াছে, বেশি যত্ন করিতে হইয়াছে। আমাদের মনের মধ্যে যে বিশ্বকর্মা আছেন, যিনি আমাদের অন্তরের নিভৃত সৃজনকক্ষে বসিয়া নানা গঠন নানা বিন্যাস নানা প্রয়াস নানা প্রকাশচেষ্টায় সর্বদা নিযুক্ত আছেন, পদ্যে তাঁহারই নিপুণ হস্তের কারুকার্য অধিক আছে। সেই তাঁহার প্রধান গৌরব। অকৃত্রিম ভাষা জলকল্লোলের, অকৃত্রিম ভাষা পল্লবমর্মরের, কিন্তু মন যেখানে আছে সেখানে বহুযত্নরচিত কৃত্রিম ভাষা।

স্রোতস্বিনী অবহিত ছাত্রীর মতো সমীরের সমস্ত কথা শুনিলেন। তাঁহার

সুন্দর নম্র মুখের উপর একটা যেন নূতন আলোক আসিয়া পড়িল। অন্য দিন নিজের একটা মত বলিতে যেরূপ ইতস্তত করিতেন, আজ সেরূপ না করিয়া একেবারে আরম্ভ করিলেন— সমীরের কথায় আমার মনে একটা ভাবের উদয় হইয়াছে, আমি ঠিক পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিব কি না জানি না। সৃষ্টির যে অংশের সহিত আমাদের হৃদয়ের যোগ— অর্থাৎ, সৃষ্টির যে অংশ শুদ্ধমাত্র আমাদের মনে জ্ঞান সঞ্চার করে না, হৃদয়ে ভাব সঞ্চার করে— যেমন ফুলের সৌন্দর্য, পর্বতের মহত্ত্ব— সেই অংশে কতই নৈপুণ্য খেলাইতে হইয়াছে, কতই রঙ ফলাইতে কত আয়োজন করিতে হইয়াছে! ফুলের প্রত্যেক পাপড়িটিকে কত যত্নে সুগোল সুডোল করিতে হইয়াছে, তাহাকে বৃন্তের উপর কেমন সুন্দর বঙ্কিম ভঙ্গিতে দাঁড় করাইতে হইয়াছে, পর্বতের মাথায় চিরতুষারমুকুট পরাইয়া তাহাকে নীলাকাশের মধ্যে কেমন মহিমার সহিত আসীন করা হইয়াছে, পশ্চিমসমুদ্রতীরের সূর্যাস্তপটের উপর কত রঙের কত তুলি পড়িয়াছে। ভূতল হইতে নভস্তল পর্যন্ত কত সাজসজ্জা, কত রঙচঙ, কত ভাবভঙ্গি, তবে আমাদের এই ক্ষুদ্র মানুষের মন ভুলিয়াছে। ঈশ্বর তাঁহার রচনায় যেখানে প্রেম সৌন্দর্য মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, সেখানে তাঁহাকেও গুণপনা করিতে হইয়াছে। সেখানে তাঁহাকেও ধ্বনি এবং ছন্দ, বর্ণ এবং গন্ধ বহুযত্নে বিন্যাস করিতে হইয়াছে। অরণ্যের মধ্যে যে ফুল ফুটাইয়াছেন তাহাতে কত পাপড়ির অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়াছেন এবং আকাশপটে একটিমাত্র জ্যোতিঃপাত করিতে তাঁহাকে যে কেমন সুনির্দিষ্ট সুসংযত ছন্দ রচনা করিতে হইয়াছে বিজ্ঞান তাহার পদ ও অক্ষর গণনা করিতেছে। ভাব প্রকাশ করিতে মানুষকেও নানা নৈপুণ্য অবলম্বন করিতে হয়, শব্দের মধ্যে সংগীত আনিতে হয়, ছন্দ আনিতে হয়, সৌন্দর্য আনিতে হয়, তবে মনের কথা মনের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে। ইহাকে যদি কৃত্রিমতা বলে, তবে সমস্ত বিশ্বরচনা কৃত্রিম।

এই বলিয়া স্রোতস্বিনী আমার মুখের দিকে চাহিয়া যেন সাহায্য প্রার্থনা করিল— তাহার চোখের ভাবটা এই, আমি কী কতকগুলা বকিয়া গেলাম তাহার ঠিক নাই, তুমি ঐটেকে আর-একটু পরিষ্কার করিয়া বলো-না। এমন সময় ব্যোম হঠাৎ বলিয়া উঠিল— সমস্ত বিশ্বরচনা যে কৃত্রিম এমন মতও আছে। স্রোতস্বিনী যেটাকে ভাবের প্রকাশ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন, অর্থাৎ দৃশ্য শব্দ গন্ধ ইত্যাদি, সেটা যে মায়ামাত্র, অর্থাৎ আমাদের মনের কৃত্রিম রচনা এ কথা অপ্রমাণ করা বড়ো কঠিন।

ক্ষিতি মহা বিরক্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন— তোমরা সকলে মিলিয়া ধান ভানিতে শিবের গান তুলিয়াছ। কথাটা ছিল এই, ভাব প্রকাশের জন্য পদ্যের কোনো আবশ্যক আছে কি না। তোমরা তাহা হইতে একেবারে সমুদ্র পার হইয়া সৃষ্টিতত্ত্ব লয়তত্ত্ব

মায়াবাদ প্রভৃতি চোরাবালির মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছ। আমার বিশ্বাস, ভাব-প্রকাশের জন্য ছন্দের সৃষ্টি হয় নাই। ছোটো ছেলেরা যেমন ছড়া ভালোবাসে তাহার ভাবমাধুর্যের জন্য নহে, কেবল তাহার ছন্দোবদ্ধ ধ্বনির জন্য, তেমনি অসভ্য অবস্থায় অর্থহীন কথার ঝংকারমাত্রই কানে ভালো লাগিত। এইজন্য অর্থহীন ছড়াই মানুষের সর্বপ্রথম কবিত্ব। মানুষের এবং জাতির বয়স ক্রমে যতই বাড়িতে থাকে, ততই ছন্দের সঙ্গে অর্থের সংযোগ না করিলে তাহার সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও অনেক সময়ে মানুষের মধ্যে দুই-একটা গোপন ছায়াময় স্থানে বালক-অংশ থাকিয়া যায়; ধ্বনিপ্রিয়তা, ছন্দঃপ্রিয়তা সেই গুপ্ত বালকের স্বভাব। আমাদের বয়ঃপ্রাপ্ত অংশ অর্থ চাহে, ভাব চাহে; আমাদের অপরিণত অংশ ধ্বনি চাহে, ছন্দ চাহে।

দীপ্তি গ্রীবা বক্র করিয়া কহিলেন— ভাগ্যে আমাদের সমস্ত অংশ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উঠে না। মানুষের নাবালক-অংশটিকে আমি অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিই, তাহারই কল্যাণে জগতে যা কিছু মিষ্টত্ব আছে।

সমীর কহিলেন— যে ব্যক্তি একেবারে পুরোপুরি পাকিয়া গিয়াছে সে'ই জগতের জ্যাঠা ছেলে। কোনো রকমের খেলা, কোনো রকমের ছেলেমানুষি তাহার পছন্দসই নহে। আমাদের আধুনিক হিন্দুজাতটা পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে জ্যাঠা জাত, অত্যন্ত বেশি মাত্রায় পাকামি করিয়া থাকে, অথচ নানান বিষয়ে কাঁচা। জ্যাঠা ছেলের এবং জ্যাঠা জাতির উন্নতি হওয়া বড়ো দুরূহ; কারণ, তাহার মনের মধ্যে নম্রতা নাই। আমার এ কথাটা প্রাইভেট। কোথাও যেন প্রকাশ না হয়। আজকাল লোকের মেজাজ ভালো নয়।

আমি কহিলাম— যখন কলের জাঁতা চালাইয়া শহরের রাস্তা মেরামত হয়, তখন কাষ্ঠফলকে লেখা থাকে— কল চলিতেছে! সাবধান! আমি ক্ষিতিকে পূর্বে হইতে সাবধান করিয়া দিতেছি, আমি কল চালাইব। বাষ্পযানকে তিনি সর্বাপেক্ষা ভয় করেন, কিন্তু সেই কল্পনাবাষ্প-যোগে গতিবিধিই আমার সহজসাধ্য বোধ হয়। গদ্যপদ্যের প্রসঙ্গে আমি আর-একবার শিবের গান গাহিব। ইচ্ছা হয় শোনো।

গতির মধ্যে খুব একটা পরিমাণ-করা নিয়ম আছে। পেণ্ডুলম নিয়মিত তালে দুলিয়া থাকে। চলিবার সময় মানুষের পা মাত্রা রক্ষা করিয়া উঠে পড়ে এবং সেই সঙ্গে তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমান তাল ফেলিয়া গতির সামঞ্জস্য বিধান করিতে থাকে। সমুদ্রতরঙ্গের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড লয় আছে। এবং পৃথিবী এক মহাছন্দে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে—

ব্যোমচন্দ্র অকস্মাৎ আমাকে কথার মাঝখানে থামাইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন— স্থিতিই যথার্থ স্বাধীন, সে আপনার অটল গাম্ভীর্যে বিরাজ করে, কিন্তু গতিকে প্রতিপদে আপনাকে নিয়মে বাঁধিয়া চলিতে হয়। অথচ সাধারণের মধ্যে একটা ভ্রান্ত সংস্কার আছে যে, গতিই স্বাধীনতার যথার্থ স্বরূপ এবং স্থিতিই বন্ধন। তাহার কারণ, ইচ্ছাই মনের একমাত্র গতি এবং ইচ্ছা-অনুসারে চলাকেই মূঢ় লোকে স্বাধীনতা বলে। কিন্তু আমাদের পণ্ডিতেরা জানিতেন, ইচ্ছাই আমাদের সকল গতির কারণ, সকল বন্ধনের মূল ; এইজন্য মুক্তি অর্থাৎ চরম স্থিতি লাভ করিতে হইলে ওই ইচ্ছাটাকে গোড়া ঘেঁষিয়া কাটিয়া ফেলিতে তাঁহারা বিধান দেন, দেহমনের সর্বপ্রকার গতিরোধ করাই যোগসাধন।

সমীর ব্যোমের পৃষ্ঠে হাত দিয়া সহাস্যে কহিলেন— একটা মানুষ যখন একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছে, তখন মাঝখানে তাহার গতিরোধ করার নাম গোলযোগ-সাধন।

আমি কহিলাম— বৈজ্ঞানিক ক্ষিতির নিকট অবিদিত নাই যে, গতির সহিত গতির, এক কম্পনের সহিত অন্য কম্পনের ভারী একটা কুটুম্বিতা আছে। সা স্বরের তার বাজিয়া উঠিলে মা স্বরের তার কাঁপিয়া উঠে। আলোকতরঙ্গ, উত্তাপতরঙ্গ, ধ্বনি-তরঙ্গ, স্নায়ুতরঙ্গ, প্রভৃতি সকলপ্রকার তরঙ্গের মধ্যে এইরূপ একটা আত্মীয়তার বন্ধন আছে। আমাদের চেতনাও একটা তরঙ্গিত কম্পিত অবস্থা। এইজন্য বিশ্বসংসারের বিচিত্র কম্পনের সহিত তাহার যোগ আছে। ধ্বনি আসিয়া তাহার স্নায়ুদোলায় দোল দিয়া যায়, আলোকরশ্মি আসিয়া তাহার স্নায়ুতন্ত্রীতে অলৌকিক অঙ্গুলি আঘাত করে। তাহার চিরকম্পিত স্নায়ুজাল তাহাকে জগতের সমুদায় স্পন্দনের ছন্দে নানাসূত্রে বাঁধিয়া জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে।

হৃদয়ের বৃত্তি, ইংরাজিতে যাহাকে ইমোশন বলে, তাহা আমাদের হৃদয়ের আবেগ, অর্থাৎ গতি ; তাহার সহিতও অন্যান্য বিশ্বকম্পনের একটা মহা ঐক্য আছে। আলোকের সহিত, বর্ণের সহিত, ধ্বনির সহিত তাহার একটা স্পন্দনের যোগ, একটা স্বরের মিল আছে।

এইজন্য সংগীত এমন অব্যবহিতভাবে আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে, উভয়ের মধ্যে মিলন হইতে অধিক বিলম্ব হয় না। ঝড়ে এবং সমুদ্রে যেমন মাতামাতি হয়, গানে এবং প্রাণে তেমনি একটি নিবিড় সংঘর্ষ হইতে থাকে।

কারণ, সংগীত আপনার কম্পন সঞ্চার করিয়া আমাদের সমস্ত অন্তরকে চঞ্চল করিয়া তোলে। একটা অনির্দেশ্য আবেগে আমাদের প্রাণকে পূর্ণ করিয়া দেয়। মন উদাস হইয়া যায়। অনেক কবি এই অপরূপ ভাবকে অনন্তের জন্য আকাঙ্ক্ষা বলিয়া নাম

দিয়া থাকেন। আমিও কখনো কখনো এমনতরো ভাব অনুভব করিয়াছি এবং এমনতরো ভাষাও প্রয়োগ করিয়া থাকিব। কেবল সংগীত কেন, সন্ধ্যাকাশের সূর্যাস্তচ্ছটাও কতবার আমার অন্তরের মধ্যে অনন্ত বিশ্বজগতের হৃৎস্পন্দন সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে; যে-একটি অনির্বচনীয় বৃহৎ সংগীত ধ্বনিত করিয়াছে তাহার সহিত আমার প্রতিদিনের সুখদুঃখের কোনো যোগ নাই, তাহা বিশ্বেশ্বরের মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নিখিল চরাচরের সামগান। কেবল সংগীত এবং সূর্যাস্ত কেন, যখন কোনো প্রেম আমাদের সমস্ত অস্তিত্বকে বিচলিত করিয়া তোলে, তখন তাহাও আমাদিগকে সংসারের ক্ষুদ্র বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অনন্তের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়। তাহা একটা বৃহৎ উপাসনার আকার ধারণ করে, দেশকালের শিলামুখ বিদীর্ণ করিয়া উৎসের মতো অনন্তের দিকে উৎসারিত হইতে থাকে।

এইরূপে প্রবল স্পন্দনে আমাদিগকে বিশ্বস্পন্দনের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়। বৃহৎ সৈন্য যেমন পরস্পরের নিকট হইতে ভাবের উন্মত্ততা আকর্ষণ করিয়া লইয়া একপ্রাণ হইয়া উঠে, তেমনি বিশ্বের কম্পন সৌন্দর্যযোগে যখন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হয় তখন আমরা সমস্ত জগতের সহিত এক তালে পা ফেলিতে থাকি, নিখিলের প্রত্যেক কম্পমান পরমাণুর সহিত এক দলে মিশিয়া অনিবার্য আবেগে অনন্তের দিকে ধাবিত হই।

এই ভাবকে কবিরা কত ভাষায় কত উপায়ে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং কত লোকে তাহা কিছুই বুঝিতে পারে নাই, মনে করিয়াছে উহা কবিদের কাব্যকুয়াশা মাত্র।

কারণ, ভাষার তো হৃদয়ের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ নাই, তাহাকে মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। সে দূতমাত্র, হৃদয়ের খাস-মহলে তাহার অধিকার নাই, আম-দরবারে আসিয়া সে আপনার বার্তা জানাইয়া যায় মাত্র। তাহাকে বুঝিতে, অর্থ করিতে অনেকটা সময় যায়। কিন্তু সংগীত একেবারে এক ইঙ্গিতেই হৃদয়কে আলিঙ্গন করিয়া ধরে।

এইজন্য কবিরা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে একটা সংগীত নিযুক্ত করিয়া দেন। সে আপন মায়াস্পর্শে হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করিয়া দেয়। ছন্দে এবং ধ্বনিতে যখন হৃদয় স্বতই বিচলিত হইয়া উঠে তখন ভাষার কার্য অনেক সহজ হইয়া আসে। দূরে যখন বাঁশি বাজিতেছে, পুষ্পকানন যখন চোখের সম্মুখে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন প্রেমের কথার অর্থ কত সহজে বোঝা যায়। সৌন্দর্য যেমন মুহূর্তের মধ্যে হৃদয়ের সহিত ভাবের পরিচয় সাধন করিতে পারে এমন আর কেহ নয়।

*

সুর এবং তাল, ছন্দ এবং ধ্বনি, সংগীতের দুই অংশ। গ্রীকরা 'জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সংগীত' বলিয়া একটা কথা বলিয়া গিয়াছেন, শেক্‌স্‌পিয়রেও তাহার উল্লেখ আছে। তাহার কারণ পূর্বেই বলিয়াছি যে, একটা গতির সঙ্গে আর-একটা গতির বড়ো নিকট সম্বন্ধ। অনন্ত আকাশ জুড়িয়া চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা তালে তালে নৃত্য করিয়া চলিয়াছে। তাহার বিশ্বব্যাপী মহাসংগীতটি যেন কানে শোনা যায় না, চোখে দেখা যায়। ছন্দ সংগীতের একটা রূপ। কবিতায় সেই ছন্দ এবং ধ্বনি দুই মিলিয়া ভাবকে কম্পান্বিত এবং জীবন্ত করিয়া তোলে, বাহিরের ভাষাকেও হৃদয়ের ধন করিয়া দেয়। যদি কৃত্রিম কিছু হয় তো ভাষাই কৃত্রিম, সৌন্দর্য কৃত্রিম নহে। ভাষা মানুষের, সৌন্দর্য সমস্ত জগতের এবং জগতের সৃষ্টিকর্তার।

শ্রীমতী স্রোতস্বিনী আনন্দোজ্জ্বলমুখে কহিলেন— নাট্যাভিনয়ে আমাদের হৃদয় বিচলিত করিবার অনেকগুলি উপকরণ একত্রে বর্তমান থাকে। সংগীত, আলোক, দৃশ্যপট, সুন্দর সাজসজ্জা, সকলে মিলিয়া নানা দিক হইতে আমাদের চিত্তকে আঘাত করিয়া চঞ্চল করে; তাহার মধ্যে একটা অবিশ্রাম ভাবস্রোত নানা মূর্তি ধারণ করিয়া, নানা কার্যরূপে প্রবাহিত হইয়া চলে— আমাদের মনটা নাট্যপ্রবাহের মধ্যে একেবারে নিরুপায় হইয়া আত্মবিসর্জন করে এবং দ্রুতবেগে ভাসিয়া চলিয়া যায়। অভিনয়স্থলে দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন আর্টের মধ্যে কতটা সহযোগিতা আছে, সেখানে সংগীত সাহিত্য চিত্রবিদ্যা এবং নাট্যকলা এক উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য সম্মিলিত হয়, বোধ হয় এমন আর কোথাও দেখা যায় না।

ফাল্গুন ১২৯৯

কাব্যের তাৎপর্য

স্রোতস্বিনী আমাকে কহিলেন— কচদেবযানীসংবাদ সম্বন্ধে তুমি যে কবিতা লিখিয়াছ তাহা তোমার মুখে শুনিতে ইচ্ছা করি।

শুনিয়া আমি মনে মনে কিঞ্চিৎ গর্ব অনুভব করিলাম, কিন্তু দর্পহারী মধুসূদন তখন সজাগ ছিলেন, তাই দীপ্তি অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন— তুমি রাগ করিয়ো না, সে কবিতাটার কোনো তাৎপর্য কিম্বা উদ্দেশ্য আমি তো কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ও লেখাটা ভালো হয় নাই।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম; মনে মনে কহিলাম, আর-একটু বিনয়ের সহিত মত প্রকাশ করিলে সংসারের বিশেষ ক্ষতি অথবা সত্যের বিশেষ অপলাপ হইত না, কারণ, লেখার দোষ থাকাও যেমন আশ্চর্য নহে তেমনি পাঠকের কাব্যবোধশক্তির

খর্বতাও নিতান্তই অসম্ভব বলিতে পারি না। মুখে বলিলাম— যদিও নিজের রচনা সম্বন্ধে লেখকের মনে অনেক সময়ে অসন্দিগ্ধ মত থাকে, তথাপি তাহা যে ভ্রান্ত হইতে পারে ইতিহাসে এমন অনেক প্রমাণ আছে; অপর পক্ষে সমালোচক-সম্প্রদায়ও যে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত নহে ইতিহাসে সে প্রমাণেরও কিছুমাত্র অসদ্ভাব নাই। অতএব কেবল এইটুকু নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, আমার এ লেখা ঠিক তোমার মনের মতো হয় নাই; সে নিশ্চয় আমার দুর্ভাগ্য, হয়তো তোমার দুর্ভাগ্যও হইতে পারে।

দীপ্তি গম্ভীরমুখে অত্যন্ত সংক্ষেপে কহিলেন— তা হইবে। বলিয়া একখানা বই টানিয়া লইয়া পড়িতে লাগিলেন।

ইহার পরে স্রোতস্বিনী আমাকে সেই কবিতা পড়িবার জন্য আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করিলেন না।

ব্যোম জানালার বাহিরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া যেন সুদূর আকাশতলবর্তী কোনো-এক কাল্পনিক পুরুষকে সম্বোধন করিয়া কহিল— যদি তাৎপর্যের কথা বলো, তোমার এবারকার কবিতার আমি একটা তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াছি।

ক্ষিতি কহিল— আগে বিষয়টা কী বলো দেখি। কবিতাটা পড়া হয় নাই সে কথাটা কবিবরের ভয়ে এতক্ষণ গোপন করিয়াছিলাম, এখন ফাঁস করিতে হইল।

ব্যোম কহিল— শুক্রাচার্যের নিকট হইতে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত বৃহস্পতির পুত্র কচকে দেবতারা দৈত্যগুরুর আশ্রমে প্রেরণ করেন। সেখানে কচ সহস্রবর্ষ নৃত্যগীত-বাদ্য-দ্বারা শুক্রতনয়া দেবযানীর মনোরঞ্জন করিয়া সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করিলেন। অবশেষে যখন বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল তখন দেবযানী তাঁহাকে প্রেম জানাইয়া আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন। দেবযানীর প্রতি অন্তরের আসক্তি-সত্ত্বেও কচ নিষেধ না মানিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। গল্পটুকু এই। মহাভারতের সহিত একটুখানি অনৈক্য আছে, কিন্তু সে সামান্য।

ক্ষিতি কিঞ্চিৎ কাতরমুখে কহিল— গল্পটি বারো হাত কাঁকুড়ের অপেক্ষা বড়ো হইবে না, কিন্তু আশঙ্কা করিতেছি ইহা হইতে তেরো হাত পরিমাণের তাৎপর্য বাহির হইয়া পড়িবে।

ব্যোম ক্ষিতির কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিয়া গেল— কথাটা দেহ এবং আত্মা লইয়া।

শুনিয়া সকলেই সশঙ্কিত হইয়া উঠিল।

ক্ষিতি কহিল— আমি এইবেলা আমার দেহ এবং আত্মা লইয়া মানে মানে বিদায় হইলাম।

সমীর দুই হাতে তাহার জামা ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া কহিল— সংকটের সময় আমাদিগকে একলা ফেলিয়া যাও কোথায় ?

ব্যোম কহিল— জীব স্বর্গ হইতে এই সংসারাশ্রমে আসিয়াছে। সে এখানকার সুখদুঃখ বিপদ-সম্পদ হইতে শিক্ষা লাভ করে। যতদিন ছাত্র-অবস্থায় থাকে ততদিন তাহাকে এই আশ্রমকন্যা দেহটার মন জোগাইয়া চলিতে হয়। মন জোগাইবার অপূর্ব বিদ্যা সে জানে। দেহের ইন্দ্রিয়বীণায় সে এমন স্বর্গীয় সংগীত বাজাইতে থাকে যে, ধরাতলে সৌন্দর্যের নন্দনমরীচিকা বিস্তারিত হইয়া যায় এবং সমুদয় শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ আপন জড়শক্তির যন্ত্রনিয়ম পরিহারপূর্বক অপরূপ স্বর্গীয় নৃত্যে স্পন্দিত হইতে থাকে।

বলিতে বলিতে স্বপ্নাবিষ্ট শূন্যদৃষ্টি ব্যোম উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, চৌকিতে সরল হইয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল— যদি এমনভাবে দেখো, তবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা অনন্তকালীন প্রেমাভিনয় দেখিতে পাইবে। জীব তাহার মূঢ় অবোধ নির্ভরপরায়ণা সঙ্গিনীটিকে কেমন করিয়া পাগল করিতেছে দেখো। দেহের প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে এমন একটি আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার করিয়া দিতেছে, দেহধর্মের দ্বারা যে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি নাই। তাহার চক্ষে যে সৌন্দর্য আনিয়া দিতেছে দৃষ্টিশক্তির দ্বারা তাহার সীমা পাওয়া যায় না, তাই সে বলিতেছ 'জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল' ; তাহার কর্ণে যে সংগীত আনিয়া দিতেছে শ্রবণশক্তির দ্বারা তাহার আয়ত্ত হইতে পারে না, তাই সে ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে 'সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ শ্রুতিপথে পরশ না গেল'। আবার এই প্রাণপ্রদীপ্ত মূঢ় সঙ্গিনীটিও লতার ন্যায় সহস্র শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া প্রেমপ্রতপ্ত সুকোমল আলিঙ্গনপাশে জীবকে আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন করিয়া ধরে ; অল্পে অল্পে তাহাকে মুগ্ধ করিয়া আনে ; অশ্রান্ত যত্নে ছায়ার মতো সঙ্গে থাকিয়া বিবিধ উপচারে তাহার সেবা করে ; প্রবাসকে যাহাতে প্রবাস জ্ঞান না হয়, যাহাতে আতিথ্যের ত্রুটি না হইতে পারে, সেজন্য সর্বদাই সে তাহার চক্ষুকর্ণহস্তপদকে সতর্ক করিয়া রাখে। এত ভালোবাসার পরে তবু একদিন জীব এই চিরানুগতা অনন্যাসক্তা দেহলতাকে ধূলিশায়িনী করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। বলে, প্রিয়ে, তোমাকে আমি আত্মনির্বিশেষে ভালোবাসি, তবু আমি কেবল একটি দীর্ঘনিশ্বাসমাত্র ফেলিয়া তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব। কায়া তখন তাহার চরণ জড়াইয়া বলে, বন্ধু, অবশেষে আজ যদি আমাকে ধূলিতলে ধূলিমুষ্টির মতো ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইবে, তবে এতদিন তোমার প্রেমে কেন আমাকে এমন মহিমাশালিনী করিয়া তুলিয়াছিলে ? হায়, আমি তোমার যোগ্য নই, কিন্তু তুমি কেন আমার এই প্রাণপ্রদীপদীপ্ত নিভৃত সোনার মন্দিরে একদা রহস্যান্ধকার নিশীথে অনন্ত সমুদ্র পার হইয়া অভিসারে

আসিয়াছিলে? আমার কোন্ গুণে তোমাকে মুগ্ধ করিয়াছিলাম? এই করুণ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া এই বিদেশী কোথায় চলিয়া যায় তাহা কেহ জানে না। সেই আজন্মমিলনবন্ধনের অবসান, সেই মাথুরযাত্রার বিদায়ের দিন, সেই কায়ার সহিত কায়াধিরাজের শেষ সম্ভাষণ, তাহার মতো এমন শোচনীয় বিরহদৃশ্য কোন্ প্রেমকাব্যে বর্ণিত আছে!

ক্ষিতির মুখভাব হইতে একটা আসন্ন পরিহাসের আশঙ্কা করিয়া ব্যোম কহিল— তোমরা ইহাকে প্রেম বলিয়া মনে কর না; মনে করিতেছ আমি কেবল রূপক-অবলম্বনে কথা কহিতেছি। তাহা নহে। জগতে ইহাই সর্বপ্রথম প্রেম এবং জীবনের সর্বপ্রথম প্রেম সর্বাপেক্ষা যেমন প্রবল হইয়া থাকে জগতের সর্বপ্রথম প্রেমও সেইরূপ সরল অথচ সেইরূপ প্রবল। এই আদিপ্রেম, এই দেহের ভালোবাসা, যখন সংসারে দেখা দিয়াছিল তখনও পৃথিবীতে জলে স্থলে বিভাগ হয় নাই। সেদিন কোনো কবি উপস্থিত ছিল না, কোনো ঐতিহাসিক জন্মগ্রহণ করে নাই, কিন্তু সেইদিন এই জলময় পঙ্কময় অপরিণত ধরাতলে প্রথম ঘোষিত হইল যে, এ জগৎ যন্ত্রজগৎমাত্র নহে; প্রেম-নামক এক অনির্বচনীয় আনন্দময় বেদনাময় ইচ্ছাশক্তি পঙ্কের মধ্য হইতে পঙ্কজবন জাগ্রত করিয়া তুলিতেছেন, এবং সেই পঙ্কজবনের উপরে আজ ভক্তের চক্ষে সৌন্দর্যরূপা লক্ষ্মী এবং ভাবরূপা সরস্বতীর অধিষ্ঠান হইয়াছে।

ক্ষিতি কহিল— আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে যে এমন একটা বৃহৎ কাব্যকাণ্ড চলিতেছে শুনিয়া পুলকিত হইলাম, কিন্তু সরলা কায়াটির প্রতি চঞ্চলস্বভাব আত্মাটার ব্যবহার সন্তোষজনক নহে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমি একান্তমনে আশা করি যেন আমার জীবাত্মা এরূপ চপলতা প্রকাশ না করিয়া অন্তত কিছু দীর্ঘকাল দেহ-দেবযানীর আশ্রমে স্থায়ীভাবে বাস করে। তোমরাও সেই আশীর্বাদ করো।

সমীর কহিল— ভ্রাতঃ ব্যোম, তোমার মুখে তো কখনো শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা শুনি নাই। তুমি কেন আজ এমন খৃস্টানের মতো কথা কহিলে? জীবাত্মা স্বর্গ হইতে সংসারাশ্রমে প্রেরিত হইয়া দেহের সঙ্গলাভ করিয়া সুখদুঃখের মধ্য দিয়া পরিণতি প্রাপ্ত হইতেছে, এ-সকল মত তো তোমার পূর্বমতের সহিত মিলিতেছে না।

ব্যোম কহিল— এ-সকল কথায় মতের মিল করিবার চেষ্টা করিয়ো না। এ-সকল গোড়াকার কথা লইয়া আমি কোনো মতের সহিতই বিবাদ করি না। জীবনযাত্রার ব্যবসায়ে প্রত্যেক জাতিই নিজরাজ্য-প্রচলিত মুদ্রা লইয়া মূলধন সংগ্রহ করে— কথাটা এই, দেখিতে হইবে ব্যাবসা চলে কি না। জীব সুখ দুঃখ বিপদ সম্পদের মধ্যে শিক্ষালাভ করিবার জন্য সংসারশিক্ষাশালায় প্রেরিত হইয়াছে এই মতটিকে মূলধন করিয়া লইয়া

জীবনযাত্রা সুচারুরূপে চলে, অতএব আমার মতে এ মুদ্রাটি মেকি নহে। আবার যখন প্রসঙ্গক্রমে অবসর উপস্থিত হইবে তখন দেখাইয়া দিব যে, আমি যে ব্যাঙ্ক-নোটটি লইয়া জীবনবাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি বিশ্ববিধাতার ব্যাঙ্কে সে নোটও গ্রাহ্য হইয়া থাকে।

ক্ষিতি করুণস্বরে কহিল— দোহাই ভাই, তোমার মুখে প্রেমের কথাই যথেষ্ট কঠিন বোধ হয়, অতঃপর বাণিজ্যের কথা যদি অবতারণ কর তবে আমাকেও এখান হইতে অবতারণ করিতে হইবে; আমি অত্যন্ত দুর্বল বোধ করিতেছি। যদি অবসর পাই তবে আমিও একটা তাৎপর্য শুনাইতে পারি।

ব্যোম চৌকিতে ঠেসান দিয়া বসিয়া জানলার উপর দুই পা তুলিয়া দিল। ক্ষিতি কহিল— আমি দেখিতেছি এভোল্যুশন থিয়োরি অর্থাৎ অভিব্যক্তিবাদের মোট কথাটা এই কবিতার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। সঞ্জীবনী বিদ্যাটার অর্থ, বাঁচিয়া থাকিবার বিদ্যা। সংসারে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে একটা লোক সেই বিদ্যাটা অহরহ অভ্যাস করিতেছে— সহস্র বৎসর কেন, লক্ষসহস্র বৎসর ধরিয়া। কিন্তু যাহাকে অবলম্বন করিয়া সে সেই বিদ্যা অভ্যাস করিতেছে সেই প্রাণীবংশের প্রতি তাহার কেবল ক্ষণিক প্রেম দেখা যায়। যেই একটা পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইয়া যায় অমনি নিষ্ঠুর প্রেমিক চঞ্চল অতিথি তাহাকে অকাতরে ধ্বংসের মুখে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যায়। পৃথিবীর স্তরে স্তরে এই নির্দয় বিদায়ের বিলাপগান প্রস্তরপটে অঙ্কিত রহিয়াছে।—

দীপ্তি ক্ষিতির কথা শেষ না হইতে হইতেই বিরক্ত হইয়া কহিল— তোমরা এমন করিয়া যদি তাৎপর্য বাহির করিতে থাক তাহা হইলে তাৎপর্যের সীমা থাকে না। কাষ্ঠকে দগ্ধ করিয়া দিয়া অগ্নির বিদায়গ্রহণ, গুটি কাটিয়া ফেলিয়া প্রজাপতির পলায়ন, ফুলকে বিশীর্ণ করিয়া ফলের বহিরাগমন, বীজকে বিদীর্ণ করিয়া অঙ্কুরের উদ্গম, এমন রাশি রাশি তাৎপর্য স্তূপাকার করা যাইতে পারে।

ব্যোম গম্ভীরভাবে কহিতে লাগিল— ঠিক বটে। ওগুলা তাৎপর্য নহে, দৃষ্টান্ত মাত্র। উহাদের ভিতরকার আসল কথাটা এই, সংসারে আমরা অন্তত দুই পা ব্যবহার না করিয়া চলিতে পারি না। বাম পদ যখন পশ্চাতে আবদ্ধ থাকে দক্ষিণ পদ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যায়, আবার দক্ষিণ পদ সম্মুখে আবদ্ধ হইলে পর বাম পদ আপন বন্ধন ছেদন করিয়া অগ্রে ধাবিত হয়। আমরা একবার করিয়া আপনাকে বাঁধি, আবার পরক্ষণেই সেই বন্ধন ছেদন করি। আমাদিগকে ভালোবাসিতেও হইবে এবং সে ভালোবাসা কাটিতেও হইবে— সংসারের এই মহত্তম দুঃখ, এবং এই মহৎ দুঃখের মধ্য দিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হয়। সমাজ সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। নূতন নিয়ম

যখন কালক্রমে প্রাচীন প্রথারূপে আমাদিগকে এক স্থানে আবদ্ধ করে তখন সমাজবিপ্লব আসিয়া তাহাকে উৎপাটনপূর্বক আমাদিগকে মুক্তি দান করে। যে পা ফেলি সে পা পরক্ষণে তুলিয়া লইতে হয় নতুবা চলা হয় না, অতএব অগ্রসর হওয়ার মধ্যে পদে পদে বিচ্ছেদবেদনা, ইহা বিধাতার বিধান।

সমীর কহিল— গল্পটার সর্বশেষে যে-একটি অভিশাপ আছে তোমরা কেহ সেটার উল্লেখ কর নাই। কচ যখন বিদ্যালাভ করিয়া দেবযানীর প্রেমবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া যাত্রা করেন তখন দেবযানী তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন যে, তুমি যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে সে বিদ্যা অন্যকে শিক্ষা দিতে পারিবে, কিন্তু নিজে ব্যবহার করিতে পারিবে না ; আমি সেই অভিশাপ-সমেত একটা তাৎপর্য বাহির করিয়াছি, যদি ধৈর্য থাকে তো বলি।

ক্ষিতি কহিল— ধৈর্য থাকিবে কি না পূর্বে হইতে বলিতে পারি না। প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া শেষে প্রতিজ্ঞা রক্ষা না হইতেও পারে। তুমি তো আরম্ভ করিয়া দাও, শেষে যদি অবস্থা বুঝিয়া তোমার দয়ার সঞ্চার হয় থামিয়া গেলেই হইবে।

সমীর কহিল— ভালো করিয়া জীবন ধারণ করিবার বিদ্যাকে সঞ্জীবনী বিদ্যা বলা যাক। মনে করা যাক কোনো কবি সেই বিদ্যা নিজে শিখিয়া অন্যকে দান করিবার জন্য জগতে আসিয়াছে। সে তাহার সহজ স্বর্গীয় ক্ষমতায় সংসারকে বিমুগ্ধ করিয়া সংসারের কাছ হইতে সেই বিদ্যা উদ্ধার করিয়া লইল। সে যে সংসারকে ভালোবাসিল না তাহা নহে, কিন্তু সংসার যখন তাহাকে বলিল, তুমি আমার বন্ধনে ধরা দাও, সে কহিল, ধরা যদি দিই, তোমার আবর্তের মধ্যে যদি আকৃষ্ট হই, তাহা হইলে এ সঞ্জীবনী বিদ্যা আমি শিখাইতে পারিব না ; সংসারে সকলের মধ্যে থাকিয়াও আপনাকে বিচ্ছিন্ন রাখিতে হইবে। তখন সংসার তাহাকে অভিশাপ দিল, তুমি যে বিদ্যা আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ সে বিদ্যা অন্যকে দান করিতে পারিবে, কিন্তু নিজে ব্যবহার করিতে পারিবে না। সংসারের এই অভিশাপ থাকাতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, গুরুর শিক্ষা ছাত্রের কাজে লাগিতেছে, কিন্তু সংসারজ্ঞান নিজের জীবনে ব্যবহার করিতে তিনি বালকের ন্যায় অপটু। তাহার কারণ, নির্লিপ্তভাবে বাহির হইতে বিদ্যা শিখিলে বিদ্যাটা ভালো করিয়া পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সর্বদা কাজের মধ্যে লিপ্ত হইয়া না থাকিলে তাহার প্রয়োগ-শিক্ষা হয় না। সেইজন্য পুরাকালে ব্রাহ্মণ ছিলেন মন্ত্রী, কিন্তু ক্ষত্রিয় রাজা তাঁহার মন্ত্রণা কাজে প্রয়োগ করিতেন। ব্রাহ্মণকে রাজাসনে বসাইয়া দিলে ব্রাহ্মণও অগাধ জলে পড়িত এবং রাজ্যকেও অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিত।

তোমরা যে-সকল কথা তুলিয়াছিলে সেগুলা বড়ো বেশি সাধারণ কথা। মনে করো যদি বলা যায়, রামায়ণের তাৎপর্য এই যে রাজার গৃহে জন্মিয়া অনেকে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, অথবা শকুন্তলার তাৎপর্য এই যে উপযুক্ত অবসরে স্ত্রীপুরুষের চিত্তে পরস্পরের প্রতি প্রেমের সঞ্চার হওয়া অসম্ভব নহে, তবে সেটাকে একটা নূতন শিক্ষা বা বিশেষ বার্তা বলা যায় না।

স্রোতস্বিনী কিঞ্চিৎ ইতস্তত করিয়া কহিল— আমার তো মনে হয় সেই-সকল সাধারণ কথাই কবিতার কথা। রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও, সর্বপ্রকার সুখের সম্ভাবনা-সত্ত্বেও, আমৃত্যুকাল অসীম দুঃখ রাম সীতাকে সংকট হইতে সংকটান্তরে ব্যাধের ন্যায় অনুসরণ করিয়া ফিরিয়াছে; সংসারের এই অত্যন্ত সম্ভবপর, মানবাদৃষ্টের এই অত্যন্ত পুরাতন দুঃখকাহিনীতেই পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট এবং আর্দ্র হইয়াছে। শকুন্তলার প্রেমদৃশ্যের মধ্যে বাস্তবিকই কোনো নূতন শিক্ষা বা বিশেষ বার্তা নাই, কেবল এই নিরতিশয় প্রাচীন এবং সাধারণ কথাটি আছে যে, শুভ অথবা অশুভ অবসরে প্রেম অলক্ষিতে অনিবার্য বেগে আসিয়া দৃঢ়বন্ধনে স্ত্রীপুরুষের হৃদয় এক করিয়া দেয়। এই অত্যন্ত সাধারণ কথা থাকাতেই সর্বসাধারণে উহার রসভোগ করিয়া আসিতেছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের বিশেষ অর্থ এই যে, মৃত্যু এই জীবজন্তু-তরুলতা-তৃণাচ্ছাদিত বসুমতীর বস্ত্র আকর্ষণ করিতেছে, কিন্তু বিধাতার আশীর্বাদে কোনোকালে তাহার বসনাঞ্চলের অন্ত হইতেছে না, চিরদিনই সে প্রাণময় সৌন্দর্যময় নববস্ত্রে ভূষিত থাকিতেছে। কিন্তু সভাপর্বে যেখানে আমাদের হৃৎপিণ্ডের রক্ত তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং অবশেষে সংকটাপন্ন ভক্তের প্রতি দেবতার কৃপায় দুই চক্ষু অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়াছিল, সে কি এই নূতন এবং বিশেষ অর্থ গ্রহণ করিয়া? না, অত্যাচারপীড়িত রমণীর লজ্জা ও সেই লজ্জা-নিবারণ-নামক অত্যন্ত সাধারণ স্বাভাবিক এবং পুরাতন কথায়? কচ-দেবযানী-সংবাদেও মানবহৃদয়ের এক অতি চিরন্তন এবং সাধারণ বিষাদকাহিনী বিবৃত আছে, সেটাকে যাঁহারা অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন এবং বিশেষ তত্ত্বকেই প্রাধান্য দেন তাঁহারা কাব্যরসের অধিকারী নহেন।

সমীর হাসিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন— শ্রীমতী স্রোতস্বিনী আমাদিগকে কাব্যরসের অধিকার-সীমা হইতে একেবারে নির্বাসিত করিয়া দিলেন, এক্ষণে স্বয়ং কবি কী বিচার করেন একবার শুনা যাক।

স্রোতস্বিনী অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া বারম্বার এই অপবাদের প্রতিবাদ করিলেন।

আমি কহিলাম— এই পর্যন্ত বলিতে পারি, যখন কবিতাটি লিখিতে বসিয়াছিলাম

তখন কোনো অর্থই মাথায় ছিল না, তোমাদের কল্যাণে এখন দেখিতেছি লেখাটা বড়ো নিরর্থক হয় নাই— অর্থ অভিধানে কুলাইয়া উঠিতেছে না। কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির সৃজনশক্তি পাঠকের সৃজনশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়; তখন স্ব স্ব প্রকৃতি -অনুসারে কেহ বা সৌন্দর্য, কেহ বা নীতি, কেহ বা তত্ত্ব সৃজন করিতে থাকেন। এ যেন আতশবাজিতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া— কাব্য সেই অগ্নিশিখা, পাঠকদের মন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আতশবাজি। আগুন ধরিবা মাত্র কেহ বা হাউইয়ের মতো একেবারে আকাশে উড়িয়া যায়, কেহ বা তুবড়ির মতো উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, কেহ বা বোমার মতো আওয়াজ করিতে থাকে। তথাপি মোটের উপর শ্রীমতী স্রোতস্বিনীর সহিত আমার মতবিরোধ দেখিতেছি না। অনেকে বলেন, আঁঠিই ফলের প্রধান অংশ, এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা তাহার প্রমাণ করাও যায়। কিন্তু তথাপি অনেক রসজ্ঞ ব্যক্তি ফলের শস্যটি খাইয়া তাহার আঁঠি ফেলিয়া দেন। তেমনি কোনো কাব্যের মধ্যে যদি বা কোনো বিশেষ শিক্ষা থাকে তথাপি কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি তাহার রসপূর্ণ কাব্যাংশটুকু লইয়া শিক্ষাংশটুকু ফেলিয়া দিলে কেহ তাঁহাকে দোষ দিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা আগ্রহসহকারে কেবল ঐ শিক্ষাংশটুকুই বাহির করিতে চাহেন আশীর্বাদ করি তাঁহারাও সফল হউন এবং সুখে থাকুন। আনন্দ কাহাকেও বলপূর্বক দেওয়া যায় না। কুসুম্ভফুল হইতে কেহ বা তাহার রঙ বাহির করে, কেহ বা তৈলের জন্য তাহার বীজ বাহির করে, কেহ বা মুগ্ধনেত্রে তাহার শোভা দেখে। কাব্য হইতে কেহ বা ইতিহাস আকর্ষণ করেন, কেহ বা দর্শন উৎপাটন করেন, কেহ বা নীতি কেহ বা বিষয়জ্ঞান উদ্‌ঘাটন করিয়া থাকেন, আবার কেহ বা কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারেন না— যিনি যাহা পাইলেন তাহাই লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে ঘরে ফিরিতে পারেন, কাহারও সহিত বিরোধের আবশ্যক দেখি না— বিরোধে ফলও নাই।

অগ্রহায়ণ ১৩০১

প্রাঞ্জলতা

স্রোতস্বিনী কোনো-এক বিখ্যাত ইংরাজ কবির উল্লেখ করিয়া বলিলেন— কে জানে, তাঁহার রচনা আমার কাছে ভালো লাগে না।

দীপ্তি আরও প্রবলতরভাবে স্রোতস্বিনীর মত সমর্থন করিলেন।

সমীর কখনো পারতপক্ষে মেয়েদের কোনো কথার স্পষ্ট প্রতিবাদ করে না।

তাই সে একটু হাসিয়া ইতস্তত করিয়া কহিল— কিন্তু অনেক বড়ো বড়ো সমালোচক তাঁহাকে খুব উচ্চ আসন দিয়া থাকেন।

দীপ্তি কহিলেন— আগুন যে পোড়ায় তাহা ভালো করিয়া বুঝিবার জন্য কোনো সমালোচকের সাহায্য আবশ্যক করে না, তাহা নিজের বাম হস্তের কড়ে আঙুলের ডগার দ্বারাও বোঝা যায়; ভালো কবিতার ভালোত্ব যদি তেমনি অবহেলে না বুঝিতে পারি তবে আমি তাহার সমালোচনা পড়া আবশ্যক বোধ করি না।

আগুনের যে পোড়াইবার ক্ষমতা আছে সমীর তাহা জানিত, এইজন্য সে চুপ করিয়া রহিল; কিন্তু ব্যোম বেচারার সে-সকল বিষয়ে কোনোরূপ কাণ্ডজ্ঞান ছিল না, এইজন্য সে উচ্চস্বরে আপন স্বগত-উক্তি আরম্ভ করিয়া দিল।

সে বলিল— মানুষের মন মানুষকে ছাড়াইয়া চলে, অনেক সময় তাহাকে নাগাল পাওয়া যায় না—

ক্ষিতি তাহাকে বাধা দিয়া কহিল— ত্রেতাযুগে হনুমানের শতযোজন লাঙ্গুল শ্রীমান হনুমানজিউকে ছাড়াইয়া বহু দূরে গিয়া পৌঁছিত; লাঙ্গুলের ডগাটুকুতে যদি উকুন বসিত তবে তাহা চুলকাইয়া আসিবার জন্য ঘোড়ার ডাক বসাইতে হইত। মানুষের মন হনুমানের লাঙ্গুলের অপেক্ষাও সুদীর্ঘ, সেইজন্য এক-এক সময়ে মন যেখানে গিয়া পৌঁছায়, সমালোচকের ঘোড়ার ডাক ব্যতীত সেখানে হাত পৌঁছে না। লেজের সঙ্গে মনের প্রভেদ এই যে, মনটা আগে আগে চলে এবং লেজটা পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। এইজন্যই জগতে লেজের এত লাঞ্ছনা এবং মনের এত মাহাত্ম্য।

ক্ষিতির কথা শেষ হইলে ব্যোম পুনশ্চ আরম্ভ করিল— বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য জানা, এবং দর্শনের উদ্দেশ্য বোঝা, কিন্তু কাণ্ডটি এমনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, বিজ্ঞানটি জানা এবং দর্শনটি বোঝাই অন্য সকল জানা এবং অন্য সকল বোঝার অপেক্ষা শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার জন্য কত ইস্কুল, কত কেতাব, কত আয়োজন আবশ্যক হইয়াছে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দ দান করা, কিন্তু সে আনন্দটি গ্রহণ করাও নিতান্ত সহজ নহে; তাহার জন্যও বিবিধ প্রকার শিক্ষা এবং সাহায্যের প্রয়োজন। সেইজন্যই বলিতেছিলাম, দেখিতে দেখিতে মন এতটা অগ্রসর হইয়া যায় যে, তাহার নাগাল পাইবার জন্য সিঁড়ি লাগাইতে হয়। যদি কেহ অভিমান করিয়া বলেন, যাহা বিনা শিক্ষায় না জানা যায় তাহা বিজ্ঞান নহে, যাহা বিনা চেষ্টায় না বোঝা যায় তাহা দর্শন নহে এবং যাহা বিনা সাধনায় আনন্দ দান না করে তাহা সাহিত্য নহে, তবে কেবল খনার বচন, প্রবাদবাক্য এবং পাঁচালি অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইবে।

সমীর কহিল— মানুষের হাতে সব জিনিসই ক্রমশ কঠিন হইয়া উঠে। অসভ্যেরা যেমন-তেমন চীৎকার করিয়াই উত্তেজনা অনুভব করে, অথচ আমাদের এমনি গ্রহ যে বিশেষ অভ্যাসসাধ্য শিক্ষাসাধ্য সংগীত ব্যতীত আমাদের সুখ নাই, আরও গ্রহ এই যে ভালো গান করাও যেমন শিক্ষাসাধ্য ভালো গান হইতে সুখ অনুভব করাও তেমনি শিক্ষাসাধ্য। তাহার ফল হয় এই যে, এক সময়ে যাহা সাধারণের ছিল, ক্রমেই তাহা সাধকের হইয়া আসে। চীৎকার সকলেই করিতে পারে এবং চীৎকার করিয়া অসভ্য সাধারণে সকলেই উত্তেজনাসুখ অনুভব করে, কিন্তু গান সকলে করিতে পারে না এবং গানে সকলে সুখও পায় না। কাজেই সমাজ যতই অগ্রসর হয় ততই অধিকারী এবং অনধিকারী, রসিক এবং অরসিক, এই দুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে থাকে।

ক্ষিতি কহিল— মানুষ বেচারাকে এমনি করিয়া গড়া হইয়াছে যে, সে যতই সহজ উপায় অবলম্বন করিতে যায় ততই দুরূহতার মধ্যে জড়ীভূত হইয়া পড়ে। সে সহজে কাজ করিবার জন্য কল তৈরি করে, কিন্তু কল জিনিসটা নিজে এক বিষম দুরূহ ব্যাপার; সে সহজে সমস্ত প্রাকৃত জ্ঞানকে বিধিবদ্ধ করিবার জন্য বিজ্ঞান সৃষ্টি করে, কিন্তু সেই বিজ্ঞানটাই আয়ত্ত করা কঠিন কাজ; সুবিচার করিবার সহজ প্রণালী বাহির করিতে গিয়া আইন বাহির হইল, শেষকালে আইনটা ভালো করিয়া বুঝিতেই দীর্ঘজীবী লোকের বারো-আনা জীবন দান করা আবশ্যক হইয়া পড়ে; সহজে আদান-প্রদান চালাইবার জন্য টাকার সৃষ্টি হইল, শেষকালে টাকার সমস্যা এমনি একটা সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে যে, মীমাংসা করে কাহার সাধ্য! সমস্ত সহজ করিতে হইবে এই চেষ্টায় মানুষের জানাশোনা খাওয়াদাওয়া আমোদপ্রমোদ সমস্তই অসম্ভব শক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

স্রোতস্বিনী কহিলেন— সেই হিসাবে কবিতাও শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এখন মানুষ খুব স্পষ্টত দুই ভাগ হইয়া গিয়াছে— এখন অল্প লোকে ধনী এবং অনেকে নির্ধন, অল্প লোকে গুণী এবং অনেকে নির্গুণ— এখন কবিতাও সর্বসাধারণের নহে, তাহা বিশেষ লোকের। সকলই বুঝিলাম। কিন্তু কথাটা এই যে, আমরা যে বিশেষ কবিতার প্রসঙ্গে এই কথাটা তুলিয়াছি সে কবিতাটা কোনো অংশেই শক্ত নহে, তাহার মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা আমাদের মতো লোকও বুঝিতে না পারে, তাহা নিতান্তই সরল— অতএব তাহা যদি ভালো না লাগে তবে সে আমাদের বুঝিবার দোষে নহে।

ক্ষিতি এবং সমীর ইহার পরে আর কোনো কথা বলিতে ইচ্ছা করিল না। কিন্তু ব্যোম অম্লানমুখে বলিতে লাগিল— যাহা সরল তাহাই যে সহজ এমন কোনো কথা নাই। অনেক সময় তাহাই অত্যন্ত কঠিন; কারণ, সে নিজেকে বুঝাইবার জন্য কোনো-

প্রকার বাজে উপায় অবলম্বন করে না, সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে ; তাহাকে না বুঝিয়া চলিয়া গেলে সে কোনোরূপ কৌশল করিয়া ফিরিয়া ডাকে না। প্রাঞ্জলতার প্রধান গুণ এই যে, সে একেবারে অব্যবহিত ভাবে মনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে, তাহার কোনো মধ্যস্থ নাই। কিন্তু যে-সকল মন মধ্যস্থের সাহায্য ব্যতীত কিছু গ্রহণ করিতে পারে না, যাহাদিগকে ভুলাইয়া আকর্ষণ করিতে হয়, প্রাঞ্জলতা তাহাদের নিকট বড়োই দুর্বোধ। কৃষ্ণনগরের কারিগরের রচিত ভিস্তি তাহার সমস্ত রঙচঙ মশক এবং অঙ্গভঙ্গি -দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয় এবং অভ্যাসের সাহায্যে চট্‌ করিয়া আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে— কিন্তু গ্রীক প্রস্তরমূর্তিতে রঙ-চঙ রকম-সকম নাই, তাহা প্রাঞ্জল এবং সর্বপ্রকার-প্রয়াস-বিহীন। কিন্তু সরল বলিয়া তাহা সহজ নহে। সে কোনোপ্রকার তুচ্ছ বাহ্য কৌশল অবলম্বন করে না বলিয়াই ভাবসম্পদ তাহার অধিক থাকা চাই।

দীপ্তি বিশেষ একটু বিরক্ত হইয়া কহিল— তোমার গ্রীক প্রস্তরমূর্তির কথা ছাড়িয়া দাও। ও সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছি এবং বাঁচিয়া থাকিলে আরও অনেক কথা শুনিতে হইবে। ভালো জিনিসের দোষ এই যে, তাহাকে সর্বদাই পৃথিবীর চোখের সামনে থাকিতে হয়, সকলেই তাহার সম্বন্ধে কথা কহে, তাহার আর পর্দা নাই, আব্রু নাই ; তাহাকে আর কাহারও আবিষ্কার করিতে হয় না, বুঝিতে হয় না, ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া তাহার প্রতি তাকাইতেও হয় না, কেবল তাহার সম্বন্ধে বাঁধি গৎ শুনিতে এবং বলিতে হয়। সূর্যের যেমন মাঝে মাঝে মেঘগ্রস্ত থাকা উচিত, নতুবা মেঘমুক্ত সূর্যের গৌরব বুঝা যায় না, আমার বোধ হয় পৃথিবীর বড়ো বড়ো খ্যাতির উপরে মাঝে মাঝে সেইরূপ অবহেলার আড়াল পড়া উচিত— মাঝে মাঝে গ্রীক মূর্তির নিন্দা করা ফেশান হওয়া ভালো, মাঝে মাঝে সর্বলোকের নিকট প্রমাণ হওয়া উচিত যে কালিদাস অপেক্ষা চাণক্য বড়ো কবি। নতুবা আর সহ্য হয় না। যাহা হউক, ওটা একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা। আমার বক্তব্য এই যে, অনেক সময়ে ভাবের দারিদ্র্যকে, আচারের বর্বরতাকে, সরলতা বলিয়া ভ্রম হয়— অনেক সময়ে প্রকাশক্ষমতার অভাবকে ভাবাধিক্যের পরিচয় বলিয়া কল্পনা করা হয়— সে কথাটাও মনে রাখা কর্তব্য।

আমি কহিলাম— কলাবিদ্যায় সরলতা উচ্চ অঙ্গের মানসিক উন্নতির সহচর। বর্বরতা সরলতা নহে। বর্বরতার আড়ম্বর-আয়োজন অত্যন্ত বেশি। সভ্যতা অপেক্ষাকৃত নিরলংকার। অধিক অলংকার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু মনকে প্রতিহত করিয়া দেয়। আমাদের বাংলা ভাষায়, কি খবরের কাগজে কি উচ্চশ্রেণীর

সাহিত্যে, সরলতা এবং অপ্রমত্ততার অভাব দেখা যায়— সকলেই অধিক করিয়া, চীৎকার করিয়া এবং ভঙ্গিমা করিয়া বলিতে ভালোবাসে ; বিনা আড়ম্বরে সত্য কথাটি পরিষ্কার করিয়া বলিতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। কারণ, এখনো আমাদের মধ্যে একটা আদিম বর্বরতা আছে ; সত্য প্রাঞ্জল বেশে আসিলে তাহার গভীরতা এবং অসামান্যতা আমরা দেখিতে পাই না, ভাবের সৌন্দর্য কৃত্রিম ভূষণে এবং সর্বপ্রকার আতিশয্যে ভারাক্রান্ত হইয়া না আসিলে আমাদের নিকট তাহার মর্যাদা নষ্ট হয়।

সমীর কহিল— সংযম ভদ্রতার একটি প্রধান লক্ষণ। ভদ্রলোকেরা কোনোপ্রকার গায়ে-পড়া আতিশয্য-দ্বারা আপন অস্তিত্ব উৎকট ভাবে প্রচার করে না ; বিনয় এবং সংযমের দ্বারা তাহারা আপন মর্যাদা রক্ষা করিয়া থাকে। অনেক সময় সাধারণ লোকের নিকট সংযত সুসমাহিত ভদ্রতার অপেক্ষা আড়ম্বর এবং আতিশয্যের ভঙ্গিমা অধিকতর আকর্ষণজনক হয়, কিন্তু সেটা ভদ্রতার দুর্ভাগ্য নহে, সে সাধারণের ভাগ্য-দোষ। সাহিত্যে সংযম এবং আচারব্যবহারে সংযম উন্নতির লক্ষণ— আতিশয্যের দ্বারা দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টাই বর্বরতা।

আমি কহিলাম— এক-আধটা ইংরাজি কথা মাপ করিতে হইবে। যেমন ভদ্র-লোকের মধ্যে তেমনি ভদ্র সাহিত্যেও, ম্যানার আছে, কিন্তু ম্যানারিজ্‌ম্ নাই। ভালো সাহিত্যের বিশেষ একটি আকৃতিপ্রকৃতি আছে সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাহার এমন একটি পরিমিত সুষমা যে, আকৃতিপ্রকৃতির বিশেষত্বটাই বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে না। তাহার মধ্যে একটা ভাব থাকে, একটা গূঢ় প্রভাব থাকে, কিন্তু কোনো অপূর্ব ভঙ্গিমা থাকে না। তরঙ্গভঙ্গের অভাবে অনেক সময়ে পরিপূর্ণতাও লোকের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়, আবার পরিপূর্ণতার অভাবে অনেক সময়ে তরঙ্গভঙ্গও লোককে বিচলিত করে ; কিন্তু তাই বলিয়া এ ভ্রম যেন কাহারও না হয় যে, পরিপূর্ণতার প্রাঞ্জলতাই সহজ এবং অগভীরতার ভঙ্গিমাই দুরূহ।

স্রোতস্বিনীর দিকে ফিরিয়া কহিলাম— উচ্চশ্রেণীর সরল সাহিত্য বুঝা অনেক সময় এইজন্য কঠিন যে, মন তাহাকে বুঝিয়া লয়, কিন্তু সে আপনাকে বুঝাইতে থাকে না।

দীপ্তি কহিল— নমস্কার করি! আজ আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে। আর কখনো উচ্চ অঙ্গের পণ্ডিতদিগের নিকট উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য সম্বন্ধে মত ব্যক্ত করিয়া বর্বরতা প্রকাশ করিব না।

স্রোতস্বিনী সেই ইংরাজ কবির নাম করিয়া কহিল— তোমরা যতই তর্ক কর এবং যতই গালি দাও, সে কবির কবিতা আমার কিছুতেই ভালো লাগে না।

চৈত্র ১৩০১

কৌতুকহাস্য

শীতের সকালে রাস্তা দিয়া খেজুর-রস হাঁকিয়া যাইতেছে। ভোরের দিককার ঝাপসা কুয়াশাটা কাটিয়া গিয়া তরুণ রৌদ্রে দিনের আরম্ভ-বেলাটা একটু উপভোগ-যোগ্য আতপ্ত হইয়া আসিয়াছে। সমীর চা খাইতেছে, ক্ষিতি খবরের কাগজ পড়িতেছে এবং ব্যোম মাথার চারি দিকে একটা অত্যন্ত উজ্জ্বল নীলে সবুজে মিশ্রিত গলাবন্ধের পাক জড়াইয়া একটা অসংগত মোটা লাঠি হস্তে সম্প্রতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

অদূরে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া স্রোতস্বিনী এবং দীপ্তি পরস্পরের কটিবেষ্টন করিয়া কী-একটা রহস্যপ্রসঙ্গে বারম্বার হাসিয়া অস্থির হইতেছিল। ক্ষিতি এবং সমীর মনে করিতেছিল এই উৎকট নীলহরিৎ-পশমরাশি-পরিবৃত সুখাসীন নিশ্চিন্তচিত্ত ব্যোমই ঐ হাস্যরসোচ্ছ্বাসের মূল কারণ।

এমন সময় অন্যমনস্ক ব্যোমের চিত্তও সেই হাস্যরবে আকৃষ্ট হইল। সে চৌকিটা আমাদের দিকে ঈষৎ ফিরাইয়া কহিল— দূর হইতে একজন পুরুষ-মানুষের হঠাৎ ভ্রম হইতে পারে যে, ঐ দুটি সখী বিশেষ কোনো একটা কৌতুককথা অবলম্বন করিয়া হাসিতেছেন। কিন্তু সেটা মায়া। পুরুষজাতিকে পক্ষপাতী বিধাতা বিনা কৌতুকে হাসিবার ক্ষমতা দেন নাই, কিন্তু মেয়েরা হাসে কী জন্য তাহা দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। চকমকি পাথর স্বভাবত আলোকহীন; উপযুক্ত সংঘর্ষ প্রাপ্ত হইলে সে অট্টশব্দে জ্যোতিঃস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে, আর মানিকের টুকরা আপনা-আপনি আলোয় ঠিকরিয়া পড়িতে থাকে, কোনো-একটা সংগত উপলক্ষের অপেক্ষা রাখে না। মেয়েরা অল্প কারণে কাঁদিতে জানে এবং বিনা কারণে হাসিতে পারে; কারণ ব্যতীত কার্য হয় না, জগতের এই কড়া নিয়মটা কেবল পুরুষের পক্ষেই খাটে।

সমীর নিঃশেষিত পাত্রে দ্বিতীয় বার চা ঢালিয়া কহিল— কেবল মেয়েদের হাসি নয়, হাস্যরসটাই আমার কাছে কিছু অসংগত ঠেকে। দুঃখে কাঁদি, সুখে হাসি, এটুকু বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু কৌতুকে হাসি কেন? কৌতুক তো ঠিক সুখ নয়। মোটা মানুষ চৌকি ভাঙিয়া পড়িয়া গেলে আমাদের কোনো সুখের কারণ ঘটে এ কথা বলিতে পারি না, কিন্তু হাসির কারণ ঘটে ইহা পরীক্ষিত সত্য। ভাবিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে আশ্চর্যের বিষয় আছে।

ক্ষিতি কহিল— রক্ষা করো ভাই। না ভাবিয়া আশ্চর্য হইবার বিষয় জগতে যথেষ্ট

আছে ; আগে সেইগুলো শেষ করো, তার পরে ভাবিতে শুরু করিয়ো। একজন পাগল তাহার উঠানকে ধূলিশূন্য করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমত ঝাঁটা দিয়া আচ্ছা করিয়া ঝাঁটাইল, তাহাতেও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ফল না পাইয়া কোদাল দিয়া মাটি চাঁচিতে আরম্ভ করিল। সে মনে করিয়াছিল এই ধুলোমাটির পৃথিবীটাকে সে নিঃশেষে আকাশে ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া অবশেষে দিব্য একটি পরিষ্কার উঠান পাইবে ; বলা বাহুল্য, বিস্তর অধ্যবসায়েও কৃতকার্য হইতে পারে নাই। ভ্রাতঃ সমীর, তুমি যদি আশ্চর্যের উপরিস্তর ঝাঁটাইয়া অবশেষে ভাবিয়া আশ্চর্য হইতে আরম্ভ কর তবে আমরা বন্ধুগণ বিদায় লই। কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ, কিন্তু সেই নিরবধি কাল আমাদের হাতে নাই।

সমীর হাসিয়া কহিল— ভাই ক্ষিতি, আমার অপেক্ষা ভাবনা তোমারই বেশি। অনেক ভাবিলে তোমাকেও সৃষ্টির একটা মহাশ্চর্য ব্যাপার মনে হইতে পারিত, কিন্তু আরো ঢের বেশি না ভাবিলে আমার সহিত তোমার সেই উঠান-মার্জন-কারী আদর্শটির সাদৃশ্য কল্পনা করিতে পারিতে না।

ক্ষিতি কহিল— মাপ করো ভাই ; তুমি আমার অনেক কালের বিশেষ পরিচিত বন্ধু, সেইজন্যই আমার মনে এতটা আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল— যাহা হউক, কথাটা এই যে কৌতুকে আমরা হাসি কেন। ভারী আশ্চর্য। কিন্তু তাহার পরের প্রশ্ন এই যে, যে কারণেই হউক হাসি কেন? একটা কিছু ভালো লাগিবার বিষয় যেই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল অমনি আমাদের গলার ভিতর দিয়া একটা অদ্ভুত প্রকারের শব্দ বাহির হইতে লাগিল এবং আমাদের মুখের সমস্ত মাংসপেশী বিকৃত হইয়া সম্মুখের দন্তপংক্তি বাহির হইয়া পড়িল, মনুষ্যের মতো ভদ্র জীবের পক্ষে এমন একটা অসংযত অসংগত ব্যাপার কি সামান্য অদ্ভুত এবং অবমানজনক? য়ুরোপের ভদ্রলোক ভয়ের চিহ্ন দুঃখের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করেন, আমরা প্রাচ্য-জাতীয়েরা সভ্যসমাজে কৌতুকের চিহ্ন প্রকাশ করাটাকে নিতান্ত অসংযমের পরিচয় জ্ঞান করি।

সমীর ক্ষিতিকে কথা শেষ করিতে না দিয়া কহিল— তাহার কারণ, আমাদের মতে কৌতুকে আমোদ অনুভব করা নিতান্ত অযৌক্তিক। উহা ছেলেমানুষেরই উপযুক্ত। এইজন্য কৌতুকরসকে আমাদের প্রবীণ লোকমাত্রেই ছ্যাবলামি বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। একটা গানে শুনিয়াছিলাম, শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রাভঙ্গে প্রাতঃকালে হুঁকা-হস্তে রাধিকার কুটিরে কিঞ্চিৎ অঙ্গারের প্রার্থনায় আগমন করিয়াছিলেন, শুনিয়া শ্রোতা-মাত্রের হাস্য উদ্রেক করিয়াছিল। কিন্তু হুঁকা-হস্তে শ্রীকৃষ্ণের কল্পনা সুন্দরও নহে

কাহারও পক্ষে আনন্দজনকও নহে— তবুও যে আমাদের হাসি ও আমোদের উদয় হয় তাহা অদ্ভুত ও অমূলক নহে তো কী? এইজন্যই এরূপ চাপল্য আমাদের বিজ্ঞ-সমাজের অনুমোদিত নহে। ইহা যেন অনেকটা পরিমাণে শারীরিক; কেবল স্নায়ুর উত্তেজনা মাত্র। ইহার সহিত আমাদের সৌন্দর্যবোধ, বুদ্ধিবৃত্তি, এমন-কি স্বার্থবোধেরও যোগ নাই। অতএব অনর্থক সামান্য কারণে ক্ষণকালের জন্য বুদ্ধির এরূপ অনিবার্য পরাভব, স্থৈর্যের এরূপ সম্যক্ বিচ্যুতি, মনস্বী জীবের পক্ষে লজ্জাজনক সন্দেহ নাই।

ক্ষিতি একটু ভাবিয়া কহিল— সে কথা সত্য। কোনো অখ্যাতনামা কবি-বিরচিত এই কবিতাটি বোধ হয় জানা আছে—

তৃষার্ত হইয়া চাহিলাম এক ঘটি জল।
তাড়াতাড়ি এনে দিলে আধখানা বেল॥

তৃষার্ত ব্যক্তি যখন এক ঘটি জল চাহিতেছে তখন অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করিয়া আধখানা বেল আনিয়া দিলে অপরাপর ব্যক্তির তাহাতে আমোদ অনুভব করিবার কোনো ধর্মসংগত অথবা যুক্তিসংগত কারণ দেখা যায় না। তৃষিত ব্যক্তির প্রার্থনামতে তাহাকে এক ঘটি জল আনিয়া দিলে সমবেদনাবৃত্তি-প্রভাবে আমরা সুখ পাই— কিন্তু তাহাকে হঠাৎ আধখানা বেল আনিয়া দিলে, জানি না কী বৃত্তি-প্রভাবে আমাদের প্রচুর কৌতুক বোধ হয়। এই সুখ এবং কৌতুকের মধ্যে যখন শ্রেণীগত প্রভেদ আছে তখন দুইয়ের ভিন্নবিধ প্রকাশ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রকৃতির গৃহিণীপনাই এইরূপ —কোথাও বা অনাবশ্যক অপব্যয়, কোথাও অত্যাবশ্যকের বেলায় টানাটানি। এক হাসির দ্বারা সুখ এবং কৌতুক দুটোকে সারিয়া দেওয়া উচিত হয় নাই।

ব্যোম কহিল— প্রকৃতির প্রতি অন্যায় অপবাদ আরোপ হইতেছে। সুখে আমরা স্মিতহাস্য হাসি, কৌতুকে আমরা উচ্চহাস্য হাসিয়া উঠি। ভৌতিক জগতে আলোক এবং বজ্র ইহার তুলনা। একটা আন্দোলনজনিত স্থায়ী, অপরটি সংঘর্ষজনিত আকস্মিক। আমি বোধ করি, যে কারণভেদে একই ঈথরে আলোক ও বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাহা আবিষ্কৃত হইলে তাহার তুলনায় আমাদের সুখহাস্য এবং কৌতুকহাস্যের কারণ বাহির হইয়া পড়িবে।

সমীর ব্যোমের কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল— আমোদ এবং কৌতুক ঠিক সুখ নহে বরঞ্চ তাহা নিম্নমাত্রার দুঃখ। স্বল্পপরিমাণে দুঃখ ও পীড়ন আমাদের চেতনার উপর যে আঘাত করে তাহাতে আমাদের সুখ হইতেও পারে। প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে বিনা কষ্টে আমরা পাচকের প্রস্তুত অন্ন খাইয়া থাকি, তাহাকে আমরা আমোদ বলি না— কিন্তু যেদিন চড়িভাতি করা যায় সেদিন নিয়ম ভঙ্গ করিয়া, কষ্ট

স্বীকার করিয়া, অসময়ে সম্ভবত অখাদ্য আহার করি, কিন্তু তাহাকে বলি আমোদ। আমোদের জন্য আমরা ইচ্ছাপূর্বক যে পরিমাণে কষ্ট ও অশান্তি জাগ্রত করিয়া তুলি তাহাতে আমাদের চেতনশক্তিকে উত্তেজিত করিয়া দেয়। কৌতুকও সেইজাতীয় সুখাবহ দুঃখ। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমাদের চিরকাল যেরূপ ধারণা আছে তাঁহাকে হুঁকা হস্তে রাধিকার কুটিরে আনিয়া উপস্থিত করিলে হঠাৎ আমাদের সেই ধারণায় আঘাত করে। সেই আঘাত ঈষৎ পীড়াজনক; কিন্তু সেই পীড়ার পরিমাণ এমন নিয়মিত যে, তাহাতে আমাদিগকে যে পরিমাণে দুঃখ দেয়, আমাদের চেতনাকে অকস্মাৎ চঞ্চল করিয়া তুলিয়া তদপেক্ষা অধিক সুখী করে। এই সীমা ঈষৎ অতিক্রম করিলেই কৌতুক প্রকৃত পীড়ায় পরিণত হইয়া উঠে। যদি যথার্থ ভক্তির কীর্তনের মাঝখানে কোনো রসিকতাবায়ুগ্রস্ত ছোকরা হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের ঐ তাম্রকূটধূমপিপাসুতার গান গাহিত তবে তাহাতে কৌতুক বোধ হইত না; কারণ, আঘাতটা এত গুরুতর হইত যে, তৎক্ষণাৎ তাহা উদ্যত মুষ্টি-আকার ধারণ করিয়া উক্ত রসিক ব্যক্তির পৃষ্ঠাভিমুখে প্রবল প্রতিঘাতস্বরূপে ধাবিত হইত। অতএব, আমার মতে কৌতুক— চেতনাকে পীড়ন, আমোদও তাই। এইজন্য প্রকৃত আনন্দের প্রকাশ স্মিতহাস্য এবং আমোদ ও কৌতুকের প্রকাশ উচ্চহাস্য; সে হাস্য যেন হঠাৎ একটা দ্রুত আঘাতের পীড়নবেগে সশব্দে উর্ধ্বে উদ্গীর্ণ হইয়া উঠে।

ক্ষিতি কহিল— তোমরা যখন একটা মনের মতো থিয়োরির সঙ্গে একটা মনের মতো উপমা জুড়িয়া দিতে পার, তখন আনন্দে আর সত্যাসত্য জ্ঞান থাকে না। ইহা সকলেরই জানা আছে কৌতুকে যে কেবল আমরা উচ্চহাস্য হাসি তাহা নহে, মৃদুহাস্যও হাসি, এমন-কি, মনে মনেও হাসিয়া থাকি। কিন্তু ওটা একটা অবান্তর কথা। আসল কথা এই যে, কৌতুক আমাদের চিত্তের উত্তেজনার কারণ, এবং চিত্তের অনতিপ্রবল উত্তেজনা আমাদের পক্ষে সুখজনক। আমাদের অন্তরে বাহিরে একটি সুযুক্তিসংগত নিয়মশৃঙ্খলার আধিপত্য; সমস্তই চিরাভ্যস্ত চিরপ্রত্যাশিত; এই সুনিয়মিত যুক্তিরাজ্যের সমভূমিমধ্যে যখন আমাদের চিত্ত অবাধে প্রবাহিত হইতে থাকে তখন তাহাকে বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারি না— ইতিমধ্যে হঠাৎ সেই চারি দিকের যথাযোগ্যতা ও যথাপরিমিততার মধ্যে যদি একটা অসংগত ব্যাপারের অবতারণা হয় তবে আমাদের চিত্তপ্রবাহ অকস্মাৎ বাধা পাইয়া দুর্নিবার হাস্যতরঙ্গে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। সেই বাধা সুখের নহে, সৌন্দর্যের নহে, সুবিধার নহে, তেমনি আবার অতিদুঃখেরও নহে, সেইজন্য কৌতুকের সেই বিশুদ্ধ অমিশ্র উত্তেজনায় আমাদের আমোদ বোধ হয়।

*

আমি কহিলাম— অনুভবক্রিয়ামাত্রই সুখের, যদি না তাহার সহিত কোনো গুরুতর দুঃখভয় ও স্বার্থহানি মিশ্রিত থাকে। এমন-কি, ভয় পাইতেও সুখ আছে, যদি তাহার সহিত বাস্তবিক ভয়ের কোনো কারণ জড়িত না থাকে। ছেলেরা ভূতের গল্প শুনিতে একটা বিষম আকর্ষণ অনুভব করে, কারণ, হৃৎকম্পের উত্তেজনায় আমাদের যে চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মে তাহাতেও আনন্দ আছে। রামায়ণে সীতাবিয়োগে রামের দুঃখে আমরা দুঃখিত হই, ওথেলোর অমূলক অসূয়া আমাদিগকে পীড়িত করে, দুহিতার কৃতঘ্নতাশর-বিদ্ধ উন্মাদ লিয়রের মর্মযাতনায় আমরা ব্যথা বোধ করি— কিন্তু সেই দুঃখপীড়া বেদনা উদ্রেক করিতে না পারিলে সে-সকল কাব্য আমাদের নিকট তুচ্ছ হইত। বরঞ্চ দুঃখের কাব্যকে আমরা সুখের কাব্য অপেক্ষা অধিক সমাদর করি ; কারণ, দুঃখানুভবে আমাদের চিত্তে অধিকতর আন্দোলন উপস্থিত করে। কৌতুক মনের মধ্যে হঠাৎ আঘাত করিয়া আমাদের সাধারণ অনুভবক্রিয়া জাগ্রত করিয়া দেয়। এইজন্য অনেক রসিক লোক হঠাৎ শরীরে একটা আঘাত করাকে পরিহাস জ্ঞান করেন ; অনেকে গালিকে ঠাট্টার স্বরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন ; বাসরঘরে কর্ণমর্দন এবং অন্যান্য পীড়ন-নৈপুণ্যকে বঙ্গসীমন্তিনীগণ এক শ্রেণীর হাস্যরস বলিয়া স্থির করিয়াছেন ; হঠাৎ উৎকট বোমার আওয়াজ করা আমাদের দেশে উৎসবের অঙ্গ এবং কর্ণবধিরকর খোল-করতালের শব্দ -দ্বারা চিত্তকে ধূমপীড়িত মৌচাকের মৌমাছির মতো একান্ত উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া ভক্তিরসের অবতারণা করা হয়।

ক্ষিতি কহিল— বন্ধুগণ, ক্ষান্ত হও। কথাটা একপ্রকার শেষ হইয়াছে। যতটুকু পীড়নে সুখ বোধ হয় তাহা তোমরা অতিক্রম করিয়াছ, এক্ষণে দুঃখ ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। আমরা বেশ বুঝিয়াছি যে, কমেডির হাস্য এবং ট্র্যাজেডির অশ্রুজল দুঃখের তারতম্যের উপর নির্ভর করে—

ব্যোম কহিল— যেমন বরফের উপর প্রথম রৌদ্র পড়িলে তাহা ঝিক্‌ঝিক্ করিতে থাকে এবং রৌদ্রের তাপ বাড়িয়া উঠিলে তাহা গলিয়া পড়ে। তুমি কতকগুলি প্রহসন ও ট্র্যাজেডির নাম করো, আমি তাহা হইতে প্রমাণ করিয়া দিতেছি—

এমন সময় দীপ্তি ও স্রোতস্বিনী হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দীপ্তি কহিলেন— তোমরা কী প্রমাণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছ?

ক্ষিতি কহিল— আমরা প্রমাণ করিতেছিলাম যে, তোমরা এতক্ষণ বিনা কারণে হাসিতেছিলে।

শুনিয়া দীপ্তি স্রোতস্বিনীর মুখের দিকে চাহিলেন, স্রোতস্বিনী দীপ্তির মুখের দিকে চাহিলেন এবং উভয়ে পুনরায় কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন।

ব্যোম কহিল— আমি প্রমাণ করিতে যাইতেছিলাম যে, কমেডিতে পরের অল্প পীড়া দেখিয়া আমরা হাসি এবং ট্র্যাজেডিতে পরের অধিক পীড়া দেখিয়া আমরা কাঁদি।

দীপ্তি ও স্রোতস্বিনীর সুমিষ্ট সম্মিলিত হাস্যরবে পুনশ্চ গৃহ কূজিত হইয়া উঠিল, এবং অনর্থক হাস্য উদ্রেকের জন্য উভয়ে উভয়কে দোষী করিয়া পরস্পরকে তর্জনপূর্বক হাসিতে হাসিতে সলজ্জভাবে দুই সখী গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

পুরুষ সভ্যগণ এই অকারণ হাস্যোচ্ছ্বাসদৃশ্যে স্মিতমুখে অবাক হইয়া রহিল। কেবল সমীর কহিল— ব্যোম, বেলা অনেক হইয়াছে, এখন তোমার ঐ বিচিত্রবর্ণের নাগপাশ-বন্ধনটা খুলিয়া ফেলিলে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা দেখি না।

ক্ষিতি ব্যোমের লাঠিগাছটি তুলিয়া অনেক ক্ষণ মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া কহিল— ব্যোম, তোমার এই গদাখানি কি কমেডির বিষয় না ট্র্যাজেডির উপকরণ?

পৌষ ১৩০১

কৌতুকহাস্যের মাত্রা

সেদিনকার ডায়ারিতে কৌতুকহাস্য সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা পাঠ করিয়া শ্রীমতী দীপ্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন:

একদিন প্রাতঃকালে স্রোতস্বিনীতে আমাতে মিলিয়া হাসিয়াছিলাম। ধন্য সেই প্রাতঃকাল এবং ধন্য দুই সখীর হাস্য। জগৎসৃষ্টি অবধি এমন চাপল্য অনেক রমণীই প্রকাশ করিয়াছে, এবং ইতিহাসে তাহার ফলাফল ভালোমন্দ নানা আকারে স্থায়ী হইয়াছে। নারীর হাসি অকারণ হইতে পারে, কিন্তু তাহা অনেক মন্দাক্রান্তা, উপেন্দ্রবজ্রা, এমন-কি, শার্দূলবিক্রীড়িতচ্ছন্দ, অনেক ত্রিপদী, চতুষ্পদী এবং চতুর্দশপদীর আদিকারণ হইয়াছে এইরূপ শুনা যায়। রমণী তরলস্বভাববশত অনর্থক হাসে, মাঝের হইতে তাহা দেখিয়া অনেক পুরুষ অনর্থক কাঁদে, অনেক পুরুষ ছন্দ মিলাইতে বসে, অনেক পুরুষ গলায় দড়ি দিয়া মরে— আবার এইবার দেখিলাম নারীর হাস্যে প্রবীণ ফিলজফরের মাথায় নবীন ফিলজফি বিকশিত হইয়া উঠে। কিন্তু সত্য কথা বলিতেছি, তত্ত্বনির্ণয় অপেক্ষা পূর্বোক্ত তিন প্রকারের অবস্থাটা আমরা পছন্দ করি।

এই বলিয়া সেদিন আমরা হাস্য সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম শ্রীমতী দীপ্তি তাহাকে যুক্তিহীন অপ্রামাণিক বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

আমার প্রথম কথা এই যে, আমাদের সেদিনকার তত্ত্বের মধ্যে যে যুক্তির প্রাবল্য ছিল না, সেজন্য শ্রীমতী দীপ্তির রাগ করা উচিত হয় না। কারণ, নারীহাস্যে পৃথিবীতে যত প্রকার অনর্থপাত করে তাহার মধ্যে বুদ্ধিমানের বুদ্ধিভ্রংশও একটি। যে অবস্থায় আমাদের ফিলজফি প্রলাপ হইয়া উঠিয়াছিল সে অবস্থায় নিশ্চয়ই মনে করিলেই কবিতা লিখিতেও পারিতাম, এবং গলায় দড়ি দেওয়াও অসম্ভব হইত না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, তাঁহাদের হাস্য হইতে আমরা তত্ত্ব বাহির করিব এ কথা তাঁহারা যেমন কল্পনা করেন নাই, আমাদের তত্ত্ব হইতে তাঁহারা যে যুক্তি বাহির করিতে বসিবেন তাহাও আমরা কল্পনা করি নাই।

নিউটন আজন্ম সত্যান্বেষণের পর বলিয়াছেন, আমি জ্ঞানসমুদ্রের কূলে কেবল নুড়ি কুড়াইয়াছি। আমরা চার বুদ্ধিমানে ক্ষণকালের কথোপকথনে নুড়ি কুড়াইবার ভরসাও রাখি না— আমরা বালির ঘর বাঁধি মাত্র। ঐ খেলাটার উপলক্ষ করিয়া জ্ঞানসমুদ্র হইতে খানিকটা সমুদ্রের হাওয়া খাইয়া আসা আমাদের উদ্দেশ্য। রত্ন লইয়া আসি না, খানিকটা স্বাস্থ্য লইয়া আসি, তাহার পর সে বালির ঘর ভাঙে কি থাকে তাহাতে কাহারও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

রত্ন অপেক্ষা স্বাস্থ্য যে কম বহুমূল্য আমি তাহা মনে করি না। রত্ন অনেক সময় ঝুঁটা প্রমাণ হয়, কিন্তু স্বাস্থ্যকে স্বাস্থ্য ছাড়া আর-কিছু বলিবার জো নাই। আমরা পাঞ্চভৌতিক সভার পাঁচ ভূতে মিলিয়া এ পর্যন্ত একটা কানাকড়ি দামের সিদ্ধান্তও সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি কি না সন্দেহ, কিন্তু, তবু যতবার আমাদের সভা বসিয়াছে আমরা শূন্যহস্তে ফিরিয়া আসিলেও আমাদের সমস্ত মনের মধ্যে যে সবেগে রক্ত-সঞ্চালন হইয়াছে এবং সেজন্য আনন্দ এবং আরোগ্য লাভ করিয়াছি তাহাতে সন্দেহ-মাত্র নাই।

গড়ের মাঠে এক ছটাক শস্য জন্মে না, তবু অতটা জমি অনাবশ্যক নহে। আমাদের পাঞ্চভৌতিক সভাও আমাদের পাঁচ জনের গড়ের মাঠ, এখানে সত্যের শস্যলাভ করিতে আসি না, সত্যের আনন্দলাভ করিতে মিলি।

সেইজন্য এ সভায় কোনো কথার পূরা মীমাংসা না হইলেও ক্ষতি নাই, সত্যের কিয়দংশ পাইলেও আমাদের চলে। এমন-কি সত্যক্ষেত্র গভীররূপে কর্ষণ না করিয়া তাহার উপর দিয়া লঘুপদে চলিয়া যাওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।

আর-এক দিক হইতে আর-এক রকমের তুলনা দিলে কথাটা পরিষ্কার হইতে পারে। রোগের সময় ডাক্তারের ঔষধ উপকারী, কিন্তু আত্মীয়ের সেবাটা বড়ো

আরামের। জর্মান পণ্ডিতের কেতাবে তত্ত্বজ্ঞানের যে-সকল চরম সিদ্ধান্ত আছে তাহাকে ঔষধের বটিকা বলিতে পারো, কিন্তু মানসিক শুশ্রূষা তাহার মধ্যে নাই। পাঞ্চভৌতিক সভায় আমরা যেভাবে সত্যালোচনা করিয়া থাকি তাহাকে রোগের চিকিৎসা বলা না যাক, তাহাকে রোগীর শুশ্রূষা বলা যাইতে পারে।

আর অধিক তুলনা প্রয়োগ করিব না। মোট কথা এই, সেদিন আমরা চার বুদ্ধিমানে মিলিয়া হাসি সম্বন্ধে যে-সকল কথা তুলিয়াছিলাম তাহার কোনোটাই শেষ কথা নহে। যদি শেষ কথার দিকে যাইবার চেষ্টা করিতাম তাহা হইলে কথোপকথনসভার প্রধান নিয়ম লঙ্ঘন করা হইত।

কথোপকথনসভার একটি প্রধান নিয়ম— সহজে এবং দ্রুতবেগে অগ্রসর হওয়া। অর্থাৎ মানসিক পায়চারি করা। আমাদের যদি পদতল না থাকিত, দুই পা যদি দুটো তীক্ষ্ণাগ্র শলাকার মতো হইত, তাহা হইলে মাটির ভিতর দিকে সুগভীর ভাবে প্রবেশ করার সুবিধা হইত, কিন্তু এক পা অগ্রসর হওয়া সহজ হইত না। কথোপ-কথনসমাজে আমরা যদি প্রত্যেক কথার অংশকে শেষ পর্যন্ত তলাইবার চেষ্টা করিতাম তাহা হইলে একটা জায়গাতেই এমন নিরুপায়ভাবে বিদ্ধ হইয়া পড়া যাইত, যে, আর চলাফেরার উপায় থাকিত না। এক-একবার এমন অবস্থা হয়, চলিতে চলিতে হঠাৎ কাদার মধ্যে গিয়া পড়ি ; সেখানে যেখানেই পা ফেলি হাঁটু পর্যন্ত বসিয়া যায়, চলা দায় হইয়া উঠে। এমন-সকল বিষয় আছে যাহাতে প্রতিপদে গভীরতার দিকে তলাইয়া যাইতে হয় ; কথোপকথনকালে সেই-সকল অনিশ্চিত সন্দেহতরল বিষয়ে পদার্পণ না করাই ভালো। সে-সব জমি বায়ুসেবী পর্যটনকারীদের উপযোগী নহে, কৃষি যাহাদের ব্যবসায় তাহাদের পক্ষেই ভালো।

যাহা হউক, সেদিন মোটের উপরে আমরা প্রশ্নটা এই তুলিয়াছিলাম যে, যেমন দুঃখের কান্না, তেমনি সুখের হাসি আছে— কিন্তু মাঝে হইতে কৌতুকের হাসিটা কোথা হইতে আসিল? কৌতুক জিনিসটা কিছু রহস্যময়। জন্তুরাও সুখ দুঃখ অনুভব করে, কিন্তু কৌতুক অনুভব করে না। অলংকারশাস্ত্রে যে-কটা রসের উল্লেখ আছে সব রসই জন্তুদের অপরিণত অপরিস্ফুট সাহিত্যের মধ্যে আছে, কেবল হাস্যরসটা নাই। হয়তো বানরের প্রকৃতির মধ্যে এই রসের কথঞ্চিৎ আভাস দেখা যায়, কিন্তু বানরের সহিত মানুষের আরও অনেক বিষয়েই সাদৃশ্য আছে।

যাহা অসংগত তাহাতে মানুষের দুঃখ পাওয়া উচিত ছিল, হাসি পাইবার কোনো অর্থই নাই। পশ্চাতে যখন চৌকি নাই তখন চৌকিতে বসিতেছি মনে করিয়া কেহ যদি মাটিতে পড়িয়া যায় তবে তাহাতে দর্শকবৃন্দের সুখানুভব করিবার কোনো

যুক্তিসংগত কারণ দেখা যায় না। এমন একটা উদাহরণ কেন, কৌতুকমাত্রেরই মধ্যে এমন একটা পদার্থ আছে যাহাতে মানুষের সুখ না হইয়া দুঃখ হওয়া উচিত।

আমরা কথায় কথায় সেদিন ইহার একটা কারণ নির্দেশ করিয়াছিলাম। আমরা বলিয়াছিলাম, কৌতুকের হাসি এবং আমোদের হাসি একজাতীয়, উভয় হাস্যের মধ্যেই একটা প্রবলতা আছে। তাই আমাদের সন্দেহ হইয়াছিল যে, হয়তো আমোদ এবং কৌতুকের মধ্যে একটা প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে; সেইটে বাহির করিতে পারিলেই কৌতুকহাস্যের রহস্যভেদ হইতে পারে।

সাধারণ ভাবের সুখের সহিত আমোদের একটা প্রভেদ আছে। নিয়মভঙ্গে যে একটু পীড়া আছে সেই পীড়াটুকু না থাকিলে আমোদ হইতে পারে না। আমোদ জিনিসটা নিত্যনৈমিত্তিক সহজ নিয়মসংগত নহে; তাহা মাঝে মাঝে এক-এক দিনের; তাহাতে প্রয়াসের আবশ্যক। সেই পীড়ন এবং প্রয়াসের সংঘর্ষে মনের যে-একটা উত্তেজনা হয় সেই উত্তেজনাই আমোদের প্রধান উপকরণ।

আমরা বলিয়াছিলাম, কৌতুকের মধ্যেও নিয়মভঙ্গজনিত একটা পীড়া আছে; সেই পীড়াটা অতি অধিক মাত্রায় না গেলে আমাদের মনে যে একটা সুখকর উত্তেজনার উদ্রেক করে, সেই আকস্মিক উত্তেজনার আঘাতে আমরা হাসিয়া উঠি। যাহা সুসংগত তাহা চিরদিনের নিয়মসম্মত, যাহা অসংগত তাহা ক্ষণকালের নিয়মভঙ্গ। যেখানে যাহা হওয়া উচিত সেখানে তাহা হইলে তাহাতে আমাদের মনের কোনো উত্তেজনা নাই, হঠাৎ, না হইলে কিম্বা আর-একরূপ হইলে সেই আকস্মিক অনতিপ্রবল উৎপীড়নে মনটা একটা বিশেষ চেতনা অনুভব করিয়া সুখ পায় এবং আমরা হাসিয়া উঠি।

সেদিন আমরা এই পর্যন্ত গিয়াছিলাম— আর বেশি দূর যাই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আর যে যাওয়া যায় না তাহা নহে। আরও বলিবার কথা আছে।

শ্রীমতী দীপ্তি প্রশ্ন করিয়াছেন যে, আমাদের চার পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয় তবে চলিতে চলিতে হঠাৎ অল্প হুঁচট খাইলে কিম্বা রাস্তায় যাইতে অকস্মাৎ অল্পমাত্রায় দুর্গন্ধ নাকে আসিলে আমাদের হাসি পাওয়া, অন্তত, উত্তেজনাজনিত সুখ অনুভব করা উচিত।

এ প্রশ্নের দ্বারা আমাদের মীমাংসা খণ্ডিত হইতেছে না, সীমাবদ্ধ হইতেছে মাত্র। ইহাতে কেবল এইটুকু দেখা যাইতেছে যে, পীড়নমাত্রেই কৌতুকজনক উত্তেজনা জন্মায় না; অতএব, এক্ষণে দেখা আবশ্যক, কৌতুকপীড়নের বিশেষ উপকরণটা কী?

জড়প্রকৃতির মধ্যে করুণরসও নাই, হাস্যরসও নাই। একটা বড়ো পাথর ছোটো পাথরকে গুঁড়াইয়া ফেলিলেও আমাদের চোখে জল আসে না, এবং সমতল ক্ষেত্রের

মধ্যে চলিতে চলিতে হঠাৎ একটা খাপছাড়া গিরিশৃঙ্গ দেখিতে পাইলে তাহাতে আমাদের হাসি পায় না। নদী-নির্ঝর পর্বত-সমুদ্রের মধ্যে মাঝে মাঝে আকস্মিক অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়— তাহা বাধাজনক বিরক্তিজনক পীড়াজনক হইতে পারে, কিন্তু কোনো স্থানেই কৌতুকজনক হয় না। সচেতন পদার্থসম্বন্ধীয় খাপছাড়া ব্যাপার ব্যতীত শুদ্ধ জড়পদার্থে আমাদের হাসি আনিতে পারে না।

কেন, তাহা ঠিক করিয়া বলা শক্ত, কিন্তু আলোচনা করিয়া দেখিতে দোষ নাই।

আমাদের ভাষায় কৌতুক এবং কৌতূহল শব্দের অর্থের যোগ আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক স্থলে একই অর্থে বিকল্পে উভয় শব্দেরই প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহা হইতে অনুমান করি, কৌতূহলবৃত্তির সহিত কৌতুকের বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

কৌতূহলের একটা প্রধান অঙ্গ নূতনত্বের লালসা, কৌতুকেরও একটা প্রধান উপাদান নূতনত্ব। অসংগতের মধ্যে যেমন নিছক বিশুদ্ধ নূতনত্ব আছে সংগতের মধ্যে তেমন নাই।

কিন্তু প্রকৃত অসংগতি ইচ্ছাশক্তির সহিত জড়িত, তাহা জড়পদার্থের মধ্যে নাই। আমি যদি পরিষ্কার পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ দুর্গন্ধ পাই তবে আমি নিশ্চয় জানি, নিকটে কোথাও এক জায়গায় দুর্গন্ধ বস্তু আছে, তাই এইরূপ ঘটিল; ইহাতে কোনো-রূপ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই, ইহা অবশ্যম্ভাবী। জড়প্রকৃতিতে যে কারণে যাহা হইতেছে তাহা ছাড়া আর-কিছু হইবার জো নাই, ইহা নিশ্চয়।

কিন্তু পথে চলিতে চলিতে যদি হঠাৎ দেখি এক জন মান্য বৃদ্ধ ব্যক্তি খেমটা নাচ নাচিতেছে, তবে সেটা প্রকৃতই অসংগত ঠেকে; কারণ, তাহা অনিবার্য নিয়মসংগত নহে। আমরা বৃদ্ধের নিকট কিছুতেই এরূপ আচরণ প্রত্যাশা করি না, কারণ সে ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন লোক— সে ইচ্ছা করিয়া নাচিতেছে, ইচ্ছা করিলে না নাচিতে পারিত। জড়ের নাকি নিজের ইচ্ছামত কিছু হয় না, এইজন্য জড়ের পক্ষে কিছুই অসংগত কৌতুকাবহ হইতে পারে না। এইজন্য অনপেক্ষিত হুঁচট বা দুর্গন্ধ হাস্যজনক নহে। চায়ের চামচ যদি দৈবাৎ চায়ের পেয়ালা হইতে চ্যুত হইয়া দোয়াতের কালীর মধ্যে পড়িয়া যায় তবে সেটা চামচের পক্ষে হাস্যকর নহে; ভারাকর্ষণের নিয়ম তাহার লঙ্ঘন করিবার জো নাই; কিন্তু অন্যমনস্ক লেখক যদি তাঁহার চায়ের চামচ দোয়াতের মধ্যে ডুবাইয়া চা খাইবার চেষ্টা করেন তবে সেটা কৌতুকের বিষয় বটে। নীতি যেমন জড়ে নাই, অসংগতিও সেইরূপ জড়ে নাই। মনঃপদার্থ প্রবেশ করিয়া যেখানে দ্বিধা জন্মাইয়া দিয়াছে সেইখানেই উচিত এবং অনুচিত, সংগত এবং অদ্ভুত।

কৌতূহল জিনিসটা অনেক স্থলে নিষ্ঠুর; কৌতুকের মধ্যেও নিষ্ঠুরতা আছে। সিরাজউদ্দৌলা দুই জনের দাড়িতে দাড়িতে বাঁধিয়া উভয়ের নাকে নস্য পুরিয়া দিতেন এইরূপ প্রবাদ শুনা যায়— উভয়ে যখন হাঁচিতে আরম্ভ করিত তখন সিরাজউদ্দৌলা আমোদ অনুভব করিতেন। ইহার মধ্যে অসংগতি কোন্‌খানে? নাকে নস্য দিলে তো হাঁচি আসিবারই কথা। কিন্তু এখানেও ইচ্ছার সহিত কার্যের অসংগতি। যাহাদের নাকে নস্য দেওয়া হইতেছে তাহাদের ইচ্ছা নয় যে তাহারা হাঁচে, কারণ, হাঁচিলেই তাহাদের দাড়িতে অকস্মাৎ টান পড়িবে, কিন্তু তথাপি তাহাদিগকে হাঁচিতেই হইতেছে।

এইরূপ ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসংগতি, উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের অসংগতি, কথার সহিত কার্যের অসংগতি, এগুলোর মধ্যে নিষ্ঠুরতা আছে। অনেক সময় আমরা যাহাকে লইয়া হাসি সে নিজের অবস্থাকে হাস্যের বিষয় জ্ঞান করে না। এইজন্যই পাঞ্চভৌতিক সভায় ব্যোম বলিয়াছিলেন যে, কমেডি এবং ট্র্যাজেডি কেবল পীড়নের মাত্রাভেদ মাত্র। কমেডিতে যতটুকু নিষ্ঠুরতা প্রকাশ হয় তাহাতে আমাদের হাসি পায় এবং ট্র্যাজেডিতে যতদূর পর্যন্ত যায় তাহাতে আমাদের চোখে জল আসে। গর্দভের নিকট অনেক টাইটিনিয়া অপূর্বমোহবশত যে আত্মবিসর্জন করিয়া থাকে তাহা মাত্রাভেদে এবং পাত্রভেদে মর্মভেদী শোকের কারণ হইয়া উঠে।

অসংগতি কমেডিরও বিষয়, অসংগতি ট্র্যাজেডিরও বিষয়। কমেডিতেও ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসংগতি প্রকাশ পায়। ফল্‌স্টাফ উইণ্ড্‌সর-বাসিনী রঙ্গিণীর প্রেম-লালসায় বিশ্বস্তচিত্তে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু দুর্গতির একশেষ লাভ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। রামচন্দ্র যখন রাবণবধ করিয়া, বনবাসপ্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়া, রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া, দাম্পত্যসুখের চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছেন, এমন সময় অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল, গর্ভবতী সীতাকে অরণ্যে নির্বাসিত করিতে বাধ্য হইলেন। উভয় স্থলেই আশার সহিত ফলের, ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসংগতি প্রকাশ পাইতেছে। অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, অসংগতি দুই শ্রেণীর আছে; একটা হাস্যজনক, আর-একটা দুঃখজনক। বিরক্তিজনক, বিস্ময়জনক, রোষজনক'কেও আমরা শেষ শ্রেণীতে ফেলিতেছি।

অর্থাৎ অসংগতি যখন আমাদের মনের অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে তখনই আমাদের কৌতুক বোধ হয়, গভীরতর স্তরে আঘাত করিলে আমাদের দুঃখ বোধ হয়। শিকারী যখন অনেক ক্ষণ অনেক তাক করিয়া হংসভ্রমে একটা দূরস্থ শ্বেত পদার্থের প্রতি গুলি বর্ষণ করে এবং ছুটিয়া কাছে গিয়া দেখে সেটা একটা ছিন্ন

বস্ত্রখণ্ড, তখন তাহার সেই নৈরাশ্যে আমাদের হাসি পায় ; কিন্তু কোনো লোক যাহাকে আপন জীবনের পরম পদার্থ মনে করিয়া একাগ্রচিত্তে একান্ত চেষ্টায় আজন্মকাল তাহার অনুসরণ করিয়াছে এবং অবশেষে সিদ্ধকাম হইয়া তাহাকে হাতে লইয়া দেখিয়াছে সে তুচ্ছ প্রবঞ্চনামাত্র, তখন তাহার সেই নৈরাশ্যে অন্তঃকরণ ব্যথিত হয়।

দুর্ভিক্ষে যখন দলে দলে মানুষ মরিতেছে তখন সেটাকে প্রহসনের বিষয় বলিয়া কাহারও মনে হয় না। কিন্তু আমরা অনায়াসে কল্পনা করিতে পারি, একটা রসিক শয়তানের নিকট ইহা পরমকৌতুকাবহ দৃশ্য ; সে তখন এই-সকল অমর-আত্মা-ধারী জীর্ণকলেবরগুলির প্রতি সহাস্য কটাক্ষপাত করিয়া বলিতে পারে, ঐ তো তোমাদের ষড়্‌দর্শন, তোমাদের কালিদাসের কাব্য, তোমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতা পড়িয়া আছে, নাই শুধু দুই মুষ্টি তুচ্ছ তণ্ডুলকণা, অমনি তোমাদের অমর আত্মা, তোমাদের জগদ্‌বিজয়ী মনুষ্যত্ব, একেবারে কণ্ঠের কাছটিতে আসিয়া ধুক্‌ধুক্‌ করিতেছে।

স্থূল কথাটা এই যে, অসংগতির তার অল্পে অল্পে চড়াইতে চড়াইতে বিস্ময় ক্রমে হাস্যে এবং হাস্য ক্রমে অশ্রুজলে পরিণত হইতে থাকে।

ফাল্গুন ১৩০১

সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ

দীপ্তি এবং স্রোতস্বিনী উপস্থিত ছিলেন না, কেবল আমরা চারিজন ছিলাম।

সমীর বলিল— দেখো, সেদিনকার সেই কৌতুকহাস্যের প্রসঙ্গে আমার একটা কথা মনে উদয় হইয়াছে। অধিকাংশ কৌতুক আমাদের মনে একটা-কিছু অদ্ভুত ছবি আনয়ন করে এবং তাহাতেই আমাদের হাসি পায়। কিন্তু যাহারা স্বভাবতই ছবি দেখিতে পায় না, যাহাদের বুদ্ধি অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট বিষয়ের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকে, কৌতুক তাহাদিগকে সহসা বিচলিত করিতে পারে না।

ক্ষিতি কহিল— প্রথমত তোমার কথাটা স্পষ্ট বুঝা গেল না, দ্বিতীয়ত অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট শব্দটা ইংরাজি।

সমীর কহিল— প্রথম অপরাধটা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু দ্বিতীয় অপরাধ হইতে নিষ্কৃতির উপায় দেখি না, অতএব সুধীগণকে ওটা নিজগুণে মার্জনা করিতে হইবে। আমি বলিতেছিলাম, যাহারা দ্রব্যটাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া তাহার গুণটাকে অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে তাহারা স্বভাবত হাস্যরসরসিক হয় না।

ক্ষিতি মাথা নাড়িয়া কহিল— উঁহু, এখনো পরিষ্কার হইল না।

সমীর কহিল— একটা উদাহরণ দিই। প্রথমত দেখো, আমাদের সাহিত্যে কোনো সুন্দরীর বর্ণনাকালে ব্যক্তিবিশেষের ছবি আঁকিবার দিকে লক্ষ্য নাই; সুমেরু দাড়িম্ব কদম্ব বিম্ব প্রভৃতি হইতে কতকগুলি গুণ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাহারই তালিকা দেওয়া হয় এবং সুন্দরীমাত্রেরই প্রতি তাহার আরোপ হইয়া থাকে। আমরা ছবির মতো স্পষ্ট করিয়া কিছু দেখি না এবং ছবি আঁকি না— সেইজন্য কৌতুকের একটি প্রধান অঙ্গ হইতে আমরা বঞ্চিত। আমাদের প্রাচীন কাব্যে প্রশংসাচ্ছলে গজেন্দ্রগমনের সহিত সুন্দরীর মন্দগতির তুলনা হইয়া থাকে। এ তুলনাটি অন্যদেশীয় সাহিত্যে নিশ্চয়ই হাস্যকর বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু এমন একটা অদ্ভুত তুলনা আমাদের দেশে উদ্ভূত এবং সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইল কেন? তাহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের লোকেরা দ্রব্য হইতে তাহার গুণটা অনায়াসে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইতে পারে। ইচ্ছামত হাতি হইতে হাতির সমস্তটাই লোপ করিয়া দিয়া কেবলমাত্র তাহার মন্দগমনটুকু বাহির করিতে পারে, এইজন্য ষোড়শী সুন্দরীর প্রতি যখন গজেন্দ্রগমন আরোপ করে তখন সেই বৃহদাকার জন্তুটাকে একেবারেই দেখিতে পায় না। যখন একটা সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য বর্ণনা করা কবির উদ্দেশ্য হয় তখন সুন্দর উপমা নির্বাচন করা আবশ্যক, কারণ, উপমার কেবল সাদৃশ্য-অংশ নহে, অন্যান্য অংশও আমাদের মনে উদয় না হইয়া থাকিতে পারে না। সেইজন্য হাতির শুঁড়ের সহিত স্ত্রীলোকের হাত-পায়ের বর্ণনা করা সামান্য দুঃসাহসিকতা নহে। কিন্তু আমাদের দেশের পাঠক এ তুলনায় হাসিল না, বিরক্ত হইল না। তাহার কারণ, হাতির শুঁড় হইতে কেবল তাহার গোলত্বটুকু লইয়া আর-সমস্তই আমরা বাদ দিতে পারি, আমাদের সেই আশ্চর্য ক্ষমতাটি আছে। গৃধিনীর সহিত কানের কী সাদৃশ্য আছে বলিতে পারি না, আমার তদুপযুক্ত কল্পনা-শক্তি নাই; কিন্তু সুন্দর মুখের দুই পাশে দুই গৃধিনী ঝুলিতেছে মনে করিয়া হাসি পায় না কল্পনাশক্তির এত অসাড়তাও আমার নাই। বোধ করি ইংরাজি পড়িয়া আমাদের না-হাসিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা বিকৃত হইয়া যাওয়াতেই এরূপ দুর্ঘটনা ঘটে।

ক্ষিতি কহিল— আমাদের দেশের কাব্যে নারীদেহের বর্ণনায় যেখানে উচ্চতা বা গোলতা বুঝাইবার আবশ্যক হইয়াছে সেখানে কবিরা অনায়াসে গম্ভীর মুখে সুমেরু এবং মেদিনীর অবতারণা করিয়াছেন, তাহার কারণ, অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্টের দেশে পরিমাণ-বিচারের আবশ্যকতা নাই; গোরুর পিঠের কুঁজও উচ্চ, কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরও উচ্চ; অতএব অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট উচ্চতাটুকু মাত্র ধরিতে গেলে গোরুর পিঠের কুঁজের

সহিত কাঞ্চনজঙ্ঘার তুলনা করা যাইতে পারে; কিন্তু যে হতভাগ্য কাঞ্চনজঙ্ঘার উপমা শুনিবামাত্র কল্পনাপটে হিমালয়ের শিখর চিত্রিত দেখিতে পায়, যে বেচারা গিরিচূড়া হইতে আলগোছে কেবল তাহার উচ্চতাটুকু লইয়া বাকি আর-সমস্তই আড়াল করিতে পারে না, তাহার পক্ষে বড়োই মুশকিল। ভাই সমীর, তোমার আজিকার এই কথাটা ঠিক মনে লাগিতেছে— প্রতিবাদ না করিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত আছি।

ব্যোম কহিল— কিছু প্রতিবাদ করিবার নাই তাহা বলিতে পারি না। সমীরের মতটা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে বলা আবশ্যক। আসল কথাটা এই, আমরা অন্তর্জগৎবিহারী। বাহিরের জগৎ আমাদের নিকট প্রবল নহে। আমরা যাহা মনের মধ্যে গড়িয়া তুলি বাহিরের জগৎ তাহার প্রতিবাদ করিলে সে প্রতিবাদ গ্রাহ্যই করি না। যেমন ধূমকেতুর লঘু পুচ্ছটা কোনো গ্রহের পথে আসিয়া পড়িলে তাহার পুচ্ছেরই ক্ষতি হইতে পারে কিন্তু গ্রহ অপ্রতিহত ভাবে অনায়াসে চলিয়া যায়, তেমনি বহির্জগতের সহিত আমাদের অন্তর্জগতের রীতিমত সংঘাত কোনোকালে হয় না; হইলে বহির্জগৎটাই হঠিয়া যায়। যাহাদের কাছে হাতিটা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ প্রবল সত্য, তাহারা গজেন্দ্রগমনের উপমায় গজেন্দ্রটাকে বেমালুম বাদ দিয়া কেবল গমনটুকুকে রাখিতে পারে না— গজেন্দ্র বিপুল দেহ বিস্তারপূর্বক অটলভাবে কাব্যের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের কাছে গজ বলো, গজেন্দ্র বলো, কিছুই কিছু নয়। সে আমাদের কাছে এত অধিক জাজ্বল্যমান নহে যে, তাহার গমনটুকু রাখিতে হইলে তাহাকে সুদ্ধ পুষিতে হইবে।

ক্ষিতি কহিল— আমরা অন্তরের বাঁশের কেল্লা বাঁধিয়া তীতুমীরের মতো বহিঃপ্রকৃতির সমস্ত 'গোলা খা ডালা'— সেইজন্য গজেন্দ্র বলো, সুমেরু বলো, মেদিনী বলো, কিছুতেই আমাদিগকে হঠাইতে পারে না। কাব্যে কেন, জ্ঞানরাজ্যেও আমরা বহির্জগৎকে খাতিরমাত্র করি না। একটা সহজ উদাহরণ মনে পড়িতেছে। আমাদের সাত স্বর ভিন্ন ভিন্ন পশুপক্ষীর কণ্ঠস্বর হইতে প্রাপ্ত, ভারতবর্ষীয় সংগীতশাস্ত্রে এই প্রবাদ বহুকাল চলিয়া আসিতেছে— এ পর্যন্ত আমাদের ওস্তাদদের মনে এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহমাত্র উদয় হয় নাই, অথচ বহির্জগৎ হইতে প্রতিদিনই তাহার প্রতিবাদ আমাদের কানে আসিতেছে। স্বরমালার প্রথম স্বরটা যে গাধার স্বর হইতে চুরি এরূপ পরমাশ্চর্য কল্পনা কেমন করিয়া যে কোনো সুরজ্ঞ ব্যক্তির মনে উদয় হইল তাহা আমাদের পক্ষে স্থির করা দুরূহ।

ব্যোম কহিল— গ্রীকদের নিকট বহির্জগৎ বাষ্পবৎ মরীচিকাবৎ ছিল না, তাহা

প্রত্যক্ষ জাজল্যমান ছিল, এইজন্য অত্যন্ত যত্নসহকারে তাঁহাদিগকে মনের সৃষ্টির সহিত বাহিরের সৃষ্টির সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইত। কোনো বিষয়ে পরিমাণ লঙ্ঘন হইলে বাহিরের জগৎ আপন মাপকাঠি লইয়া তাঁহাদিগকে লজ্জা দিত। সেইজন্য তাঁহারা আপন দেব-দেবীর মূর্তি সুন্দর এবং স্বাভাবিক করিয়া গড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন— নতুবা জাগতিক সৃষ্টির সহিত তাঁহাদের মনের সৃষ্টির একটা প্রবল সংঘাত বাধিয়া তাঁহাদের ভক্তির ও আনন্দের ব্যাঘাত করিত। আমাদের সে ভাবনা নাই। আমরা আমাদের দেবতাকে যে মূর্তিই দিই না কেন, আমাদের কল্পনার সহিত বা বহির্জগতের সহিত তাহার কোনো বিরোধ ঘটে না। মূষিকবাহন চতুর্ভুজ একদন্ত লম্বোদর গজানন মূর্তি আমাদের নিকট হাস্যজনক নহে, কারণ আমরা সেই মূর্তিকে আমাদের মনের ভাবের মধ্যে দেখি, বাহিরের জগতের সহিত, চারি দিকের সত্যের সহিত তাহার তুলনা করি না। কারণ, বাহিরের জগৎ আমাদের নিকট তেমন প্রবল নহে, প্রত্যক্ষ সত্য আমাদের নিকট তেমন সুদৃঢ় নহে, আমরা যে-কোনো একটা উপলক্ষ অবলম্বন করিয়া নিজের মনের ভাবটাকে জাগ্রত করিয়া রাখিতে পারি।

সমীর কহিল— যেটাকে উপলক্ষ করিয়া আমরা প্রেম বা ভক্তির উপভোগ অথবা সাধনা করিয়া থাকি, সেই উপলক্ষটাকে সম্পূর্ণতা বা সৌন্দর্য বা স্বাভাবিকতায় ভূষিত করিয়া তোলা আমরা অনাবশ্যক মনে করি। আমরা সম্মুখে একটা কুগঠিত মূর্তি দেখিয়াও মনে তাহাকে সুন্দর বলিয়া অনুভব করিতে পারি। মানুষের ঘননীলবর্ণ আমাদের নিকট স্বভাবত সুন্দর মনে না হইতে পারে, অথচ ঘননীলবর্ণে চিত্রিত কৃষ্ণের মূর্তিকে সুন্দর বলিয়া ধারণা করিতে আমাদিগকে কিছুমাত্র প্রয়াস পাইতে হয় না। বহির্জগতের আদর্শকে যাহারা নিজের ইচ্ছামতে লোপ করিতে জানে না, তাহারা মনের সৌন্দর্যভাবকে মূর্তি দিতে গেলে কখনোই কোনো অস্বাভাবিকতা বা অসৌন্দর্যের সমাবেশ করিতে পারে না। গ্রীকদের চক্ষে এই নীলবর্ণ অত্যন্ত অধিক পীড়া উৎপাদন করিত।

ব্যোম কহিল— আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির এই বিশেষত্বটি উচ্চ অঙ্গের কলাবিদ্যার ব্যাঘাত করিতে পারে, কিন্তু ইহার একটু সুবিধাও আছে। ভক্তি স্নেহ প্রেম, এমন-কি, সৌন্দর্যভোগের জন্য আমাদিগকে বাহিরের দাসত্ব করিতে হয় না, সুবিধা-সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। আমাদের দেশের স্ত্রী স্বামীকে দেবতা বলিয়া পূজা করে— কিন্তু সেই ভক্তিভাব উদ্রেক করিবার জন্য স্বামীর দেবত্ব বা মহত্ত্ব থাকিবার কোনো আবশ্যক করে না, এমন-কি ঘোরতর পশুত্ব থাকিলেও পূজার ব্যাঘাত হয় না। তাহারা এক দিকে স্বামীকে মানুষভাবে লাঞ্ছনা গঞ্জনা করিতে পারে, আবার অন্য দিকে দেবতাভাবে পূজাও করিয়া থাকে। একটাতে

অন্যটা অভিভূত হয় না। কারণ, আমাদের মনোজগতের সহিত বাহ্যজগতের সংঘাত তেমন প্রবল নহে।

সমীর কহিল— কেবল স্বামীদেবতা কেন, পৌরাণিক দেবদেবী সম্বন্ধেও আমাদের মনের এইরূপ দুই বিরোধী ভাব আছে— তাহারা পরস্পর পরস্পরকে দূরীকৃত করিতে পারে না। আমাদের দেবতাদের সম্বন্ধে যে-সকল শাস্ত্রকাহিনী ও জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে তাহা আমাদের ধর্মবুদ্ধির উচ্চ-আদর্শ-সংগত নহে, এমন-কি, আমাদের সাহিত্যে আমাদের সংগীতে সেই-সকল দেবকুৎসার উল্লেখ করিয়া বিস্তর তিরস্কার ও পরিহাসও আছে— কিন্তু ব্যঙ্গ ও ভর্ৎসনা করি বলিয়া যে ভক্তি করি না তাহা নহে। গাভীকে জন্তু বলিয়া জানি, তাহার বুদ্ধিবিবেচনার প্রতিও কটাক্ষপাত করিয়া থাকি, খেতের মধ্যে প্রবেশ করিলে লাঠি হাতে তাহাকে তাড়াও করি, গোয়ালঘরে তাহাকে একহাঁটু গোময়পঙ্কের মধ্যে দাঁড় করাইয়া রাখি; কিন্তু ভগবতী বলিয়া ভক্তি করিবার সময় সে-সব কথা মনেও উদয় হয় না।

ক্ষিতি কহিল— আবার দেখো, আমরা চিরকাল বেসুরো লোককে গাধার সহিত তুলনা করিয়া আসিতেছি, অথচ বলিতেছি গাধাই আমাদিগকে প্রথম সুর ধরাইয়া দিয়াছে। যখন এটা বলি তখন ওটা মনে আনি না, যখন ওটা বলি তখন এটা মনে আনি না। ইহা আমাদের একটা বিশেষ ক্ষমতা সন্দেহ নাই, কিন্তু এই বিশেষ ক্ষমতা-বশত ব্যোম যে সুবিধার উল্লেখ করিতেছেন আমি তাহাকে সুবিধা মনে করি না। কাল্পনিক সৃষ্টি বিস্তার করিতে পারি বলিয়া অর্থলাভ জ্ঞানলাভ এবং সৌন্দর্যভোগ সম্বন্ধে আমাদের একটা ঔদাসীন্যজড়িত সন্তোষের ভাব আছে। আমাদের বিশেষ-কিছু আবশ্যক নাই। য়ুরোপীয়েরা তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক অনুমানকে কঠিন প্রমাণের দ্বারা সহস্র বার করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তথাপি তাঁহাদের সন্দেহ মিটিতে চায় না— আমরা মনের মধ্যে যদি বেশ একটা সুসংগত এবং সুগঠিত মত খাড়া করিতে পারি তবে তাহার সুসংগতি এবং সুষমাই আমাদের নিকট সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়, তাহাকে বহির্জগতে পরীক্ষা করিয়া দেখা বাহুল্য বোধ করি। জ্ঞানবৃত্তি সম্বন্ধে যেমন, হৃদয়বৃত্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ। আমরা সৌন্দর্য-রসের চর্চা করিতে চাই, কিন্তু সেজন্য অতি যত্নসহকারে মনের আদর্শকে বাহিরে মূর্তিমান করিয়া তোলা আবশ্যক বোধ করি না— যেমন-তেমন একটা-কিছু হইলেই সন্তুষ্ট থাকি; এমন-কি, আলংকারিক অত্যুক্তির অনুসরণ করিয়া একটা বিকৃত মূর্তি খাড়া করিয়া তুলি এবং সেই অসংগত বিরূপ বিসদৃশ ব্যাপারকে মনে মনে আপন ইচ্ছামত ভাবে পরিণত করিয়া তাহাতেই পরিতৃপ্ত হই; আপন দেবতাকে, আপন সৌন্দর্যের

আদর্শকে প্রকৃতরূপে সুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করি না। ভক্তিরসের চর্চা করিতে চাই, কিন্তু যথার্থ ভক্তির পাত্র অন্বেষণ করিবার কোনো আবশ্যকতা বোধ করি না— অপাত্রে ভক্তি করিয়াও আমরা সন্তোষে থাকি। সেইজন্য আমরা বলি গুরুদেব আমাদের পূজনীয়, এ কথা বলি না যে যিনি পূজনীয় তিনি আমাদের গুরু। হয়তো গুরু আমার কানে যে মন্ত্র দিয়াছেন তাহার অর্থ তিনি কিছুই বুঝেন না, হয়তো গুরুঠাকুর আমার মিথ্যা মোকদ্দমায় প্রধান মিথ্যাসাক্ষী, তথাপি তাঁহার পদধূলি আমার শিরোধার্য— এরূপ মত গ্রহণ করিলে ভক্তির জন্য ভক্তিভাজনকে খুঁজিতে হয় না, দিব্য আরামে ভক্তি করা যায়।

সমীর কহিল— ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র তাহার একটি উদাহরণ। বঙ্কিম কৃষ্ণকে পূজা করিবার এবং কৃষ্ণপূজা প্রচার করিবার পূর্বে কৃষ্ণকে নির্মল এবং সুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এমন-কি, কৃষ্ণের চরিত্রে অনৈসর্গিক যাহা-কিছু ছিল তাহাও তিনি বর্জন করিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণকে তাঁহার নিজের উচ্চতম আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি এ কথা বলেন নাই যে, দেবতার কোনো কিছুতেই দোষ নাই, তেজীয়ানের পক্ষে সমস্ত মার্জনীয়। তিনি এক নূতন অসন্তোষের সূত্রপাত করিয়াছেন; তিনি পূজা-বিতরণের পূর্বে প্রাণপণ চেষ্টায় দেবতাকে অন্বেষণ করিয়াছেন ও হাতের কাছে যাহাকে পাইয়াছেন তাহাকেই নমোনমঃ করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই।

ক্ষিতি কহিল— এই অসন্তোষটি না থাকাতে বহুকাল হইতে আমাদের সমাজে দেবতাকে দেবতা হইবার, পূজ্যকে উন্নত হইবার, মূর্তিকে ভাবের অনুরূপ হইবার প্রয়োজন হয় নাই। ব্রাহ্মণকে দেবতা বলিয়া জানি, সেইজন্য বিনা চেষ্টায় তিনি পূজা প্রাপ্ত হন, এবং আমাদেরও ভক্তিবৃত্তি অতি অনায়াসে চরিতার্থ হয়। স্বামীকে দেবতা বলিলে স্ত্রীর ভক্তি পাইবার জন্য স্বামীর কিছুমাত্র যোগ্যতালাভের আবশ্যক হয় না, এবং স্ত্রীকেও যথার্থ ভক্তির যোগ্য স্বামী -অভাবে অসন্তোষ অনুভব করিতে হয় না। সৌন্দর্য অনুভব করিবার জন্য সুন্দর জিনিসের আবশ্যকতা নাই, ভক্তি বিতরণ করিবার জন্য ভক্তিভাজনের প্রয়োজন নাই, এরূপ পরমসন্তোষের অবস্থাকে আমি সুবিধা মনে করি না। ইহাতে কেবল সমাজের দীনতা, শ্রীহীনতা এবং অবনতি ঘটিতে থাকে। বহির্জগৎটাকে উত্তরোত্তর বিলুপ্ত করিয়া দিয়া মনোজগৎকেই সর্বপ্রাধান্য দিতে গেলে যে ডালে বসিয়া আছি সেই ডালকেই কুঠারাঘাত করা হয়।

মাঘ ১৩০১

ভদ্রতার আদর্শ

স্রোতস্বিনী কহিল— দেখো, বাড়িতে ক্রিয়াকর্ম আছে, তোমরা ব্যোমকে একটু ভদ্রবেশ পরিয়া আসিতে বলিয়ো।

শুনিয়া আমরা সকলে হাসিতে লাগিলাম। দীপ্তি একটু রাগ করিয়া বলিল— না, হাসিবার কথা নয়; তোমরা ব্যোমকে সাবধান করিয়া দাও না বলিয়া সে ভদ্র-সমাজে এমন উন্মাদের মতো সাজ করিয়া আসে। এ-সকল বিষয়ে একটু সামাজিক শাসন থাকা দরকার।

সমীর কথাটাকে ফলাইয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিল— কেন দরকার?

দীপ্তি কহিল— কাব্যরাজ্যে কবির শাসন যেমন কঠিন— কবি যেমন ছন্দের কোনো শৈথিল্য, মিলের কোনো ত্রুটি, শব্দের কোনো রূঢ়তা মার্জনা করিতে চাহে না— আমাদের আচারব্যবহার বসনভূষণ সম্বন্ধে সমাজ-পুরুষের শাসন তেমনি কঠিন হওয়া উচিত, নতুবা সমগ্র সমাজের ছন্দ এবং সৌন্দর্য কখনোই রক্ষা হইতে পারে না।

ক্ষিতি কহিল— ব্যোম বেচারা যদি মানুষ না হইয়া শব্দ হইত তাহা হইলে এ কথা নিশ্চয় বলিতে পারি, ভট্টিকাব্যেও তাহার স্থান হইত না; নিঃসন্দেহ তাহাকে মুগ্ধবোধের সূত্র অবলম্বন করিয়া বাস করিতে হইত।

আমি কহিলাম— সমাজকে সুন্দর সুশিষ্ট সুশৃঙ্খল করিয়া তোলা আমাদের সকলেরই কর্তব্য সে কথা মানি, কিন্তু অন্যমনস্ক ব্যোম বেচারা যখন সে কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া দীর্ঘ পদবিক্ষেপে চলিয়া যায় তখন তাহাকে মন্দ লাগে না।

দীপ্তি কহিল— ভালো কাপড় পরিলে তাহাকে আরও ভালো লাগিত।

ক্ষিতি কহিল— সত্য বলো দেখি, ভালো কাপড় পরিলে ব্যোমকে কি ভালো দেখাইত? হাতির যদি ঠিক ময়ূরের মতো পেখম হয় তাহা হইলে কি তাহার সৌন্দর্যবৃদ্ধি হয়? আবার ময়ূরের পক্ষেও হাতির লেজ শোভা পায় না— তেমনি আমাদের ব্যোমকে সমীরের পোশাকে মানায় না, আবার সমীর যদি ব্যোমের পোশাক পরিয়া আসে উহাকে ঘরে ঢুকিতে দেওয়া যায় না।

সমীর কহিল— আসল কথা, বেশভূষা আচারব্যবহারের স্খলন যেখানে শৈথিল্য অজ্ঞতা ও জড়ত্ব সূচনা করে সেইখানেই তাহা কদর্য দেখিতে হয়। সেইজন্য আমাদের বাঙালিসমাজ এমন শ্রীবিহীন। লক্ষ্মীছাড়া যেমন সমাজছাড়া তেমনি বাঙালিসমাজ যেন পৃথ্বীসমাজের বাহিরে। হিন্দুস্থানীর সেলামের মতো বাঙালির কোনো সাধারণ অভিবাদন নাই। তাহার কারণ, বাঙালি কেবল ঘরের ছেলে,

কেবল গ্রামের লোক ; সে কেবল আপনার গৃহসম্পর্ক এবং গ্রামসম্পর্ক জানে, সাধারণ পৃথিবীর সহিত তাহার কোনো সম্পর্ক নাই— এজন্য অপরিচিত সমাজে সে কোনো শিষ্টাচারের নিয়ম খুঁজিয়া পায় না। একজন হিন্দুস্থানি ইংরাজকেই হউক আর চীনেম্যানকেই হউক ভদ্রতাস্থলে সকলকেই সেলাম করিতে পারে— আমরা সে স্থলে নমস্কার করিতেও পারি না, সেলাম করিতেও পারি না, আমরা সেখানে বর্বর। বাঙালি স্ত্রীলোক যথেষ্ট আবৃত নহে এবং সর্বদাই অসম্বৃত— তাহার কারণ, সে ঘরেই আছে, এইজন্য ভাশুর-শ্বশুর-সম্পর্কীয় গৃহপ্রচলিত যে-সকল কৃত্রিম লজ্জা তাহা তাহার প্রচুর পরিমাণেই আছে, কিন্তু সাধারণ ভদ্রসমাজসংগত লজ্জা সম্বন্ধে তাহার সম্পূর্ণ শৈথিল্য দেখা যায়। গায়ে কাপড় রাখা বা না-রাখার বিষয়ে বাঙালি পুরুষদেরও অপর্যাপ্ত ঔদাসীন্য ; চিরকাল অধিকাংশ সময় আত্মীয়সমাজে বিচরণ করিয়া এ সম্বন্ধে একটা অবহেলা তাহার মনে দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। অতএব বাঙালির বেশভূষা চাল-চলনের অভাবে একটা অপরিমিত আলস্য শৈথিল্য স্বেচ্ছাচার ও আত্মসম্মানের অভাব প্রকাশ পায়, সুতরাং তাহা যে বিশুদ্ধ বর্বরতা তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমি কহিলাম— কিন্তু সেজন্য আমরা লজ্জিত নহি। যেমন রোগবিশেষে মানুষ যাহা খায় তাহাই শরীরের মধ্যে শর্করা হইয়া উঠে, তেমনি আমাদের দেশের ভালোমন্দ সমস্তই আশ্চর্য মানসিক-বিকার-বশত কেবল অতিমিষ্ট অহংকারের বিষয়েই পরিণত হইতেছে। আমরা বলিয়া থাকি আমাদের সভ্যতা আধ্যাত্মিক সভ্যতা, অশনবসনগত সভ্যতা নহে, সেইজন্যই এই-সকল জড় বিষয়ে আমাদের এত অনাসক্তি।

সমীর কহিল— উচ্চতম বিষয়ে সর্বদা লক্ষ স্থির রাখাতে নিম্নতন বিষয়ে যাঁহাদের বিস্মৃতি ও ঔদাসীন্য জন্মে তাঁহাদের সম্বন্ধে নিন্দার কথা কাহারও মনেও আসে না। সকল সভ্যসমাজেই এরূপ এক সম্প্রদায়ের লোক সমাজের বিরল উচ্চশিখরে বাস করিয়া থাকেন। অতীত ভারতবর্ষে অধ্যয়ন-অধ্যাপন-শীল ব্রাহ্মণ এই-শ্রেণী-ভুক্ত ছিলেন ; তাঁহারা যে ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের ন্যায় সাজসজ্জা ও কাজকর্মে নিরত থাকিবেন এমন কেহ আশা করিত না। য়ুরোপেও সে সম্প্রদায়ের লোক ছিল এবং এখনো আছে। মধ্যযুগের আচার্যদের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক, আধুনিক য়ুরোপেও নিউটনের মতো লোক যদি নিতান্ত হাল-ফ্যাশানের সান্ধ্যবেশ না পরিয়াও নিমন্ত্রণে যান এবং লৌকিকতার সমস্ত নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন না করেন, তথাপি সমাজ তাঁহাকে শাসন করে না, উপহাস করিতেও সাহস করে না। সর্বদেশে সর্বকালেই স্বল্পসংখ্যক মহাত্মা লোকসমাজের

মধ্যে থাকিয়াও সমাজের বাহিরে থাকেন, নতুবা তাঁহারা কাজ করিতে পারেন না এবং সমাজও তাঁহাদের নিকট হইতে সামাজিকতার ক্ষুদ্র শুল্কগুলি আদায় করিতে নিরস্ত থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে বাংলাদেশে, কেবল কতকগুলি লোক নহে, আমরা দেশসুদ্ধ সকলেই সকল-প্রকার স্বভাববৈচিত্র্য ভুলিয়া সেই সমাজাতীত আধ্যাত্মিক শিখরে অবহেলে চড়িয়া বসিয়া আছি। আমরা ঢিলা কাপড় এবং অত্যন্ত ঢিলা আদব-কায়দা লইয়া দিব্য আরামে ছুটি ভোগ করিতেছি— আমরা যেমন করিয়াই থাকি আর যেমন করিয়াই চলি তাহাতে কাহারও সমালোচনা করিবার কোনো অধিকার নাই— কারণ, আমরা উত্তম মধ্যম অধম সকলেই খাটো ধুতি ও ময়লা চাদর পরিয়া নির্গুণ ব্রহ্মে লয় পাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছি।

হেনকালে ব্যোম তাহার বৃহৎ লগুড়খানি হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত। তাহার বেশ অন্য দিনের অপেক্ষাও অদ্ভুত; তাহার কারণ, আজ ক্রীড়াকর্মের বাড়ি বলিয়াই তাহার প্রাত্যহিক বেশের উপরে বিশেষ করিয়া একখানা অনির্দিষ্ট-আকৃতি চাপকান গোছের পদার্থ চাপাইয়া আসিয়াছে; তাহার আশপাশ হইতে ভিতরকার অসংগত কাপড়গুলার প্রান্ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে— দেখিয়া আমাদের হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল এবং দীপ্তি ও স্রোতস্বিনীর মনে যথেষ্ট অবজ্ঞার উদয় হইল।

ব্যোম জিজ্ঞাসা করিল— তোমাদের কী বিষয়ে আলাপ হইতেছে?

সমীর আমাদের আলোচনার কিয়দংশ সংক্ষেপে বলিয়া কহিল— আমরা দেশসুদ্ধ সকলেই বৈরাগ্যের 'ভেক' ধারণ করিয়াছি।

ব্যোম কহিল— বৈরাগ্য ব্যতীত কোনো বৃহৎ কর্ম হইতেই পারে না। আলোকের সহিত যেমন ছায়া, কর্মের সহিত তেমনি বৈরাগ্য নিয়ত সংযুক্ত হইয়া আছে। যাহার যে পরিমাণে বৈরাগ্যে অধিকার পৃথিবীতে সে সেই পরিমাণে কাজ করিতে পারে।

ক্ষিতি কহিল— সেইজন্য পৃথিবীসুদ্ধ লোক যখন সুখের প্রত্যাশায় সহস্র চেষ্টায় নিযুক্ত ছিল তখন বৈরাগী ডারুয়িন সংসারের সহস্র চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া কেবল প্রমাণ করিতেছিলেন যে, মানুষের আদিপুরুষ বানর ছিল। এই সমাচারটি আহরণ করিতে ডারুয়িনকে অনেক বৈরাগ্য সাধন করিতে হইয়াছিল।

ব্যোম কহিল— বহুতর আসক্তি হইতে গারিবাল্‌ডি যদি আপনাকে স্বাধীন করিতে না পারিতেন তবে ইটালিকেও তিনি স্বাধীন করিতে পারিতেন না। যে-সকল জাতি কর্মিষ্ঠ জাতি তাহারাই যথার্থ বৈরাগ্য জানে। যাহারা জ্ঞানলাভের জন্য জীবন ও জীবনের সমস্ত আরাম তুচ্ছ করিয়া মেরুপ্রদেশের হিমশীতল

*

মৃত্যুশালার তুষাররুদ্ধ কঠিন দ্বারদেশে বারম্বার আঘাত করিতে ধাবিত হইতেছে, যাহারা ধর্মবিতরণের জন্য নরমাংসভুক্ রাক্ষসের দেশে চিরনির্বাসন বহন করিতেছে, যাহারা মাতৃভূমির আহ্বানে মুহূর্তকালের মধ্যেই ধনজনযৌবনের সুখশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দুঃসহ ক্লেশ এবং অতি নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, তাহারাই জানে যথার্থ বৈরাগ্য কাহাকে বলে। আর আমাদের এই কর্মহীন শ্রীহীন নিশ্চেষ্ট নির্জীব বৈরাগ্য কেবল অধঃপতিত জাতির মূর্ছাবস্থামাত্র— উহা জড়ত্ব, উহা অহংকারের বিষয় নহে।

ক্ষিতি কহিল— আমাদের এই মূর্ছাবস্থাকে আমরা আধ্যাত্মিক 'দশা' পাওয়ার অবস্থা মনে করিয়া নিজের প্রতি নিজে ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া বসিয়া আছি।

ব্যোম কহিল— কর্মীকে কর্মের কঠিন নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়, সেইজন্যই সে আপন কর্মের নিয়মপালন উপলক্ষে সমাজের অনেক ছোটো কর্তব্য উপেক্ষা করিতে পারে— কিন্তু অকর্মণ্যের সে অধিকার থাকিতে পারে না। যে লোক তাড়াতাড়ি আপিসে বাহির হইতেছে তাহার নিকটে সমাজ সুদীর্ঘ সুসম্পূর্ণ শিষ্টালাপ প্রত্যাশা করে না। ইংরাজ মালী যখন গায়ের কোর্তা খুলিয়া হাতের আস্তিন গুটাইয়া বাগানের কাজ করে তখন তাহাকে দেখিয়া তাহার অভিজাতবংশীয়া প্রভুমহিলার লজ্জা পাইবার কোনো কারণ নাই। কিন্তু আমরা যখন কোনো কাজ নাই, কর্ম নাই, দীর্ঘ দিন রাজপথপার্শ্বে নিজের গৃহদ্বারপ্রান্তে স্থূল বর্তুল উদর উদ্‌ঘাটিত করিয়া, হাঁটুর উপর কাপড় গুটাইয়া, নির্বোধের মতো তামাক টানি, তখন বিশ্বজগতের সম্মুখে কোন্ মহৎ বৈরাগ্যের কোন্ উন্নত আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়া এই কুশ্রী বর্বরতা প্রকাশ করিয়া থাকি! যে বৈরাগ্যের সঙ্গে কোনো মহত্তর সচেষ্ট সাধনা সংযুক্ত নাই তাহা অসভ্যতার নামান্তর মাত্র।

ব্যোমের মুখে এই-সকল কথা শুনিয়া স্রোতস্বিনী আশ্চর্য হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল— আমরা সকল ভদ্রলোকেই যত দিন না আপন ভদ্রতা রক্ষার কর্তব্য সর্বদা মনে রাখিয়া আপনাদিগকে বেশে ব্যবহারে বাসস্থানে সর্বতোভাবে ভদ্র করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিব তত দিন আমরা আত্মসম্মান লাভ করিব না এবং পরের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইব না। আমরা নিজের মূল্য নিজে অত্যন্ত কমাইয়া দিয়াছি।

ক্ষিতি কহিল— সে মূল্য বাড়াইতে হইলে এ দিকে বেতনবৃদ্ধি করিতে হয়, সেটা প্রভুদের হাতে।

দীপ্তি কহিল— বেতনবৃদ্ধি নহে চেতনবৃদ্ধির আবশ্যক। আমাদের দেশের

ধনীরাও যে অশোভন ভাবে থাকে সেটা কেবল জড়তা এবং মূঢ়তা -বশত, অর্থের অভাবে নহে। যাহার টাকা আছে সে মনে করে জুড়িগাড়ি না হইলে তাহার ঐশ্বর্য প্রমাণ হয় না, কিন্তু তাহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, তাহা ভদ্রলোকের গোশালারও অযোগ্য। অহংকারের পক্ষে যে আয়োজন আবশ্যক তাহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আছে, কিন্তু আত্মসম্মানের জন্য, স্বাস্থ্যশোভার জন্য যাহা আবশ্যক তাহার বেলায় আমাদের টাকা কুলায় না। আমাদের মেয়েরা এ কথা মনেও করে না যে, সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য যতটুকু অলংকার আবশ্যক তাহার অধিক পরিয়া ধনগর্ব প্রকাশ করিতে যাওয়া ইতরজনোচিত অভদ্রতা— এবং সেই অহংকারতৃপ্তির জন্য টাকার অভাব হয় না, কিন্তু প্রাঙ্গণপূর্ণ আবর্জনা এবং শয়নগৃহভিত্তির তৈলকজ্জলময় মলিনতা -মোচনের জন্য তাহাদের কিছুমাত্র সত্বরতা নাই। টাকার অভাব নহে, আমাদের দেশে যথার্থ ভদ্রতার আদর্শ এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

স্রোতস্বিনী কহিল— তাহার প্রধান কারণ, আমরা অলস। টাকা থাকিলেই বড়োমানুষি করা যায়, টাকা না থাকিলেও ধার করিয়া নবাবি করা চলে, কিন্তু ভদ্র হইতে গেলে আলস্য-অবহেলা বিসর্জন করিতে হয়, সর্বদা আপনাকে উন্নত সামাজিক আদর্শের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত রাখিতে হয়, নিয়ম স্বীকার করিয়া আত্মবিসর্জন করিতে হয়।

ক্ষিতি কহিল— কিন্তু আমরা মনে করি আমরা স্বভাবের শিশু, অতএব অত্যন্ত সরল। ধুলায় কাদায় নগ্নতায়, সর্বপ্রকার নিয়মহীনতায় আমাদের কোনো লজ্জা নাই— আমাদের সকলই অকৃত্রিম এবং সকলই আধ্যাত্মিক।

শ্রাবণ ১৩০২

অপূর্ব রামায়ণ

বাড়িতে একটা শুভকার্য ছিল, তাই বিকালের দিকে অদূরবর্তী মঞ্চের উপর হইতে বারোয়াঁ রাগিণীতে নহবত বাজিতেছিল। ব্যোম অনেকক্ষণ মুদ্রিতচক্ষে থাকিয়া হঠাৎ চক্ষু খুলিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—

আমাদের এই-সকল দেশীয় রাগিণীর মধ্যে একটা পরিব্যাপ্ত মৃত্যুশোকের ভাব আছে; সুরগুলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, সংসারে কিছুই স্থায়ী হয় না। সংসারে সকলই অস্থায়ী, এ কথাটা সংসারীর পক্ষে নূতন নহে, প্রিয়ও নহে, ইহা একটা অটল

কঠিন সত্য ; কিন্তু তবু এটা বাঁশির মুখে শুনিতে এত ভালো লাগিতেছে কেন ? কারণ, বাঁশিতে জগতের এই সর্বাপেক্ষা সুকঠোর সত্যটাকে সর্বাপেক্ষা সুমধুর করিয়া বলিতেছে— মনে হইতেছে, মৃত্যুটা এই রাগিণীর মতো সকরুণ বটে, কিন্তু এই রাগিণীর মতোই সুন্দর। জগৎসংসারের বক্ষের উপরে সর্বাপেক্ষা গুরুতম যে জগদ্দল পাথরটা চাপিয়া আছে এই গানের সুরে সেইটাকে কী-এক মন্ত্রবলে লঘু করিয়া দিতেছে। একজনের হৃদয়কুহর হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলে যে বেদনা চীৎকার হইয়া বাজিয়া উঠিত, ক্রন্দন হইয়া ফাটিয়া পড়িত, বাঁশি তাহাই সমস্ত জগতের মুখ হইতে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়া এমন অগাধকরুণাপূর্ণ অথচ অনন্তসান্ত্বনাময় রাগিণীর সৃষ্টি করিতেছে।

দীপ্তি এবং স্রোতস্বিনী আতিথ্যের কাজ সারিয়া সবেমাত্র আসিয়া বসিয়াছিল, এমন সময় আজিকার এই মঙ্গলকার্যের দিনে ব্যোমের মুখে মৃত্যুসম্বন্ধীয় আলোচনায় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। ব্যোম তাহাদের বিরক্তি না বুঝিতে পারিয়া অবিচলিত অম্লানমুখে বলিয়া যাইতে লাগিল। নহবতটা বেশ লাগিতেছিল, আমরা আর সেদিন বড়ো তর্ক করিলাম না।

ব্যোম কহিল— আজিকার এই বাঁশি শুনিতে শুনিতে একটা কথা বিশেষ করিয়া আমার মনে উদয় হইতেছে। প্রত্যেক কবিতার মধ্যে একটি বিশেষ রস থাকে— অলংকারশাস্ত্রে যাহাকে আদি করুণ শান্তি -নামক ভিন্ন ভিন্ন নামে ভাগ করিয়াছে ; আমার মনে হইতেছে, জগৎরচনাকে যদি কাব্যহিসাবে দেখা যায় তবে মৃত্যুই তাহার সেই প্রধান রস, মৃত্যুই তাহাকে যথার্থ কবিত্ব অর্পণ করিয়াছে। যদি মৃত্যু না থাকিত, জগতের যেখানকার যাহা তাহা চিরকাল সেইখানেই যদি অবিকৃত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত, তবে জগৎটা একটা চিরস্থায়ী সমাধিমন্দিরের মতো অত্যন্ত সংকীর্ণ, অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত বদ্ধ হইয়া রহিত। এই অনন্ত নিশ্চলতার চিরস্থায়ী ভার বহন করা প্রাণীদের পক্ষে বড়ো দুরূহ হইত। মৃত্যু এই অস্তিত্বের ভীষণ ভারকে সর্বদা লঘু করিয়া রাখিয়াছে, এবং জগৎকে বিচরণ করিবার অসীম ক্ষেত্র দিয়াছে। যে দিকে মৃত্যু সেই দিকেই জগতের অসীমতা। সেই অনন্ত রহস্যভূমির দিকেই মানুষের সমস্ত কবিতা, সমস্ত সংগীত, সমস্ত ধর্মতন্ত্র, সমস্ত তৃপ্তিহীন বাসনা সমুদ্রপারগামী পক্ষীর মতো নীড়-অন্বেষণে উড়িয়া চলিয়াছে। একে, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা বর্তমান, তাহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রবল, আবার তাহাই যদি চিরস্থায়ী হইত তবে তাহার একেশ্বর দৌরাত্ম্যের আর শেষ থাকিত না— তবে তাহার উপরে আর আপিল চলিত কোথায় ? তবে কে নির্দেশ করিয়া দিত ইহার বাহিরেও অসীমতা আছে ? অনন্তের

ভার এ জগৎ কেমন করিয়া বহন করিত মৃত্যু যদি সেই অনন্তকে আপনার চিরপ্রবাহে নিত্যকাল ভাসমান করিয়া না রাখিত ?

সমীর কহিল— মরিতে না হইলে বাঁচিয়া থাকিবার কোনো মর্যাদাই থাকিত না। এখন জগৎসুদ্ধ লোক যাহাকে অবজ্ঞা করে সেও মৃত্যু আছে বলিয়াই জীবনের গৌরবে গৌরবান্বিত।

ক্ষিতি কহিল— আমি সেজন্য বেশি চিন্তিত নহি ; আমার মতে মৃত্যুর অভাবে কোনো বিষয়ে কোথাও দাঁড়ি দিবার জো থাকিত না সেইটাই সব চেয়ে চিন্তার কারণ। সে অবস্থায় ব্যোম যদি অদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন করিত কেহ জোড়হাত করিয়া এ কথা বলিতে পারিত না যে, ভাই, এখন আর সময় নাই, অতএব ক্ষান্ত হও। মৃত্যু না থাকিলে অবসরের অন্ত থাকিত না। এখন মানুষ নিদেন সাত-আট বৎসর বয়সে অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া পঁচিশ বৎসর বয়সের মধ্যে কলেজের ডিগ্রি লইয়া অথবা দিব্য ফেল করিয়া নিশ্চিন্ত হয় ; তখন কোনো বিশেষ বয়সে আরম্ভ করারও কারণ থাকিত না, কোনো বিশেষ বয়সে শেষ করিবারও তাড়া থাকিত না। সকলপ্রকার কাজকর্ম ও জীবনযাত্রার কমা সেমিকোলন দাঁড়ি একেবারেই উঠিয়া যাইত।

ব্যোম এ-সকল কথায় যথেষ্ট কর্ণপাত না করিয়া নিজের চিন্তাসূত্র অনুসরণ করিয়া বলিয়া গেল— জগতের মধ্যে মৃত্যুই কেবল চিরস্থায়ী— সেইজন্য আমাদের সমস্ত চিরস্থায়ী আশা ও বাসনাকে সেই মৃত্যুর মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। আমাদের স্বর্গ, আমাদের পুণ্য, আমাদের অমরতা সব সেইখানেই। যে-সব জিনিস আমাদের এত প্রিয় যে, কখনো তাহাদের বিনাশ কল্পনাও করিতে পারি না, সেগুলিকে মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়া জীবনান্তকাল অপেক্ষা করিয়া থাকি। পৃথিবীতে বিচার নাই, সুবিচার মৃত্যুর পরে ; পৃথিবীতে প্রাণপণ বাসনা নিষ্ফল হয়, সফলতা মৃত্যুর কল্পতরুতলে। জগতের আর-সকল দিকেই কঠিন স্থূল বস্তুরাশি আমাদের মানস আদর্শকে প্রতিহত করে, আমাদের অমরতা অসীমতাকে অপ্রমাণ করে— জগতের যে সীমায় মৃত্যু, যেখানে সমস্ত বস্তুর অবসান, সেইখানেই আমাদের প্রিয়তম প্রবলতম বাসনার, আমাদের শুচিতম সুন্দরতম কল্পনার, কোনো প্রতিবন্ধক নাই। আমাদের শিব শ্মশানবাসী— আমাদের সর্বোচ্চ মঙ্গলের আদর্শ মৃত্যুনিকেতনে।

মুলতান-বারোয়াঁ শেষ করিয়া সূর্যাস্তকালের স্বর্ণাভ অন্ধকারের মধ্যে নহবতে পুরবী বাজিতে লাগিল। সমীর বলিল— মানুষ মৃত্যুর পারে যে-সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছে, এই বাঁশির সুরে সেই-সকল চিরাশ্রুসজল

হৃদয়ের ধনগুলিকে পুনর্বার মনুষ্যলোকে ফিরাইয়া আনিতেছে। সাহিত্য এবং সংগীত এবং সমস্ত ললিতকলা, মনুষ্যহৃদয়ের সমস্ত নিত্য পদার্থকে মৃত্যুর পরকালপ্রান্ত হইতে ইহজীবনের মাঝখানে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। বলিতেছে, পৃথিবীকে স্বর্গ, বাস্তবকে সুন্দর এবং এই ক্ষণিক জীবনকেই অমর করিতে হইবে। মৃত্যু যেমন জগতের অসীম রূপ ব্যক্ত করিয়া দিয়াছে, তাহাকে এক অনন্ত বাসরশয্যায় এক পরমরহস্যের সহিত পরিণয়পাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেই রুদ্ধদ্বার বাসরগৃহের গোপন বাতায়নপথ হইতে অনন্ত সৌন্দর্যের সৌগন্ধ এবং সংগীত আসিয়া আমাদিগকে স্পর্শ করিতেছে, তেমনি সাহিত্যরস এবং কলারস আমাদের জড়ভারগ্রস্ত বিক্ষিপ্ত প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে প্রত্যক্ষের সহিত অপ্রত্যক্ষের, অনিত্যের সহিত নিত্যের, তুচ্ছের সহিত সুন্দরের, ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র সুখদুঃখের সহিত বিশ্বব্যাপী বৃহৎ রাগিণীর যোগসাধন করিয়া তুলিতেছে। আমাদের সমস্ত প্রেমকে পৃথিবী হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া মৃত্যুর পারে পাঠাইয়া দিব না এই পৃথিবীতেই রাখিব, ইহা লইয়াই তর্ক। আমাদের প্রাচীন বৈরাগ্যধর্ম বলিতেছে, পরকালের মধ্যেই প্রকৃত প্রেমের স্থান ; নবীন সাহিত্য এবং ললিতকলা বলিতেছে, ইহলোকেই আমরা তাহার স্থান দেখাইয়া দিতেছি।

ক্ষিতি কহিল— এই প্রসঙ্গে আমি এক অপূর্ব রামায়ণ-কথা বলিয়া সভাভঙ্গ করিতে ইচ্ছা করি।

রাজা রামচন্দ্র— অর্থাৎ মানুষ— প্রেম-নামক সীতাকে নানা রাক্ষসের হাত হইতে রক্ষা করিয়া আনিয়া নিজের অযোধ্যাপুরীতে পরমসুখে বাস করিতেছিলেন। এমন সময় কতকগুলি ধর্মশাস্ত্র দল বাঁধিয়া এই প্রেমের নামে কলঙ্ক রটনা করিয়া দিল। বলিল, উনি অনিত্য পদার্থের সহিত একত্র বাস করিয়াছেন, উঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। বাস্তবিক অনিত্যের ঘরে রুদ্ধ থাকিয়াও এই দেবাংশজাত রাজকুমারীকে যে কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারে নাই, সে কথা এখন কে প্রমাণ করিবে ? এক, অগ্নিপরীক্ষা আছে, সে তো দেখা হইয়াছে— অগ্নিতে ইঁহাকে নষ্ট না করিয়া আরও উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে। তবু শাস্ত্রের কানাকানিতে অবশেষে এই রাজা প্রেমকে একদিন মৃত্যু-তমসার তীরে নির্বাসিত করিয়া দিলেন! ইতিমধ্যে মহাকবি এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দের আশ্রয়ে থাকিয়া এই অনাথিনী কুশ এবং লব, কাব্য এবং ললিতকলা -নামক যুগল-সন্তান, প্রসব করিয়াছেন। সেই দুটি শিশুই কবির কাছে রাগিণী শিক্ষা করিয়া রাজসভায় আজ তাহাদের পরিত্যক্তা জননীর যশোগান করিতে আসিয়াছে। এই নবীন গায়কের গানে বিরহী রাজার চিত্ত চঞ্চল এবং

তাঁহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এখনো উত্তরকাণ্ড সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই। এখনো দেখিবার আছে— জয় হয় ত্যাগপ্রচারক প্রবীণ বৈরাগ্যধর্মের, না, প্রেমমঙ্গল-গায়ক দুটি অমর শিশুর।

আষাঢ় ১৩০২

বৈজ্ঞানিক কৌতূহল

বিজ্ঞানের আদিম উৎপত্তি এবং চরম লক্ষ্য লইয়া ব্যোম এবং ক্ষিতির মধ্যে মহা তর্ক বাধিয়া গিয়াছিল। তদুপলক্ষে ব্যোম কহিল— যদিও আমাদের কৌতূহলবৃত্তি হইতেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি, তথাপি, আমার বিশ্বাস, আমাদের কৌতূহলটা ঠিক বিজ্ঞানের তল্লাশ করিতে বাহির হয় নাই; বরঞ্চ তাহার আকাঙ্ক্ষাটা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। সে খুঁজিতে যায় পরশ-পাথর, বাহির হইয়া পড়ে একটা প্রাচীন জীবের জীর্ণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ; সে চায় আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ, পায় দেশালাইয়ের বাক্স; আল্‌কিমিটাই তাহার মনোগত উদ্দেশ্য, কেমিস্ট্রি তাহার অপ্রার্থিত সিদ্ধি; অ্যাস্ট্রলজির জন্য সে আকাশ ঘিরিয়া জাল ফেলে, কিন্তু হাতে উঠিয়া আসে অ্যাস্ট্রনমি। সে নিয়ম খোঁজে না, সে কার্যকারণশৃঙ্খলের নব নব অঙ্গুরী গণনা করিতে চায় না; সে খোঁজে নিয়মের বিচ্ছেদ; সে মনে করে, কোন্‌ সময়ে এক জায়গায় আসিয়া হঠাৎ দেখিতে পাইবে সেখানে কার্যকারণের অনন্ত পুনরুক্তি নাই। সে চায় অভূতপূর্ব নূতনত্ব— কিন্তু বৃদ্ধ বিজ্ঞান নিঃশব্দে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া তাহার সমস্ত নূতনকে পুরাতন করিয়া দেয়, তাহার ইন্দ্রধনুকে পরকলা-বিচ্ছুরিত বর্ণমালার পরিবর্ধিত সংস্করণ এবং পৃথিবীর গতিকে পক্কতালফলপতনের সমশ্রেণীয় বলিয়া প্রমাণ করে।

যে নিয়ম আমাদের ধূলিকণার মধ্যে, অনন্ত আকাশ ও অনন্ত কালের সর্বত্রই সেই এক নিয়ম প্রসারিত; এই আবিষ্কারটি লইয়া আমরা আজকাল আনন্দ ও বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকি। কিন্তু এই আনন্দ এই বিস্ময় মানুষের যথার্থ স্বাভাবিক নহে। সে অনন্ত আকাশে জ্যোতিষ্করাজ্যের মধ্যে যখন অনুসন্ধানদূত প্রেরণ করিয়াছিল তখন বড়ো আশা করিয়াছিল যে, ঐ জ্যোতির্ময় অন্ধকারময় ধামে ধূলিকণার নিয়ম নাই, সেখানে অত্যাশ্চর্য একটা স্বর্গীয় অনিয়মের উৎসব, কিন্তু এখন দেখিতেছে ঐ চন্দ্রসূর্য গ্রহনক্ষত্র, ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল, ঐ অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা আমাদের এই ধূলিকণারই জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সহোদর-সহোদরা। এই নূতন তথ্যটি লইয়া আমরা যে আনন্দ

প্রকাশ করি, তাহা আমাদের একটা নূতন কৃত্রিম অভ্যাস, তাহা আমাদের আদিম প্রকৃতিগত নহে।

সমীর কহিল— সে কথা বড়ো মিথ্যা নহে। পরশপাথর এবং আলাদিনের প্রদীপের প্রতি প্রকৃতিস্থ মানুষমাত্রেরই একটা নিগূঢ় আকর্ষণ আছে। ছেলেবেলায় কথামালার এক গল্প পড়িয়াছিলাম যে, কোনো কৃষক মরিবার সময় তাহার পুত্রকে বলিয়া গিয়াছিল যে, অমুক ক্ষেত্রে তোমার জন্য আমি গুপ্তধন রাখিয়া গেলাম। সে বেচারা বিস্তর খুঁড়িয়া গুপ্তধন পাইল না, কিন্তু প্রচুর খননের গুণে সে জমিতে এত শস্য জন্মিল যে তাহার আর অভাব রহিল না। বালকপ্রকৃতি বালকমাত্রেরই এ গল্পটি পড়িয়া কষ্ট বোধ হইয়া থাকে। চাষ করিয়া শস্য তো পৃথিবী-সুদ্ধ সকল চাষাই পাইতেছে, কিন্তু গুপ্তধনটা গুপ্ত বলিয়াই পায় না; তাহা বিশ্বব্যাপী নিয়মের একটা ব্যভিচার, তাহা আকস্মিক, সেইজন্যই তাহা স্বভাবত মানুষের কাছে এত বেশি প্রার্থনীয়। কথামালা যাহাই বলুন, কৃষকের পুত্র তাহার পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হয় নাই সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। বৈজ্ঞানিক নিয়মের প্রতি অবজ্ঞা মানুষের পক্ষে কত স্বাভাবিক আমরা প্রতিদিনই তাহার প্রমাণ পাই। যে ডাক্তার নিপুণ চিকিৎসার দ্বারা অনেক রোগীর আরোগ্য করিয়া থাকেন, তাঁহার সম্বন্ধে আমরা বলি লোকটার হাতযশ আছে। শাস্ত্রসংগত চিকিৎসার নিয়মে ডাক্তার রোগ আরাম করিতেছে এ কথায় আমাদের আন্তরিক তৃপ্তি নাই; উহার মধ্যে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমস্বরূপ একটা রহস্য আরোপ করিয়া তবে আমরা সন্তুষ্ট থাকি।

আমি কহিলাম— তাহার কারণ এই যে, নিয়ম অনন্ত কাল ও অনন্ত দেশে প্রসারিত হইলেও তাহা সীমাবদ্ধ, সে আপন চিহ্নিত রেখা হইতে অণুপরিমাণ ইতস্তত করিতে পারে না, সেইজন্যই তাহার নাম নিয়ম এবং সেইজন্যই মানুষের কল্পনাকে সে পীড়া দেয়। শাস্ত্রসংগত চিকিৎসার কাছে আমরা অধিক আশা করিতে পারি না— এমন রোগ আছে যাহা চিকিৎসার অসাধ্য; কিন্তু এপর্যন্ত হাতযশ-নামক একটা রহস্যময় ব্যাপারের ঠিক সীমানির্ণয় হয় নাই; এইজন্য সে আমাদের আশাকে কল্পনাকে কোথাও কঠিন বাধা দেয় না। এইজন্যই ডাক্তারি ঔষধের চেয়ে অবধৌতিক ঔষধের আকর্ষণ অধিক। তাহার ফল যে কত দূর পর্যন্ত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে আমাদের প্রত্যাশা সীমাবদ্ধ নহে। মানুষের যত অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি হইতে থাকে, অমোঘ নিয়মের লৌহপ্রাচীরে যতই সে আঘাত প্রাপ্ত হয়, ততই মানুষ নিজের স্বাভাবিক অনন্ত আশাকে সীমাবদ্ধ করিয়া আনে, কৌতূহলবৃত্তির স্বাভাবিক নূতনত্বের আকাঙ্ক্ষা সংযত করিয়া আনে, নিয়মকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত

করে এবং প্রথমে অনিচ্ছাক্রমে পরে অভ্যাসক্রমে তাহার প্রতি একটা রাজভক্তির উদ্রেক করিয়া তোলে।

ব্যোম কহিল— কিন্তু সে ভক্তি যথার্থ অন্তরের ভক্তি নহে, তাহা কাজ-আদায়ের ভক্তি। যখন নিতান্ত নিশ্চয় জানা যায় যে, জগৎকার্য অপরিবর্তনীয় নিয়মে বদ্ধ, তখন কাজেই পেটের দায়ে প্রাণের দায়ে তাহার নিকট ঘাড় হেঁট করিতে হয়; তখন বিজ্ঞানের বাহিরে অনিশ্চয়ের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে সাহস হয় না; তখন মাছলি তাগা জল-পড়া প্রভৃতিকে গ্রহণ করিতে হইলে ইলেক্‌ট্রিসিটি ম্যাগ্নেটিজ্‌ম্ হিপ্‌নটিজ্‌ম্ প্রভৃতি বিজ্ঞানের জাল মার্কা দেখিয়া আপনাকে ভুলাইতে হয়। আমরা নিয়ম অপেক্ষা অনিয়মকে যে ভালোবাসি তাহার একটা গোড়ার কারণ আছে। আমাদের নিজের মধ্যে এক জায়গায় আমরা নিয়মের বিচ্ছেদ দেখিতে পাই। আমাদের ইচ্ছাশক্তি সকল নিয়মের বাহিরে— সে স্বাধীন; অন্তত আমরা সেইরূপ অনুভব করি। আমাদের অন্তরপ্রকৃতিগত সেই স্বাধীনতার সাদৃশ্য বাহ্যপ্রকৃতির মধ্যে উপলব্ধি করিতে স্বভাবতই আমাদের আনন্দ হয়। ইচ্ছার প্রতি ইচ্ছার আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল; ইচ্ছার সহিত যে দান আমরা প্রাপ্ত হই সে দান আমাদের কাছে অধিকতর প্রিয়; সেবা যতই পাই তাহার সহিত ইচ্ছার যোগ না থাকিলে তাহা আমাদের নিকট রুচিকর বোধ হয় না। সেইজন্য, যখন জানিতাম যে, ইন্দ্র আমাদিগকে বৃষ্টি দিতেছেন, মরুৎ আমাদিগকে বায়ু যোগাইতেছেন, অগ্নি আমাদিগকে দীপ্তি দান করিতেছেন, তখন সেই জ্ঞানের মধ্যে আমাদের একটা আন্তরিক তৃপ্তি ছিল; এখন জানি, রৌদ্রবৃষ্টিবায়ুর মধ্যে ইচ্ছা-অনিচ্ছা নাই, তাহারা যোগ্য-অযোগ্য প্রিয়-অপ্রিয় বিচার না করিয়া নির্বিকারে যথানিয়মে কাজ করে; আকাশে জলীয় অণু শীতলবায়ুসংযোগে সংহত হইলেই সাধুর পবিত্র মস্তকে বর্ষিত হইয়া সর্দি উৎপাদন করিবে এবং অসাধুর কুষ্মাণ্ডমঞ্চে জলসিঞ্চন করিতে কুণ্ঠিত হইবে না— বিজ্ঞান আলোচনা করিতে করিতে ইহা আমাদের ক্রমে একরূপ সহ্য হইয়া আসে, কিন্তু বস্তুত ইহা আমাদের ভালোই লাগে না।

আমি কহিলাম— পূর্বে আমরা যেখানে স্বাধীন ইচ্ছার কর্তৃত্ব অনুমান করিয়াছিলাম, এখন সেখানে নিয়মের অন্ধ শাসন দেখিতে পাই, সেইজন্য বিজ্ঞান আলোচনা করিলে জগৎকে নিরানন্দ ইচ্ছাসম্পর্কবিহীন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইচ্ছা এবং আনন্দ যতক্ষণ আমার অন্তরে আছে, ততক্ষণ জগতের অন্তরে তাহাকে অনুভব করিতেই হইবে —পূর্বে তাহাকে যেখানে কল্পনা করিয়াছিলাম সেখানে না হউক, তাহার অন্তরতর অন্তরতম স্থানে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত না জানিলে আমাদের অন্তরতম প্রকৃতির প্রতি

ব্যভিচার করা হয়। আমার মধ্যে সমস্ত বিশ্বনিয়মের যে-একটি ব্যতিক্রম আছে, জগতে কোথাও তাহার একটা মূল আদর্শ নাই, ইহা আমাদের অন্তরাত্মা স্বীকার করিতে চাহে না। এইজন্য আমাদের ইচ্ছা একটা বিশ্ব-ইচ্ছার, আমাদের প্রেম একটা বিশ্বপ্রেমের নিগূঢ় অপেক্ষা না রাখিয়া বাঁচিতে পারে না।

সমীর কহিল— জড়প্রকৃতির সর্বত্রই নিয়মের প্রাচীর চীনদেশের প্রাচীরের অপেক্ষা দৃঢ়, প্রশস্ত ও অভ্রভেদী ; হঠাৎ মানবপ্রকৃতির মধ্যে একটা ক্ষুদ্র ছিদ্র বাহির হইয়াছে, সেইখানে চক্ষু দিয়াই আমরা এক আশ্চর্য আবিষ্কার করিয়াছি, দেখিয়াছি প্রাচীরের পরপারে এক অনন্ত অনিয়ম রহিয়াছে ; এই ছিদ্রপথে তাহার সহিত আমাদের যোগ ; সেইখান হইতেই সমস্ত সৌন্দর্য স্বাধীনতা প্রেম আনন্দ প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। সেইজন্য এই সৌন্দর্য ও প্রেমকে কোনো বিজ্ঞানের নিয়মে বাঁধিতে পারিল না।

এমন সময়ে স্রোতস্বিনী গৃহে প্রবেশ করিয়া সমীরকে কহিল— সেদিন দীপ্তির পিয়ানো বাজাইবার স্বরলিপি-বইখানা তোমরা এত করিয়া খুঁজিতেছিলে, সেটার কী দশা হইয়াছে জান ?

সমীর কহিল— না।

স্রোতস্বিনী কহিল— রাত্রে ইঁদুরে তাহা কুটি-কুটি করিয়া কাটিয়া পিয়ানোর তারের মধ্যে ছড়াইয়া রাখিয়াছে। এরূপ অনাবশ্যক ক্ষতি করিবার তো কোনো উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সমীর কহিল— উক্ত ইন্দুরটি বোধ করি ইন্দুরবংশে একটি বিশেষক্ষমতাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক ; বিস্তর গবেষণায় সে বাজনার বহির সহিত বাজনার তারের একটা সম্বন্ধ অনুমান করিতে পারিয়াছে। এখন সমস্ত রাত ধরিয়া পরীক্ষা চালাইতেছে। বিচিত্র ঐক্যতানপূর্ণ সংগীতের আশ্চর্য রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তীক্ষ্ণ দন্তাগ্রভাগ-দ্বারা বাজনার বহির ক্রমাগত বিশ্লেষণ করিতেছে, পিয়ানোর তারের সহিত তাহাকে নানাভাবে একত্র করিয়া দেখিতেছে। এখন বাজনার বই কাটিতে শুরু করিয়াছে, ক্রমে বাজনার তার কাটিবে, কাঠ কাটিবে, বাজনাটাকে শতছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রপথে আপন সূক্ষ্ম নাসিকা ও চঞ্চল কৌতূহল প্রবেশ করাইয়া দিবে— মাঝে হইতে সংগীতও ততই উত্তরোত্তর সুদূরপরাহত হইবে। আমার মনে এই তর্ক উদয় হইতেছে যে ইন্দুরকুলতিলক যে উপায় অবলম্বন করিয়াছে তাহাতে তার এবং কাগজের উপাদান সম্বন্ধে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে, কিন্তু উক্ত কাগজের সহিত উক্ত তারের যথার্থ যে সম্বন্ধ তাহা কি শতসহস্র বৎসরেও বাহির হইবে। অবশেষে কি

সংশয়পরায়ণ নব্য ইন্দুরদিগের মনে এইরূপ একটা বিতর্ক উপস্থিত হইবে না যে, কাগজ কেবল কাগজ মাত্র, এবং তার কেবল তার— কোনো জ্ঞানবান্ জীব -কর্তৃক উহাদের মধ্যে যে একটা আনন্দজনক উদ্দেশ্যবন্ধন বদ্ধ হইয়াছে তাহা কেবল প্রাচীন ইন্দুরদিগের যুক্তিহীন সংস্কার, সেই সংস্কারের কেবল একটা এই শুভফল দেখা যাইতেছে যে তাহারই প্রবর্তনায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া তার এবং কাগজের আপেক্ষিক কঠিনতা সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা সম্পন্ন হইয়াছে।

কিন্তু এক-একদিন গহ্বরের গভীরতলে দন্তচালনকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া মাঝে মাঝে অপূর্ব সংগীতধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করে এবং অন্তঃকরণকে ক্ষণকালের জন্য মোহাবিষ্ট করিয়া দেয়। সেটা ব্যাপারটা কী? সে একটা রহস্য বটে। কিন্তু সে রহস্য নিশ্চয়ই কাগজ এবং তার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে করিতে ক্রমশ শতছিদ্র আকারে উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইবে।

ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২

গ্রন্থপরিচয়

[রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণ, বর্তমানে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচলিত সংস্করণ, রচনাবলী-সংস্করণ, এই তিনটির পার্থক্য সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে নির্দেশ করা গেল]

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' ১২৯১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে প্রকাশকরূপে বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন। প্রকাশকের বিজ্ঞাপনে লিখিত হইয়াছে—

'ভানুসিংহের পদাবলী শৈশব সঙ্গীতের আনুষঙ্গিক স্বরূপে প্রকাশিত হইল। ইহার অধিকাংশই পুরাতন কালের খাতা হইতে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছি। প্রকাশক।'

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে প্রকাশিত দুইটি কবিতা ('আজু সখি মুহু মুহু' ও 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যামসমান') পূর্বে 'ছবি ও গান'এর প্রথম সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, পরে 'ছবি ও গান' হইতে বর্জিত হয়। 'কো তুঁহু বোলবি মোয়' কবিতাটি ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর প্রথম সংস্করণের অন্তর্গত হয় নাই। উহা প্রথমে 'কড়ি ও কোমল'এর প্রথম সংস্করণে সংকলিত হইয়াছিল, পরে 'কড়ি ও কোমল' হইতে বর্জিত ও পদাবলীতে সংকলিত হয়।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর প্রথম সংস্করণ ১৫-সংখ্যক কবিতা 'সখি রে পিরীত বুঝবে কে' ও ১৬-সংখ্যক কবিতা 'হম সখি দারিদ নারী' পরবর্তী কালে বর্জিত হয়। এই দুইটি ব্যতীত প্রথম সংস্করণের অন্যান্য কবিতা ও 'কো তুঁহু' কবিতা বিশ্বভারতী সংস্করণে (ফাল্গুন ১৩৩৫) মুদ্রিত আছে, তবে অনেকগুলি অল্পবিস্তর পরিবর্তিত বা খণ্ডিত হইয়াছে। রচনাবলীতে উক্ত সংস্করণ অনুসৃত হইয়াছে।

জীবনস্মৃতিতে 'ভানুসিংহের কবিতা' -শীর্ষক প্রবন্ধে কবি 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের মাত্র দুইটি কবিতা ('মরণ রে তুঁহু মম শ্যামসমান' ও 'কো তুঁহু বোলবি মোয়') স্বীকারযোগ্য —সঞ্চয়িতার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী', 'সন্ধ্যাসংগীত' কাব্যের পূর্বে রচিত হইলেও, গ্রন্থ-প্রকাশকালের ক্রম-অনুযায়ী রচনাবলীতে ইহা পরে স্থান পাইয়াছে।

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে কবিতাগুলির পাদটীকায়

দুরূহ শব্দের অর্থনির্দেশ ও আরম্ভে স্বরনির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

কড়ি ও কোমল

'কড়ি ও কোমল' আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় -কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া ১২৯৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। আশুতোষ চৌধুরী এই কবিতাগুলি 'যথোচিত পর্যায়ে সাজাইয়া' প্রকাশ করিয়াছিলেন।—

'তাঁহারই 'পরে প্রকাশের ভার দেওয়া হইয়াছিল। মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে : এই চতুর্দশপদী কবিতাটি তিনিই গ্রন্থের প্রথমেই [গ্রন্থারম্ভের পূর্বে প্রবেশকরূপে] বসাইয়া দিলেন। তাঁহার মতে এই কবিতাটির মধ্যেই সমস্ত গ্রন্থের মর্মকথাটি আছে।'

— জীবনস্মৃতি

জীবনস্মৃতিতে 'শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী' ও 'কড়ি ও কোমল' অধ্যায় দুইটিতে কবি 'কড়ি ও কোমল' সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। সঞ্চয়িতার ভূমিকায় 'কড়ি ও কোমল' সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন—

'কড়ি ও কোমলে অনেক ত্যাজ্য জিনিস আছে, কিন্তু সেই পর্বে আমার কাব্য-ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে।'

— সঞ্চয়িতা। পৌষ ১৩৩৮

'কড়ি ও কোমল'এর বর্তমান ভূমিকাটি রচনাবলী-সংস্করণের জন্য নূতন লিখিত।

'কড়ি ও কোমল'এর প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত নিম্নোক্ত কবিতাগুলি পরবর্তীকালে এই গ্রন্থ হইতে বর্জিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম চারিটি কবিতা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে পত্ররূপে লিখিত হইয়াছিল।—

পত্র : মাগো আমার লক্ষ্মী ইত্যাদি

পত্র : বসে বসে লিখলেম চিঠি ইত্যাদি

জন্মতিথির উপহার : একটি কাঠের বাক্স : স্নেহ উপহার এনেছি রে ইত্যাদি

চিঠি : চিঠি লিখব কথা ছিল ইত্যাদি

শরতের শুকতারা : একাদশী রজনী পোহায় ধীরে ধীরে ইত্যাদি

কো তুঁহু : কো তুঁহু বোলবি মোয় ইত্যাদি

পত্র : দামু বোস আর চামু বোসে কাগজ বেনিয়েছে ইত্যাদি

উল্লিখিত কবিতাগুলির মধ্যে 'কো তুঁহু' পরে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে

সংকলিত হইয়াছে, এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। 'পত্র' (মা গো আমার লক্ষ্মী ইত্যাদি), 'জন্মতিথির উপহার', 'চিঠি' ও 'শরতে শুকতারা' 'শিশু' গ্রন্থে পরিবর্তিত আকারে 'বিচ্ছেদ', 'উপহার', 'পরিচয়' ও 'অস্তসখী' নামে সংকলিত। পূর্বোল্লিখিত কয়েকটি কবিতা ব্যতীত, প্রথম সংস্করণের অন্য কবিতাগুলি বর্তমানে প্রচলিত স্বতন্ত্র সংস্করণের অন্তর্গত আছে।

বর্তমান স্বতন্ত্র সংস্করণের কয়েকটি কবিতা রচনাবলী-সংস্করণ 'কড়ি ও কোমল' হইতে পরিত্যক্ত হইল, সেগুলি অন্য গ্রন্থে সংকলিত হইবে।—

'বিদেশী ফুলের গুচ্ছ' শীর্ষক কবিতাগুলি (এবং ইহার পূর্ব ও পরবর্তী কালে রচিত অনুবাদ-কবিতাগুলি) রচনাবলীতে একটি স্বতন্ত্র অনুবাদ-বিভাগে সংকলিত হইবে।

নিম্নলিখিত কবিতাগুলি পরবর্তীকালে শিশু গ্রন্থেও মুদ্রিত হইয়াছিল, বর্তমানেও মুদ্রিত আছে। রচনাবলীতে সেগুলি 'কড়ি ও কোমল' হইতে বর্জিত হইল ; 'শিশু'তেই সেগুলি মুদ্রিত হইবে।—

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর : দিনের আলো নিবে এল ইত্যাদি
সাত ভাই চম্পা : সাতটি চাঁপা সাতটি গাছে ইত্যাদি
পুরানো বট : লুটিয়ে পড়ে জটিল জটা ইত্যাদি
হাসিরাশি : নাম রেখেছি বাবলারানী ইত্যাদি
মা লক্ষ্মী : কার পানে মা, চেয়ে আছ ইত্যাদি
আকুল আহ্বান : অভিমান করে কোথায় গেলি ইত্যাদি
মায়ের আশা : ফুলের দিনে সে যে চলে গেল ইত্যাদি
পাখির পালক : খেলাধুলো সব রহিল পড়িয়া ইত্যাদি
আশীর্বাদ : ইহাদের করো আশীর্বাদ ইত্যাদি

এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, উল্লিখিত কবিতাগুলি ব্যতীত, 'কড়ি ও কোমল'এর আরও কতকগুলি কবিতা 'শিশু'তে সংকলিত হইয়াছিল। রচনাবলীতে সেগুলি 'কড়ি ও কোমল'এরই অন্তর্ভুক্ত রাখা হইল, রচনাবলী-সংস্করণ 'শিশু' হইতে সেগুলি পরিত্যক্ত হইবে।

'বিদায় করেছ যারে নয়নজলে' এই গানটি 'মায়ার খেলা'তে মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া রচনাবলীতে 'কড়ি ও কোমল' হইতে পরিত্যক্ত হইল।

মানসী

'মানসী' ১২৯৭ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের মতে মানসী তাঁহার সর্বপ্রথম কাব্যপদবাচ্য রচনা, সঞ্চয়িতার ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন—

'মানসী থেকে আরম্ভ করে বাকি বইগুলির কবিতায় ভালো মন্দ মাঝারির ভেদ আছে, কিন্তু আমার আদর্শ অনুসারে ওরা প্রবেশিকা অতিক্রম করে কবিতার শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।'

—সঞ্চয়িতা। পৌষ ১৩৩৮

মানসীর 'গুরুগোবিন্দ' ও 'নিষ্ফল উপহার' কবিতা দুইটি 'কথা ও কাহিনী' কাব্যেও সংকলিত হয়; রচনাবলীতে ঐ দুইটি কবিতা মানসী হইতে পরিত্যক্ত হইল, 'কথা ও কাহিনী'তে মুদ্রিত হইবে।

'শেষ উপহার' কবিতাটি সম্বন্ধে প্রথম-প্রকাশ-কালীন গ্রন্থকারের 'ভূমিকা'য় লিখিত আছে—

'শেষ উপহার -নামক কবিতাটি আমার কোনো বন্ধুর রচিত এক ইংরাজি কবিতা অবলম্বন করিয়া রচনা করিয়াছি। মূল কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু আমার বন্ধু সম্প্রতি সুদূর প্রবাসে থাকা -প্রযুক্ত তাহা পারিলাম না।'

—মানসী। ১২৯৭

লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়ের একটি ইংরেজি কবিতা পড়িয়া শেষ উপহার কবিতার ভাব কবির মনে উদিত হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ এইরূপ বলিয়াছেন।

'তবু' কবিতাটিকে কবি কিছু পরিবর্তন করিয়া গীতরূপ দিয়াছেন।

'পত্র' (পৃ ১৫৪-৫৭) ও 'শ্রাবণের পত্র' (পৃ ১৬২-৬৩) কবিতা দুইটি শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে লিখিত।

'ধর্মপ্রচার' কবিতাটি সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল। "২৮ জৈ্যষ্ঠ সঞ্জীবনীতে 'এই কি পুরুষার্থ' প্রবন্ধ পাঠ করিয়া" —এরূপ মন্তব্য কবিতাটির পাণ্ডু-লিপিতে লিখিত আছে।

বিসর্জন

'বিসর্জন' 'রাজর্ষি উপন্যাসের প্রথমাংশ হইতে নাট্যাকারে রচিত' ও ১২৯৭ সালে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৩০৩ সালে প্রকাশিত 'কাব্যগ্রন্থাবলী'র সংকলনে বিসর্জনের বহুল পরিবর্তন সাধিত হয়; অনেকগুলি দৃশ্য সংক্ষিপ্ত হয়, নূতন-লিখিত কোনো কোনো অংশ যোজিত হয়, কোনো কোনো অংশ পরিবর্তিত হয়, ও কয়েকটি দৃশ্য সম্পূর্ণ বর্জিত হয়। এই-সকল পরিবর্তনের ফলে প্রথম সংস্করণে প্রকটিত অনেকগুলি চরিত্রও সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়, যথা— হাসি, হাসির কাকা কেদারেশ্বর, অপর্ণার অন্ধ পিতা ইত্যাদি।

১৩০৬ সালে বিসর্জনের 'দ্বিতীয় সংস্করণ' প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের প্রধান পরিবর্তন— পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে 'পুষ্প-অর্ঘ্য লইয়া গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ' ও তৎপরবর্তী অংশের যোজনা।

'কাব্যগ্রন্থাবলী' সংস্করণ ও দ্বিতীয় সংস্করণের উল্লেখযোগ্য অন্য পার্থক্য পঞ্চম অঙ্কের দৃশ্যবিভাগ-গত। 'কাব্যগ্রন্থাবলী' সংস্করণের পঞ্চম অঙ্কের চারিটি স্বতন্ত্র দৃশ্য দ্বিতীয় সংস্করণে দুইটি দৃশ্যে পরিণত হয়; 'কাব্যগ্রন্থাবলী' সংস্করণের পঞ্চম অঙ্কের প্রথম ও চতুর্থ দৃশ্য যুক্ত করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণে পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় (বা শেষ) দৃশ্য করা হয়; 'কাব্য-গ্রন্থাবলী' সংস্করণের পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্য যুক্ত করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম দৃশ্য করা হয়। পঞ্চম অঙ্কের এই দৃশ্যবিভাগে প্রচলিত সংস্করণ ও রচনাবলী-সংস্করণ 'কাব্যগ্রন্থাবলী' সংস্করণেরই অনুরূপ, দ্বিতীয় সংস্করণের শেষ দৃশ্যে নূতন-যোজিত অংশটিও প্রচলিত সংস্করণে ও রচনাবলীতে মুদ্রিত আছে।

১৩৩৩ সালে বিসর্জনের একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহাতে 'প্রথম সংস্করণের অনেকগুলি পরিত্যক্ত অংশ পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে; এবং ১৩৩০ সালে লেখা সম্পূর্ণ নূতন একটি অংশও যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেইজন্য [এই] সংস্করণে কবি অঙ্ক ও দৃশ্য -বিভাগ সম্পূর্ণ নূতন করিয়া সাজাইয়াছেন।' এই সংস্করণ পরে পরিত্যক্ত হয় এবং 'কাব্যগ্রন্থাবলী' সংস্করণ ও দ্বিতীয় সংস্করণ -অবলম্বনে একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়, উহাই বর্তমানে প্রচলিত।

রবীন্দ্র-রচনাবলীতে প্রচলিত সংস্করণই অনুসৃত হইয়াছে, তবে পুরাতন সংস্করণ-গুলির সহায়তায় বিভিন্ন স্থানে পাঠসংশোধন করা হইয়াছে। শেষ দৃশ্যের একটি সংশোধন পাণ্ডুলিপির সাহায্যে।

রাজর্ষি

'রাজর্ষি' ১২৯৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রাজর্ষির গল্পটি অংশতঃ স্বপ্নলব্ধ, ঐ স্বপ্নের সহিত ত্রিপুরার পুরাবৃত্ত -যোগে ইহার রচনা। এই স্বপ্ন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন—

'ছবি ও গান এবং কড়ি ও কোমল -এর মাঝখানে বালক নামে একখানি মাসিক পত্র এক বৎসরের ওষধির মতো ফসল ফলাইয়া লীলাসম্বরণ করিল।··· দুই-এক সংখ্যা বালক বাহির হইবার পর দুই-এক দিনের জন্য দেওঘরে রাজনারায়ণ বাবুকে দেখিতে যাই। কলিকাতায় ফিরিবার সময় রাত্রের গাড়িতে ভিড় ছিল; ভালো করিয়া ঘুম হইতেছিল না— ঠিক চোখের উপরে আলো জ্বলিতেছিল। মনে করিলাম ঘুম যখন হইবেই না তখন এই সুযোগে বালকের জন্য একটা গল্প ভাবিয়া রাখি। গল্প ভাবিবার ব্যর্থ চেষ্টার টানে গল্প আসিল না, ঘুম আসিয়া পড়িল। স্বপ্ন দেখিলাম, কোন্-এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে— বাবা, একি! এ যে রক্ত! বালিকার এই কাতরতায় তাহার বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভাণ করিয়া কোনোমতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে। জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প। এমন স্বপ্নে পাওয়া গল্প এবং অন্য লেখা আমার আরও আছে। এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুরাবৃত্ত মিশাইয়া রাজর্ষি গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে বালকে বাহির করিতে লাগিলাম।'

—বালক অধ্যায়। জীবনস্মৃতি

ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য কবিকে গোবিন্দমাণিক্যের ইতিহাস পাঠাইয়াছিলেন; তাহা রাজর্ষির প্রথম সংস্করণে পরিশিষ্টরূপে প্রকাশিত। নক্ষত্ররায়ের ত্রিপুরা-অধিকার ও গোবিন্দমাণিক্যের স্ব-ইচ্ছায় সিংহাসনত্যাগ এবং নক্ষত্ররায়ের মৃত্যুর পর গোবিন্দমাণিক্যের রাজ্যভার-পুনর্গ্রহণ প্রভৃতি এই ইতিবৃত্তে বর্ণিত আছে।

বিভিন্ন সংস্করণে রাজর্ষির অনেকাংশ বর্জিত এবং চত্বারিংশ ও একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ বর্জিত হয়। ১৩৩১ সালের বিশ্বভারতী-সংস্করণে ঐ দুইটি পরিচ্ছেদ ও অন্যান্য অনেক বর্জিত অংশ পুনঃসংকলিত হয়। রচনাবলী-সংস্করণ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের সহায়তায় নূতন প্রস্তুত হইল; ইহাতে উক্ত বর্জিত পরিচ্ছেদগুলি সংগৃহীত, অন্যান্য বর্জিত অংশ প্রয়োজনমতে সংকলিত এবং প্রথম দ্বিতীয় ও আধুনিক সংস্করণের সহায়তায় বিভিন্ন স্থলে পাঠ সংশোধিত হইয়াছে। উত্তরকালে 'রাজর্ষি'র গল্পাংশ লইয়াই 'বিসর্জন' নাটক রচিত হয়।

*

চিঠিপত্র

চিঠিপত্রের অন্তর্গত রচনাবলী সমস্তই ১২৯২ সনের 'বালক' মাসিক পত্রে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। গ্রন্থভুক্ত নয়টি নিবন্ধ যথাক্রমে 'বালক'এর জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন-কার্তিক, পৌষ, মাঘ ও চৈত্রে (৮ ও ৯ -সংখ্যক নিবন্ধ) প্রকাশিত হয়। সেই নিবন্ধসমূহে নানারূপ পরিবর্তন ও পরিবর্জন করিয়া 'চিঠিপত্র' ১২৯৪ সালে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। পরে ইহা ১৩১৪-১৫ সালে গদ্যগ্রন্থাবলীর অন্তর্গত 'সমাজ' গ্রন্থে সংকলিত হয় ; সে সময়েও রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে সম্পাদনা করেন। অতঃপর ইহা আর স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচলিত ছিল না। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে পুনঃসংকলন-সময়ে প্রথম-প্রচারিত গ্রন্থের পাঠ প্রধানতঃ অনুসৃত হইলেও, সাময়িক পত্রের এবং গদ্য গ্রন্থাবলীর পাঠ মিলাইয়া দেখা হইয়াছে— অনবধানে বা মুদ্রণপ্রমাদে অনভিপ্রেত 'পাঠান্তর' সৃষ্ট হইয়া থাকিলে পূর্বতন পাঠ গৃহীত হইয়াছে।

পঞ্চভূত

'পঞ্চভূত' ১৩০৪ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরে স্থানে স্থানে পরিবর্জিত ও পরিবর্তিত হইয়া ইহা গদ্যগ্রন্থাবলীর অন্তর্গত 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থে স্থান লাভ করে, স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচলিত ছিল না। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' হইতে পঞ্চভূত-অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া ১৩৪২ সালে পঞ্চভূতের একটি স্বতন্ত্র নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয় ; প্রথম সংস্করণ হইতে বর্জিত অংশগুলি প্রায় সবই এই সংস্করণে পুনরায় যোজিত হয় ও নূতন-লিখিত কোনো কোনো অংশ সন্নিবিষ্ট হয়। বর্তমানে-প্রচলিত এই সংস্করণই রবীন্দ্র-রচনাবলীতে অনুসৃত হইয়াছে ; তবে 'সাধনা' অথবা প্রথম সংস্করণের সহিত মিলাইয়া বিভিন্ন স্থানে পাঠসংশোধন করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি 'ডায়ারি' 'পঞ্চভূতের ডায়ারি' বা অন্য নামে 'সাধনা' মাসিক পত্রে কয়েক বৎসর ধরিয়া (মাঘ ১২৯৯ - কার্তিক ১৩০২) প্রকাশিত হইয়াছিল। রচনাবলীতে প্রত্যেক প্রবন্ধশেষে 'সাধনা'য় প্রকাশের কাল মুদ্রিত হইল।

বর্ণানুক্রমিক সূচী